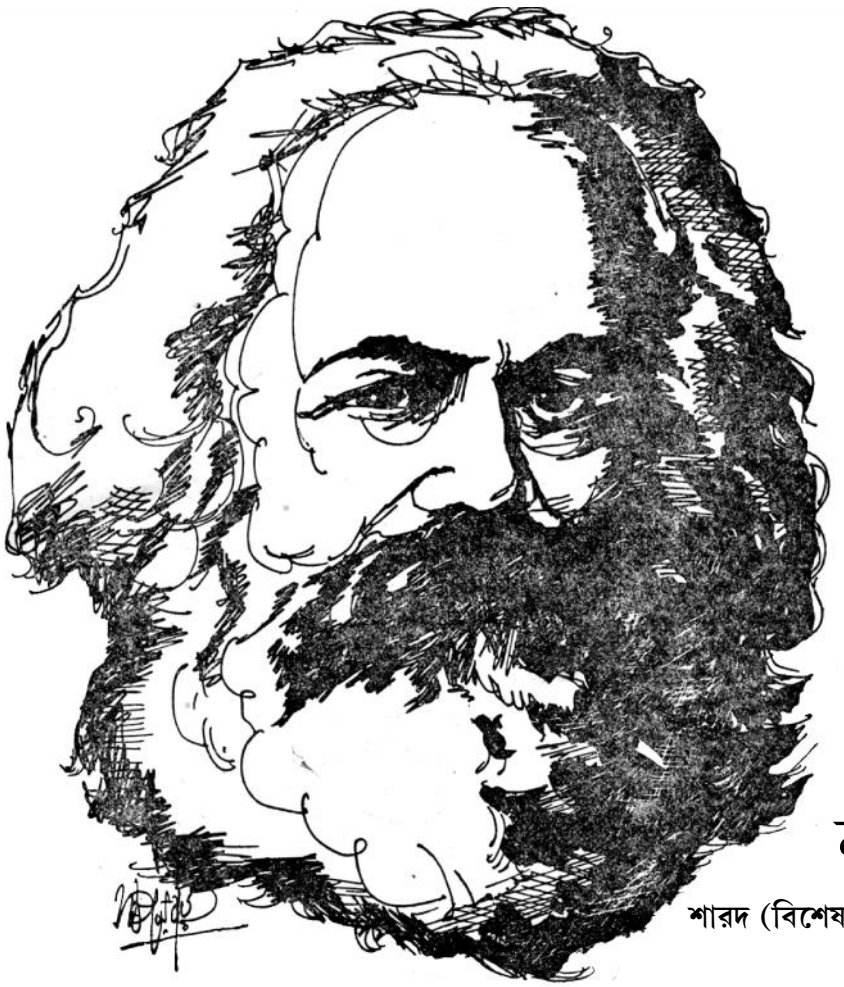

নতুন চিঠি

শারদ (বিশেষ মার্কস) সংখ্যা ১৯৮৩

জ্যোতি বসু

৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩

কার্ল মার্কস মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ''নতুন চিঠি'' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। শোষিত মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে মার্কসের চিন্তাধারা যাতে দিকে দিকে আরও ব্যাপক প্রসার লাভ করে সেই সংকল্প বর্তমান সময়ে প্রত্যেক মার্কসবাদীর পক্ষে গ্রহণ করা সমীচীন। সর্বহারা শ্রেণীর তত্ত্ব হিসেবে মার্কসবাদের সর্বজনীন মূল্যকে সকলের কাছে বোঝাতে হবে। আমাদের দেশের মার্কসবাদীদের আজ কর্তব্য হবে মার্কসের বৈপ্লবিক তত্ত্ব, শিক্ষা ও কার্যাবলীর বিভিন্ন দিকের গভীর অনুশীলন করা এবং মার্কসীয় পদ্ধতির ভিত্তিতে মার্কসের তত্ত্ব ও শিক্ষাগুলি দেশের সুনির্দিষ্ট অবস্থায় প্রয়োগের চেষ্টা করা। কার্ল মার্কসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর রচনা ও কার্যাবলীকেও অনুশীলন করতে হবে, কারণ এই দুই চিন্তাবিদের বৈপ্লবিক তত্ত্ব ও শিক্ষার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলসের দর্শন, রাজনৈতিক অর্থতত্ত্ব, ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগ, শ্রেণীসংগ্রাম ও সর্বহারা-শ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্ব ও সমাজতান্ত্রিক ও কম্যুনিস্ট সমাজের সাধারণ-তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা ও মৌলিক চিন্তা-ভাবনা বিশ্বের ইতিহাসে নতুন বাঁক এনে দিয়েছে। শোষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রামকে ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে মজবুত করতে মার্কস ও এঙ্গেলস অমূল্য অবদান রেখেছেন।

মার্কসীয় তত্ত্ব এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃত। মার্কস দেখিয়েছেন ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার ভিত্তিতে মনুষ্য-সমাজের ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম এবং পুঁজিবাদী সমাজের গোপন-রহস্য অর্থাৎ ''উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জন''—এই দুই তত্ত্ব আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মার্কস সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞানে পরিণত করেছেন।

ভারতবর্ষের ওপর মার্কসের রচনাবলী বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণের মুক্তি-আন্দোলনে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। ভারতবর্ষীয় পরিস্থিতির তথ্যবহুল এবং সুনিপুণ বিশ্লেষণ তাঁর রচনায় ধরা আছে। কার্ল মার্কসের গবেষণা ও আবিষ্কারের ভিত্তি হলো দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এটাই হলো মূলত মার্কসীয় পদ্ধতি। দেশের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের প্রয়োগকালে মার্কসীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর রচনা যুগে যুগে মনুষ্য-সমাজের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সঠিক পথনির্দেশ দিয়ে যাবে।

শোষণমুক্ত সমাজের জন্য অবিরত সংগ্রাম করে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা মহান বিপ্লবী ও বিজ্ঞানী মার্কসকে প্রকৃত শ্রদ্ধা আজ জানাতে পারি।

''নতুন চিঠি'' পত্রিকার মার্কস-সম্পর্কিত সংখ্যার বহুল প্রচার কামনা করি।

যুবক মার্কসের একটি কবিতা, ১৮৩৬

অনুবাদ : জিয়াদ আলী

সংকটহীন সহজ জীবন নয় তো আমার জন্য,
আমার ঝড়ো মনের কাছেও তেমন চাওয়া নয়;
বরং আমার জীবনটুকু সংগ্রামে থাক পূর্ণ
মহান এবং সুউচ্চ এক লক্ষ্যে যা অক্ষয়।

আমার মনের মধ্যে জমা শিল্প-শোভার ভাণ্ড
উজাড় হয়ে চল্‌কে উঠুক মানব জাতির হর্ষে,
আমি আমার বুদ্ধিবৃত্তি এবং বিবেক শৌর্যে
জড়িয়ে নেব সারা জগৎ উষ্ণ বুকের স্পর্শে।

এসো এখন জমাই পাড়ি সুদূর পথের লক্ষ্যে
হোক না সে-পথ কঠিন কঠোর আসুক অমা-রাত্রি,
ধূসরতা প্রার্থিত নয় এখন এ অস্তিত্বে,
আমরা তো নই লক্ষ্যবিহীন তারকাহীন যাত্রী।

ফোঁটায় ফোঁটায় চুইয়ে পড়া কর্ষ-ক্লেশের মধ্যে
শীতল সরীসৃপের জীবন আমরা তো কেউ চাই না,
আমরা তো চাই সাচ্চা মানুষ যেমন মনের গর্ভে
ফুটিয়ে তোলে ক্রোধ অনুরাগ আবেগ অহং কান্না।

ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে কার্ল মার্কসের প্রাসঙ্গিকতা

ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদ

সারা বিশ্বের মার্কসবাদীরা ১৯৮৩ সালকে কার্ল মার্কসের মৃত্যু-শতবর্ষ হিসেবে পালন করছেন। একশো বছর আগে তাঁর মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত মার্কসবাদ যেভাবে ক্রমবিকশিত হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত তা যেভাবে বিবর্তিত হয়ে এসেছে, সে-সম্পর্কে গভীর পর্যালোচনায় এইসব মার্কসবাদীরা পুরো বছরটিই নিয়োজিত থাকবেন।

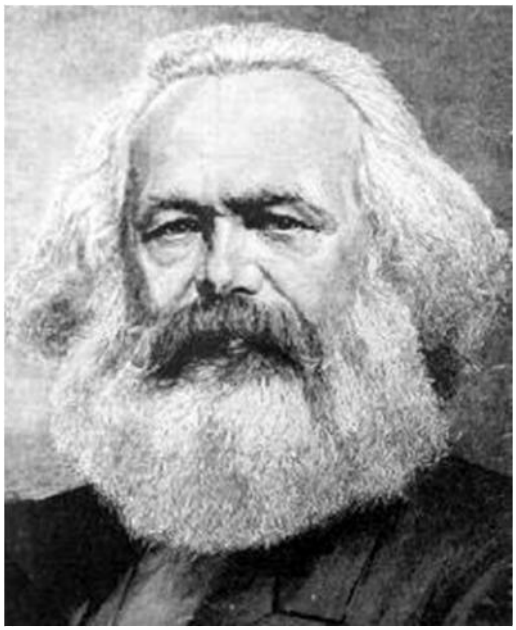

আমাদের ভারতীয় মার্কসবাদীদের কাছে বিষয়টির গুরুত্ব এইখানে যে, দ্বন্দ্বাত্মক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠাতা ভারত-সম্পর্কে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন এ-বছরটি হোল সেই প্রবন্ধমালার প্রথম প্রবন্ধটির একশো-তিরিশতম বছর। ১৮৫৩ সালের ১০ জুন তিনি 'ভারতে বৃটিশ শাসন' শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখেন। ২৫ জুন তা 'নিউইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর পরেই ২৪ জুন তারিখে লেখা এবং একই পত্রিকায় পূর্ববর্তী প্রবন্ধটির সঙ্গে একই তারিখে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধটির নাম 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী—তার ইতিহাস ও ফলাফল'। 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভাবী ফল' শীর্ষক তৃতীয় প্রবন্ধটি তিনি লেখেন ২২ জুলাই, এবং ওই পত্রিকায় ৮ আগস্ট তা প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধ-তিনটি লেখা হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন তৎকালীন (ইস্ট ইন্ডিয়া) কোম্পানীর শাসন এক গভীর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলছিল যার সমাধানের একমাত্র পথ ছিল কোম্পানীর শাসনের পরিবর্তে ভারতের সম্রাট (সম্রাজ্ঞী) হিসেবে বৃটিশ-রাজের প্রত্যক্ষ শাসন। মার্কস তাঁর পাঠকদের ব্যাখ্যা করে দেখাচ্ছিলেন, কোন্ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পশ্চাৎপটে এই সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে। সংক্ষিপ্ত সাংবাদিক মন্তব্যের আকারে হলেও প্রবন্ধগুলির মধ্যে ছিল মৌলিক তথ্যের বিরাট সম্পদ, এবং যাকে বলা যায় 'ভারতীয় সমস্যা'—সে-সম্পর্কে আরও মূল্যবান অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ। প্রাসঙ্গিক তথ্যের এইরকম সুদক্ষ পর্যালোচনার ভিত্তিতেই তিনি তাঁর বহুবিদিত পূর্বাভাষে বলেছিলেন—

''বৃটিশ বুর্জোয়ারা ভারতবাসীদের মধ্যে সমাজের যে-সব নতুন উপাদান ছড়িয়ে দিয়েছে তার ফললাভ করা তাঁদের (ভারতবাসীদের) পক্ষে সম্ভব হবে না, যতদিন না খোদ ব্রিটেনে বর্তমান শাসক-শ্রেণিসমূহ শিল্প-শ্রমিকদের দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়, অথবা যতদিন না স্বয়ং ভারতীয়রাই আপন শক্তি সঞ্চয় ক'রে ইংরেজের যোয়ালকে সম্পূর্ণ ছুড়ে ফেলে দেয়।''

ভারতীয় সমস্যার পর্যালোচনায় মার্কসের অবদান ১৯৫৩ সালে লিখিত ও প্রকাশিত প্রবন্ধ-তিনটিতেই শেষ হয়ে যায়নি। বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি তিনি ঘষ্ঠিভাবে অনুধাবন করছিলেন এবং সে-সব সম্পর্কে তাঁর মতামতও দিচ্ছিলেন। ভারতের ক্ষেত্রেও ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহের মধ্যে যে পরিস্থিতির রূপায়ণ ঘটেছিল, তাও তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং সে-সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। ১৮৫৭ সালের ৩০ জুন লিখিত এবং একই পত্রিকায় ১৫ জুলাই প্রকাশিত 'ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে শুরু করে এ-দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূলে কাঁপন-ধরিয়ে-দেওয়া এই ভারতীয় বিদ্রোহের প্রতিটি পর্যায় তিনি লক্ষ্য ক'রে গেছেন। মাসের পর মাস ধরে প্রধানত মার্কস এবং অংশত এঙ্গেলসও এ-সম্পর্কে যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন, তাতেই বোঝা যায় কী গভীর আগ্রহ নিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এই যুগ্ম-প্রতিষ্ঠাতা ''ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ''-এর গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করেছেন।

ভারতে বৃটিশ-শাসন যে গভীর সংকটের সম্মুখীন তার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পশ্চাৎপট সম্পর্কে লিখিত ১৮৫৩ সালের তিনটি প্রবন্ধ, ১৮৫৭ সালের ৩০ জুন থেকে ১৮৫৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৬ মাসের মধ্যে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের লিখিত প্রবন্ধাবলী এবং ১৮৭০-এর দশকে লেখা মার্কসের ''ভারতীয় ইতিহাসের উপর টীকা'' আমাদের যে বিপুল উপাদান সরবরাহ করে তার সাহায্যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতের গণতান্ত্রিক ও সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের পর্যালোচনা করা সম্ভব। কাজেই আশা করা যায়, ভারতীয়

মার্কসবাদীরা মার্কসের এই মৃত্যু-শতবর্ষটিকে ভারত সম্পর্কে মার্কসের রচনাবলীর গভীর অধ্যয়নের কাজে ব্যবহার করবেন।

এ-ব্যাপারে অবশ্য সতর্কতার সঙ্গে দেখতে হবে, আমরা যেন এমন চিন্তার ফাঁদে না পড়ে যাই যে ভারতীয় সমস্যার মার্কসবাদী অনুধাবনের জন্য ১৮৫৩ সালে এবং তারপর ১৮৫৩ থেকে ৫৮ সালের মধ্যে রচিত মার্কসের নিবন্ধগুলিই যথেষ্ট—আর কিছুই প্রয়োজন নেই। মনে রাখতে হবে, মার্কস যখন ভারতে বৃটিশ-শাসনের সংকট এবং তার বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রতিরোধ-সংগ্রামের বিষয়টি পর্যালোচনা করেছিলেন, তখন তা ছিল নিতান্তই প্রাথমিক স্তরে। তাঁর মৃত্যু-পরবর্তীকালে ভারতে বৃটিশ-শাসনের এই সংকট এবং ভারতীয় জনগণের প্রতিরোধ—উভয়েরই দ্রুত বিকাশ ঘটেছে।

কীভাবে স্তরে স্তরে এই বিকাশ ঘটেছে, সাময়িক সুরাহা সত্ত্বেও কীভাবে মূল ব্যাধির নিরাময়ের যে-কোনো প্রচেষ্টাই সংকটকে আরো গভীর এবং জনগণের প্রতিরোধকে আরো তীব্র করে তুলেছে, কীভাবে শেষ পর্যন্ত বৃটিশকে ভারত ছাড়তে হোল, ছাড়তে গিয়েও কীভাবে বৃটিশ একচেটিয়া গোষ্ঠী ও তার সহযোগীরা নয়া কৌশলে ভারতকে বিভক্ত করল, কীভাবে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের নবীন শাসকরা সেই পুরোনো কায়দায়ই শাসন চালিয়ে যেতে লাগলো এবং যে পুরোনো নীতিগুলি বৃটিশ-শাসনের সঙ্কট ডেকে এনেছিল সেই নীতিই অনুসরণ করে চললো—এই সমস্ত ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়েই কীভাবে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমশ জঙ্গী রূপ নিতে লাগলো, এবং কীভাবে এই বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য থেকেই এক নতুন শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী, আত্মপ্রকাশ করলো, আত্মসংহত হোল এবং অপরাপর বিপ্লবী শক্তিগুলির সঙ্গে একাত্ম হোল—সে-সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে যাওয়া এখানে সম্ভব নয়।

'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র সেই তাৎপর্যপূর্ণ অংশটি অবশ্য এখানে স্মরণ করা দরকার, যেখানে বলা হয়েছে : ''বুর্জোয়ারা নিজেদের মারণাস্ত্রই শুধু নিজেরা তৈরি করেছে তা নয়, সেই অস্ত্র যারা ধারণ করবে সেই আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী, সর্বহারা শ্রেণীরও সৃষ্টি করেছে।''

মার্কস যখন ভারত-বিষয়ক নিবন্ধগুলি রচনা করছিলেন, তখন ভারতীয় সমাজে বুর্জোয়া বা সর্বহারা কোনো শ্রেণীরই উদ্ভব ঘটেনি। এটা অবশ্য তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, ভারতকে করায়ত্ত করে বৃটিশ বুর্জোয়ারা তৎকালীন প্রাক্-পুঁজিবাদী ভারতীয় সমাজের উপর ইতোমধ্যেই মোক্ষম আঘাত হেনেছে। তারা শুধু পুরোনো ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদের মতো ধ্বংসাত্মক কাজই করেছে তা নয়, এক গঠনাত্মক ভূমিকারও সূচনা করেছে যে যে কাজগুলির মাধ্যমে সেগুলি হোল : ক) ভারতীয় ঐক্যের সংহতি ও প্রসার, খ) এতদ্দেশীয় এক সামরিক বাহিনী সৃষ্টির মাধ্যমে হিন্দু, মুসলমান, শিখ এবং উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মানুষের একত্র সমাবেশ, গ) স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রচলন, ঘ) জমিদারী ও রায়তওয়ারী—এই দুই রূপে জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রবর্তন, ঙ) বাষ্পীয় ইঞ্জিন, টেলিগ্রাফ লাইন, প্রভৃতি আধুনিক কৃৎকৌশলের প্রবর্তন, চ) সর্বোপরি, রেলগাড়ির প্রবর্তন, যার মাধ্যম দেশের অর্থনীতিতে সেই সমস্ত বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হবে যেগুলি ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের ফল হিসেবে একসময় দেখা দিয়েছিল।

বৃটিশ কর্তৃক গৃহীত এই গঠনাত্মক কাজগুলি আপনা-আপনিই ভারতের আধুনিকীকরণ সম্পন্ন করে দেবে, এমন কোন বিভ্রান্তি মার্কসের ছিল না। তিনি লিখেছিলেন : ''আমি জানি, ইংরেজ মিল-মালিকরা যে ভারতে রেল ব্যবস্থা পত্তন করতে চেয়েছিলেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের কারখানার জন্য স্বল্পব্যয়ে তুলা এবং অন্যান্য কাঁচামাল সংগ্রহ করা।'' তিনি আরো লিখেছিলেন : ''কিন্তু লোহা ও কয়লার সমৃদ্ধ একটি দেশে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যন্ত্রশক্তির প্রবর্তন একবার ঘটালে তার জাল-বিস্তারকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। দেশ জুড়ে বিস্তৃত রেল যোগাযোগ ব্যবহার রক্ষণাবেক্ষণ অসম্ভব যদি না সেই ব্যবস্থার আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার মতো শিল্প-প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করা হয়। এ থেকেই আবার অনিবার্য ভাবে গড়ে উঠবে রেল ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় এমন সব শিল্পের শাখা। সুতরাং রেল-ব্যবস্থাই প্রকৃত পক্ষে হবে ভারতে আধুনিক শিল্পায়নের অগ্রদূত।''

বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে মার্কস মন্তব্য করেছিলেন : ''ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার ভিত্তি যে জন্মগত শ্রমবিভাগ, যা কিনা ভারতীয় প্রগতি ও ভারতীয় শক্তির সবচেয়ে বড় বাধা, তার অবলোপ ঘটাবে রেল-ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত এই আধুনিক শিল্প।''

মার্কস এ-ব্যাপারে দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন যে ইওরোপের মতো ভারতেও আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের দুই শ্রেণী—বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটবে। উপরের কথাগুলি লেখার পরবর্তী ১৩০ বছর ধরে ঠিক সেই ঘটনাই ঘটছে।

মার্কসের ভারত-বিষয়ক পত্রাবলী রচনার ৫৫ বছর পরে তাঁর দীপ্তিমান শিষ্য লেনিন দেখালেন, ভারতে এক নবীন শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয়ই যে শুধু ঘটেছে তা নয়, সংগ্রামী স্বাধীনতা-যোদ্ধা লোকমান্য তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সম্মিলিত রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সেই শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পদার্পণ করেছে।

সেই সময় থেকে ভারতে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের দুই বিকাশমান বিরোধী শ্রেণী—বুর্জোয়া ও সর্বহারা—পরস্পরের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এ-লড়াই শুধু মজুরি, কাজের সময়, বাসস্থান, পণ্যমূল্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক প্রশ্নেই নয়, ভারতের স্বাধীনতার জন্য ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংগ্রামে কোন্ শ্রেণীর আধিপত্য বজায় থাকবে, সেই প্রশ্নেও বটে। বোম্বের শ্রমিকদের রাজনৈতিক আন্দোলনের তাৎপর্যের প্রতি লেনিনের অঙ্গুলিনির্দেশের পর যে সাতটি দশক বা তারও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, সেই সময়কালের বৈশিষ্ট্যই হল, স্বাধীনতার আন্দোলনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম।

রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে অবশ্য বুর্জোয়া শ্রেণীরই জয় হয়। বৃটিশ শাসকদের যখন ভারত ছেড়ে চলে যেতে হোল তখন এই শ্রেণীর হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি অবশ্য তখন নগণ্য ছিল না, এবং তারপর থেকে সংখ্যায় ও রাজনৈতিক শক্তিতে তা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আজ এই দুই শ্রেণী পরস্পর যুযুধান দুই শিবিরের নেতৃত্ব দিচ্ছে—একটি শিবিরে আছে বুর্জোয়ারা ও তাদের সহযোগীরা যারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে, বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছে জাতীয় স্বার্থ বন্ধক দিতে এবং শ্রমজীবী মানুষের উপর মোক্ষম আঘাত হানতে সদা-তৎপর। এবং অপর শিবিরে আছে তারা যাদের উদ্দেশ্য গণতন্ত্রকে বজায় রাখা, বহুজাতিক সংস্থা ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিহত করা এবং শহর বা গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা।

মার্কস যে-সময়ে ভারত-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন (১৮৩৫-৫৮), তখনও অবশ্য সর্বহারা শ্রেণি মঞ্চে অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু তিনি দেখেছিলেন চীন, পারস্য প্রভৃতি অন্যান্য এশীয় দেশের মতোই ভারতেও বিদেশী শোষণের ধাক্কা এসে পড়েছে নিঃস্ব-করে -দেওয়া গ্রামীণ গরীব মানুষদের ওপর। তিনি দেখেছিলেন, বিদেশী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের আক্রমণে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত মানুষ পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। তিনি দেখেছিলেন, প্রাক্-বৃটিশ আমলের শাসক

পরিবারগুলিও ক্ষমতাচ্যুত হচ্ছে এবং প্রতিরোধে বাধ্য হচ্ছে। এইসব প্রক্রিয়ার ফলে বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে যে ভারতীয় জনগণের ব্যাপকতম ঐক্য গড়ে উঠছে, তা-ও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের যুগ্ম-স্রষ্টা ভারতীয় বিদ্রোহের এই তাৎপর্যেরই বিশদ বিশ্লেষণ করছিলেন।

ভারতীয় বিদ্রোহের উপর ১৮৫৭-৫৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস যে-সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার সবগুলির মধ্যে যাওয়ার কোনো প্রস্তাব এখানে নেই, তার প্রয়োজন নেই। আমরা ১৮৫৭ সালের ১০ জুন ও ১৭ জুলাই তারিখ দুটিতে রচিত মার্কসের পৃথক দুটি প্রবন্ধের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। এই প্রবন্ধদুটির মধ্যেই মার্কস কীভাবে এই বিদ্রোহকে দেখেছিলেন তার মোটামুটি একটি সঠিক ছবি পাওয়া যাবে।

প্রবন্ধ-দুটির প্রথমটিতে বৃটিশ কর্তৃক ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠনের অন্তর্নিহিত বিরোধের উল্লেখ আছে। একদিকে ''এটা পরিষ্কার যে এ-দেশীয় সৈন্য-বাহিনীর বিশ্বস্ততার উপরই ভারতীয় জনগণের আনুগত্য ভিত্তিশীল।'' অপর দিকে, এদেশীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের মাধ্যমে ''বৃটিশ-শাসকরা একই সাথে সংগঠিত করে তুললো প্রতিরোধের এমন এক সাধারণ কেন্দ্রভূমি যা ভারতীয় জনগণের কখনোই ছল না।'' অন্য ভাষায় বলতে গেলে, নিজেরই বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক সংগঠিত শক্তি গড়ে না তুলে বৃটিশ-শাসনকে সংহত ও সুরক্ষিত করা যাচ্ছিল না। বৃটিশ স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য সশস্ত্র ভারতীয়ের যে সংগঠিত শক্তি সৃষ্টি করা হোল, তা-ই হয়ে উঠল বৃটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের প্রতিরোধের মূল কেন্দ্র।

মার্কস আরও লিখছেন : ''এদেশীয় সৈন্যবাহিনীর উপর কতটা আস্থা রাখা যায় তা সম্প্রতি পরিষ্কার দেখা গেল যখন বাঙলা প্রেসিডেন্সি পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রায় ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী হয়ে উঠল। এর আগেও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ হয়েছে, কিন্তু বর্তমান বিদ্রোহের চরিত্র ও ভয়ঙ্করতা আলাদা। এই সর্বপ্রথম সিপাহী রেজিমেন্টগুলি তাদের অফিসারদের হত্যা করেছে; মুসলমান ও হিন্দু পারস্পরিক বিরাগ ভুলে তাদের সাধারণ প্রভুর বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে; হিন্দুরা যে বিদ্রোহের সূচনা করলো, দিল্লির সিংহাসনে এক মুসলমান সম্রাটকে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তাঁর পরিসমাপ্তি ঘটলো; বিদ্রোহ কতকগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রইল না; এবং শেষত, ইঙ্গ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে বৃহৎ এশীয় জাতিগুলির সাধারণ বিক্ষোভ-প্রকাশের সঙ্গে মিলে গেলো—বাঙলার সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ তো নিঃসন্দেহে পারসিক ও চৈনিক যুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।''

এই বিদ্রোহ যে দলিত হবে এবং অনেক বেশি সংগঠিত ও উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বৃটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা যে বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারবে না, এ-ব্যাপারে মার্কস নিঃসন্দেহ ছিলেন। বিদ্রোহীরা ছিল ''বিবিধ সৈন্যের এক জনতার মতো, যারা তাদের অফিসারদের হত্যা করেছে, শৃঙ্খলার বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, এবং সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে এমন কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ সংগঠিত করার মতো দল এ মোটেই ছিল না। বিভ্রান্তিকে আরও বিভ্রান্ত করতে, বাঙলা প্রেসিডেন্সির সমস্ত দিক থেকে রোজ রোজ নতুন নতুন বিদ্রোহী-বাহিনী এসে দিল্লির বহুবিচিত্র সিপাহীর দলকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলতে লাগল, যেন পূর্ব-নির্দিষ্ট এক পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা অভিশপ্ত নগরীর গর্ভে নিজেদের নিক্ষেপ করছে।''

দিল্লি-নগরী যে বেশিদিন বিদ্রোহীদের দখলে থাকতে পারে না, মার্কসের মতে তা ছিল তর্কাতীত। মার্কস প্রকৃতপক্ষে বিস্মিত হয়ে ভাবছিলেন, কেন বৃটিশ সেনাবাহিনী নগরী দখল করার ব্যাপারে কালক্ষেপ করছে : দিল্লির পতনের খবর প্রতিদিনই প্রত্যাশিত ছিল।''

মার্কসের মতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল : ''এরপরে কী?'' ভারতীয় সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রের উপর বিদ্রোহীদের এক মাসের যুদ্ধহীন দখল সম্ভবত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উত্তেজক হিসেবে যদি এমন ভূমিকা পালন করে থাকে যার ফলে বাঙালী সৈন্যবাহিনী ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেল, উত্তরে কোলকাতা থেকে পাঞ্জাবে এবং পশ্চিমে রাজপুতনা পর্যন্ত বিদ্রোহ এবং সেনাবাহিনী ত্যাগ ছড়িয়ে পড়ল, এবং ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বৃটিশ কর্তৃত্বে কাঁপন ধরে গেল, তাহলে একথা ভাবার থেকে থেকে বড় ভুল আর কিছু হতে পারে না যে, দিল্লির পতন সিপাহীবাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হলেও, বিদ্রোহের সংক্রমণ রোধে কিংবা এর অগ্রগতি স্তব্ধ করে দিতে অথবা বৃটিশ-শাসন পুনরুদ্ধার করার পক্ষে যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।''

সুতরাং বিদ্রোহীদের হাত থেকে বৃটিশ সেনাবাহিনী যদি দিল্লিকে আবার ছিনিয়েও নেয়, তাহলেও সংকটের নিরসন হচ্ছে না। কেননা, ভারতীয় সেনানীদের মধ্যে তখন দেশব্যাপী আলোড়ন চলছে, ''অনেক রেজিমেন্ট প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে এদেশীয় সৈন্যরা বর্তমানে যে-ব্যাপারে নিযুক্ত সে-ব্যাপার ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তারা বিশ্বস্ত থাকবে এবং বৃটিশ কর্তৃত্বকে সমর্থন দেবে; এদেশীয় রেজিমেন্টগুলির মধ্যে যারা বিদ্রোহী রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষকে তারা সাহায্য তো করবেই না, বরংচ বিদ্রোহী 'ভাইদের'ই পাশে তারা দাঁড়াবে। কোলকাতা থেকে প্রায় প্রতিটি স্থানে এই সত্য রূপায়িত হয়েছে। এদেশীয় রেজিমেন্টগুলি কিছুদিন অক্রিয় ছিল, কিন্তু যে-মুহূর্তে তার নিজেদের যথেষ্ট শক্তিশালী বলে কল্পনা করেছে, সেই মুহূর্তে তারা বিদ্রোহ করেছে।''

'লন্ডন টাইমস্' পত্রিকার ভারতীয় প্রতিবেদকের বক্তব্যের নিম্নলিখিত অংশটি তিনি অনুমোদন সহকারে উদ্ধৃত করেছেন :

''এই লেখা পড়ে যদি আপনারা ধরে নেন যে সবকিছুই শান্ত, তাহলে বুঝে নিন যে এর অর্থ এদেশীয় সেনানীরা এখনো প্রকাশ্যে বিদ্রোহে নামেনি; বিক্ষুব্ধ অধিবাসীরা এখনো প্রকাশ্যে মাথা তোলেনি; তারা হয় খুবই দুর্বল নয়তো নিজেদের দুর্বল ভাবছে, অথবা আরো উপযুক্ত সময়ের জন্য তারা অপেক্ষা করছে। অশ্বারোহী বা পদাতিক এদেশীয় বাঙালী রেজিমেন্টের যে-কোনোটিতেও যদি আনুগত্যের প্রকাশ কোথাও দেখেন, তাহলে তা থেকে বুঝে নিন যে প্রশংসিত এইসব রেজিমেন্টগুলির মধ্যে অর্ধেকমাত্র প্রকৃতপক্ষে বিশ্বস্ত; বাকী অর্ধেকও বিশ্বস্ততার অভিনয় করছে মাত্র, উপযুক্ত সময় এলে ইউরোপীয়দের অসতর্ক অবস্থাটা আরো ভালোভাবে বুঝবার অবস্থানে থেকে অথবা সন্দেহ প্রতিহত করার মাধ্যমে, সহযোগী বিদ্রোহী বন্ধুদের সাহায্য করার ক্ষমতা তাদের আরো বেশি।''

কাজেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহকে বৃটিশ-শাসকরা 'মিউটিনি আখ্যা দিয়ে যেভাবে দেখাতে চাইছিল, সেভাবে কেবলমাত্র সিপাহী-স্তরের সাধারণ এক খণ্ড-বিদ্রোহ হিসেবে মার্কস একে দেখেননি। মার্কস এই বিদ্রোহকে দেখেছিলেন ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রকাশ হিসেবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী সিপাহীরা তাঁর মতে ছিল বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিমাত্র।

মার্কস লক্ষ্য করেছিলেন যে সিপাহীদের বিক্ষোভ ও ক্রোধের মধ্যে ধর্ম ও বর্ণের একটা চড়া সুর ছিল, ''পাছে সরকার তাদের

ধর্মে হস্তক্ষেপ করে এই এক আশংকা ছিল এতদ্দেশীয়দের মধ্যে।" তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন, ''গরু ও শুয়োরের চর্বি-মাখানো কাগজে-তৈরি কার্তুজের কথা, যা ব্যবহার করতে গেলে দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে হোত বলে এতদ্দেশীয়রা তাকে ধর্মীয় অনুশাসন-বিরোধী বলে মনে করতো এবং ফলে যা আঞ্চলিক বিদ্রোহের সংকেত হিসেবে কাজ করেছিল।"

এ-ব্যাপারটি অবশ্য ছিল ভারতীয় জনগণের এক গভীর অনুভূতি প্রকাশের অব্যবহিত কারণমাত্র। মার্কস তাঁর প্রথমদিকের লেখায় এই অনুভূতিকেই ''পুরোনো জগতকে হারানো অথচ নতুন জগতের সন্ধান না-পাওয়া'' বলে বর্ণনা করেছেন, যা কিনা ''ভারতীয় জনগণের দুর্দশার ওপর এক বিশেষ ধরনের বিষণ্ণতার ছায়া ফেলেছে।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ অবশ্যই দমিত হলো মার্কস যেমন আগেই বলেছিলেন। কিন্তু যা দমন করা গেল না তা হোল ভারতীয় জনগণের ''পুরোনো জগতকে হারানো ও নতুন জগতকে খুঁজে না-পাওয়ার অনুভূতি। অপর পক্ষে এই অনুভূতি বেড়েই চললো এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরে তা বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হতে লাগলো। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির ধারাবাহিক আলোচনা না করে সংক্ষেপে দেখা যাক্ কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ঠিক ৯০ বছর পরে বৃটিশদের বাধ্য করলোভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ভারত ছেড়ে চলে যেতে, যদিও যাবার আগে সার্থকতার সঙ্গে তারা ভারতের অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান এই দুটি রাষ্ট্র তৈরি করে দিয়ে গেল।

১৮৫৭ সালের মে-জুন মাসে যেমন, পুরো ১৯৪৬ সাল ও ১৯৪৭ সালের প্রথম কয়েকটি সপ্তাহ ধরে তেমনি ভারতীয় জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাছাড়াও, ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহ যেমন মার্কসের ভাষায় বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে পারসিক ও চৈনিক যুদ্ধগুলির কাজে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত বৃহৎ এশীয় জাতিগুলির সাধারণ বিক্ষোভ প্রকাশের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল", ১৯৪৬-৪৭ সালের গণ-অভ্যুত্থানও তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল, যে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পরিণতিতে পূর্ব ইউরোপ, কোরিয়া, চীন, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলির বিজয় ঘোষিত হোল।

ভারতের বুকেও, ৯০ বছর আগের মতোই, জনগণের বিভিন্ন অংশের সংগ্রামী মানুষ আর একটি বিদ্রোহের মধ্যে তাদের প্রতিফলন দেখতে পেলো—সেই বিদ্রোহ হোল ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত ভারতের রাজকীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ। এছাড়াও, বোম্বের সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী এবং সমস্ত দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলি ভারতের রাজকীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহী সেনাদের সঙ্গে সংহতি জানাতে এগিয়ে এলো।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের নেতারা, যাঁরা সগর্বে দাবি করতেন তাদের সাম্রাজ্যে ''সূর্য কখনো অস্ত যায় না", এবার বুঝতে পারলেন যে খেলা শেষ। তাঁরা অবশ্য লক্ষ্য করেছিলেন যে, সশস্ত্র সৈনিকদের নেতৃত্বাধীন জনগণ যদিও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সম্পূর্ণ অবসান ও ভারতীয় জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতা আদায় না করে শান্ত হবেন না, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে আসীন কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ কিন্তু আপসের জন্য প্রস্তুত। কাজেই প্রশ্ন দাঁড়ালো, এই দুই সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে আপস রক্ষা করে কীভাবে ভারতের উপর সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্বের যতটুকু বাঁচিয়ে রাখা যায় তার জন্য চেষ্টা করা যায়; এইভাবে তারা এমন অবস্থারও সৃষ্টি করতে পারবে যেখানে দুই সদ্য-গঠিত রাষ্ট্র সমানে নিজেদের মধ্যে লড়াই চালিয়ে যাবে এবং সাম্রাজ্যবাদ সেই সুবর্ণ-সুযোগকে কৌশলে কাজে লাগাতে পারবে।

১৮৫৭ সাল থেকে শুরু করে বহু প্রজন্ম তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করেছে যে স্বাধীনতার জন্য, সেই সদ্য-অর্জিত স্বাধীনতার ফললাভের সুযোগ থেকে অবশ্য এর ফলে বঞ্চিত হোল শিল্প ও কৃষি-শ্রমিক, বিপুল সংখ্যক কৃষক, কারিগর ও ক্ষুদ্র মালিক, পেশাজীবী প্রভৃতি সহ সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ। কিন্তু একটি স্বীকৃত শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো সংগ্রামী মানুষ। তারা গড়ে তুলেছিল তাদের নিজস্ব সংগ্রামী সংগঠন—ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ সভা, কৃষি-শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র, যুবক, মহিলা সংগঠন, ইত্যাদি। প্রতিটি সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই সমস্ত সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি, যার মধ্যে ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর ভিত্তিশীল এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের সমকালীন এবং তাদের উভয়েরই মৃত্যুর পরবর্তীকালীন পৃথিবীতে সংঘটিত বিপ্লবগুলির অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত দলগুলি।

স্বাধীনতা অর্জন এবং তারপরে দেশের জন্য এক বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করার ফলে দুটি রাজনৈতিক পক্ষের মুখোমুখি সমাবেশ ঘটল। একদিকে রইল ভারতীয় ইউনিয়নের নতুন শাসক-দল, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। এই দল জনগণের সামনে পুঁজিতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আদর্শ তুলে ধরল। অন্য কয়েকটি (বিরোধী) দলও অবশ্য ছিল, যারা কোন কোন ব্যাপারে এই শাসক-দলের সঙ্গে ভিন্নমত হলেও অগ্রগতির এই বাৎলানো পথে একই সঙ্গে চললো।

অন্য ভাষায় বলতে গেলে, শাসক কংগ্রেস দলের সমশ্রেণী, বুর্জোয়া-জমিদার শাসকশ্রেণীভুক্ত আরো কয়েকটি দল ছিল এবং আছে, যারা বিরোধী শিবিরে থাকলেও আর্থ-সামাজিক প্রশ্নে একই মতাবলম্বী। শাসকশ্রেণীভুক্ত এইসব দল ও সংগঠনের বিপরীতে আছে আর একটি শিবির, যেখানে সমাবিষ্ট হয়েছে সর্বহারা-গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সংগ্রামী সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলি।

এই দুই শ্রেণী-সমাবেশের মধ্যে সংঘাত এবং এই দুই সমাবেশের মধ্যে অন্য নানা সংগঠনের ঘনঘন স্থান পরিবর্তন—এই হোল ১৯৫০ সালের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ ও বিশেষ করে ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকে ভারতীয় রাজনীতির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

মার্কসের মৃত্যুর এই শতবর্ষে এবং মার্কসের ভারত-বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধের একশ তিরিশতম এই বছরে, এই দুই রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশের মধ্যে সংঘাত উল্লেখযোগ্যভাবে তীব্র রূপ ধারণ করেছে। দেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তাদের পথ ঠিক করে নিয়েছেন—এপথ গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের জন্য যারা প্রস্তুত তাদের মধ্যে ঐক্যকে সুদৃঢ় করার ও স্বৈরতন্ত্রের দিকে শাসকশ্রেণির অভিসারকে স্তব্ধ করার পথ এবং সেই সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের সমস্ত সংগ্রামী সংগঠনের স্বাধীন শক্তি ও ঐক্যকে বিকশিত করারও পথ। সাধারণভাবে মার্কসের রচনাবলীর এবং বিশেষভাবে তাঁর ভারত-সম্বন্ধীয় রচনাবলীর, গভীর অধ্যয়ন এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করবে।

(শারদীয় নতুন চিঠি, ১৯৮৩। বানান অপরিবর্তিত)

পুঁজিবাদী শোষণের রহস্যোদ্ঘাটনে কার্ল মার্কস

নিরুপম সেন

"ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের দ্বারা পুঁজিবাদী উৎপাদনের রহস্য উদ্ঘাটন এই দুই বিরাট আবিষ্কারের জন্য মার্কসের কাছে আমরা ঋণী।" মার্কসের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলি বলেন মার্কসের অকৃত্রিক বন্ধু ফেডারিক এঙ্গেলস্। ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধিই মার্কসকে অর্থনীতিশাস্ত্রের গভীরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সমাজ কিভাবে বিকশিত হচ্ছে, এক সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে অন্য সমাজ ব্যবস্থায় কিভাবে তা রূপান্তরিত হচ্ছে—এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই মার্কস সিদ্ধান্তে আসেন যে মানুষকে প্রথমে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তার জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদন করতে হয়েছে। অন্য সব কিছুর আগে তার দরকার হয়েছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সমস্যার সমাধান করার। একাজ করতে গিয়ে মানুষ একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত হয়েছে, উৎপাদনে অংশ নিয়েছে, উৎপাদন সামগ্রী নিজেদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করেছে। এ সবের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এটিই হল সমাজের মূল ভিত্তি। এর ওপর রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি দাঁড়িয়ে থাকে। সমাজ-বিকাশের চাবিকাঠি তাই খুঁজতে হবে মানুষের পরিবর্তনশীল চিন্তাধারার মধ্যে নয়, সেই সমাজের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। মার্কসের এই উপলব্ধিই তাঁকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি সেই সময় পুঁজিবাদী অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর দেশ ইংল্যাণ্ডে এসে গভীরভাবে অর্থনীতিচর্চায় মনোনিবেশ করেন। বিশ্বের অর্থনীতির ক্ষেত্রে তখন সর্বাপেক্ষা অগ্রসর চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্বও করত ইংল্যাণ্ড। পুঁজিবাদী শোষণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করার ব্রত নিয়ে মার্কস তাঁর গবেষণা শুরু করেন। দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তিনি পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির চুলচেরা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন।

দীর্ঘ ২৫ বছর গভীর অধ্যবসায়, নিরলস সাধনা ও গবেষণার পর ১৮৬৭ সালে মার্কস তাঁর অমূল্য গ্রন্থ 'পুঁজি'-র প্রথম খণ্ড লেখা শেষ করেন। এই বইয়েই তিনি তাঁর মূল অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ব্যক্ত করেন। মার্কসের অর্থনীতির আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্কের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতিদের কিভাবে মুনাফা হয়, শ্রমিকশ্রেণী শোষিত হয়, তিনি অকাট্য যুক্তির সাহায্যে দেখিয়ে দেন। মার্কসের আগে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদরা যে সকল প্রশ্নের সমাধান করতে পারেন নি, মার্কস তার সমাধান করলেন।

অর্থশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলির সূত্র ধরেই তিনি একে আরও বিকশিত এবং সুসঙ্গত রূপ দিলেন। চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের দুই অনন্যসাধারণ প্রতিভা এ্যাডাম স্মিথ এবং ডেভিড রিকার্ডোর অর্থনৈতিক নীতিগুলির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতা ছিল মার্কস তা কাটিয়ে তুললেন।

শ্রমই সকল সম্পর্দের এবং মূল্যের উৎস—স্বয়ং এ্যাডাম স্মিথই এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। পণ্যের মূল্য নির্ধারণে এবং সম্পদ সৃষ্টিতে শ্রমের ভূমিকার অপরিহার্যতার কথা মার্কস-এর কোন আবিষ্কার নয়। পুঁজিবাদ বিকাশের সূচনা লগ্নেই শ্রমের এ ভূমিকার কথা চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের প্রবক্তাদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এই আবিষ্কারই পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন করে দিল। এঙ্গেলস বললেন, ''অর্থশাস্ত্র যখনই এই প্রতিপাদ্য দিয়েছে যে শ্রমই হল সব সম্পদ ও সব মূল্যের উৎস, তখন থেকেই এই প্রশ্নটা অনিবার্য হয়ে উঠেছে—তাহলে, মজুরী-খাটা শ্রমিক যে নিজের শ্রমে উৎপন্ন মূল্যের সবটুকু পায়না, যে মূল্যের এক অংশ তাকে পুঁজিপতির কাছে সমর্পণ করে দিতে হয়, এ তথ্যের সঙ্গে তা মেলে কি করে? বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা ও সমাজতন্ত্রীরা উভয়েই এ প্রশ্নের বিজ্ঞান-সম্মত উত্তর দেবার বৃথা চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত মার্কস এগিয়ে এলেন তার সমাধান নিয়ে।'' (সূত্র—কার্ল মার্কস-এঙ্গেলস, জুন ১৮৭৭)। শ্রমই সকল সম্পদ ও মূল্যের উৎস একথা বলার পরে স্বভাবতঃই প্রস্ন ওঠে যে সমাজে যারা শ্রম করে না, যারা উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার জন্য সম্পদের মূল্যের একটি অংশ ভোগ করে, তাদের অংশটি তাহলে কে সৃষ্টি করে। অর্থাৎ পুঁজিপতিদের হাতে যে সম্পদ জমা হয় তা কিভাবে এবং কেন হয়? ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদের ভেরীবাদক 'ম্যালথ্যাস'-এর জনৈক ছাত্র শ্রমের দ্বারা সম্পদ বা মূল্যসৃষ্টির সমালোচনা করতে গিয়ে আসল কথাটি বলে ফেললেন। তিনি বললেন, ''শ্রমই হচ্ছে সম্পদের একমাত্র উৎস এ শিক্ষা যেমন বিপজ্জনক তেমনই ভ্রান্ত। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ বক্তব্য তাদের হাতকেই শক্তিশালী করে যারা বলতে চায় সমস্ত সম্পত্তি শ্রমজীবী শ্রেণীর ও অন্যরা যা পায় তা হল তাদের কাজ থেকে জোর করে লুট করে নেওয়া অংশ। (সূত্র : Theories of Surplus Value—Karl Marx)

চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের প্রবক্তরা পুঁজিপতিদের মুনাফার উৎস সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিলেন তা সন্তোষজনক নয়। তাঁরা বললেন, মালিক তার পুঁজির জন্য মুনাফা পায়, জমির মালিক তার জমির জন্য খাজনা পায়, আর শ্রমিক মজুরী পায় তার শ্রমের দরুণ। পুঁজি বা জমি কিভাবে মুনাফা বা খাজনা সৃষ্টি করতে পারে তার কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না। মার্কস-এর মূল আবিষ্কার এখানেই—তিনি দেখালেন যে পণ্যের মূল্য সৃষ্টি হয় শ্রমিকের শ্রমে। সেই পণ্য উৎপাদনে যে গড় সামাজিক শ্রম লাগে, তার দ্বারাই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। শ্রমিককে মজুরী হিসাবে যা দেওয়া হয়, তা শ্রমের দাম নয়, শ্রমিকের শ্রম-ক্ষমতার দাম। শ্রমের দাম কথাটির কোন অর্থ হয় না কেননা পণ্যের মূল্য নির্ধারণের মাপকাঠিই হল শ্রম। মার্কসই প্রথম শ্রম এবং শ্রম-ক্ষমতার মধ্যেকার পার্থক্য আবিষ্কার করলেন এ কাজ করতে গিয়ে তিনি শ্রমের দু-ধরনের চরিত্রের ব্যাখ্যা দিলেন, যা পণ্যের দু-রকম মূল্য সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। মার্কস-এর এটাই একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের সাথে মার্কস এই জায়গায় পার্থক্য টানলেন। মার্কস এঙ্গেলসকে লেখা এক চিঠিতে বললেন, ''আমার বইয়ের যেটা সেরা জিনিষ তা হল ১) শ্রমের প্রকাশ উপযোগ-মূল্যে ঘটছে, না বিনিময়-মূল্যে ঘটছে (এর উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে তথ্য সম্পর্কে যাবতীয় উপলব্ধি) তার নিরিখে শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্র—যার উপর প্রথম অধ্যায়েই জোর দেওয়া হয়েছে; ২) মুনাফা, সুদ, জমির খাজনা ইত্যাদি অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্যের বিশেষ রূপ নির্বিশেষে তার তত্ত্বানুসন্ধান।'' (সূত্র : কার্ল মার্কস, ই. স্তেপানোভা / পৃ. ২৩৪)।

প্রতিটি পণ্যের মূল্য দুই-ধরনের—প্রত্যেক পণ্যই মানুষের কোন না কোন কাজে লাগে, তাই তার একটি ব্যবহারিক মূল্য আছে। আর কোন জিনিষ তখনই পণ্যে রূপান্তরিত হয় যখন সেটি বিক্রয়ের জন্য বা বিনিময়ের জন্য উৎপাদিত হয়। বাড়ির উঠানে লাগানো বেগুন গাছের বেগুন যদি বাড়ীর লোকেরাই খায় তখন তা পণ্য হবে না, যদিও তার ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। কিন্তু যদি সেই বেগুন বাজারে নিয়ে যাওয়া হয় বিক্রির জন্য তখনই তা পণ্যে রূপান্তরিত হয়। তখন বেগুনের বিনিময়ে হয় টাকা কিংবা অন্য কোন জিনিষ আমরা পেতে পারি। এটাই হল পণ্যের বিনিময় মূল্য। আমরা সাধারণত পণ্যের মূল্য বলতে এই বিনিময় মূল্যকেই বুঝি। মার্কস দেখালেন যে, পণ্যের এই দুটি মূল্য সৃষ্টি করে দুই-ধরনের শ্রম, একটি হল নির্দিষ্ট শ্রম, অপরটি হল বিমূর্ত শ্রম। কামার, কুমোর, তাঁতি, স্যাকরা ইত্যাদি নাম করলেই আমরা বুঝতে পারি কে কোন কাজে দক্ষ। স্যাকরা গহনা তৈরীতে দক্ষ, তেমনই ছুতোর কাঠের কাজ জানে, এদের প্রত্যেকেরই কাজের ধরণ, দক্ষতা আলাদা। এই যে বিশেষ দক্ষতাযুক্ত শ্রম যা একটি নির্দিষ্ট রূপে কামার, কুমোর, স্যাকরা, তাঁতী, জেলে ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, একেই বলে নির্দিষ্ট শ্রম, বা শ্রমের নির্দিষ্ট চরিত্র এর দ্বারা প্রকাশ পায়। কিন্তু কামার-কুমোর যার যে ধরনেরই কর্মদক্ষতা থাকুক না কেন প্রত্যেককেই তার নির্দিষ্ট কাজটি করতে গিয়ে মেহনত করতে হয়। এই কাজের ফলে তার শরীরের ক্ষয়ক্ষতি হয়, ঘাম ঝরে, ক্লান্তি আসে, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ধরনের শ্রমের পেছনেই আছে মানুষের এই মেহনত বা পরিশ্রম। এই মেহনত আমাদের সামনে কখনই প্রতিভাত হয়না। একেই মার্কস বলেছেন, বিমূর্ত শ্রম।

যে কোন পণ্যের ব্যবহারিক মূল্য সৃষ্টি করে মানুষের নির্দিষ্ট শ্রম। একখণ্ড ইস্পাত কামারের দক্ষতাতেই পরিণত হতে পারে আমাদের অতি প্রয়োজনীয় কাটারী বা কাস্তেতে। অথবা স্যাকরার হাতের যাদুর স্পর্শেই একতাল সোনা নববধূর কণ্ঠের মণিহারে রূপান্তরিত হয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এক পণ্যের সাথে আরেক পণ্যের বিনিময়-মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হবে। একই পণ্যের মধ্যে বিনিময় হয় না। তাহলে একটি পণ্য অপর একটি পণ্যের সাথে বিনিময়ের অর্থ হল দুই ধরনের নির্দিষ্ট শ্রমের মধ্যে বিনিময়। কামারের আর কুমোরের শ্রমের ধরন আলাদা। যদি হাঁড়ি বা কলসীর সাথে ছুরি বা কাস্তের বিনিময় করতে হয় তাহলে একটি ছুরি পেতে কটি হাঁড়ি প্রয়োজন হবে তা কি করে নির্ধারিত হবে? এই দুটি পণ্যের মধ্যে এমন কোন একটি বিষয় থাকতে হবে যা দুটিতেই আছে। কামার এবং কুমোর এদের দুজনের মধ্যেই যেটি সাধারণ তা হল বিমূর্ত শ্রম। তাই মার্কস বললেন, পণ্যের বিনিময়-মূল্য নির্ধারণ করে দুই পণ্যের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিমূর্ত শ্রম। এই বিমূর্ত শ্রমই পণ্যের বিনিময়-মূল্য নির্ধারণের মাপকাঠি। মার্কস বললেন, ''আমিই প্রথম পণ্যের মধ্যে নিহিত শ্রমের দুই-ধরনের প্রকৃতির কথা বলি এবং তাকে গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। কেননা এটাই হল মূল যার ওপরে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ ধারণার মোড় ঘুরেছে। আমাদের এর আরও গভীরে যেতে হবে।'' (Ref. Capital. Vol. I, Page 49)

বিমূর্ত শ্রমের পরিমাণের ওপর পণ্যের মূল্য নির্ভরশীল। এর পরিমাণ মাপা হয় সময় দিয়ে অর্থাৎ একটি পণ্য উৎপাদন কতখানি শ্রম লেগেছে। একটি পণ্য উৎপাদন সকলেই যে একই সময়ের

মধ্যে করে উঠতে পারবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যে একটু বেশী চটপটে তার কম সময় লাগে, লাগতে পারে। আবার যন্ত্রপাতি ব্যবহারেও সময়ের হেরফের হতে পারে। এর জন্য একই পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিনিময় মূল্য হয় না। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে একটি পণ্য উৎপাদনে যে গড় সামাজিক শ্রম লাগে তার দ্বারাই পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়।

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি, শ্রমিক যদি তার শ্রমের দামই মজুরী হিসেবে পেত তাহলে সবটুকুই শ্রমিকের প্রাপ্য হত। কিন্তু শ্রমিক তা পায় না। মূল্যের একটি অংশ উৎপাদনের উপায়গুলির যে মালিক সে পায়। মার্কস এখানেও একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন, পণ্যের বিনিময়-মূল্য যেহেতু শ্রমের দ্বারাই নির্ধারিত হয় সেইজন্য 'শ্রমের মূল্য' এ ধারণাটি উদ্ভট। শ্রমিককে মজুরী হিসাবে যা দেওয়া হয় তা হচ্ছে তার শ্রম-ক্ষমতার দাম। শ্রম এবং শ্রমক্ষমতা এক নয়। শ্রম-ক্ষমতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে মার্কস বললেন, ''শ্রমক্ষমতা বলতে আমাদের বুঝতে হবে মানুষের মধ্যে সেই শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা যা সে কোন একটি বস্তুর ব্যবহারিক মূল্য সৃষ্টির জন্য কাজে লাগায়।'' (সূত্র—Capital. Vol. I, Page 164) শ্রম-ক্ষমতার ব্যবহার হল শ্রম। অর্থাৎ কারখানায় একজন শ্রমিকের যখনই ৮ ঘণ্টা / ১০ ঘণ্টা তার শ্রম-ক্ষমতা ব্যবহৃত হচ্ছে, সেটাই হল শ্রম। মালিক দাম দিচ্ছে শ্রম-ক্ষমতার আর নিচ্ছে শ্রম। শ্রম-ক্ষমতার দামটি নির্ধারিত হয় একই কায়দায় অর্থাৎ সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় গড় সময়ের ভিত্তিতে। মার্কস বললেন, ''শ্রম ক্ষমতার মূল্য নির্ধারিত হয় অন্যান্য পণ্যের মতোই তার উৎপাদনে ও পুনরুৎপাদনে, প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের উপরে।'' (সূত্র—ঐ—পৃষ্ঠা—১৬৭)। এর অর্থ হল, একজন শ্রমিকের কর্মক্ষমতা অর্জনের জন্য তাকে খেতে পরতে হয়েছে। প্রথম দিন কারখানার কাজ করার পরে পরের দিন আবার যাতে সে কাজে আসতে পারে এবং যদি সে মারা যায় অথবা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন সে যাতে অপর একজন শ্রমিককে তার পরিবর্তে দিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হয়। আর এটা করার জন্য অর্থাৎ তার জীবনধারণের জন্য এবং পুনরুৎপাদনের জন্য তার ন্যূনতম যা প্রয়োজন তারই ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় শ্রমক্ষমতার মূল্য বা মজুরী। এর সাথে কারখানায় সে কতক্ষণ কাজ করল তার কোন সম্পর্ক নাই। কারণ কারখানায় ঢোকার আগেই শ্রমিকের কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে তার মজুরী নির্ধারিত হয়ে যায়। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ফিটার, ড্রাইভার এদের সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন মজুরী নির্ধারিত হয় ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ধরুন আমরা একটি পাম্প কিনব। পাম্পাটি বাড়িতে নিয়ে এসে কতক্ষণ চালাব তার ওপরে পাম্পের মূল্য নির্ধারিত হয় না। পাম্পটি কত অশ্বশক্তিবিশিষ্ট তারই উপর পাম্পের মূল্য নির্ভর করে। পাম্পটি কেনা হয়ে যাবার পরে পাম্পটির ব্যবহার মালিকের ইচ্ছাধীন। এর সাথে দামের কোন সম্পর্ক নাই। শ্রম-ক্ষমতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু একটি পার্থক্য আছে। সেটি হল, পাম্পটি খরিদ করার সাথে সাথে সেটির দাম দিয়ে দিতে হয় এবং তা পূর্বতন মালিকের কাছ হতে নতুন মালিকের অধিকারে চলে আসে। শ্রম-ক্ষমতার ক্ষেত্রে তা হয় না। প্রথমতঃ শ্রম-ক্ষমতার দামটি দেওয়া হয় তাকে ব্যবহারের পর, আর শ্রম-ক্ষমতাকে শ্রমিকের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, একমাত্র মালিক তাকে ব্যবহার করেই নিজের অধিকারে আনতে পারে। সেইজন্য শ্রমিকের মজুরীটি প্রতিভাত হয় শ্রমের দাম হিসাবে, যদিও আসলে তা শ্রম-ক্ষমতার দাম।

শ্রম-ক্ষমতা নামক পণ্যটি এক বিশেষ গুণের অধিকারী। এটি নিজের যা মূল্য তার থেকেও বেশী মূল্য সৃষ্টিতে সক্ষম। অর্থাৎ শ্রম-ক্ষমতাকে ব্যবহার করে মালিক মজুরী হিসাবে শ্রমিককে যা দেয় তার থেকেও সে বেশী আদায় করে নিতে পারে। শ্রম-ক্ষমতার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি আমাদের বোঝা দরকার। সমাজের বিকাশই থমকে যেত যদি মানুষ নিজের জীবন-ধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার থেকেও বিশী উৎপাদন করতে না পারত। মার্কস বললেন, ''শ্রম-ক্ষমতার মূল্য এবং এই শ্রম-ক্ষমতা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে মূল্য সৃষ্টি করে সে দুটির পরিমাণ ভিন্ন।'' (সূত্র : ক্যাপিটাল, পৃষ্ঠা ১৮৮) তিনি আরও বললেন যে অন্যান্য পণ্যের মতোই শ্রমক্ষমতারও ব্যবহারিক এবং বিনিময় মূল্য আছে। শ্রমক্ষমতার ব্যবহারিক মূল্য হল তার নূতন মূল্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা। আমরা আগেই বলেছি শ্রম-ক্ষমতার ব্যবহারই হল শ্রম আর এই শ্রমই পণ্যের বিনিময়-মূল্য সৃষ্টি করে। সেই জন্যই মালিক শ্রমক্ষমতাকে ব্যবহার করতে চায়, শ্রম-ক্ষমতা তার নিজের মূল্যের থেকে যে বেশী মূল্য সৃষ্টি করে সেটাই হল উদ্বৃত্ত মূল্য। মার্কসের এই আবিষ্কারটি পুঁজিবাদী শোষণের স্বরূপটি বোঝার চাবিকাঠি, এবং রিকার্ডো ও তাঁর অনুগামীরা যে সমস্যার সমাধান করতে পারেননি মার্কস তা করলেন। আগের অর্থনীতিবিদরা বলতে চেয়েছিলেন, শ্রমিকেরা তাদের শ্রম বিক্রি করে এবং মজুরী হিসাবে তার পুরো শ্রমের মূল্যই ফেরৎ পায়। যেহেতু পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমিককে কাজ করিয়ে নেবার পর ১ দিন, ১ সপ্তাহ বা ১ মাস বাদে মজুরী দেওয়া হয়, সেজন্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাতে তার শ্রমের দামই দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়। কারখানায় একজন শ্রমিক যদি ৮ ঘণ্টা কাজ করে তাহলে দেখা যাবে সে ৪ ঘণ্টার মধ্যেই যা উৎপাদন করছে তা দিয়েই তার মজুরী হয়ে যাবে। কিন্তু শ্রমিক চুক্তিবদ্ধ যে, সে কারখানায় ৮ ঘণ্টা কাজ করবে। ফলে বাকী ৪ ঘণ্টায় সে যা উৎপাদন করবে তার সবটাই মালিকের। মালিক সেজন্য সবসময়ই চায় এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়াতে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রথম যুগে উদ্বৃত্ত মূল্য বেশী পাবার তাগিদে শ্রমিকদের ১৬/১৭ ঘণ্টা পর্যন্ত খাটানো হতো আর কোনরকমে বেঁচে থাকার মতো মজুরী দেওয়া হতো। কিন্তু বেশীদিন এ অবস্থা স্থায়ী হতো পারল না। শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হল। কাজের ঘণ্টা কমাবার দাবী উঠল, দাবী উঠল মজুরী-বৃদ্ধিরও। সংঘবদ্ধ

শ্রমিক-আন্দোলনের চাপে পুঁজিপতিরা নতি-স্বীকারে বাধ্য হলো। যেমন খুশী কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে যখন উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়ানোর সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে এলো, তখন পুঁজিপতিদের চেষ্টা শুরু হল কিভাবে যেটুকু সময় কারখানাতে শ্রমিক খাটবে সেই সময়টুকুর মধ্যে শ্রমিকের মজুরীর জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় কমিয়ে উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় বাড়ান যায়। কারখানার মধ্যে উৎপাদনের কাজকে এমন ভাবে সংগঠিত করা হল, যাতে করে শ্রমিকেরা কোন ফাঁকি দিতে না পারে এবং অযথা সময় নষ্ট না হয়। শুধু এটুকু করেই ক্ষান্ত থাকল না তারা, ক্রমগত চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল কিভাবে শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ান যায়। এই উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ প্রভৃতিদের কাজে লাগান হল। কারখানায়-কারখানায় নতুন নতুন যন্ত্রপাতির আমদানি ঘটতে লাগল। শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতাও দ্রুতহারে বাড়তে লাগল। মালিকের উদ্বৃত্ত মূল্যবৃদ্ধির এই প্রচেষ্টাই শিল্পক্ষেত্রে যান্ত্রিক কৃৎকৌশলের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করল। ইউরোপে আমরা যাকে শিল্পবিপ্লব বলে থাকি তা হল পুঁজিবাদী বিকাশেরই প্রতিফলন।

মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্যের এই তত্ত্ব আবিষ্কার করে এবং এর সূত্র ধরেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট এবং তার পতনের অনিবার্যতার বিষয়টি প্রমাণ করলেন। তিনি সমাজ-বিকাশের ঐতিহাসিক বস্তুনির্ভর পর্যালোচনা করে দেখালেন যে পুঁজিবাদ হঠাৎ করে আসেনি। সমাজের ক্রমবিবর্তনের ধারায় একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ে পুঁজিবাদের সৃষ্টি ও বিকাশ। সমাজে যখন উৎপাদনের উপায়ের উপর মালিকানা অর্থাৎ কলকারখানা জমি ও যন্ত্রপাতির উপর মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলো এবং সমাজের ব্যাপকতম অংশ উৎপাদনের উপায়গুলি থেকে বঞ্চিত হয়ে কেবলমাত্র নিজেদের খেটে-খাওয়ার ক্ষমতাটুকুর ওপরেই নির্ভরশীল হল, তখনই পুঁজিবাদের আবির্ভাব সম্ভব হল। সমাজে একদল মানুষ যখন সহায়-সম্বলহীন হয়ে নিজেদের শ্রমক্ষমতাকে বিক্রি করার জন্য স্বাধীনভাবে পুঁজিপতিদের দরজায় উপস্থিত হল, তখনই মানুষের শ্রমক্ষমতা আর দশটা পণ্যের মতোই একটি পণ্যে পরিণত হল। সমাজে শুরু হল মজুরী-দাসত্বের যুগ। সর্বহারা শ্রেণীর নিজের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হল পুঁজিপতিদের দরজায় নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করা। স্বাধীনতা বলতে এটুকুই যে তারা যেখানে খুসী সেখানেই শ্রমশক্তি বিক্রির জন্য হাজির হতে পারবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা যা চাইবে তাই পাবে। পুঁজিপতিরা সবাই চায় শ্রমের বাজারে যোগান যাতে বেশী থাকে অর্থাৎ হাজার হাজার লোক যাতে বেকার থাকে, যাতে করে মালিকের যে-কোন শর্তে মজুর কাজ করতে বাধ্য হয়।

পুঁজির এই ঐতিহাসিক চরিত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে মার্কস প্রমাণ করলেন যে পুঁজিবাদ চিরস্থায়ী নয়। পুঁজিপতিরা যে অর্থনৈতিক নিয়ম চালু করেন সে জালেই তারা জড়িয়ে পড়েন। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যেই সংকট থাকে লুকিয়ে। কল কারখানা যন্ত্রপাতির ব্যাপক উন্নতির ফলে একদিকে উৎপাদনের চরিত্র হয় সামাজিক, কিন্তু উৎপন্ন সামগ্রীর ভোগ থাকে ব্যক্তিগত। একদিকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যাদের প্রয়াসে সম্পদ সৃষ্টি হয়, আর অন্যদিকে মুষ্টিমেয় মালিক যারা এই সম্পদ ভোগ করে। সমাজের দ্বন্দ্ব বাড়ে, সংঘাত বাড়ে। মার্কস এও দেখালেন, অতিরিক্ত পরিমাণে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির তাগিদ পুঁজিপতিদের ব্যাপকভাবে যান্ত্রিকীকরণে উৎসাহ জোগায়। আর এইটি পরে বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়, মুনাফার হারকে কমিয়ে দেয়। কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই, ভয়াবহ বেকারী, মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার নিদারুণ হ্রাসপ্রাপ্তি পুঁজিপতিদের বাজারকে সংকুচিত করে তোলে। এক গভীর সংকটের জালে পুঁজিবাদ জড়িয়ে পড়ে। এর থেকে উদ্ধারের কোন পথ খোলা থাকে না।

মার্কস এও ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করলেন যে পুঁজিপতিরা মুনাফা হিসাবে যা পায় সেটা যেমন উদ্বৃত্ত মূল্য, তেমনই জমির মালিক খাজনা হিসাবে যা পায় এবং মহাজন বা ব্যাঙ্ক-এর মালিক সুদ হিসাবে যা পায় এ সবই উদ্বৃত্ত মূল্যেরই অংশ। এমনকি যারা উৎপাদনের কাজে অংশ না নিয়ে ব্যবসা বা বাণিজ্যে তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করেন তারাও যা মুনাফা পান সেটাও উদ্বৃত্ত মূল্যেরই একটি অংশ। উৎপাদনের উপায়ের মালিকদের মধ্যে এই উদ্বৃত্ত মূল্য কিভাবে বণ্টিত হয় তার বিশদ ব্যাখ্যা করে তিনি আগেকার অর্থনীতিবিদদের মুনাফা, সুদ এবং খাজনা সম্পর্কিত বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দেন। মার্কস-এর এটিও একটি মহোত্তম আবিষ্কার। তিনি সমস্ত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি সুসংগত, যুক্তিনিষ্ঠ এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন। তিনি পুঁজিবাদের বিকাশ ও পরিণতি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হলেন যে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র এবং ব্যক্তিগত ভোগের দ্বন্দ্বই হল পুঁজিবাদী-ব্যবস্থায় পুঁজিপতিশ্রেণী বনাম শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের উৎস। যতদিন এই দ্বন্দ্ব থাকবে, ততদিন এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হল উৎপাদানের উপায়গুলির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালীকানায় প্রতিষ্ঠা। আর এটিই হল এই দ্বন্দ্ব নিরসনের একমাত্র উপায়। পুঁজিবাদী উৎপাদনের চরিত্র যত বেশী সামাজিক আকার নেয়, অন্যদিকে মালিকানাও যতই মুষ্টিমেয়ের হাতে কুক্ষিগত হতে থাকে, ততই সমাজে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেখানে উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশ আর সেই কাঠামোর মধ্যে আটকে থাকতে পারে না। উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশের অনিবার্য তাগিদেই এই উৎপাদন সম্পর্ককে ভেঙে ফেলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পুরাতন সমাজের গর্ভে একটি নতুন সমাজের আবির্ভাব সমাসন্ন হয়ে ওঠে। সমাজের একটি বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হয়। ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটে। সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা হয়। আর এটাই হল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি। এই ভাবেই মার্কস উপস্থাপিত করলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা এবং তার অবশ্যম্ভাবিতা। যে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তিনি পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গী তাকে পৌঁছে দিল একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে। সমাজ-বিবর্তনের ধারায় পুঁজিবাদের আবির্ভাব, বিকাশ, পরিণতি এবং তার অভ্যন্তরে নতুন সমাজের অঙ্কুর যা তিনি দেখেছিলেন, তার মৃত্যুর একশত বছরের মধ্যেই আমরা সেই অঙ্কুরকে মহীরূহে পরিণত হতে দেখছি, পুঁজিবাদের মৃত্যু-ঘণ্টার শব্দও শুনতে পাচ্ছি।

(শারদীয় নতুন চিঠি, ১৯৮৩। বানান অপরিবর্তিত)

স্ত্রী জেনি, দুই কন্যা ও কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কসের দ্বিশতজন্মবর্ষ : শ্রদ্ধা ও শপথ

অচিন্ত্য মল্লিক

ইউরোপ ভূত দেখছে—কমিউনিজমের ভুত। এই বাক্য দিয়েই শুরু হয়েছে মার্কস-এঙ্গেল্‌স্ রচিত 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'—জার্মান ভাষায় যার প্রথম প্রকাশ ১৮৪৮ সালে। আমরা সবাই জানি, 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর মূল ভিত্তি ১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লিগ-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে এঙ্গেল্‌সের পেশ করা 'কমিউনিস্টদের নীতি' নামাঙ্কিত দলিল। অবশ্য 'ইশতেহার'-এর বেশিরভাগ ভাষা মার্কসেরই এবং মার্কস অনেকক্ষেত্রে তাকে সমৃদ্ধ করেছেন—যা ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস্‌ও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' কার্ল মার্কস ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস্-এর যৌথ চিন্তার ফসল। শুধু 'ইশতেহার' রচনার ক্ষেত্রেই নয়, মার্কসের সারা জীবনের কাজ, লড়াই-সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্-এর নাম। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পরিচয়ের পর থেকে মার্কসের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত (১৪ মার্চ, ১৮৮৩) এঙ্গেলস্ ছিলেন তাঁর তত্ত্ব রচনা থেকে রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রামের ক্ষেত্রে সারা জীবনের সঙ্গী এবং অকৃত্রিম বন্ধু। আর তাই, কার্ল মার্কস নিজেও বারে বারে বলেছেন, সমাজবিপ্লবের মতবাদ আবিষ্কারে এঙ্গেলসেরও সমান ভূমিকার কথা। এই মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস-এর দ্বিশত জন্মবর্ষের মধ্য দিয়ে চলেছি। স্বাভাবিকভাবেই যারা সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে নিয়োজিত, তাঁদের কাছে বর্তমান বছরটা নতুন তাৎপর্য বহন করে এনেছে। প্রয়োজন নতুন করে এবং আরো নিবিড়ভাবে মার্কসবাদী তত্ত্বে নিজেদের সমৃদ্ধ করে তোলা, মার্কসের চিন্তা-আদর্শে নিজেদের গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করা। অন্যদিকে, বর্তমান বছরটি হল মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ—যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মার্কসের দর্শন ও বিজ্ঞান দুনিয়াতে প্রথম বাস্তবায়িত হয়েছিল রুশ দেশের মাটিতে। আবার এবছরটি কার্ল মার্কস রচিত বিখ্যাত 'পুঁজি' গ্রন্থ প্রকাশের দেড়শো বছর। ফলে, অনেক দিক থেকেই বর্তমান বছরটি তাৎপর্যপূর্ণ।

মার্কসের নামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আর একটি নাম—মার্কসের স্ত্রী জেনি মার্কস। অভিজাত রাজবংশের কন্যা হয়েও রাজপরিবারের অঢেল সম্পদ, ভোগ-বিলাস ছেড়ে দিয়ে মার্কসের অনিশ্চিত জীবনকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে তাঁর সাথে বাড়ির অসম্মতিতেও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন জেনি। জনগণের প্রতি মার্কসের গভীর ভালোবাসা, তাঁর প্রকাণ্ড হৃদয় আর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যই মার্কসের ছন্নছাড়া জীবনকে নিজের জীবনে ভাগ করে নিতে জেনিকে প্রেরণা দিয়েছিল। সারা জীবনে নির্মম দারিদ্র্য, অপুষ্টি আর বিনা চিকিৎসায় একের পর এক সন্তানের মৃত্যু—সবকিছু যন্ত্রণাই সহ্য করে নিয়েছিলেন। আর জেনিরও মৃত্যু ঘটে কার্যত অপুষ্টি আর বিনা চিকিৎসায়, মার্কসের মৃত্যুর দু-বছর আগে ১৮৮১ সালে। জেনি শুধু মার্কসের সারা জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণার অংশীদারই ছিলেন না, মার্কসের সমস্ত রচনা জেনি না দেখা পর্যন্ত এবং জেনির পরামর্শ ব্যতিরেকে প্রকাশিত হয়নি। এমনই ছিল মার্কসের সারা জীবনের সঙ্গী, জেনি মার্কসের ভূমিকা।

দুনিয়ার মানবজাতির মুক্তির লক্ষ্যে আলোকবর্তিকা হিসেবে

মার্কসের দুটি আবিষ্কারের উল্লেখ করেছেন ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস। এই দুটি হল—মানবসমাজের বিবর্তনের তত্ত্ব এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব।

মার্কস সমাজের বিবর্তনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখালেন সমাজে যেদিন থেকে শ্রেণির উদ্ভব, সেদিন থেকেই দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণির মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি, যাকে তিনি শ্রেণিসংগ্রাম হিসেবেই অভিহিত করেছেন। 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এ মার্কস-এঙ্গেলস্ বললেন, মানবসমাজের সমগ্র লিখিত ইতিহাস হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। এবং মার্কস এও দেখালেন এই শ্রেণিসংগ্রাম যেমন অনিবার্য, ঠিক তেমনই শ্রেণিসংগ্রামের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পুরোনো সমাজের পতন এবং নতুন সমাজের উদ্ভবও সমানভাবেই অনিবার্য। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার এবং প্রযুক্তির উন্নতির ব্যবহারে পুঁজিবাদ যতই শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর হয়ে উঠুক না কেন—তার সংকট থেকে পুঁজিবাদ বেরিয়ে আসতে পারে না। মার্কসের ভাষায় পুঁজিবাদের গর্ভেই তার পতনের বীজ লুকিয়ে আছে। পুঁজিবাদী বিকাশের মধ্য দিয়ে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণি আরও সংহত, আরও সংগঠিত হবে। একদিন তারাই এই পুঁজিবাদী উৎপাদন-কাঠামোকে ভেঙে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলবে।

পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির রহস্য মার্কস উদ্ভাবন করলেন তাঁর 'উদ্বৃত্ত মূল্য' তত্ত্বের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। তিনি দেখালেন একজন পুঁজিপতি শ্রমিকের শ্রমশক্তি কেনার জন্য যে মূল্য দেয়, সেই শ্রমশক্তি ব্যবহার করে অনেক বেশি মূল্য উপার্জন করে। এখানেই 'উদ্বৃত্ত মূল্য' তত্ত্বের রহস্য। তিনি আরও দেখালেন, পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়া সামাজিক, কিন্তু উৎপাদনের মালিকানা ব্যক্তিগত। এর ফলে তৈরি হয় উৎপাদনব্যবস্থায় সংকট আর সেই সংকট চেহারা নেয় শ্রমিক শ্রেণি বনাম পুঁজিপতি শ্রেণির দ্বন্দ্বে। আর এই অনিবার্য পরিণতিতে চূড়ান্ত শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে পতন ঘটে পুঁজিবাদী সমাজের—জন্ম হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার। কিন্তু, মনে রাখা প্রয়োজন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আপনা-আপনি পতন ঘটে না, শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে তার পতন ঘটাতে হয়।

কার্ল মার্কসের দ্বিশত জন্মবর্ষে তাই মার্কসের শিক্ষাকে আরও বেশি বেশি করে পরিস্থিতি-উপযোগী করে প্রয়োগ করতে হবে। এ-প্রসঙ্গে লেনিন যে-কথা বারে বারে বলেছেন সে-কথা স্মরণ করেই এ-লেখার ইতি টানা যেতে পারে—'মার্কসবাদ আপ্তবাক্য নয়, প্রয়োগের দর্শন'। আজকের দুনিয়ায় এবং দেশেও মার্কসবাদ সেকেলে হয়ে গিয়েছে এবং সৃজনশীল মার্কসবাদের নামে মার্কসবাদের চিরায়ত শিক্ষাকে লঘু করার প্রয়াস চলছে। এই অপপ্রয়াসের মোকাবিলায় মার্কসবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষার আপসহীন লড়াই চালানোর অঙ্গীকার গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। 'মার্কসবাদ অপরাজেয়'—এই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই পথ চলতে হবে। অন্ধকারের বুক চিরে আলোকে ছিনিয়ে আনার শপথই হোক মহান দার্শনিক, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ কার্ল মার্কসের দ্বিশততম জন্মবর্ষের শপথ।

With Best Compliments of

M/s SREE KHAITAN TRADERS

Hattala Road, Durgapur

Sl. No. 101

শতবর্ষে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সাফল্য ও বিপর্যয় থেকে শিক্ষা

সুকান্ত কোঙার

অতীতকে স্মরণ করলে বর্তমান সময়টি উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে ১৮১৮ সালের ৫ মে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আবিষ্কর্তা কার্ল মার্কস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে ১৮৬৭ সালে তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে ১৯১৭ সালে মার্কসের দর্শনকে রাশিয়ার মাটিতে বাস্তবে প্রয়োগ করে বিপ্লবকে সফল করে প্রথম শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র গঠনের নেতৃত্ব দেন লেনিন।

অর্থনীতির দিক থেকে মার্কস আবিষ্কার করলেন উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। পুঁজিবাদের নগ্ন চেহারা তিনি তুলে ধরলেন তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে। মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে। পরের ২টি খণ্ড প্রকাশিত হয় মার্কসের মৃত্যুর পরে, প্রকাশ করেন এঙ্গেলস। 'পুঁজি' গ্রন্থে পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ করা হয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। তিনি দেখালেন যে জমি ও কলকারখানায় মালিকের কাছে শ্রমিক বিক্রি করে তার 'শ্রমশক্তি'। শ্রমিকেরা যে সময়টা কাজ করে তার একটা অংশ সে মজুরি হিসাবে পায়, বাকিটা সে খাটে বিনা মজুরিতে এবং সেটা সে খাটে মালিকের জন্য। পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফা ও সম্পদের উৎস হলো এই উদ্বৃত্ত মূল্য। ক্যাপিটাল গ্রন্থ সম্পর্কে মার্কসের নিজের উক্তি হলো, ''বুর্জোয়াদের মাথা লক্ষ করে এতাবৎকাল দাগা সবচেয়ে ভয়াবহ গোলা হলো ক্যাপিটাল।''

পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্কসের মূল্যায়ন অনবদ্য। আজও তা প্রাসঙ্গিক ও চিরকাল তা প্রাসঙ্গিক থাকবে। মুনাফা ছাড়া পুঁজিপতিরা কিছু বোঝে না। মুনাফার জন্য হেন নীচ কাজ নেই যা তারা করতে পারে না। সারা পৃথিবী জুড়েই পুঁজিপতিদের এই চেহারা আমরা দেখছি। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন, ''নিজেদের তৈরি মালের অবিরাম ক্রমবর্ধমান বাজারের তাগিদ বুর্জোয়াদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে গোটা দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। সর্বত্র এদের ঢুঁ মারতে হচ্ছে, সর্বত্র গিয়ে শেকড় গেড়ে বসতে হচ্ছে, সর্বত্র স্থাপন করতে হচ্ছে যোগসূত্র।'' কমিউনিস্ট ইস্তাহারে তাঁরা আরো লিখলেন, ''উৎপাদনের যন্ত্রপাতিতে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে আর তার ফলে উৎপাদন সম্পর্ক এবং সেই সঙ্গে সমাজের গোটা সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণি টিকে থাকতে পারে না। ...আগের সমস্ত যুগের সঙ্গে বুর্জোয়া যুগের পার্থক্য এই যে, এ যুগে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছে, সমস্ত সামাজিক সম্পর্কে অনবরত রদবদল ঘটছে, অনিশ্চয়তা আর উত্তেজনা এ যুগে হয়েছে চিরস্থায়ী।'' ১৬৯ বছর আগে মার্কস এবং এঙ্গেলস পুঁজিপতিদের সম্পর্কে যা লিখে গেছেন আজ হুবহু তা মিলে যাচ্ছে।

মার্কস বলেছেন যে দার্শনিকরা দুনিয়াকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল কাজ হলো দুনিয়াকে পরিবর্তন করা। মার্কস শুধু এটা বলেননি, তিনি নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করেছেন। নিজেকে 'সমাজতান্ত্রিক' হিসেবে ঘোষণা করায় তাঁকে বুর্জোয়ারা শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে তিনি এক দেশ থেকে আর এক দেশে বিতাড়িত হয়েছেন। কিন্তু তিনি বিতাড়িত হয়ে যে দেশে গেছেন সে দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের সামনের সারিতে থেকেছেন। তিনি নিজেকে 'আমি পৃথিবীর নাগরিক' একথা বলতে গর্ব অনুভব করতেন। তাই কমিউনিস্ট ইস্তাহারের শেষ কথা, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'।

দারিদ্র, অভাব বা বৈষম্য থাকলেই মানুষ বিপ্লব করে না, শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে বিপ্লবী চেতনা গড়ে তুলতে হয়। সংকট থাকলেই হবে না, দরকার সত্যিকারের একটা শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী পার্টির। এর অভাব থাকলে বস্তুগত উপাদান থাকলেও কমিউনিস্ট প্যার্টি এগোতে পারবে না। শ্রমিকশ্রেণির পার্টি সম্পর্কে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি বলতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন, ''আমরা শ্রেণির অবসান চাই। এটা কীভাবে আমরা অর্জন করবো? সর্বহারা যখন রাজনৈতিক আধিপত্য লাভ করবে... বিপ্লব হচ্ছে রাজনীতির সর্বোচ্চ পন্থা। যারা এই বিপ্লবটা করতে চাইবে, তাদেরকে বিপ্লবের পথ—যা হলো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড—তা খুঁজে নিতে হবে। শ্রমিকশ্রেণিকে বিপ্লবের শিক্ষাদানের মাধ্যমেই বিপ্লবের পথ খুঁজে নিতে হবে। তা না হলে শ্রমিকশ্রেণি চিরকাল প্রতারিত হবে। কিন্তু আমাদের যে রাজনীতি প্রয়োজন, তা

হলো শ্রমিকশ্রেণির রাজনীতি। এই শ্রমিকশ্রেণির পার্টি কখনই কোনো বুর্জোয়া পার্টির লেজুড় হিসেবে গড়ে উঠবে না, বরং তার নিজস্ব লক্ষ্য ও রাজনীতির ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র পার্টি হিসাবে গড়ে উঠবে।" আদর্শের ওপর দাঁড়ানো একটি সুশৃঙ্খল বিপ্লবী পার্টি হিসেবে গড়ে উঠবে।

শ্রমিক শ্রেণির পার্টিকে হতে হবে শৃঙ্খলাপরায়ণ, ধৈর্যশীল, এমনকি যখন পরাজয়ের মুখোমুখি তখনও। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে কমিউনিস্ট পার্টিকে অনেক অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হবে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আক্রমণের মোকাবিলা করেই একটা বিপ্লবী পার্টিকে এগোতে হবে। পার্টি সংগঠনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। সকলের আলোচনার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা সকলে মেনে চলতে বাধ্য। এর অন্যথা হলে পার্টি একটা বিশৃঙ্খল পার্টিতে পরিণত হবে এবং তা শোষকশ্রেণির হাতকেই শক্তিশালী করবে।

মার্কস বলেছেন যে শ্রেণিসংগ্রামই হলো ইতিহাসের চালিকাশক্তি। যদিও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে শ্রেণিসংগ্রামের আবিষ্কর্তা তিনি নন। তাঁর কথায়, ''আধুনিক সমাজে শ্রেণির অস্তিত্বের আবিষ্কার আমার কৃতিত্ব নয়। আমি নতুন করে যা প্রমাণ করলাম তা হলো—

ক) উৎপাদনের অগ্রগতির নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ের সাথেই শ্রেণির অস্তিত্ব জড়িয়ে রয়েছে।

খ) শ্রেণিসংগ্রামের স্বাভাবিক পরিণতি হলো সর্বহারার একনায়কত্ব।

গ) সর্বহারার একনায়কত্বর মধ্য দিয়েই শ্রেণির অবসান ঘটবে এবং শ্রেণিহীন সমাজে উত্তরণ ঘটবে।"

মার্কসের শিক্ষা হলো এই যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে রণকৌশলের ভূমিকা আছে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিকে এগোতে হলে তীব্র শ্রেণিসংগ্রাম ও গণসংগ্রাম করেই এগোতে হবে।

লেনিনের মতে, বৈজ্ঞানিক চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মার্কস দেখালেন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে একটা সমাজব্যবস্থা থেকে আর একটা সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের বুকে জন্ম নিয়েছে পুঁজিবাদ। তিনি এও দেখালেন যে ইতিহাসে পুঁজিবাদ শেষ সমাজ নয়। পুঁজিবাদেরও পতন ঘটবে এবং সমাজতন্ত্র আসবে। পুঁজিবাদ নিজের কবরখননকারী শ্রমিকশ্রেণির জন্ম দেয়।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে লেনিন মার্কসবাদকে বিকশিত করেন। লেনিন পুঁজিবাদের একচেটিয়া চরিত্র ও তার ফলস্বরূপ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র লক্ষ করলেন। এইগুলিকে তিনি ব্যাখ্যা করলেন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সর্বহারার সংগ্রাম পরিচালনা করার তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক পদ্ধতিও তিনি রচনা করেন।

মার্কসবাদ কোনো মুখস্থবিদ্যা নয়, বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ হলো মার্কসবাদ। লেনিন ' শান্তি, রুটি ও জমির' শ্লোগান তুললেন এবং রাশিয়ার মানুষ তা গ্রহণ করলো। জারের আমলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষকের পরিবারের যুবকেরা সেনা হিসেবে যুদ্ধ করেছে। অনেকের যুদ্ধে প্রাণ গেছে, যারা বেঁচে ছিলেন তারাও যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত। দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকের জমির ক্ষুধা ছিল। জারের আমলে তার দখলে ছিলো উৎকৃষ্ট ৬ কোটি বিঘা জমি, ২৮০০০ বড় জমির মালিকের দখলে ছিলো ৫০ কোটি ২২ লক্ষ বিঘা জমি। অন্যদিকে কৃষক ছিলো জমিহারা।

লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লব সফল হলো। এর আগে পৃথিবীতে যে সব বিপ্লব হয়েছে সেই বিপ্লবে এক শোষকশ্রেণির হাত থেকে আর এক শোষকশ্রেণির হাতে ক্ষমতা এসেছে। কিন্তু নভেম্বর বিপ্লব সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। এই বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে। শ্রমিকশ্রেণি ও তার সহযোগী শোষিতশ্রেণি গরিব কৃষক সহ মিত্ররা শাসক বুর্জোয়াশ্রেণি ও শোষকশ্রেণিগুলিকে উৎখাত করতে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছে। কায়েম হলো সমাজতন্ত্র—যার অর্থ উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণ। শিল্প, জমি , কৃষি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ যৌথ মালিকানায় রাষ্ট্র তুলে নিলো এবং প্রতিষ্ঠিত হলো এক নূতন রাষ্ট্র।

বিপ্লব সফল হলো। লেনিন বললেন, বিপ্লব করা যত কঠিন, বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখা আরও অনেক কঠিন। লেনিনের ভাষায়, ''প্রথম গুরুতর পরাজয়ের পর ক্ষমতাচ্যুত শোষকরা—যারা ক্ষমতা থেকে উৎখাত প্রত্যাশা করেনি, ভাবতেও পারেনি—তারা দশগুণ বর্ধিত শক্তি নিয়ে, একশোগুণ বেশি বর্ধিত প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঘৃণা নিয়ে 'স্বর্গ' পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।" বিপ্লবের পরই শুরু হয়ে যায় প্রতিবিপ্লব। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো যে সদ্যোজাত সমাজতন্ত্রকে গলা টিপে শেষ করতে হবে এবং তারা অস্ত্র ও সেনা দিয়ে প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য করে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করা জন্য। বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন শ্রমিক ও কৃষকের লাল ফৌজ ব্যাপক আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে লড়াই করে প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে পরাস্ত করতে সফল হয়। ৪ বছর ধরে এই লড়াই চলে। এই যুদ্ধে মারা যায় ১০ লাখ মানুষ, আর ৫০ হাজার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। রাশিয়ার মানুষ সাম্রাজবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবন দিয়ে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করে। কারণ এটা হলো তাদের নিজেদের সমাজব্যবস্থা। অন্যদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণি রাস্তায় নামে সমাজতন্ত্রের সমর্থনে এবং দাবি করে যে সাম্রাজ্যবাদকে রাশিয়ার মাটি থেকে হাত ওঠাতে হবে। লেনিন বলেছেন, এই আন্তর্জাতিক সমর্থন ছাড়া গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব ছিলো না।

সমাজতন্ত্রের বিষয়টা শুধু অর্থনীতির বিষয় নয়, সমাজতন্ত্রে নতুন মানুষ তৈরি করতে না পারলে সমাজতন্ত্র এগোতে পারবে না। কাজটা কঠিন। পুরোনো শোষণের সমাজের স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, সংকীর্ণতা, আঞ্চলিকতার মনোভাব সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় না। নতুন মানুষ তৈরি করার জন্য চললো আদর্শগত সংগ্রাম। সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য জনগণকে যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো।

অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে লেনিন ও পরবর্তীকালে স্তালিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র এগিয়ে চললো ও বিস্ময়কর সাফল্য পেলো। এই প্রথম বিশ্ব এমন এক রাষ্ট্র দেখলো যে রাষ্ট্রে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারদের কাজ দেওয়া—সবই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বেকার না থাকার কারণে ১৯৩৬ সালের মধ্যে সব কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র তুলে দিতে হলো। মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা ছিলো না। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, ক্রীড়া ও জীবনমুখী সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিপুল সাফল্য এলো। লেনিন মহিলাদের উৎপাদনের কাজে যুক্ত করলেন। ভোটের অধিকার সহ বুর্জোয়ারা মেয়েদের যে অধিকার দেয়নি, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র মেয়েদের সেই অধিকার দিলো।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো তাদের দেশে শ্রমিক আন্দোলনের কারণে পেনশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বেকারদের সুবিধাসহ বিভিন্ন কল্যাণকর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হলো—সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরে যা আজ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হিটলারের বাহিনীর কাছে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স যখন আত্মসমর্পণ করেছে, গোটা বিশ্ব যখন প্রায় হিটলারের পায়ের তলায়, তখন স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সেনা ও বীর জনগণ প্রায় ২ কোটি মানুষের

জীবনের বিনিময়ে ফ্যাসিবাদের বিপদ থেকে বিশ্বকে রক্ষা করে। সোভিয়েত বিপ্লবের ৫০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর কোনো দেশ পরাধীন ছিলো না, যদিও কমিউনিস্টরা মনে করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে পারে। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবায় সমাজতন্ত্র কায়েম হয়।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব গোটা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। ৭৪ বছর বাদে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ও সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দেয়।

এত বিপুল সাফল্য সত্ত্বেও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটলো কেন? এটা নিয়ে চর্চা ও গবেষণা চলছে, আগামী দিনেও তা অব্যাহত থাকবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) প্রাথমিক কিছু মূল্যায়ন করেছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একথা দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেছে যে এই ঘটনা মার্কসবাদের ব্যর্থতা প্রমাণ করে না। এটা ঘটেছে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি ও মার্কসবাদের প্রয়োগের ব্যর্থতার কারণে।

লেনিন বারে বারে আদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে নূতন মানুষ তৈরি করার কথা বলেছিলেন, যা থেকে পরবর্তীকালে সোভিয়েত পার্টি বিচ্যুত হয়েছিলো। সমাজতান্ত্রিক চেতনার নিরন্তর বিকাশ ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুতর বিচ্যুতি ঘটলো। স্তালিনের মৃত্যুর পরে ১৯৫৬ সালে সি.পি.এস.ইউ-এর ২০ তম কংগ্রেস স্তালিনের ভূমিকার অনৈতিহাসিক ও বিকৃত অবমূল্যায়ন করলো এবং এটা করতে গিয়ে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সাফল্যকে ছোটো করা হলো। পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম তীব্র করলো, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের পক্ষ থেকে একে হাল্কা করা হলো। লেনিন শেখালেন যে সাম্রাজ্যবাদ মানেই যুদ্ধের বিপদ, আর ক্রুশ্চভ সাম্রাজ্যবাদকে কোটের বোতামের সঙ্গে তুলনা করলেন। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের বিপদকে ছোটো করে দেখানো হলো।

লেনিন বারে বারে বলেছেন যে গণতন্ত্র ছাড়া সমাজতন্ত্র অসম্ভব। এটা ঠিক যে সমাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বহারার একনায়কত্ব দরকার, কিন্তু সমাজতন্ত্র সংহত হলে গণতন্ত্রকে প্রসারিত করার দরকার ছিলো, কিন্তু তা হয়নি। জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের ক্ষমতাকে ব্যবহার করা হয়নি। ফলে আমলাতান্ত্রিকতা বাড়লো, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকার দমনের মতো বিকৃতির ঘটনা ঘটলো।

পার্টির নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা থাকতে হবে, তবে ভিন্নমত জানানোর অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে—এক্ষেত্রেও বিচ্যুতি হয়েছে। সর্বহারার একনায়কত্বের অর্থ হলো বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব। এটা পর্যবসিত হলো পার্টির একনায়কত্বে, অনেক ক্ষেত্রে নেতার একনায়কত্বে। ফলে রাষ্ট্র ও পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে স্তালিন এই বলে সতর্ক করেছিলেন যে, ''সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যগুলো সত্যই বিরাট। কিন্তু দুনিয়ার অন্য সব কিছুর মতোই সাফল্যের খারাপ দিক আছে। যেসব মানুষ রাজনীতিতে খুব একটা পোক্ত নন তাঁদের মধ্যে বড় বড় সাফল্য ও লাভ প্রায়শই অযত্ন, আত্মসন্তুষ্টি, আত্মপ্রসাদ, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, মদমত্ততা ও অতি গর্ববোধের উদ্ভব করে। এটা অস্বীকার করতে পারবেন না যে ইদানীং কালে আমাদের মধ্যে হামবড়াদের সংখ্যা খুব বেশিরকম বেড়ে গেছে।''

সাম্রাজ্যবাদের সামরিক শক্তির মোকাবিলায় সামরিকখাতে বরাদ্দ বাড়াতে হয়েছে, ফলে সামাজিক খাতে বরাদ্দ কমেছে। উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নত করা হয়নি। ফলে মানুষের চাহিদা পূরণ হয়নি। পার্টি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের বিচ্ছিন্নতা এবং আদর্শগত বিচ্যুতি এমনস্তরে পৌঁছালো যে গর্বাচভ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পার্টি ভেঙে দেওয়ার পরেও কোন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ হলো না। মার্কসবাদে বিশ্বাসী একটা পার্টিতে আদর্শগত বিচ্যুতি ঘটলে কী পরিণতি হতে পারে তা সমগ্র বিশ্ব দেখলো। এর থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

মার্কসীয় দর্শনের আবিষ্কারের পর থেকেই মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে কুৎসা ও অপপ্রচার চলছে। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অপপ্রচার কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা বোঝা যায় মুজফ্ফর আহমদ-এর একটা লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন, ''প্রচার হতো যে, বলশেভিকরা মায়েদের বুক হতে শিশুদের কেড়ে নিচ্ছে। এখানেই শেষ ছিল না। বলা হতো যে, সোভিয়েত ভূমিতে নারী জাতিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছিল।'' এক একটা পরাজয়ের পরে এই প্রচারের মাত্রা অনেক বেড়েছে—যা দেখা গেছে ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউনের পতন, ১৯০৫ সালের রাশিয়ায় বিপ্লব ব্যর্থ হওয়া ও ১৯৯১ সালে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরে। মার্কসের উপর যেমন আক্রমণ হয়েছে, এক দেশ থেকে আর এক দেশে তাঁকে বহিস্কার করা হয়েছে, ঠিক তেমনি তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে কখনও কখনও চলেছে নীরবতার ষড়যন্ত্র। কমিউনিস্টদের উপেক্ষা করাও এক ধরনের আক্রমণ। পুঁজিপতিরা নিজেরাও বিশ্বাস করেনা যে মার্কসবাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তা যদি হতো তাহলে সারা বিশ্ব জুড়ে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য বিপুল অর্থ খরচা করা হতো না, কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসীদের উপর শারীরিক আক্রমণ হতো না। ওদের আসল উদ্দেশ্য হল কমিউনিস্ট কর্মী ও জনগণকে হতাশ করে দেওয়া।

পুঁজিপতিরা মার্কসবাদের বিরোধিতা করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বামপন্থায় বিশ্বাসী বলে দাবি করেন এমন কেউ কেউ মার্কসবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বিভ্রান্তি বাড়াচ্ছেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মার্কসবাদ একটা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের মতো মার্কসবাদেরও বিকাশ আছে। লেনিন বলেছেন, ''মার্কসের তত্ত্বকে কোনো সময়েই চিরন্তন বা অপরিবর্তনীয় মনে করলে চলবে না। বরং আমরা সুনিশ্চিত যে, মার্কসবাদ একটি বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছে। সমাজতন্ত্রবাদীরা যদি পিছিয়ে পড়তে না চান তবে সেই বিজ্ঞানকে ক্রমাগত চতুর্দিকে সম্প্রসারিত করে যেতেই হবে।'' কিন্তু এই বিজ্ঞানকে বিকশিত করার নামে যারা বিজ্ঞানের ভিত্তিটাকেই নস্যাৎ করতে চান, তাঁরা নিজেদেরকে যতই মার্কসবাদী হিসেবে জাহির করুন না কেন, তাঁরা মার্কসবাদী হতে পারেন না।

সমগ্র পৃথিবীতে পুঁজিবাদ আজ গভীর সংকটে জর্জরিত। ২০০৮ সাল থেকে সংকটের তীব্রতা থেকে পুঁজিবাদ মুক্ত হতে পারছে না। যারা মার্কসবাদকে মৃত বলছে তারাই মার্কসের 'পুঁজি' বইটি কিনছেন ও পড়ছেন। 'অক্স ফেম' রিপোর্ট অনুসারে বিশ্বের এক শতাংশ ধনীর হাতে যে সম্পত্তি আছে তা বিশ্বের অবশিষ্ট মানুষের সম্পত্তির থেকে বেশি। 'ইকোনমিক পলিসি ইনস্টিটিউট'-এর তথ্য অনুসারে সংস্থার সি.ই.ও এবং শ্রমিকের বেতনের অনুপাত ১৯৬৫ সালে ছিল ২০:১, ২০১৩ সালে হয়েছে ২৯৬:১। ফারাকটা প্রায় ১৫ গুণ বেড়েছে। সারা বিশ্বে আজ ২৫০ কোটি মানুষ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যের সুবিধা পায় না, ১৩০ কোটি মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে না, ৭৮ কোটি মানুষ পরিশ্রুত পানীয় জল পায় না, বছরে ৩৫ লক্ষ শিশু না খেতে পেয়ে মারা যায়, ৮০ কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে, ৪০০ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে না। আজ পুঁজিবাদী দুনিয়ায় নজিরবিহীন বৈষম্য দেখা দিয়েছে, যা পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে প্রমাণ করছে। মার্কসবাদীদের কথা বাদ দিলাম। ভ্যাটিকানের প্রধান যাজক ফ্রান্সিস পোপ বলেছেন, ''অর্থই এখন আমাদের ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছে। অর্থই ঈশ্বরের স্থান নিয়েছে।

অর্থের উপাসনা করে আমরা নিজেদের পাপে নিমজ্জিত করছি। আমরা মনে করি যে বিশ্ব অর্থনীতি ব্যবস্থায় আমরা রয়েছি —তা মোটেই ভালো নয়।" এটা থেকেই বোঝা যায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবস্থাটি কী!

যারা সমাজ পরিবর্তনের মতাদর্শে বিশ্বাসী সেই রকম একটা কমিউনিস্ট পার্টির উপর শাসকশ্রেণির আক্রমণ স্বাভাবিক ঘটনা। এই আক্রমণ কমিউনিস্ট পার্টির সবলতার পরিচয়। আক্রমণের মোকাবিলা করতে মানুষকে সঙ্গে নিয়েই পার্টিকে এগোতে হবে। মনের রাখতে হবে কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বসূরিরা কত কষ্ট ও অত্যাচারের মধ্যেও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মার্কসের কথাই ধরা যাক। বি.বি.সি কর্তৃক জনগণের বিচারে ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি অনায়াসে অধ্যাপনার কাজ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের রাস্তায় না গিয়ে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের লড়াইয়ে তাঁর জীবনকে সঁপে দিলেন। মার্কসের পারিবারিক জীবন ছিল খুবই বেদনাদায়ক। তিনটি শিশু মারা যায়, একটি মৃত শিশু জন্মায়, তাঁকে বিতাড়িত হয়ে এক দেশ থেকে আর এক দেশে চলে যেতে হয়েছে। তিনি যখন 'পুঁজি' গ্রন্থ লেখেন, তখন তিনি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাচ্ছেন। কিন্তু কোনো অবস্থাই তাঁকে শোষণের ব্যবস্থার উচ্ছেদের লড়াই থেকে ক্ষণিকের জন্যেও বিরত করতে পারে নি।

কমিউনিস্ট আন্দোলন জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়েই এগোয়। মার্কস বলেছিলেন, পরাজয়ের মধ্যেও নতুন সম্ভবনাকে খুঁজতে হবে এবং শ্রমিকশ্রেণিকে আরো বেশি সংখ্যায় শিক্ষিত করতে হবে ও সংগঠিত করতে হবে। তাঁর কথায়, ''যারা শুধু নিরবচ্ছিন্ন জয়লাভের স্বপ্ন দেখে সমাজতন্ত্রের লড়াইতে আসেন তারা কাপুরুষ, তাদের দিয়ে বিপ্লব হবে না। 'পৃথিবীটা পাল্টাবার' এই যুদ্ধে, যেমন যে-কোনো যুদ্ধে, জয় এবং পরাজয় দুটোই হবে। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করে, শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের নিয়ম মেনে সমাজতন্ত্র জিতবে। যারা প্রতি পদে জিতবার গ্যারান্টি চায়, তারা দূরে হটুক।"

২০১১ সালের ভোটে জনসমর্থন কমার কারণে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের পরাজয় ঘটেছে। চলে যাওয়া জনসমর্থনকে ফিরিয়ে আনতে হবে, বিশেষ করে ক্ষেতমজুর, গরিব কৃষক ও অসংগঠিত শ্রমিকদের। কোনো 'কৌশল' করে এই জনসমর্থন ফিরিয়ে আনা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন তীব্র শ্রেণিসংগ্রাম ও গণসংগ্রামের। অতীত ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে পশ্চিমবঙ্গে পার্টির অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন অংশের মানুষের দাবি নিয়ে লড়াই করার মধ্য দিয়ে। বারে বারে স্মরণ করতে হবে যে কমিউনিস্ট পার্টি ভোটের পার্টি নয়, পার্টির মূল লক্ষ্য সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করা। ই.এম.এস নাম্বুদিরিপাদ বলেছেন, ''বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির পক্ষে নির্বাচনে জয়ী হওয়া, সরকার গঠন করা প্রভৃতি হলো তাদের রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য, আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। আমাদের পার্টির প্রধান কাজ হলো জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত করা, এ কাজের অধীনস্থ হিসাবেই (সরকার গঠন সমেত) নির্বাচনের রাজনীতিকে আমাদের পার্টি দেখে থাকে।" মুজফ্ফর আহমদ ভোটের প্রচারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেছেন, ''সাধারণ মানুষের চেতনাতে যদি পরিবর্তন আনতে হয়, যদি আমরা চাই যে দেশের জনসাধারণ আমাদের মত ও পথ কী তা বুঝে নিয়ে আমাদের ভোট দিতে এগিয়ে আসুন, তবে আমাদের নির্বাচনের প্রচারও বিশেষ ধারায় চালাতে হবে। মুখে কেবল কথার খই ফোটালে হয়তো আমরা কিছু লোককে আমাদের দিকে টানতে পারবো, হয়তো কিছু লোক আমাদের কথার তোড়ে ভেসে এসে আমাদের পার্টিকে ভোটও দিয়ে যাবেন, কিন্তু সে ভোট সচেতন লোকের ভোট হবে না। ভোট পাওয়ার পরেও আমরা জোর করে বলতে পারবো না যে আমাদের পক্ষের লোক আমাদের ভোট দিয়ে গেলেন। এই যদি অবস্থা হয় তবে একথা স্বীকার করতে হবে সে ভোট পেয়েও আমাদের পার্টি লাভবান হলো না। যাঁরা না বুঝে আমাদের ভোট দিয়ে গেলেন তাঁরা আবার না বুঝে পরের দিন অন্যের পক্ষে চলে যেতে পারেন।" (নির্বাচন ও কমিউনিস্ট পার্টি) বামফ্রন্টের ৩৪ বছরে এই বিষয়ে বড়ো রকমের ঘাটতি না থাকলে জনসমর্থনের ক্ষেত্রে আজকের এই অবস্থা হতো বলে মনে হয়না। মানুষের চেতনার উন্নয়ন ঘটাতে হলে নিজেদের চেতনারও উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

বর্তমানে জরুরি কাজ হলো মানুষের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ গড়ে তুলে তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে লড়াই করা। সর্বভারতীয় ও রাজ্যগত দাবি ছাড়াও স্থানীয় দাবি নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে লড়াই করতে হবে—যা কমিউনিস্ট পার্টিকে জনপ্রিয় করে তুলবে। মানুষকে ওরা সুবিধাবাদী করে দেওয়ার চেষ্টা করছে জোটবদ্ধভাবে বাঁচার পরিবর্তে ওরা মানুষকে একা বাঁচতে শেখাচ্ছে। লড়াই ,সংগ্রাম আর মার্কসবাদী চেতনা দিয়েই তা কাটাতে হবে। অনেক দার্শনিক সর্বহারার দারিদ্রের মধ্যে শুধু দারিদ্রই দেখেছিলেন, ব্যথা পেয়েছিলেন—বেদনা পেয়েছিলেন। কিন্তু মার্কসই সর্বপ্রথম দেখালেন যে সর্বহারারা শুধুমাত্র দুর্দশাগ্রস্ত শ্রেণি নয়, তারা হলো বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে সক্রিয় যোদ্ধা। সর্বহারারা এমন একটা শ্রেণি যার বেঁচে থাকার পরিস্থিতি তাকেই একমাত্র এই বুর্জোয়া সমাজের বিপ্লবী উপাদানে পরিণত করেছে। সর্বহারার মধ্যে একটা বিপ্লবী উপাদান থাকে, সেই বিপ্লবী উপাদানকে জাগিয়ে তোলা কমিউনিস্টদের কর্তব্য। 'গরিবরা সুবিধাবাদী হয়ে গেছে' একথা বলে দায় এড়ানো যাবে না।

কার্ল মার্কসের জন্মদ্বিশতবর্ষে ও নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তিতে একজন প্রকৃত কমিউনিস্টকে এই শপথ নিতে হবে যে কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করার মতো যোগ্য হতে হবে, নিজেদের মতাদর্শগতভাবে সমৃদ্ধ করতে হবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা কর্মীর অন্য দলে চলে যাওয়া আগে ভাবা যেত না। আজ অল্প হলেও ঘটছে। এই ঘটনাই বলে দিচ্ছে যে পার্টির ভিতরে আদর্শগত সংগ্রাম চালানো কত জরুরি এবং এখানে ঘাটতি থাকলে সর্বনাশ হবে। সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টরা নিজেদেরও পরিবর্তন ঘটায়। মার্কসের ভাষায়, ''ব্যাপকহারে এই কমিউনিস্ট চেতনা তৈরির জন্যও বটে, আবার আদর্শের সাফল্য সাধনের জন্য বটে, ব্যাপকহারে মানুষের পরিবর্তন প্রয়োজন, যে পরিবর্তন ঘটতে পারে কেবলমাত্র বাস্তব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, একটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। অতএব এই বিপ্লবের প্রয়োজন শুধুমাত্র এইজন্য নয় যে, অন্য কোনো উপায়ে শাসক শ্রেণিকে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়, প্রয়োজন এজন্যও বটে যে, যে-শ্রেণি তাকে উচ্ছেদ করবে একমাত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সেই শ্রেণির পক্ষে সম্ভব যুগ যুগান্তরের সমস্ত পচা কাদা নিজের গা থেকে ধুয়ে ফেলে নিজেকে নতুনভাবে সমাজ গঠনের জন্য উপযুক্ত করে তোলা।"

তথ্যসূত্র

১. *কমিউনিস্ট ইস্তাহার*, মার্কস ও এঙ্গেলস
২. *মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি উপাদান*, লেনিন
৩. 'দেশহিতৈষী', 'মার্কসবাদী পথ' ও 'নন্দন'-এর বিশেষ সংখ্যা
৪. সি.পি.আই(এম)-র বিভিন্ন দলিল

নভেম্বর বিপ্লবের আলোয় সমকাল

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

২৫ অক্টোবর ১৯১৭। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক সময়পঞ্জি অনুসারে ৭ নভেম্বর ১৯১৭। এক মার্কিন প্রত্যক্ষদর্শী, জন রিড্ অভিহিত করলেন 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন'।

রাশিয়াতে বৈপ্লবিক ঐতিহাসিক পরিবর্তন রচিত হল যা তৎকালীন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মূলে আঘাত করে, তার রক্ষণশীল ধ্যানধারণাকে ভেঙেচুরে, গুঁড়ো করে, ঝড়ের মুখে উড়িয়ে দিয়ে, পৃথিবীর বুকে বপন করল প্রথম 'শ্রমিক-কৃষক শাসিত রাষ্ট্র', সোভিয়েত রাশিয়াকে। এই বিপ্লব জাতি-ভাষা-বিভিন্নতাকে বর্জন করে, রাশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে তাদের স্বয়ংশাসনে প্রতিষ্ঠিত করেও, 'সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের' কেন্দ্রীয় ছত্রছায়ায় সমাবেশ ঘটালো। এই বিপ্লব সাম্যবাদের-সমাজবাদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঔপনিবেশিকতা, রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও অন্যান্য বহুবিধ পুঁজিবাদী অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণের অবসানের সংকল্পের প্রতীক 'লাল পতাকা' উড়িয়ে দিল। এই বিপ্লব পৃথিবীর দেশে দেশে শোষণ-মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে তুলল। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ল। বিংশ শতাব্দী সমাজতন্ত্রের প্রসার, মুক্তি আন্দোলনের বিস্তৃতি এবং ধনতন্ত্রের ক্রম-অবলুপ্তির শতক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেল ওই নভেম্বর বিপ্লবের ফলে। আমেরিকা সহ পুঁজিবাদী পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই বিপ্লব তীব্র আতঙ্ক ও ত্রাসের সঞ্চার ঘটালো।

মঞ্চের পেছনের দৃশ্যপট : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। চার বছর তিন মাস দু-সপ্তাহ ব্যাপী ভয়ংকর যুদ্ধের অবসান ঘটে ১১ নভেম্বর, ১৯১৮। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জারতন্ত্র সমগ্র রাশিয়াকে ভৌগোলিক অবলুপ্তির মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব রাশিয়ার জারতন্ত্র শাসনক্ষমতা থেকে উৎখাত করে; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে।

১৯১৭-র পূর্বে ভৌগোলিক বিচারে রাশিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো রাষ্ট্র ছিল। জারতন্ত্রে, যে কোনো অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে রাশিয়া ছিল অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া রাষ্ট্র—তার ভৌগোলিক বিশালত্ব এবং অপার প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহারের সম্ভাবনা সত্ত্বেও। জারতন্ত্র বদ্ধ জলায় আবদ্ধ অভিজাত জীবনযাপনের স্বার্থে সমাজের বাকি সব শ্রেণির মানুষকে অবদমিত করে রেখেছিল তার ১২ মিলিয়ন সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে।

আড়াই বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলার পর রাশিয়ার জাতীয় আয়ের আরো ২৩ শতাংশ পতন ঘটল। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার পতন ঘটলো ৩৭ শতাংশ। নভেম্বর বিপ্লব জারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে রাশিয়াকে বাঁচিয়ে দিল। যে যুদ্ধ থেকে রাশিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল, তা আরও প্রায় দেড় বছর চলল। কারণ রাশিয়ার ফেলে যাওয়া শূন্যমঞ্চে পুঁজিবাদী মার্কিনিদের প্রবেশ ঘটল। মার্কিনিরা ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের সমরাস্ত্র বিক্রির উদ্দেশ্যে যুদ্ধে জড়ালো।

তাছাড়া আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ নভেম্বর বিপ্লবের পূর্বেই রাশিয়ার অভ্যন্তরে সমাজবাদী শক্তির সংগঠন ও ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধির কারণে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে ছিল। 'সমাজবাদী আদর্শের অনুপ্রেরণায় ইউরোপের দেশে দেশে এবং পৃথিবীর অন্যত্রও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম প্রসারিত হবে', একথা সঠিকভাবে অনুধাবন করেই, দরিদ্র-শোষিত-নিপীড়িত মানুষের ঐক্যকে বিঘ্নিত করার স্বার্থে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রলম্বিত করে আমেরিকা।

উড্রো উইলসনের ঘোষণা—'রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরীক্ষিত পথেই যুদ্ধ-শান্তি হবে'—মেনে নেয়নি ইতিমধ্যে প্রস্তুত বিপ্লবী বলশেভিক নেতৃত্ব। ট্রটস্কি পাল্টা ঘোষণা করলেন—''হয় বিপ্লব করো, অথবা অবলুপ্ত হও। এই পরিস্থিতিতে হয় আমরা প্রতিষ্ঠিত হবো এবং সমগ্র ইউরোপে প্রসারিত হবো, নয় তো সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মাটিতে পুঁতে ফেলুক। বিজ্ঞান সত্যের পরীক্ষার পথেই চলে, সে পথ সোজা নয়।''

সমাজবাদী সমাবেশের এই প্রতিজ্ঞা ও অটল আত্মবিশ্বাসের সম্মুখীন হয়ে ঢক্কানিনাদ বন্ধ করে আমেরিকা যুদ্ধ শেষ করতে বাধ্য হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলেও, অবসান হল না মার্কিনি চক্রান্তের। ১৯১৮ সালে সাম্যবাদকে তার সূতিকাগারে পাঠাতে পশ্চিমি শক্তিসমূহ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পুনরায় সামরিক অভিযানের সূচনা করে। যথারীতি এবারও তাদের মুখ-পুড়িয়ে প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

কী-ই বা থাকে হারাবার

কী-ই বা থাকে হারাবার
শেকল পরা দিন যাপনে?
তার চেয়ে ভালো, উঠে এসো।
কাস্তে কোদাল বেলচা হাতে
খনি থেকে, খামার থেকে,
হাতে হাত—আঁধার থেকে,
আলোর পথে উঠে এসো।
সাম্যহান-প্রেমহীন-কাব্যহীন

শেকল ছিঁড়ে, ভুবন ভরিয়ে
সাম্যের গান গেয়ে উঠে এসো।

অক্ষমের এই কবিতা শিশুসুলভ হতে পারে, কিন্তু নভেম্বর বিপ্লবের প্রতি দুর্বলতার পরিচায়ক, যা আজও অমলিন। ১৯১৭-র অক্টোবর থেকে যে পথ চলার শুরু তার চালিকাশক্তি ছিল কাল মার্কসের বিখ্যাত দর্শন—''পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।'' সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত লেনিন-ট্রটস্কি-স্তালিন সমাজতন্ত্রের রূপায়ণে সুযোগ্য নেতৃত্ব দেন।

জারের শাসনকালে যে ১২ মিলিয়ন সামরিক কর্মী নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা ছিলেন কৃষক শ্রেণি থেকে উদ্ভূত অথচ শিক্ষার আলোকে অগ্রসর। সুতরাং শ্রেণি-চেতনায় এগিয়ে থাকা এই অংশকে উদ্বুদ্ধ করে সাম্যবাদী নেতৃত্ব তাদের 'জারকে সমর্থন করা থেকে বিচ্ছিন্ন' করতে সমর্থ হয়। 'জারের ফৌজ, জারের হয়ে অবদমিত মানুষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অসম্মত' হয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে যোগদান করে। বিনা রক্তপাতে এ এক যুদ্ধজয়।

শ্রেণি-শোষণের বিভিন্ন কৌশল বর্ণনা করে সুযোগ্য নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে শ্রেণিচেতনা জাগ্রত করতে সমর্থ হন। ফলে উপযুক্ত মজুরি ও উপযুক্ত বিশ্রামের দাবিতে তারা, বিশেষত খনি শ্রমিকেরা, কর্মবিরতির মাধ্যমে জারের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চূড়ান্ত আঘাত হানে। 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই দাবি উঠে আসে। কৃষক সোচ্চার হয়ে ওঠে তাদের অধিকারের দাবিতে। শ্রমিকশ্রেণি-কৃষকশ্রেণিকে সমবেত করে জারতন্ত্রকে আঘাত হানা হল। এখানেও বিনা রক্তপাতে যুদ্ধজয় হল।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই উষালগ্নে যা এই বিপ্লবকে অনন্য মর্যাদার আসনে বসিয়েছে তা হল শ্রেণি-চেতনার উন্মেষ, শ্রেণিশত্রু চিহ্নিতকরণ, শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম পরিচালনা ও সমবেত শক্তিতে জারতন্ত্রের শেষ ঘণ্টা বাজানো। কামান-বন্দুক-যুদ্ধবিমান-গোলাগুলি-যুদ্ধজাহাজ ব্যবহার করতে হয়নি। ক্ষয়ক্ষতি-রক্তপাত যতটুকু তা সংগ্রামী মানুষকে জারতন্ত্রের শেষ উপহার, ক্ষমতা ধরে রাখার মরিয়া শেষ চেষ্টা থেকে। জার 'নিকোলাস-২' ক্ষমতা থেকে অবসৃত হন, ভ্রাতা 'মাইকেল'কে ক্ষমতায় বসিয়ে। তাকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। ইতিপূর্বে রাসপুটিন (নিরক্ষর ও চরিত্রহীন লম্পট) তার লাম্পট্যের কারণে জারতন্ত্রের মুখমণ্ডলে বিষ্ঠালেপন করে রেখেছিলেন। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে দিকে দিকে জনপ্রিয়তার পথে এগিয়ে চলে গণ-আন্দোলন; আর তা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জারতন্ত্র নেতাদের কারাগৃহে বিনা বিচারে বন্দি করে, সাইবেরিয়ার শীতলতম স্থানে দ্বীপান্তরিত করে হত্যার পরোয়ানা সহ; 'প্রাভদা' (১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত) এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়।

এই অস্থিরতার কালে একমাত্র স্তালিন জারতন্ত্রের রক্তচক্ষুকে নানা উপায়ে ফাঁকি দিয়ে অন্তরাল থেকে 'সমাজবাদী বিপ্লবী দল'কে ধরে রাখা ও 'জনপ্রিয় বামপন্থী দল' হিসেবে গড়ে তোলার দুঃসাধ্য কর্মে ব্রতী ছিলেন। লেনিন, আত্মনির্বাসনের রেশ কাটিয়ে, ১৯১৭ সালের এপ্রিলে রাশিয়ায় ফিরে আসেন।

একটু পিছনে তাকানো যাক্।

১৯০৩ সালে 'সমাজবাদী গণতন্ত্রী' সমাবেশে বলা হয়েছিল রাশিয়াতে দু-দুটি বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। প্রথম স্তরের বিপ্লব হবে 'বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব'। এই বিপ্লবের ফলে জারতন্ত্র উৎখাত হবে, নির্বাচিত আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হবে, কৃষকদের হাতে জমির অধিকার বন্টিত হবে—অনেকটা 'ফরাসি বিপ্লব'-এর ধাঁচে। কিন্তু এই বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদী বাজার সংহত হবে এবং প্রসারিত হবে, সুতরাং দ্বিতীয় স্তরের 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। সেই সময় থেকেই সমাজবাদী গণতান্ত্রিক শ্রমিক দলে মতাদর্শগত লড়াই চলতে থাকে।

একদলের মতে সমাজবাদী-গণতান্ত্রিকদের উচিত 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা। এরা সংখ্যালঘু (মেনশেভিক) প্রতিপন্ন হয়েছেন পরবর্তীকালে।

লেনিন, অপরপক্ষে মনে করতেন যে ''শুধুমাত্র তাত্ত্বিক-আদর্শগত অবস্থানেই সমাজতান্ত্রিক নেতৃত্বের দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। প্রতিটি আন্দোলনে যুক্ত থাকতে হবে, নেতৃত্বের ও আদর্শের গ্রহণযোগ্যতা প্রসারিত করতে হবে, মানুষের পাশে থেকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পরিস্ফুট করতে হবে। এ-কাজের উপযুক্ত এমন শ্রমিক শ্রেণির পার্টি তৈরি করতে হবে, যা শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' অনুসারী।'' এঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ (বলশেভিক) প্রতিপন্ন হয়েছেন পরবর্তীকালে।

আবার এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ফিরে যেতে হয় ১৯১৭-এর এপ্রিলে, লেনিনের 'এপ্রিল উপপাদ্যে'। লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কালে নানা সমাজবাদী উপকরণ মিশ্রণের প্রস্তুতি শুরু হল। ভূস্বামীদের জমি অধিগ্রহণ করা; অধিগৃহীত জমি ভূমিহীন শ্রমিক-কৃষকদের বন্টন করা; কৃষকের কর মুকুব করা; শিল্পশ্রমিকের কাজের ঘন্টা স্থির করা; আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের রাষ্ট্রীয়করণ। শুরু হল গোষ্ঠীবদ্ধ ব্যক্তিপুঁজির প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার কাজ। এই পর্বে সম্পন্ন কৃষকদের (কুলাক) অবশ্য এর আওতার বাইরে রাখা হয়।

পাশাপাশি শুরু হল ভৌগোলিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংহতি রচনার উদ্দেশ্যে রাশিয়াকে কেন্দ্র করে অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলির স্বশাসন বজায় রেখে, সমগ্র রাশিয়ার ভূখণ্ডগুলিকে একত্রিত করে তোলার কাজ।

জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, উজবেকিস্তান, কাজাকস্তান, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, আজারবাইজান, বেলারুশ, মলডাভিয়া, কিরঘিজস্তান, তুর্কিস্তান, চেচনিয়া, উক্রেইন—এই ১৪টি অঙ্গরাজ্যের প্রত্যেকের পৃথক আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হল। মস্কোতে রাশিয়ার নিজস্ব আইনসভা আগেই ছিল। এখন মোট ১৫টি রাজ্য মিলিত হল। গঠিত হল একটি যুক্তরাষ্ট্র। সকলের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা হল। মস্কোতে স্থায়ী ঠিকানা হল 'Federal Supreme Soviet' এবং 'Congress of People's Deputies'-এর। কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন 'Soviet Socialist Republic বা USSR'-এর প্রতিষ্ঠা মানবসভ্যতার ইতিহাসে 'শ্রমজীবী মানুষের' বিজয়ের সূচনা করল। এই প্রথম তারা শোষণমুক্তির স্বাদ পেলেন, সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটল, অর্থনীতি-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-শিল্পের অভূতপূর্ব অগ্রগতির সূচনা হল। জনগণের হাতে এল ক্ষমতা—নতুন জীবন গঠনের পরিচালন ক্ষমতা। বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষার প্রচলন সৃষ্টি হতে থাকল।

সোভিয়েত রাশিয়ার এই উত্থান পুঁজিবাদী শক্তিগুলিকে তাদের শাসন-শোষণের কৌশল বদলাতে বাধ্য করল। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শাসকেরা দেশে দেশে নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রসারের ঘোষণা করতে বাধ্য হল। এটা অবশ্যই আন্তরিক ছিল না। ছিল একটি পুঁজিবাদী 'Window Dressing'। তাদের 'Hidden Agenda' সবসময়ই ছিল সমাজবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে বিবিধ চক্রান্তে লিপ্ত থাকা, সমাজবাদী শিবিরকে অস্থিরতা সৃষ্টি করে ভেতর থেকে ধ্বংসসাধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ অস্ত্র সাম্রাজ্যবাদ

লেনিন ১৯১৬ সালেই অনুধাবন করেছিলেন ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে পুঁজিবাদ তার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে উন্মুক্ত করবে এবং টিকে থাকার চেষ্টা করবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জারতন্ত্রকে অন্যায্য যুদ্ধে সমর্থন জানিয়েছিলেন প্লেখানভ (মেনশেভিক বা সংখ্যালঘু)। ওই সময় লেনিন ও অন্যান্য বলশেভিক (সংখ্যাগরিষ্ঠ) নেতৃবৃন্দ তাদের সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যয়ে অবিচল ছিলেন।

১৯১৮ থেকে ১৯৩৯ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়।

১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে লেনিন প্রয়াত হন। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন সাকার করতে সুযোগ্য নেতৃত্ব তাঁদের কর্মসূচি অব্যাহত রাখেন।

সেন্ট পিটসবার্গ থেকে পেট্রোগাড থেকে লেনিনগ্রাড।

সোভিয়েত রাশিয়ার সুরক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে তৈরি দুনিয়ার অন্যতম শক্তিশালী 'লাল ফৌজ'।

সাক্ষরতার হার মেয়েদের মধ্যে ১৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫২ শতাংশ ও ছেলেদের মধ্যে ৪৬ থেকে বেড়ে ৬৮ শতাংশ।

শিল্প উৎপাদন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে সমবায়ভিত্তিক খামার ও কৃষিজাত সামগ্রীর সুষম বন্টন।

শৃঙ্খলাপরায়ণতা ও নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে জনজীবনে উন্নতি।

সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বিপুল বৃদ্ধি। বিপণন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এবং মুনাফা পুঁজি-দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নির্বাসনে।

সুতরাং, পুঁজিবাদের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ এবং উন্নত বিকল্প হিসেবে সমাজবাদের আত্মপ্রকাশ।

একদিকে ব্রিটিশ, ফরাসি, স্পেনীয়, ওলন্দাজ, ইটালীয়, পোর্তুগিজ উপনিবেশগুলি সম্প্রসারিত হতে থাকল পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে। অপরদিকে ভারত, সিংহল, বার্মা, মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস্, গোল্ডকোস্ট, নাইজেরিয়া, উগান্ডা, মরক্কো, কেনিয়া, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশে দেশে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত 'মুক্তিকামী' গণআন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে এবং ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি দুর্বল হতে শুরু করে। Eric Hobsbawm একেই 'Revolution' আখ্যা দেন।

ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, কৃষকসভা-ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, ছাত্র ফেডারেশন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রভৃতি ১৯২০ সাল থেকেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার কবল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি প্রস্তুত করে।

সুতরাং দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে 'সোভিয়েত রাশিয়া' সমগ্র দুনিয়ায় অত্যন্ত প্রভাবশালী সমীহ করার শক্তিতে রূপান্তরিত হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ৬ বছর ১ দিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্যাপৃত। নাৎসি উগ্র জাত্যভিমান সম্বল করে, জাপানের রাজতন্ত্র (হিরোহিতো) এবং ফ্যাসিবাদী ইতালি (বেনিটো মুসোলিনি)-র সমর্থন নিয়ে, সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে, ভৌগোলিক আগ্রাসন রচনার হীন উদ্দেশ্যে হিটলারের নেতৃত্বে 'Axis Power' আক্রমণ শুরু করে।

জোসেফ স্তালিন (সোভিয়েত রাশিয়া) হিটলারের ঔদ্ধত্য, দর্প ও দম্ভের মূর্ত প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ান। এমনকি রুজভেল্ট (আমেরিকা), উইনস্টন চার্চিল (যুক্তরাজ্য) এবং চিয়াং-কাই-শেক (চিন) স্তালিনের নেতৃত্বে 'Allied Power'-এর ছত্রছায়ায় সমবেত হন।

পরিণামে কী হল?

পরিণামে নাৎসি জার্মানির অপমানজনক পরাজয় ঘটল, জাপানি-ইতালীয় সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়ালো, মার্কিনি-ব্রিটিশ-ফরাসি শক্তির বিপুল সামাজিক-অর্থনৈতিক-সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হল, এমনকি এককভাবে মার্কিনিরা আর ইউরোপ ভূখণ্ডের সামরিক সুরক্ষার ব্যয়ভার বহন করা যুক্তিযুক্ত নয় বলে ফৌজ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিল। ১৯৪৫-এর ইয়াল্টা সম্মেলনে রুজভেল্ট এবং চার্চিল ইউরোপের রক্ষাভার স্তালিনের হাতেই অর্পণ করেন।

সুতরাং ১৯৪৬ থেকে ১৯৫২, নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের প্রসার ঘটবে এবং জার্মান ভূমিখণ্ড বিভক্ত হবে, এ আর এমন আশ্চর্য কী?

স্তালিনকে অনেক সমালোচক অত্যন্ত 'আগ্রাসী চরিত্রের সেনানায়ক' এবং 'হৃদয়হীন লৌহপুরুষ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার লালফৌজ পূর্ব ইউরোপের ভূখণ্ড থেকে জার্মান বাহিনীকে বিতাড়ন না করলে, মার্কিন-ব্রিটিশ-ফরাসিদের অস্তিত্বকে সংকটের মুখে পড়তে হতো। দ্বিতীয়ত, স্তালিনকে পূর্ব ইউরোপের সুরক্ষার ভার দিয়েছিল মার্কিন-ব্রিটিশ যৌথ নেতৃত্ব। তৃতীয়ত, পূর্ব ইউরোপে স্তালিন একটি প্রভাব-বলয় নির্মাণে সক্ষম হয়েছিলেন, যার ফলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি সহ সোভিয়েত রাশিয়াও সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত ছিল। চতুর্থত, দ্বি-মাত্রিক বিশ্বে ঠাণ্ডাযুদ্ধ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের আর কোনো উপায়ও ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের বিপক্ষে প্রবল শক্তিমান সমাজবাদী শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রতিরোধের নিশ্চয়তা।

নি-স্তালিনীকরণ?

১৯৪৫ থেকে ১৯৫২ অবধি স্তালিন যুদ্ধবিধ্বস্ত সোভিয়েত অর্থনীতিকে পুনরায় শক্ত জমির ওপর দাঁড় করিয়ে দেন। কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপকরণের প্রয়োগে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা আনেন। প্রাকৃতিক সম্পদ-সম্ভাবনাকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করেন।

১৯৫৩ সালের মার্চে স্তালিনের প্রয়াণ ঘটে। নিকিতা ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক হয়ে ওঠেন। ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভ 'নি-স্তালিনীকরণ উপপাদ্য' তুলে ধরেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম সম্মেলনে।

নি-স্তালিনীকরণের ফলে 'ছিল বেড়াল হয়ে গেল রুমাল'— হয়ে গেল মার্কসবাদের অতি সরলীকরণ। বৈদেশিক নীতি হয়ে উঠল দিশাহীন। পুঁজিবাদ-বিরোধিতা থেকে সরে এসে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সুস্থ প্রতিযোগিতার নীতি চালু করা হল। ১৯৫৫ সালে ক্রুশ্চেভ যে 'ওয়ারশ চুক্তি' সম্পাদন করেছিলেন তা ছিল সামরিক সমঝোতামূলক, মোটেই তা সমাজতান্ত্রিক নীতি বা আদর্শ অনুসারী ছিল না।

তারপর... তার আর পর নেই

ক্রুশ্চেভ মূলত শৃঙ্খলাপরায়ণতা আর নিয়মানুবর্তিতার মূলে আঘাত করেছিলেন নি-স্তালিনীকরণের নামে। রথকে টানতে আরম্ভ করলো নানাদিকে অনেক ঘোড়া। রথ হারালো পথ। ব্রেজনেভ শুধুমাত্র এই অধঃপতনের কাছে আত্মসমর্পণ করেই দায়িত্ব এড়ালেন।

লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে লাগল, নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রীগুলির জন-চাহিদা উপেক্ষিত হতে লাগল, অর্থনীতির গতি প্রায় থমকে গেল, অসন্তুষ্ট জনসাধারণ সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার

প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা দুই-ই হারিয়ে বসল। সুস্থ প্রতিযোগিতার নামে আমেরিকার সাথে অকারণ প্রতিযোগিতায় নেমে মহাকাশ গবেষণা, ভারি শিল্পে বিনিয়োগ ও কৃত্রিম উপগ্রহ-ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন—এই হয়ে উঠল সোভিয়েত রাশিয়ার একমাত্র কাজ।

গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা

১৯৮৫ সালে মার্চ মাসে, মাত্র ৫৪ বছর বয়সে মিখাইল গর্বাচভ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধান হন।

১৯৮৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি, গর্বাচভ তাঁর গ্লাসনস্ত (মুক্তচিন্তা, মুক্ত পরিবেশ, স্বচ্ছতা) ও পেরেস্ত্রোইকা (পুনর্গঠন) প্রস্তাব পেশ করেন। সোভিয়েত কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা হয়ে গেল। বরিস ইয়েলৎসিন আরও বেশি বেশি প্রতিক্রিয়াশীল আচরণের মাধ্যমে গর্বাচভের জীবন দুর্বিষহ করে তোলেন। ১৯৯১ সালের ২৪ আগস্ট বিধ্বস্ত গর্বাচভ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে স্বেচ্ছানির্বাসনে অন্তরালে চলে যান।

সত্তর বছরের সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই বেদনাদায়ক পরিসমাপ্তি প্রসঙ্গে প্রকাশ কারাত 'মার্কসিস্ট' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লেখেন—''১৯৮৭ সালের নভেম্বর থেকে গর্বাচভ পর্যায়ক্রমে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন ও চরিত্রে শৈথিল্য আমদানি করেন... ফলে দুর্বল মুহূর্তে ইয়েলৎসিনের প্রতিআক্রমণের প্রতিকার, প্রতিরোধ, মোকাবিলার ক্ষমতা সোভিয়েত পার্টির ছিল না।''

আরও একটি প্রবন্ধে প্রকাশ কারাত লিখেছেন—''১৯৯১ সালের ৭ নভেম্বর, বিপ্লবের ৭৪ বছরে ক্রেমলিনে গর্বাচভ একাকী। তিনি 'রেড স্কোয়ারের' প্যারেডে অংশ নেননি, কারণ কোনও প্যারেড এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। তিনি পার্টির কোনও আনন্দানুষ্ঠানে নেই, কারণ পার্টিকে নিষিদ্ধ ও অনৈতিক ঘোষণা করা হয়েছে—পার্টিরই আর কোনো অস্তিত্ব নেই।''

কনস্তান্তিন চেরনেস্কোর মৃত্যুর পর গর্বাচভ ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলেন। মাত্র ৬ বছরে তাঁর রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটল। গ্লাসনস্ত পেরেস্ত্রোইকার ফল।

সোভিয়েত রাশিয়ার পতন হল, ইয়েলৎসিন ১৯৯১ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত ক্ষমতায় রইলেন। তারপর কেজিবি প্রধান ভ্লাদিমির পুতিনের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে বাধ্য হন। ২০০৭ সালের ২৩ এপ্রিল ইয়েলৎসিনের প্রয়াণ ঘটে।

পুনরায় একমাত্রিক বিশ্বের বিশ্বায়ন

সোভিয়েত রাশিয়ার পতনে একমাত্রিক পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবির সমগ্র ভুবনে প্রসারিত হবার সুযোগ পেল। পুঁজি যে-কোনো ভৌগোলিক সীমারেখাকে উপেক্ষা করে অবাধ চলাচাল শুরু করল—ঔদ্ধত্য বা স্পর্ধার সাথে ফিনান্স পুঁজির ভুবনায়ন-বিশ্বায়নের নামে। আর্থিকভাবে দুর্বলতর দেশগুলির অভ্যন্তরে বৈদেশিক পুঁজি প্রবেশ করে, বাজার দখল করে, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে ফিরে যাচ্ছে তার উৎসস্থলে, পুঁজিবাদের জন্মভূমিতে। দেশে দেশে পুনরায় শোষণযন্ত্র চালু হয়েছে। ধনী ও নির্ধনের প্রভেদ ক্রমশ স্ফীত আকার ধারণ করছে।

কেমন চলছে বিশ্বায়ন? বন্ধুবর সমাজকর্মী দিনেশ ঝা হিন্দিতে একটি কবিতা লিখেছেন। তার একটি অক্ষম বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করি—

কী লিখতে তুমি আজ
মুন্সি প্রেমচন্দ্?
কোথায় তোমার আদরের
হীরা-মোতি বলদ দুটি?
তেল মাখানো শিং,
আওয়াজ তুলে টিং-টিং,
গলায় ঘণ্টার মালা,
টিকলিতে কড়ির মালা,
হলকর্ষণ করে না তো আর
অবলা শ্রমিক দুটি।
কোথায় গেছে তারা?
পৃথিবীর এপারে না ওপারে?
ফেলে রেখে রশিগাছি দুটি?

কাস্তে-কোদাল-হাল চালানো
চাষিরাই বা কোথায় থাকে?
হালে জুতে দেবার দড়ি
উঠে গেছে গলার ফাঁসে
অনাহার থেকে মুক্তি দিতে।

চটকলেও বাজে না ভেঁপু।
আধুনিক শিল্পের পেটেও তো
বসবাস, কর্মহীন কঙ্কালসার
রুগ্ন অথবা মৃত মানুষের
স্তূপীকৃত অবয়ব।

কোদাল হারা, কাস্তে হারা,
জোতহারা, বলদ হারা,
কর্মহারা সর্বহারার মিছিল?
কী লিখতে তুমি আজ
মুন্সি প্রেমচন্দ্?

সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের উত্থান নভেম্বর বিপ্লবের ফলে। যা রচিত হয়েছিল মার্কস-লেনিনের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে। তা দুনিয়ার তামাম দেশে সাম্রাজ্যবাদকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। স্তালিনের দৃঢ়তার ফলে এক দ্বি-মাত্রিক বিশ্বক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, যা উপনিবেশগুলির পতন ঘটায়, রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ পরাস্ত হয়। মুক্তি আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, শোষিত মানুষের পাশে থাকা সমাজতন্ত্র সমর্থন করে চলে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে।

সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ঘটে শৃঙ্খলা ও নিয়মের শৈথিল্যে। মার্কস-লেনিন-স্তালিনের সঠিক নীতি রূপায়ণে পরবর্তী নেতৃত্বের দুর্বলতা ও বিচ্যুতির ফলে। কিন্তু আবারও একমাত্রিক বিশ্বে পুঁজিবাদের উত্থান ও ভুবনায়ন প্রমাণ করেছে সমাজতন্ত্রের নীতির যথার্থতাকে। তাই নভেম্বর বিপ্লব আজও সমান প্রাসঙ্গিক। এই সমকালে তা এখনও আলোর বিকিরণ ঘটাচ্ছে। বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, যাঁরা ইতিহাসের সত্যতায় আস্থাশীল তাঁরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অবস্থানেই অচল থাকবেন, কারণ মানবসভ্যতার ইতিহাসে নভেম্বর বিপ্লব একটি চিরকালীন দিকচিহ্ন অঙ্কন করে গেছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
প্রকাশ কারাত, সীতারাম ইয়েচুরি, ইরফান হাবিব, বিজয় প্রসাদ, প্রভাত পট্টনায়েক, বিটি রণদিভে, গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ—যাঁদের পুস্তক ও প্রবন্ধমালা পাঠ করে সমৃদ্ধ হয়েছি।

কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণ

সুশান্ত ব্যানার্জি

সমস্ত দেশে সমস্ত যুগে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছে জনগণের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ থেকে। ক্ষুদ্রতম অংশের পক্ষে মহাশক্তিধর শ্রেণিশত্রুদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে শ্রমিকশ্রেণির জয়ী হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। পার্টির চৌহদ্দির বাইরের ব্যাপক সংখ্যক জনগণকে পার্টির পতাকাতলে সংগঠিত করতে পারলে তবেই এই সংগ্রামে জয়ী হওয়া সম্ভব। কমিউনিস্ট পার্টি যদি নিরন্তর নিজেকে নিজের খোলসের মধ্যে গুটিয়ে রাখে, জনগণ থেকে দূরে থাকে, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে বা কোনো কারণে পার্টির প্রতি জনগণ রুষ্ট বা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে, পার্টির সমস্ত সংগ্রামই ব্যর্থ হবে। শ্রেণিশত্রুরা পার্টিকে নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এটাই হল ইতিহাসের অভিজ্ঞতা। কারণ জনগণই হল পার্টির মূল শক্তি, পার্টির প্রাণ, পার্টির রক্ষক। জনগণই প্রকৃত বীর, জনগণই অমিত ক্ষমতার অধিকারী, জনগণ অপরাজেয়। জনগণেরই আছে সীমাহীন শক্তি, সৃজনীশক্তি। যার জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী জনগণকে বলা হয় ইতিহাসের স্রষ্টা।

তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে 'কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন—''সংখ্যালঘিষ্ঠরা যদি জনগণকে পরিচালনা করতে, তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে অক্ষম হয়, তাহলে তাদের কমিউনিস্ট পার্টি বলা যেতে পারে না। সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে তারা অকেজো, তা তারা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে যতই জাহির করুক না কেন!"

কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রেই নয়, মানব সমাজের ইতিহাসে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব হওয়ার বহু আগে থেকেই বহু সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। একটার পর একটা সমাজব্যবস্থারও বদল হয়েছে। এক ধরনের শাসকশ্রেণির জায়গায় অন্য এক ধরনের শাসক-শোষক শ্রেণি আধিপত্যের জায়গায় কায়েম হয়েছে। সেইসব পরিবর্তনের কোনোটাই এমনি এমনি হয়ে যায়নি। প্রত্যেকটি পরিবর্তনের পিছনেই আছে পারস্পরিক সংঘর্ষ, বিদ্রোহ, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, বিপ্লবের ঘটনা। আজ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো শাসকশ্রেণিই কাউকে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়নি। যা আবিষ্কার করে মার্কস-এঙ্গেলস্ তাঁদের 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'-এ বললেন—''আজ পর্যন্ত মানব সমাজের যে লিখিত ইতিহাস সেই লিখিত ইতিহাসটি হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস।" প্রত্যেকটি শ্রেণি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে জনগণই প্রধান এবং নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে এসেছে। তবে অতীতের প্রত্যেকটি শ্রেণিসংগ্রামের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির সমাজবিপ্লবের সংগ্রামের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রভেদ আছে, যার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে এইজাতীয় সমাজবিপ্লবে জনগণের অংশগ্রহণ এবং ভূমিকার মতো মৌলিক প্রশ্নটি।

পুঁজিবাদকে উৎখাত করে অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণিকে উৎখাত করার বৈপ্লবিক সংগ্রাম পূর্বেকার সংগ্রামগুলির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মানব ইতিহাসে পুঁজিবাদী সমাজ পর্যন্ত যতগুলি শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ক্ষমতা দখল করেছে তার বিশেষত্ব হল একটি শাসকশ্রেণিকে উচ্ছেদ করে তার জায়গায় ক্ষমতা দখল করেছে অন্য আর একটি শাসকশ্রেণি বা শোষক শ্রেণি। যেমন—দাসব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে সামন্তশ্রেণি। এরপর সামন্তশ্রেণিকে পুঁজিপতি শ্রেণি উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করেছে। অর্থাৎ এই স্তর পর্যন্ত একের পর এক শ্রেণিবিভক্ত শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থাই কায়েম হয়ে আসছে। এরপর যে লড়াই তা হল কমিউনিস্ট পার্টি তথা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে ব্যক্তিমালিকানা, ব্যক্তিশোষণের অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানাধীন শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লড়াই। পুঁজিপতি শ্রেণি হল প্রচণ্ড শক্তিধর শ্রেণি, তার সঙ্গে আছে অনেক মিত্র শ্রেণি, অনেক মিত্রশক্তি। সর্বোপরি 'পুঁজি হল একটি আন্তর্জাতিক শক্তি'। তামাম বিশ্বে পুঁজিপতি শ্রেণির পাশে মদতদাতা হিসেবে তৈরি আছে কমিউনিস্ট-বিরোধী শক্তি। পুঁজিপতি শ্রেণির হাতেই 'রাষ্ট্রযন্ত্র'। উন্নত বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, তথ্য প্রচারমাধ্যম ইত্যাদি সমস্তই তাদের অধিকারে। বিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করার মতো হেন কোনো অস্ত্র নেই যা পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে মজুত নেই। কিন্তু ইতিহাসে বারবার প্রমাণ হয়ে গেছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী জনগণের হাতে তাদেরকেই বারংবার পর্যুদস্ত হতে হয়েছে। জনশক্তি এমনই এক অপরাজেয় শক্তি। ইতিহাস সে-কথাই বলে।

দুনিয়ার বুকে রুশদেশে সর্বপ্রথম ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে লেনিনের পরিচালনায় পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল এবং ক্ষমতা দখল করেছিল শ্রমিকশ্রেণি। রুশবিপ্লবে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবিপ্লবে, সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদবিরোধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের কোটি কোটি বীর জনগণ অকাতরে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র সোভিয়েত রাশিয়াকেই নয়, বিশ্বশান্তি-প্রগতি এবং মানবসভ্যতাকে ফ্যাসিস্ত শক্তির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করেছিলেন।

চীন দেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মাও-জে-দঙ-এর পরিচালনায় ১৯৩৪ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৩৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত টানা দু-বছর ধরে চীনা শ্রমিক-কৃষকের লালফৌজের দুনিয়া কাঁপানো সাড়ে-বারো হাজার কিলোমিটারের ঐতিহাসিক সফল সামরিক অভিযান (লংমার্চ) অগণিত জনগণের বিপুল সমর্থনে বলীয়ান হওয়ার মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়েছে। এরই

রেশ ধরে ১৯৪৮ সালে চীনের মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল এবং অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিল।

এর পরে কয়েক শতাধিক বছর দেশি-বিদেশি শাসক ও পররাজ্যগ্রাসীদের নির্মম শোষণ-শাসনের নাগপাশে জর্জরিত মাত্র সাড়ে তিন কোটি ভিয়েতনামী জনগণ ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে হো চি মিন-এর পরিচালনায় পর্যায়ক্রমে ফরাসি, ব্রিটিশ এবং অবশেষে বিশ্বমাতব্বর মহাশক্তিধর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 'পোকা' (ভিয়েতনাম) বনাম 'হাতি' (ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি)-র যুদ্ধে চূড়ান্ত পর্বে আমেরিকার বিরুদ্ধে আমরণ আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভিয়েতনামবাসীর অবিশ্বাস্য-অত্যাশ্চর্যজনক জয়ী হওয়ার মতো নজিরবিহীন ঐতিহাসিক ঘটনা সম্ভব হয়েছে মাত্র বিয়াল্লিশ বছর আগে। ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির মুক্তিফৌজের কালজয়ী সংগ্রামের সাফল্য লাভের সমুদয় কৃতিত্ব বীর দেশপ্রেমিক জনগণেরই।

ছোট্ট কিউবা ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতপুষ্ট স্বৈরাচারী শাসককে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা, কিউবাতে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ অভিযানে প্রতি পদে পদে দোরগোড়ার প্রতিবেশী আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নিরন্তর ধ্বংসাত্মক গভীর ষড়যন্ত্রকে কঠোর হাতে মোকাবিলার মধ্য দিয়ে নির্ভীকভাবে এগিয়ে চলেছে। 'হয় সমাজতন্ত্র না হয় মৃত্যু'কে আলোকবর্তিকা করে নিয়েছে সমগ্র কিউবা। এক্ষেত্রেও দীর্ঘস্থায়ী অবরুদ্ধ কিউবার সাফল্যলাভের একমাত্র কারণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একশো শতাংশ কিউবাবাসীর ধারাবাহিক কঠিন জীবনযুদ্ধ এবং সর্বশক্তি উজাড় করে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সুদৃঢ় সমর্থন।

এছাড়া ভারতের মতো বিশ্বের দেশে দেশে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি সংগ্রামে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলায় এবং গণতন্ত্র-শান্তি-সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে প্রতিটি দেশের দেশপ্রেমিক জনগণের আত্মবলিদান পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তাই শেষ বিচারে ইতিহাসের স্রষ্টা জনগণই হল কমিউনিস্ট পার্টির শক্তির মূল উৎস।

এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতেই হবে ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগ বেশ কিছুদিন হল উদ্বেগজনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যা কিছু ক্ষয়ক্ষতি তাকে প্রতিরোধ করে প্রতিকারের পথের সন্ধানেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বিগত একুশতম পার্টি কংগ্রেস এবং তার পরপরই সাংগঠনিক প্লেনাম ডেকে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তার প্রয়োগ প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে।

আমাদের স্মরণে রাখা দরকার জনগণের সঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবধান বিচ্ছিন্নতা অকস্মাৎভাবে ঘটেনি। পার্টি সম্পর্কে জনগণের যাবতীয় নেতিবাচক মানসিকতা গড়ে উঠেছে দিনের পর দিন ধরে। মূল সমস্যা-ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি নির্দিষ্ট করে উচ্চতর পার্টি নেতৃত্ব একাধিকবার লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন, মৌখিক সতর্কতাও জারি রেখেছিলেন, কিন্তু পার্টির ত্রুটি সংশোধন-শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া বিশেষ একটা কাজ দেয়নি। পার্টির একটা অংশের নেতা ও কর্মীদের মানুষের সাথে বিসদৃশ আচার-ব্যবহার, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভূমিকা, চালচলন, জীবনযাত্রা, বিলাস, বৈভব, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, সুবিধাবাদ-সুবিধাভোগী ভূমিকা, আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ, অহমিকা, দাম্ভিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, উপদলীয় কার্যকলাপ, কথার সাথে কাজের ফারাক, অসততা, অনৈতিক-অকমিউনিস্টসুলভ ভূমিকা ইত্যাদি গুরুতর নানা ব্যাধি গ্রাস করেছিল। সে-সব অনাকাঙ্ক্ষিত বিচ্যুতি মানুষ মেনে নিতে পারেননি। মানুষ যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েছেন, গভীরভাবে আহত হয়েছেন, ক্ষুব্ধ, বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। কাছের মানুষ দূরে সরে গেছেন। পার্টির প্রতি জনসমর্থন, দরদ ক্রমান্বয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে গণভিত্তিও দুর্বল হয়েছে। তাই যাবতীয় ঘটে যাওয়া ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি থেকে নিজেদের মুক্ত করে নতুন করে শিক্ষা নিয়ে জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের পরিকল্পনা পার্টি গ্রহণ করেছে। লেনিনের অমূল্য শিক্ষা—''কোনো রাজনৈতিক পার্টি কতখানি একনিষ্ঠ এবং নিজ শ্রেণি আর মেহনতি জনসাধারণের কাছে নিজের দায়িত্ব সে কার্যত কতখানি পালন করে তা বিচার করার সবচেয়ে নিশ্চিত আর মূল্যবান উপায়ের অন্যতম হল নিজের ভুল সম্বন্ধে পার্টির মনোভাব। অকপটে ভুলভ্রান্তি স্বীকার করা, তার কারণ খুঁজে বের করা, কোন অবস্থায় এই ভুল হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা এবং সংশোধন করার উপায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা—এ সবই হল দায়িত্বশীল রাজনৈতিক পার্টির লক্ষণ। এইভাবেই তার কর্তব্য পালন করা উচিত, এইভাবেই তার উচিত প্রথমে শ্রেণিকে তারপর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা।...'' (সূত্র : বামপন্থী কমিউনিজ়ম ও শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা)।

সেইজন্য প্লেনামের মধ্য দিয়ে পার্টি গ্রহণ করেছে 'গণলাইন (Mass line) যার মূল আহ্বান হল—''পার্টির মতাদর্শ-রাজনীতি ও আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মসূচি নিয়ে জনগণের কাছে যেতে হবে, নিবিড় ও নিরন্তর গণসংযোগের মধ্য দিয়ে জনগণের প্রতিক্রিয়া, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগুলি নিয়ে আসতে হবে, সেগুলির পর্যালোচনার ভিত্তিতে আবার তাঁদের কাছে ফিরে যেতে হবে। এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমগ্র পার্টির বোঝাপড়া ও কাজের ধারাকে ক্রমাগত উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে বেশি বেশি মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে, শ্রেণিশক্তিসমূহের ভারসাম্যের পরিবর্তন করতে হবে। পার্টির মধ্যে গতানুগতিকতা, ধরাবাঁধা রুটিনসর্বস্ব কাজের ধারা সংশোধন করে রাজ্য কমিটি থেকে শুরু করে পার্টি শাখার সকল সদস্য পর্যন্ত সকলকে এই কাজে সামিল করার ভিত্তিতে পার্টি সংগঠনকে 'স্ট্রিম লাইন' করতে হবে। (রাজ্য পার্টির সাংগঠনিক প্লেনামে গৃহীত সংগঠন সম্পর্কিত প্রস্তাব)

এই প্রক্রিয়া হল সীমাহীন ঘূর্ণাবর্তের মতো। যার মধ্য দিয়ে সম্মিলিত মত হয়ে ওঠে আরও বেশি সর্বজনগ্রাহ্য, আরও বেশি নির্ভুল, আরো বেশি প্রাণবন্ত এবং আরও বেশি সুসমৃদ্ধ। জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার এটাই একমাত্র গ্যারান্টি।

'গণলাইন'-এর প্রকৃত অর্থই হল 'সমস্ত কিছু জনগণের জন্য' এবং 'সমস্ত ব্যাপারেই জনগণের ওপর নির্ভর করা', 'জনগণের মধ্যে যাওয়া' এবং 'জনগণের কাছ থেকে আসা', পারস্পরিক 'দেওয়া-নেওয়া'র গভীর সম্পর্ককে নিয়ে পথচলা। মাও-জে-দঙ বারবার জোরালোভাবে বলতেন, ''যতদিন পর্যন্ত আমরা জনগণের ওপর নির্ভর করে থাকবো, জনগণের অফুরন্ত সৃজনীশক্তির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখবো আর সেইজন্য জনগণের ওপর আস্থা রেখে আমাদের নিজেদেরকে তাদের সঙ্গে এক করে দেখবো, এতদিন পর্যন্ত কোনো শত্রুই আমাদের পর্যুদস্ত করতে পারবে না। বরং আমরাই আমাদের প্রত্যেক শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে পারব এবং প্রতিটি বাধাই অতিক্রম করতে পারব।" ইতিহাসেও একই কথা প্রমাণিত হয়ে চলেছে।

কমিউনিস্ট পার্টিতে এখন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অপ্রয়োজনীয়?

আভাস রায়চৌধুরী

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র বেশ কিছু সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বড় বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পার্টির নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজকর্ম নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে, পার্টির অনুসারী মানুষদের মধ্যে, পার্টির ভিতরে বিতর্ক স্বাভাবিক। সুস্থ বিতর্কে পার্টির সজীবতা রক্ষা পায় এবং পার্টি তার অনুসারী জনগণকে নিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রতিটি স্তরের বিতর্কের বিষয়বস্তু ও পরিপ্রেক্ষিত এক হলেও চরিত্র ও লক্ষ্য এক নয়। পার্টি-সদস্যরা নীতিগত প্রশ্নে পার্টির ভিতের বিতর্ক ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সাফল্যগুলিকে সংহত এবং দুর্বলতা কিংবা ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করে এগিয়ে যেতে। পার্টির ভিতরের প্রতিটি বিতর্কের নির্ণায়ক বিন্দুটি হল মতাদর্শ। মতাদর্শগত বিতর্ক সমাজ-বিচ্ছিন্ন নিরালম্ব শুধুমাত্র পার্টি-কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু নয়, পার্টির বাইরে বৃহত্তর সমাজে শ্রেণি সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি হল পার্টির ভিতরের বিতর্কগুলি। অনুসারী জনগণ পার্টিসভ্য নন কিন্তু জীবন দিয়ে পার্টিকে ভালোবাসেন, পার্টির নীতি-সিদ্ধান্ত কাজকর্ম তাঁদের মনে প্রশ্নের জন্ম দিলে পার্টিকে সেই বিতর্কে অংশগ্রহণ করে নীতিগত প্রশ্নে পার্টির অবস্থান পরিষ্কার করতে হয়। এই কাজের মধ্য দিয়ে পার্টির প্রতি অনুসারী জনগণের আস্থা আরো মজবুত হয়। সাধারণ জনগণের যে অংশ হয়তো এখনো পার্টির নীতি ও আদর্শের অনুসারী নয় কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় শাসকশ্রেণির অন্যান্য পার্টিগুলি কিংবা আরো অন্যান্য পার্টিগুলির থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে অন্য চোখে দেখেন, তাঁদের মধ্যে বিতর্ক এবং প্রশ্নগুলিকেও পার্টিকে ধৈর্য ও বিনয়ের সাথে মোকাবিলা করে নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করতে হয়। বিতর্ক ও সমালোচনায় ধৈর্য, বিনয় ও দৃঢ়তা পার্টির মর্যাদা ও আকর্ষণী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু যে বিতর্কগুলিকে পার্টির শ্রেণি-শত্রুরা পৃষ্ঠপোষকতা করে সেগুলির উদ্দেশ্য পার্টির কর্মী ও অনুসারী জনগণকে বিভ্রান্ত করে বিপথগামী করে পার্টিকে দুর্বল করা। এ সম্পর্কে পার্টিকে সদা সতর্ক ও সচেতন থাকতে হয়।

ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নয়া উদারনীতির নরমেধের ঘোড়া যখন পশ্চিম থেকে আমাদের দেশেও এল তখন সিপিআই(এম)-এর বিরুদ্ধে যতগুলি বিতর্ককে শ্রেণি-শত্রুরা সংগঠিত করেছিল তার সবগুলির মূল সুর ছিল—আজকের বিশ্বে সমাজতন্ত্র, বামপন্থা অচল। এই বিতর্ক, বা আরো স্পষ্ট করে বলা যায় নির্মিত মতামত, আজও ক্রিয়াশীল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব বিষয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা সংবাদ-মাধ্যমের অন্যতম হটকেক অ্যাজেণ্ডায় পরিণত হয়েছে। আসলে পঁচিশ বছরের তথাকথিত মুক্ত পৃথিবীর বাস্তব চেহারায় নয়া উদারনীতির পরিচালকরা ভয় পাচ্ছেন, 'কমিউনিজমের ভূত' যদি আবার তাদের তাড়া করে বেড়ায়। সামগ্রিকভাবে এখন এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি, বামপন্থীদের শক্তি ক্ষয়ের পরেও শ্রমিক-কৃষক সহ শ্রমজীবী মানুষ স্বৈরশাসকের লাল চোখকে অস্বীকার করে কলে কারখানায় খেত খামারে বন্দরে নগরে গ্রামে—ঘামের দাম পেটের ভাত আর কাজের দাবিতে সংগ্রামে সামিল হচ্ছেন। আজকের কুয়াশার কুহেলিকাই চিরস্থায়ী নয়, শ্রমজীবী মানুষের জীবন-যন্ত্রণাই আঁধার চিরে আলো আর উত্তাপ আনবেই। তাই আজ দুর্বল অবস্থায় থাকলেও ভবিষ্যতে যাতে সবল হয়ে দাঁড়াতে না পারে তাই কমিউনিস্ট পার্টির মেরুদণ্ড, প্রাণবস্তু গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে ওরা ক্রমাগত আক্রমণ করে যাচ্ছে। অতীতেও দেখা গেছে কমিউনিস্ট পার্টি যখন মতাদর্শগত প্রশ্নে ভিতরে-বাইরে সংগ্রাম করছে তখনও হয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে বিকৃত করা হয়েছে, অথবা সামগ্রিকভাবে এই নীতিকেই আক্রমণ করা হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু এই সমাজের মধ্যে কাজ করে, তার সভ্যরা যেহেতু এই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও অংশ থেকে আসে, তাই বাইরের বিরুদ্ধ বা শত্রুশ্রেণির আদর্শগত প্রভাব, স্বার্থের অসচেতন প্রভাব ধারাবাহিকভাবেই পার্টির ভিতরে গিয়ে উপস্থিত হয়। ফলে ইতিহাস বলছে কমিউনিস্ট পার্টির মেরুদণ্ড গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বাহির ও ভিতর উভয় দিক থেকেই আক্রমণের মুখে পড়ে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রতি এই আক্রমণ বিদ্বেষ আসলে কমিউনিস্ট পার্টির সজীবতাকেই প্রমাণ করে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির মূল বক্তব্যটি কী? পার্টির কাঠামো ও অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে গঠিত। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অর্থ হলো অন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব। অন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের মর্মবস্তু হলো পার্টি, পার্টির নীতি ও কাজের সমস্ত বিষয়ে পার্টি ইউনিটে খোলামেলা আলোচনা। কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র হলো সজীব, যৌথকাজের গণতন্ত্র অর্থাৎ এমন এক গণতন্ত্র যেখানে পার্টি-সদস্যরা কেবল নেতৃত্বকে নির্বাচিতই করে না, নীতি নিয়ে আলোচনা করে এবং পার্টির কাজে সক্রিয় অংশ নেয়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হলো কেন্দ্রিকতা ও গণতন্ত্রের প্রকৃত মিলন। যৌথ কাজের ধারার অর্থ হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যৌথ আলোচনার মাধ্যমে, তারপর গৃহীত সিদ্ধান্তকে সকল পার্টিসদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্বমতো পালন করতে হয় এবং আবার সিদ্ধান্ত রূপায়ণের

অভিজ্ঞতাকে যৌথভাবে পর্যালোচনা করা হয়। যৌথ কাজের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রত্যেক পার্টিসভ্যের সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পূর্ণ অধিকার আছে। অন্যভাবে বলা যায় সমালোচনা-আত্মসমালোচনা যৌথ কাজের ধারাকে শক্তিশালী করে। কমিউনিস্ট পার্টিতে এইভাবে সম্মিলিত মত ও আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোৎকৃষ্ট গণতান্ত্রিক পদ্ধতি রয়েছে। আবার গৃহীত সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শৃঙ্খলায় সকল পার্টি সদস্যই আবদ্ধ। এটাই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। এখানে নিচের স্তরের কমিটিগুলি ও সভ্যদের উচ্চস্তরের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পার্টির ভিতরে মতামত জানানোর পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু উচ্চস্তরের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে সকলকেই দায়বদ্ধ থাকতে হয়। এটাই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। কমিউনিস্ট পার্টি অন্য ধরনের রাজনৈতিক দল। শ্রেণি বিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণি বা তার অনুচরদের আর পাঁচটা রাজনৈতিক দলের মতো কমিউনিস্ট পার্টি সমাজের প্রবহমান স্রোতের পক্ষে অর্থাৎ শোষণশাহিকে সুরক্ষিত রাখতে কাজ করে না। কমিউনিস্ট পার্টি সমাজ পরিবর্তন করতে চায়, সমাজ থেকে শোষণশাহিকে চিরতরে উচ্ছেদ করতে চায়। ফলে প্রতিনিয়ত প্রবহমান সমাজের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকল্প নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয়। এই শ্রেণি বিভক্ত সমাজে শাসক শ্রেণির প্রধান প্রতিষ্ঠান 'রাষ্ট্রের' বিপরীতে সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান হল কমিউনিস্ট পার্টি। ফলে তা শুধুমাত্র বর্তমান সমাজের শাসকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির সচেতন বা অসচেতন অনুসারী অন্যান্য পার্টিগুলির মতো হালকা গ্রন্থির পার্টি নয়, তাকে চিন্তা, চেতনা ও কাজকর্মে সচেতন, আটোসাটো, শক্তিশালী ও সদাসক্রিয় হতে হয়। পার্টির এই শৃঙ্খলাবদ্ধ বৈশিষ্ট্যটাই শাসকশ্রেণি ও তাদের অনুসারী শিবিরের পছন্দ নয়। এই চরিত্রকে লঘু করতেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে আঘাত করা হয়।

পৃথিবীব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে পার্টির প্রাণবস্তু এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিটি লেনিনের আবিষ্কার। বুর্জোয়া আধিপত্যকে উচ্ছেদ করার মতো কঠিন কাজে যে বাধাগুলি আসবে, যে যে আক্রমণগুলি আসবে, তাকে মোকাবিলা করে কমিউনিস্ট পার্টিকে রক্ষা ও তৎপর করতে পার্টি-কাঠামোয় এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নির্মাণ। এই নীতি নির্ধারণে লেনিনকে পার্টির ভিতরে তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রাম করতে হয়েছে।

পৃথিবীব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে পার্টির প্রাণবস্তু এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিটি লেনিনের আবিষ্কার। বুর্জোয়া আধিপত্যকে উচ্ছেদ করার মতো কঠিন কাজে যে বাধাগুলি আসবে, যে যে আক্রমণগুলি আসবে, তাকে মোকাবিলা করে কমিউনিস্ট পার্টিকে রক্ষা ও তৎপর করতে পার্টি-কাঠামোয় এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নির্মাণ। এই নীতি নির্ধারণে লেনিনকে পার্টির ভিতরে তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রাম করতে হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি হলো 'শ্রমিক শ্রেণির অগ্রণী বাহিনী', 'শ্রমিক শ্রেণির সংগঠিত বাহিনী' — কথাগুলি নিছক শব্দবন্ধ নয়, গভীর রাজনৈতিক সামাজিক ব্যুৎপত্তি যুক্ত জৈব বিষয়বস্তু। পার্টি শ্রমিকশ্রেণি ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে থেকে, তাদের সঙ্গে নিয়ে, তাদের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম একটি সংগঠিত সদস্যপদের সম্মিলন। পার্টি শ্রমিক শ্রেণির পার্টি, কিন্তু একমাত্র শ্রমিকদের পার্টি নয়। শোষণমূলক সমাজের উচ্ছেদ অর্থাৎ বিপ্লবের লক্ষ্যে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সহ এমনকি শাসক শ্রেণির অনুসারী শ্রেণিগুলি থেকেও অনেক মানুষ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়, যোগ দিতে পারে। তবে শ্রমিক সহ সকলকেই শ্রমিক শ্রেণির আদর্শ, লক্ষ্য ও স্বার্থের সাথে নিজেকে একাত্ম করতে হয়। এ কথাগুলি বলা যত সহজ রূপায়ণ করা ততটাই কঠিন। শ্রমিক শ্রেণির পার্টি কমিউনিস্ট পার্টিকে তার অভ্যন্তরে অসংখ্য শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্যকে একসূত্রে বেঁধে বিপ্লবের লক্ষ্যে চলতে চলতে অসংখ্য বিতর্কের মুখোমুখি হতে হয় এবং একটা সময়ের পর আলোচনার মধ্য দিয়ে কর্তব্য স্থির করতে হয়। ফলে পার্টি অভ্যন্তরে সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করেও কখনোই নিজেকে বিতর্ক সভায় পরিণত করে শ্রেণি-শত্রুদের উৎসাহিত করতে পারে না। কমিউনিস্ট পার্টিতে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সূচনাবিন্দু ও মূল স্তম্ভ। এই অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত রেখে দৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টি গড়ে তোলার লক্ষ্যেই পার্টির সকলে কাজ করে চলার চেষ্টা করে। পার্টির অভ্যন্তরে নীতি নির্ধারণে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নীতিগুলি কাজের শৃঙ্খলার সাথে রূপায়ণের কেন্দ্রিকতার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা আজও আমাদের দেশেও স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পার্টিকে শক্তি জোগায়। সিপিআই(এম)-এর গঠনতন্ত্রের ১৩ নম্বর ধারায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ রয়েছে। বিপ্লব সম্পন্ন করা অথবা বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যে থাকা পৃথিবীর সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এটি। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা শুধুমাত্র গঠনতান্ত্রিক বিধি নয়, তা ভাবলে ভাবনা যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হবে। এটি স্পষ্টভাবেই একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, নীতি, যেখানে শোষণমুক্তির পথের যাত্রীরা একই সঙ্গে তার লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন, নিজের ও অন্যের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়, আবার বিপুল আকারের শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সুনির্দিষ্টভাবে সংগঠিত করার জন্য ভবিষ্যতে পুনরায় আলোচনার সুযোগকে উন্মুক্ত রেখেই শ্রেণি-ঐক্যকে মজবুত করতে পারে। সেই জন্যই কমিউনিস্ট পার্টির জৈব কাঠামোটি হল সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতীক।

ক'দিন আগে মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছে, 'তত্ত্বগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক নিবিড়, কিন্তু বাস্তবে গণতন্ত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে এক পরাক্রমশালী পার্টিতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গে গড়ে উঠেছে।' পার্টির শৃঙ্খলায় ওদের ভয়। তাই পার্টির সংগঠিত চেহারা ও শৃঙ্খলাকে ওরা বিদ্রুপ করে 'পার্টিতন্ত্র' বলতে চায়। শাসকশ্রেণির আধিপত্যকে রক্ষা করছে রাষ্ট্র। শাসকশ্রেণির বিভিন্ন দলের মধ্যে যে বিরোধই দেখা দিক না কেন সেগুলির কোনোটাই শাসকশ্রেণির আধিপত্য কিংবা রাষ্ট্র কাঠামোর প্রতি কোনো চ্যালেঞ্জ নয়। শ্রমজীবীদের মূল কাজটাই শাসকশ্রেণির আধিপত্য আর রাষ্ট্র কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানানো, তাকে উচ্ছেদ করা। ফলে এই অসম লড়াইয়ে তাদের একমাত্র হাতিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র আর সিদ্ধান্ত রূপায়ণে ইস্পাতের মতো শৃঙ্খলা। 'কমিউনিজমের ভূত'র

ভয় থেকে ওদের পূর্বপুরুষদের মতই আজো এ বাংলায় ওরা এই শৃঙ্খলাকে বিদ্রুপ করে 'পার্টিতন্ত্র' বলে।

কেউ কেউ বলেন, ঠিক আছে গৃহযুদ্ধের সময়ে লেনিন, মাও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা নিয়ে পার্টি গড়েছিলেন, আজ তার বাস্তবতা নেই। এটা কি সত্যি? কমিউনিস্ট পার্টি কি এখন শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের স্বার্থবাহী ব্যবস্থায় আছে? কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক ও অনুসারী মানুষদের ওপর কি শাসকশ্রেণির আক্রমণ থেমে গেছে? বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে কি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলছে? এই সব ক'টা প্রশ্নের একটাই উত্তর—'না'। শ্রমজীবী জনগণকে, কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রয়োজনের তাগিদেই সংসদীয় ব্যবস্থায় থাকতে হবে। অবশ্যই তা সংসদীয় ব্যবস্থার সুখভোগের জন্য নয়, প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের স্বার্থেই এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ ও ভূমিকাকে ব্যবহার করতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থাকে একেবারে বাদ দিয়ে চলার বাস্তবতা এই মুহূর্তে এ দেশের কমিউনিস্টদের নেই, তবে এটাই শেষ গন্তব্য নয়। ভবিষ্যতে যখন শ্রমিক শ্রেণি তার নিজের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কার্যকরীভাবে এগিয়ে যাবে তখন কি শাসকশ্রেণি চুপ করে বসে থাকবে? কোনো মার্কসবাদী কি কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেন যে শাসকশ্রেণি শ্রমজীবী জনগণের হাতে স্বেচ্ছায় রাষ্ট্র ক্ষমতা ছেড়ে দেবে? বিরুদ্ধ ব্যবস্থায় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে, এগিয়ে যেতে কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোন্ পথ থাকতে পারে কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে? রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন তো অনেক দূরের গন্তব্য, বর্তমানে এ দেশে যে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে কমিউনিস্ট পার্টি সেখানেও কি কঠোর শৃঙ্খলা ছাড়া টিকে থাকতে পারে? এগিয়ে যেতে পারে? উত্তরগুলিও প্রায় সকলের জানা।

শ্রমিক শ্রেণির কোনো পার্টি যদি সোস্যাল ডেমোক্রেসির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে সেখানে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা অপ্রয়োজনীয়, পরিত্যজ্য। পঁচিশ বছর আগের ইওরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর বিশ্বের বহু কমিউনিস্ট পার্টি নিজেকে পরিবর্তন করে নিয়ে চালু প্রবাহের সাথে খাপখাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তা করে নি। বরং সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে করণীয় নির্ধারণ করতে পেরেছে। অভিজ্ঞতা ও করণীয় কাজের লক্ষ্য থেকেই ২০০০-এ বিশেষ পার্টি কংগ্রেস থেকে পার্টি কর্মসূচিকে সময়োপযোগী করেছে এবং বিংশতি পার্টি কংগ্রেস থেকে মতাদর্শগত দলিল গ্রহণ করেছে। পার্টি কর্মসূচি, মতাদর্শগত দলিলে কোথাও বলা হয়নি যে পার্টি সোস্যাল ডেমোক্রেসির দিকে পথ হাঁটছে। দুনিয়ার সব কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরেই অনেক সময় সংশোধনবাদের হাতছানি প্রকট হয়ে ওঠে এবং তার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হয়। কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ইতিহাসেও এই মতাদর্শগত সংগ্রামের ধারা আছে। আবার সব দেশেরই কমিউনিস্ট পার্টিতে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিনেই সংকীর্ণতাবাদের জন্ম হয় এবং তার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালাতে হয়। ১৯০৫-এ রুশ দেশে বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর লেনিনকেও পার্টির অভ্যন্তরে একইসাথে সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। ইতিহাসে যা লিকুইডেটর ও অটজোভিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বলে পরিচিত। সিপিআই(এম)-ও এই দুই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে উপর্যুপরি মতাদর্শগত সংগ্রাম সংগঠিত করেই বিকশিত হয়েছে। ১৯৬৪-তে নতুনভাবে পার্টি গঠন ও ১৯৬৮-তে বর্ধমান প্লেনাম যার অন্যতম ফলাফল। মতাদর্শগত সংগ্রাম একটি ধারাবহিক প্রক্রিয়া, এই সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। এদেশে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়েই এখন পার্টি চলছে। পার্টির মতাদর্শগত দলিলে বিশ শতকে সমাজতন্ত্রের সাফল্য-ব্যর্থতার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেই একুশ শতকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথনির্দেশিকার কথা বলা হয়েছে। সেই সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। এটাই তো স্বাভাবিক। সমাজতন্ত্র মানেই তো উন্নত গণতন্ত্র। কিন্তু সেই স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য কঠিন বিপ্লবী সংগ্রামের পথ অতিক্রম করতে হবে। যার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সিপিআই(এম)-এর সর্বভারতীয় প্লেনাম ঘোষণা করেছে পার্টি নিজেকে গড়ে তুলতে চায় 'গণলাইন সম্পন্ন বিপ্লবী পার্টি' রূপে। যে যে দুর্বলতাগুলির কারণে গণবিপ্লবী পার্টি গঠনের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়নি, তার পর্যালোচনার ভিত্তিতে আগামী করণীয় কাজের মূল কথাটা হল পার্টিকে বিপ্লবী পার্টিতে পরিণত করতে হবে, জনগণের মধ্যে থেকেই জনগণের দিন-প্রতিদিনের সংগ্রামকে সমাজ পরিবর্তনের সাথে যুক্ত করার দক্ষতা অর্জনের জন্য পার্টির বিপ্লবী গুণকে উন্নত করতে হবে, পার্টির নেতৃত্ব থেকে সকল সদস্য ও অনুসারী জনগণের মধ্যে বিপ্লবী মর্মবস্তুকে সজীব রাখতে হবে। পার্টির নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। পার্টির নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধির উপরেই বামপন্থী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা ও আজকের দিনে স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সংগ্রামের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। এ কাজ এক দিনে হবে না এবং সহজ নয়, কিন্তু বিকল্পহীন।

এই বিকল্পহীন, কঠিন ও ধারাবাহিক রাজনৈতিক সাংগঠনিক কতর্ব্য পালনের জন্য পার্টি জীবনে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সঠিক রূপায়ণ ঘটাতেই হবে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সঠিক প্রয়োগ মসৃণভাবে হয় না। কখনো কখনো একাংশের মধ্যে সমগ্র পার্টি-কাঠামো পার্টির সিদ্ধান্ত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কেন্দ্রিকতার ঝোঁকের জন্ম হয়। এই বিচ্যুতি নেতৃত্বের অংশের মধ্যেও সৃষ্টি হতে পারে। আবার কখনো কখনো অন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের দাবিতে পার্টি-সিদ্ধান্তের সাথে সহমত না হলে সিদ্ধান্তকে অমান্য করার ঝোঁকের জন্ম হয়। এটাও অতি-গণতান্ত্রিক চিন্তার প্রতিফলন, যার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির গণতন্ত্রের কোনো সাদৃশ্য নেই। এতে পার্টি দুর্বল হয় শ্রেণি-শত্রুদের হাত শক্তিশালী করা হয়। এই উভয় ধরনের বিচ্যুতির বিরুদ্ধেই অন্তঃপার্টি সংগ্রামের ইতিহাস আছে বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে, আমাদের দেশেও এবং পার্টিতেও। কমিউনিস্ট পার্টির মানুষ হিসাবে এই কর্তব্য সদস্যদের সব সময় মনে রাখতে হয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী, সজীব, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও বিপ্লবী পথে রাখতে এই নীতিকেই সঠিক প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছে পার্টির সর্বশেষ সাংগঠনিক প্লেনাম। এই সংগ্রাম সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব পার্টিজীবনে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি পার্টিসভ্যদের কাছে অন্ধ আনুগত্য দাবি করে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রূপায়ণ ও পর্যালোচনা সবই পরিচালিত হতে হয় নীতি ও যুক্তির ভিত্তিতে। অন্ধ আনুগত্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সফল রূপায়ণের পথে সব থেকে বড় প্রতিবন্ধকতা, এতে উভয় দিক থেকেই বিচ্যুত্তির জন্ম হয়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সঠিক প্রয়োগ কেমনভাবে সম্ভব? লিউ শাও চি'র ভাষায়, ''অন্তঃপার্টি গণতন্ত্র অবশ্যই সম্প্রসারিত হবে, কিন্তু পার্টি-সিদ্ধান্ত অবশ্যই শর্তহীনভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে।'' একথা কখনো ভুলে যাওয়া চলবে না যে পার্টির দায়বদ্ধতা শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমজীবী মানুষের কাছে, পার্টির ঘোষিত লক্ষ্যের প্রতি, কখনোই তা শ্রেণি-শত্রুদের প্রচার-মাধ্যম বা অনুচরদের কাছে নয়।

With best compliments of

BAKSHI ENTERPRISE

KHANDRA, PASCHIM BARDHAMAN

Sl. No. 131

বর্তমান পরিস্থিতি ও কৃষক আন্দোলনের কয়েকটি বিষয়

অমল হালদার

দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও ১৯৯১ সালের জুন মাসে অর্থনৈতিক সংস্কারের অজুহাতে দেশে উদার অর্থনীতি চালু করেন। ঠিক এক বছরের মধ্যেই ১৯৯২ সালের ২৭-৩০ সেপ্টেম্বর হিসারে অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত কৃষকসভার ২৭তম সম্মেলন। সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে তৎকালীন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রামনারায়ণ গোস্বামী বলেন, ''কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান নীতির কৃষক সমাজের মধ্যে ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়বে। এই নীতির ফলে গরিবের সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাবে, ছোটো ও মাঝারি কৃষকের ক্ষেত্রে দুর্দশা চরম রূপ নেবে। কর্মহীন যুবকের সংখ্যা গ্রাম ও শহরে নজিরবিহীন ভাবে বৃদ্ধি পাবে। ডাংকেল প্রস্তাব কৃষিব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। আমাদের দেশের কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে বায়োটেকনোলজি, বায়োইঞ্জিনিয়ারিং সহ অন্যান্য গবেষণার ক্ষেত্রগুলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হবে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি দেশের বীজ উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিকে সংকুচিত করে দেবে এবং বিদেশ থেকে বীজ আমদানি হবে। যে বিপদ আসছে, আমাদের সমগ্র কৃষক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদার অর্থনীতি এবং ডাংকেল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ব্যাপক জমায়েত করতে হবে। কৃষকের কাছে ব্যাখ্যা হওয়া উচিত কৃষিতে এই নীতির কী ধরনের ভয়ংকর প্রভাব পড়বে।''

প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা হল এই জন্য যে উদার অর্থনীতির সূচনার অব্যবহতি পরেই অন্যান্য কৃষক সংগঠনগুলি উদার নীতি ও সরকারের কৃষিনীতিকে উদারভাবে যখন সমর্থন করছেন তখন একমাত্র সারা ভারত কৃষকসভা প্রথম দিন থেকে এই নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং দেশের কৃষকসমাজকে এই নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণে আহ্বান জানাচ্ছে। কৃষকসভার একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে গর্ববোধ করি এই জন্য, যে-কথাগুলি তখন উচ্চারিত হয়েছিল বর্তমানে সারা দেশের কৃষকসমাজ গৃহীত নীতির ফলে সর্বস্বান্ত হয়ে এমনকি নিজের জীবনটুকু বিসর্জন দিয়ে হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করছেন। যে সংকট কৃষিতে ভয়ংকর রূপ নিয়েছে, আগামী দিনে তা আরও বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান অবস্থায় শুধু কৃষি নয়, দেশের শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষেবার সকল ক্ষেত্রে সংকট ক্রমবর্ধমান। এই সংকট আরও তীব্র হবে।

আমাদের হয়তো অনেকের জানা, কৃষিতে এই সংকট বুঝতে গেলে একটু পিছনের দিকে তাকাতে হবে। শাসকশ্রেণি কৃষিতে ধনতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হবার লক্ষ্যে যে নীতি গ্রহণ করে, দুইভাবে তা দেখা দরকার। প্রথমটি হল, দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এবং অপরটি হল ১৯৯০ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার

লক্ষ্য নিয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অনিবার্যভাবে তাদের শ্রেণিনীতির স্বার্থে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু রাস্তা বেছে নেয় তৎকালীন শাসকশ্রেণি। সামগ্রিকভাবে দেশের আপামর মানুষের স্বার্থে অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘদিনের দাবি আমূল ভূমিসংস্কারের প্রশ্নটি উপেক্ষিত হল। সরকারের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সেচের সম্প্রসারণ, কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার, পরিবহন, যোগাযোগ, হিমঘরের মাধ্যমে সংরক্ষণ, সহজ শর্তে কৃষিঋণ, কিছু শস্যের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে সংগ্রহের ব্যবস্থা— অবশ্যই উৎপাদন খরচ বিবেচনা করে, দেশের বাজারকে রক্ষা করতে শস্য আমদানি ও রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা, শস্যবিমা চালু ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলির ফলে সারা দেশে কৃষি উৎপাদন দ্রুত বিকাশ লাভ করে। যদিও সমগ্র লক্ষ্যটা ছিল দেশের ধনী অংশকে আরও শক্তিশালী করা, এই অংশই এই নীতির ফলে অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে। সরকারি সুযোগকে বেশি মাত্রায় কাজে লাগিয়েছে এই ধনী অংশ। এই নীতির মূল দুর্বলতার কারণে কৃষক ও খেতমজুরদের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি।

১৯৯০ সালের পর শুরু হল দ্বিতীয় স্তর। শাসকশ্রেণি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবনায় আর একটি নীতি তৈরি করতে অগ্রণী হল। সেচ, বিদ্যুৎ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার সহ নানা ক্ষেত্রে অতীতে সরকারি বরাদ্দ ছিল, শুরু হল পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ সর্বক্ষেত্রে বরাদ্দ ছাঁটাই। কৃষিতে যা ভর্তুকি ছিল তা ভয়ানকভাবে কমে গেল। আমদানি ও রপ্তানির উপর বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হল। উৎপাদনব্যয় বিবেচনা করে কৃষককে সাহায্য করতে সরকারিভাবে শস্য সংগ্রহের নীতি কার্যত তুলে দেওয়া হল। ব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঋণ দেবার ব্যবস্থা ছিল কৃষিক্ষেত্রে তা ব্যাপকভাবে কমানো হল। রেশন সামগ্রী সরবরাহে ব্যাপক কাটছাঁট করা হল। অ-বাম শাসিত রাজ্যগুলিতে ভূমি-সংস্কারের বিপরীতমুখী ব্যবস্থা চালু হল। কার্যত বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল সমগ্র কৃষি-অর্থনীতিকে।

এই ব্যবস্থার কী চরম পরিণতি হতে পারে বর্তমান ব্যবস্থায় সারা দেশের কৃষকসমাজ কিছুটা হলেও বুঝতে পারছেন। বর্তমানে সারা দেশের কৃষক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি দেখে তা অনেকটাই স্পষ্ট। জীবনের যন্ত্রণা নিয়ে কৃষক সংগ্রামের ময়দানে নামছেন। ইতিমধ্যেই সারা দেশে ৩ লক্ষের বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছেন দেনার দায়ে। আত্মহত্যা কোনো পথ হতে পারে না, সংগ্রাম-আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে যারা নিজেরা বাঁচতে চায় তারা বাঁচে না। লড়াই ছাড়া কোনো পথ নেই। সারা ভারত কৃষকসভার এই আহ্বান কৃষকদের মধ্যে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন জোগাচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের কৃষক রাস্তায় নামল মন্দাসৌর থেকে। এটা উল্লেখ করছি এ-কারণে যে মন্দাসৌর হল নাগপুরের পর আরএসএস-এর দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘাঁটি। কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতায় আছে বিজেপি। তাই মধ্যপ্রদেশের এই আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনাশ করার মতো প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কৃষক আন্দোলন দমেনি। হাজার হাজার কৃষক যখন ফসলের দাম, ঋণ মুকুবের দাবিতে সড়ক, রেল অবরোধ করলো, পুলিশ গুলি চালালো, ৭ জন কৃষক পুলিশের গুলিতে মারা গেলেন। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু সহ কয়েকটি রাজ্যে আন্দোলনের চেহারা দেখে কৃষিঋণ মুকুবের ঘোষণা করা হল রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে। সবচেয়ে প্রধান দাবির কোনো সমাধান হয়নি, প্রধান দাবি ছিল ফসলের দর। আমাদের রাজ্যে যেমন ধান, আলু, পাট সহ সমস্ত ফসলের দাম নেই, তেমনি ওই রাজ্যগুলিতে গম, আলু, চাল সোয়াবিন সহ কোনো শস্যের দাম নেই। স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উৎপাদন-ব্যয়ের ন্যূনতম ৫০ শতাংশ বেশি দাম দিয়ে ফসল ক্রয় করার ঘোষণা বাস্তবে রূপ পেল না। নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনী ঘোষণা যে কৃষকদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য, আজ সারা দেশে কৃষকদের কাছে তা পরিষ্কার। যেমন তাঁর ঘোষণা ছিল বিদেশে কালো টাকা উদ্ধার করে সমস্ত গরিবদের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ করে টাকা দেওয়া হবে। সেটাও ভোট আদায়ের কৌশল। বলা হয়েছিল, প্রতি বছর ২ কোটি বেকার যুবককে চাকরি দেওয়া হবে, ক্ষমতায় আসার পর বৎসরে দেড় লক্ষ বেকার ছেলেও চাকরি পায়নি। আসলে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে আম্বানি, আদানির মতো মুষ্টিমেয় কর্পোরেট হাউস। কৃষকের জন্য কৃষিঋণ মুকুব করতে সরকারের কষ্ট হয়, কিন্তু কর্পোরেট হাউসের ১১ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্কে দেনা, তাকে ছাড় দিতে সরকার ব্যস্ত।

গত শতকের নব্বুইয়ের দশকের পর যে সীমাহীন সংকট শুরু, তা শুধু কৃষিক্ষেত্রে নয় জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভয়ানক ভাবে ক্রিয়াশীল। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলির বিরাষ্ট্রীকরণ, ব্যাংকে মজুত অর্থের সুদের ক্রমান্বয়ে হ্রাস, নোট বাতিল, জিএসটি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকায় জনজীবনে নেমে এসেছে গভীর অন্ধকার। আরও সংকট বাড়বে, কৃষিতে এই সংকট অতি পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হচ্ছে। কৃষক প্রতি বছর ফসলের দাম না পেলে কিংবা ঋণ বাড়লে একসময় ফসল উৎপাদন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবে। সরকার সেটাই চায়, তাদের লক্ষ্য কর্পোরেট হাউস জমি চাষ করবে, কৃষক হবে সেই জমির মজুর। কর্পোরেট হাউসের খাদ্যশস্য তৈরি করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নিজেদের মুনাফার স্বার্থে বাণিজ্যিক ফসল তৈরি করার প্রতি স্বাভবিক আগ্রহ থাকবে। এই মুহূর্তে বিপদের এই সম্ভাবনাটা কেউ কেউ নস্যাৎ করতে পারেন, কিন্তু আগামী ভবিষ্যৎ সেই দিকেই হাঁটছে। শুধু কৃষি নয়, এর সাথে পশুপালনও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। আমাদের দেশের কৃষক ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ পশুপালন থেকে আয় করেন। সেই পথও বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। ইতিমধ্যেই পশুহাটগুলি বন্ধ করার ফতোয়া এসে গেছে। গরুর হাট থেকে গরু কিনে বাড়ি ফেরার পথে বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। পহেলু খানের মৃত্যু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সুপরিকল্পিত চক্রান্ত শুরু হয়েছে দেশব্যাপী। গো-মাংস বহন, ভক্ষণের ওপর নজরদারি চলছে, স্থানে স্থানে চলছে পিটিয়ে খুন, খাদ্যাভ্যাসের অধিকারও আক্রান্ত। আসল লক্ষ্য পশুপালন, গোমাংস রপ্তানিও কর্পোরেট হাউসের হাতে তুলে দেওয়া। গরু দুধ ছেড়ে দেবার পর সবাই গরু বিক্রি করতে চায়, গরুর পাইকার নির্দিষ্ট দরদাম করে তা কিনে নিয়ে যেতে চায়। বর্তমান সময়ে সকল ধর্মের মানুষ যারা দুধ ব্যবসা করেন কিংবা গরু বাড়িতে পোষার পর নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রি করেন, তাদের সমস্যা ক্রমশ বাড়বে। হাট বন্ধ হলে পাইকার আসবে না, তখন এই ব্যবস্থা ক্রমশ গ্রাস করবে কর্পোরেট হাউস। জলের দরে ওই কর্পোরেট হাউসের কর্মীকে গরু বিক্রি করতে বাধ্য হবেন। কর্পোরেট হাউস বিশাল স্লটার হাউস তৈরি করবে এবং মাংস রপ্তানি হবে বিদেশে। আগামী দিনে কৃষি ও পশুপালন, যা একান্তভাবে কৃষিপ্রধান এই দেশে কৃষকদের সহায় সম্বল ছিল, তা গ্রাস করবে দেশের পুঁজিপতিশ্রেণি।

পশ্চিমবাংলার বর্তমান রাজ্য সরকার কৃষিক্ষেত্রে এই আক্রমণ সম্পর্কে শুধু নীরব নয়, কার্যত মোদি সরকারকে কখনও প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে মদত দিচ্ছে। উভয়ের মদতে মৌলবাদীদের তৎপরতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে বহু জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে গেছে। মূল লক্ষ্য জনগণ যেন ভাত, কাপড়

কিংবা বেকারির জ্বালা বুঝতে না পারে। তাই যে-কোনো মূল্যে বিভাজন প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে।

রাজ্যে কৃষকদের সমস্যার কথায় ফিরে আসি। ইতিমধ্যেই এই রাজ্যে দু-শতাধিক কৃষক আত্মহত্যা করেছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তা মানতে নারাজ। ধানের সহায়ক মূল্যে বিক্রি হল না, কৃষক বঞ্চিত হলেও ফোড়েদের পেট ভরল। আলু চাষির মাথায় হাত। এখন সরকার ৫০ টাকা বেশি দিয়ে ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানির কথা বললেও কয়েজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সেই টাকা যাবে। কৃষকের কিছু লাভ হবে না। পাটচাষিদের দুরবস্থা লক্ষণীয়। কৃষকসভা দাবি করে ৬০০০ টাকা দরে পাট কিনতে হবে, কিন্তু জে সি আই নির্বিকার। মূলত উৎপাদন খরচের নিচে এখন পাটের দাম, বিপুল লোকসান অপেক্ষা করছে পাটচাষিদের জন্য। বন্যায় সবজি নষ্ট হয়ে গেল। আগে দাম ছিল না। বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল চাষি। জমির ধান সহ ফসল নষ্ট হল কিন্তু রাজ্য সরকারের কোনো হেলদোল নেই। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো মিউটেশন ফি কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা হল, বাড়ল রেজিস্ট্রেশন ফি। কৃষকের সুনির্দিষ্ট দাবি নিয়ে নবান্ন অভিযান হল, প্রায় তিন লক্ষ কৃষক অংশগ্রহণ করলেন। কোনো দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার তো দূরের কথা পুলিশ-প্রশাসনের আক্রমণে দু-হাজার কর্মী আহত হলেন, একজন দলীয় কর্মী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলেন। এই রাজ্য বিগত ৬ বছরে তৃণমূল সরকারের আমলে কৃষক, খেতমজুরের অবস্থার ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রচারমাধ্যমকে ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত অসত্য তথ্য সরবরাহ করছে। গ্রামবাংলা সহ নগর শহরে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন। তোলাবাজি, দুর্নীতিগ্রস্ত কয়েকজন গুণ্ডা সবকিছুর নির্ধারক। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে। ডিজিট্যাল রেশনকার্ড সর্বত্র দেওয়া হল না, অথচ ঘোষণা করা হচ্ছে যে ডিজিট্যাল রেশনকার্ড ছাড়া ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২ টাকা কেজি দরে চাল পাওয়া যাবে না। রেশনে কেরোসিন, চিনির পরিমাণ ছাটাই—এগুলি তো আছেই, চাল-গম যা দেওয়া হচ্ছে তা মানুষের খাবার অযোগ্য। নারদা সারদা সহ নানা দুর্নীতির ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেস বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে।

সমস্যা হচ্ছে কিছু মানুষ বিজেপির অর্থনৈতিক নীতি বোঝার চেষ্টা করছে না। উত্তপ্ত তাওয়া থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দিলে প্রাণ বাঁচে না, মৃত্যু অনিবার্য। স্বাভাবিকভাবে বিজেপির অর্থনৈতিক নীতিকে তীব্র আক্রমণ করতে হবে। বামপন্থীরা নির্দিষ্ট ইস্যুতে সংগ্রাম চালানোর ফলে প্রচারমাধ্যমও আতঙ্কিত। বামপন্থীদের আন্দোলনগুলিকে জনগণের নজরে না এনে বিজেপিকে সামনে আনার করুণ প্রয়াস জনগণও উপলব্ধি করছেন। কর্পোরেট হাউস পরিচালিত প্রচারমাধ্যম কখনও বামপন্থী আন্দোলনকে সামনে আনতে পারে না। এই উপলব্ধি থেকে বামপন্থীদের লড়াই-আন্দোলনকে সেভাবেই সাজিয়ে তুলতে হবে। লাগাতার আন্দোলনের জয়গানে উপস্থিত থেকে আন্দোলনকে আরও প্রসারিত করতে হবে। সেই প্রচেষ্টা চলছে সর্বস্তরে। মানুষের সংকট বাড়বে আর বামপন্থীরা পিছিয়ে থাকবে তা হয় না। ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে বামপন্থী শক্তি এগিয়ে যাবেই, আঘাত হয়তো আসবে, সেই আঘাতকে চূর্ণবিচুর্ণ করে এগিয়ে যেতে হবে।

With best compliments of

M/S PRAKASH CONSTRUCTION

FABRICATOR, ERECTOR, MECHANICAL, CIVIL CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

Qr. No. L/32, Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211
Phone : 2558523, Mobile : 9332017271, 9932653994

Sl. No. 98

মহাপুরুষের পূণ্যস্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

কলকাতা পৌরসংস্থার নব প্রয়াস

কলকাতা পৌরসংস্থা

Sl. No. 126

মতিচ্ছন্ন

কৃষ্ণ ধর

বড়ো শখ ছিল বাগানের
যদি এক চিলতে জায়গাও পাওয়া যায়
প্রথম সুযোগেই বাগান গড়ে তুলবে
এই মতিচ্ছন্ন শহরে
যেখানে শুধু উঁচুতে আরও উঁচুতে থাকতে চায় মানুষ
যাতে একদম মাটিতে পা না পড়ে
যেসব গাছপালা অদম্য শক্তিতে টিঁকে ছিল
তার ওপরেও জল্লাদের নজর পড়তে দেরি হয় না
ঝিলিক দেওয়া উড়াল পথ বুকের ওপর দিয়ে চলে যায়
কান পাতলেই শোনা যায় দূর পাল্লার ট্রাকের গর্জন
শহর বাড়ছে তার জন্য ছেড়ে দিতে হয় জায়গা
কোথায় বাগান সাজাবে যেটুকু থাকবে তা ঝুল বারান্দায়
আলোকলতারা শূন্যে দোল খেয়ে রোদ পোহাবে দিনভর।
হায় মতিচ্ছন্ন নগরকোটাল একবার তাকাও আকাশের দিকে
চোখ নামিয়ে তারপর দেখো কোথায় তুমি দাঁড়িয়ে আছো।
তোমার বুকে গড়ে ওঠা বনবিথির শবদেহের ওপর দিয়ে
চলে গেছে ইস্পাতের মতো মসৃণ সড়ক
কত দূরে গিয়ে থামবে সে নিজেই জানে না
মানুষজনকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।
লটবহর নিয়ে তারা কেবলি ঠিকানা বদলায়
তারা সবাই আগন্তুক
আস্তানার সামনে অস্থায়ী নম্বরে দাগ দেওয়া
যাযাবর জীবনে তাঁবুতে ক্ষণিকের বসবাস
এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে
কোথায় যাত্রা শেষ তারা তা জানে না।

যুডাস তুমিও

প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

কনস্টান্টিনোপলের চরের হাতে ধরা পড়ার পর
বিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন যীশু
যুডাস তুমিও

রোম শহরের শতকরা আশি জন মানুষ সেদিন বলেছিল
যীশু লোকটা একজন ভণ্ড, ওকে ক্রুশে দাও
যুডাস জানত না
অনেক মানুষ একসাথে মত দিলে
সেটা গণতন্ত্র হতে পারে
সবসময় সত্য হয় না

সত্য সেদিন প্রতারিত হয়েছিল
যুডাসরা আজও সম্মাননীয়
সত্য পরাজিত হয় না কখনও

আকাশের নীল শূন্যে জ্যোৎস্না চাঁদের ঘরবাড়ি

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

উঠোনে রজনীগন্ধা নক্ষত্রের ফুল
মাটির আয়নায় প্রতিবিম্বে অন্য এক মুখ
ভাষা খুঁজে খিদে ও তৃষ্ণায়।

উপোসি রাত্রে যদি ভাত ফুটে
সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ঝমঝম বাজায় যৌবন

মেঘের শিবিরে নাচে রামধনু
মূলে বসে ফোটাই মুকুল
সমস্ত রহস্য মুছে একা একা ডেকে যায় চাঁদ।

লাল সেলাম

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

আমি শ্রমিকশ্রেণির সংগঠনের মধ্যে আছি
আমি শ্রমিক কবি, মিছিলে যাই
আমি কোনো নেতা নই
অধ্যাপক নই
বুদ্ধিজীবী নই
দু-নৌকায় পা দিয়েও কখনো চলিনি
আবার বাজার ফেরৎ কোনো কবিও না।

না, একটাও মুকুট আমার মাথার ওপরে নেই
তার জন্য অবহেলা করতে পারেন
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং অপমানও করতে পারেন—
করুন, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই
তবে—এবার আর আপনারা ডাকবেন না
আমি আর কবিতা দেব না।

লাল সেলাম।

বাবা লিখছে

অংশুমান কর

কৃশকায় এক বৃদ্ধ তাঁর তরুণী কন্যাকে
পৌঁছতে এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে
কাঁপা কাঁপা হাতে মেয়েটির মাথার ওপর ধরে আছেন
ফুলফুল ছাপ-ওয়ালা ছাতা

দেখি আর ভাবি
শত অব্যবহারেও জীর্ণ হয়নি;
'বাবা' শব্দটা আজও
ভাদ্রমাসের দুপুরে
ফুলফুল ছাপ ছাতার তলার
বটগাছের ছায়া...

অন্ধকার বিষয়ক একটি প্রদর্শনীর কথা

শ্যামলবরণ সাহা

অন্ধকার বিষয়ক প্রদর্শনী
নিজেই সাজাচ্ছি নিজেই দেখছি—
আজ এ গ্যালারি, কাল ও গ্যালারি...

তবু অন্ধকারের প্রকৃত রং কী ঠিক জানা হল না!

মায়ের মুখাগ্নি করার সময়—
দু-হাত চুইয়ে ঝরতে দেখেছি অন্ধকার,
গ্রীষ্মের রাতে নেড়া ছাদে—
মাদুরে শুয়ে থাকতে দেখেছি অন্ধকার,
না-বাজানো হারমোনিয়ামের
প্রতিটি রিডে দেখেছি অন্ধকার,
অপারেশনের পর আঁধার চৈতন্যে
জাগতে দেখেছি অন্ধকার...

একটা অন্ধকারের সাথে
আরেকটা অন্ধকারের কোনো মিল নেই।
যার দাঁত আছে তার হুল নেই
যার হুল আছে তার দাঁত নেই
কোনো কোনো অন্ধকার
দাঁত, নখ, থাবা নিয়ে ওত পেতে আছে
জীবনের দিকে।

অন্ধকার বিষয়ক প্রদর্শনী
নিজেই সাজাচ্ছি নিজেই দেখছি—
আজ এ গ্যালারি, কাল ও গ্যালারি...

তবু অন্ধকারের প্রকৃত রং কী ঠিক জানা হল না!

পৃথিবী সৃষ্টির আগে

বিতস্তা ঘোষাল

যদি কপালে দিই গনগনে সূর্যের মতো লাল টিপ
চোখেদের করি আরও উজ্জ্বল
আর ঠোঁটে দিই লাল লিপস্টিক
তারপর প্রশ্ন করি আয়নাকে—
''সব কিছু ঠিক আছে তো?''

সে আমার রূপের অহংকার নয়,
আমি খুঁজছি কেবল সে মুখ
যে মুখ ছিলো আমার
এই পৃথিবী সৃষ্টির আগে।

সঞ্চয়িতা কুণ্ডু-র দুটি কবিতা

অস্ত্রকথা

চাঁদ পড়তে ভালোবাসি
রহস্যের উপর-ভিতরে অক্ষম আমি
নিঙড়ে নিচ্ছি লক্ষ্মীপূর্ণিমা
নক্ষত্রের হিজিবিজি।
কোথাও দেশাত্মবোধ অস্ত্রের গয়নায় সম্বল,
ইন্দ্রের দিগন্ত ঝনঝন
যুদ্ধের জন্য অপেক্ষাও
অস্ত্রের বাহাদুরি চায়।

গঙ্গা

বাতাসের সব ঝাঁপ খুলে দিই
আমি গঙ্গা পারাপার...
ওদিকে হানাদারি, মৃত্যুত্রাস
আর তুমি—
এত জীবন অঙ্গে ধরো
দীর্ঘ দেশ-কাল
সেই তো নৌকাডুবি

ধর্মের

যযাতি দেবল

আকাশ আঁধার করে হেঁটে আসছে সন্ত্রাসী বিপদ
টুঁটি টিপে ধরতে চাইছে ধর্মের পোশাক
আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে ধর্ম নয়
ধর্মের হাড়িকাঠ।

বোধিদ্রুমে কীটের উৎসব!
নীল নীল হয়ে আছে বিষের তীব্রতায়
সুজাতার পায়সান্ন!

ফ্রিজে কী আছে? কিসের মাংস ওটা?
মৃত্যু ছুঁয়ে যাক্ তোকে; যাই হোক সেটা।
আজ গুলশন কাল আতাতুর্কের ঘর
আল্লা হো আকবর!

ছবি আঁকে নাকি? কে ওই সেন? হু-সেন!
তুমি ফিদা হও! হতে পার,
ধর্মের নামে ওকে দেশ থেকে বার কর।

এক যে ছিল গাঁওবুড়ো

(কার্ল মার্কস-এর দুশো বছর জন্মবার্ষিকীকে মনে রেখে)

পার্থ রাহা

পৃথিবীর সমান বয়সী এক গাঁওবুড়ো
আমার মুখ দেখে
বিস্বাদ কাঠের গুঁড়োর মতো মুখ
কাঁধে হাত রেখেছিল :
দুঃখে ধনুকের মতো বেঁকে যাওয়া পাপ
তোমার দুঃখ অনেক, তোমার মায়ের দুঃখ
তার চেয়ে ঢের বেশি
তোমার আমার মা।

আকাশের সমান বিশাল সেই গাঁওবুড়ো
কবে কোন দুশো বছর ধরে
বাতাসের সওয়ার হয়ে
কানে কানে বলে :
এসো না আমরা সবাই মিলে
বদলে যাই
চারপাশের ছিটানো মানুষদের
ঘুমের আবেশ ভেঙে
বুকের ভিতর ঘৃণা আর ভালোবাসা
পুরে দিয়ে যাই
হাতের মুঠোর জিজ্ঞাসা আর পায়ের ছাপের বিস্ময়
কুটি কুটি হলুদ রোদ্দুরে
মিলে মিশে একাকার
সুতো ছেঁড়া লাল বেলুনেরা এক হয়ে
ফোটাক গোলাপ।
অরণ্যের সমান গভীর সেই গাঁওবুড়ো
একটানা দুশো বছর ধরে
ঝড়ের মতন আমাদের
উদ্দাম নাড়িয়েছিল
আর মাঘের রাত্রিতে
আমাদের জন্য
লাল টুকটুকে আগুন
ভাদ্রের গুমোট বিকেলে
এক ঝলক দমকা বাতাস

আরো কত কয়েকশো বছর
বাতাস আমাদের
নিঃশ্বাস নেবার পথে থমকে দাঁড়াবে?

এক ছিল এক গাঁওবুড়ো
ঝোলায় ছিল দুঃখহরণ মন্ত্র
লাল টুকটুকে আগুন, আর
শুকনো পাতা উড়িয়ে নেবার, গুঁড়িয়ে দেবার
বুকভরা এক ঝড়ের মতন বাতাস।

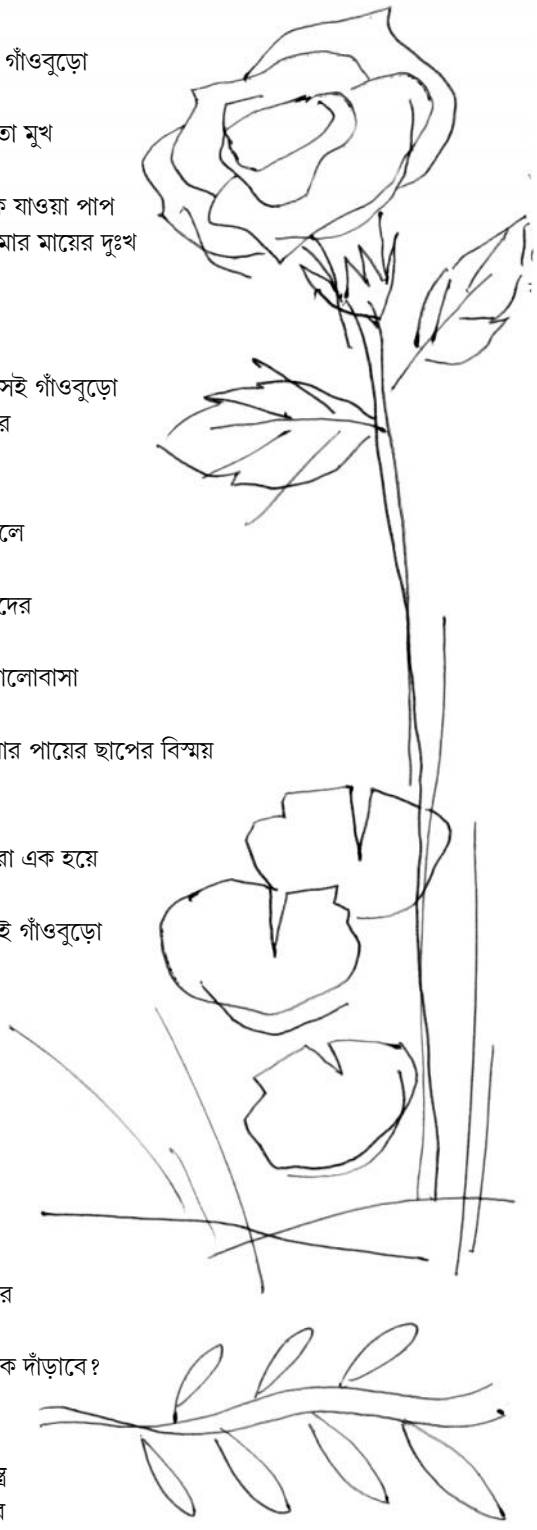

ঝলসে যায় মানব সন্তান

জিয়াদ আলি

কমলা লেবুর রঙে যে শিশুরা নিজেকে
সাজাতে ভালোবাসে
তাদের রক্তে ভাসে বিপন্ন স্বদেশ
বৃষ্টির বদলে বোমা ঝরে পড়ে মেঘ ছিঁড়ে ফুঁড়ে
ঘুমন্ত শহর পুড়ে যায়।

যেখানেই হাত রাখো জলের বদলে
রক্তের ভিতরে ক্রমে ডুবে যাবে পবিত্র আঙুল
যেদিকে তাকাও কোনও সৃষ্টি নয়, শুধুই তাণ্ডব
ঝলসে যাওয়া অসহায় মানব সন্তান।

এ কোন্ সভ্যতা যার অদৃশ্য নির্দেশে
পৃথিবীকে বানায় গণিকা
মানুষকে বিধ্বস্ত করে মহাশূন্যে কোন্ অভিযান!

অথচ পৃথিবী আছে পৃথিবীর ভিতরে নিথর
সুগন্ধী রুমালে বাঁধা কী অদ্ভুত নিজস্ব মায়ায়।

হা হুতাশে স্বাধীনতা বাঁচে!

বিপ্লবের শতবর্ষে : প্রতিশ্রুতি

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

শৃঙ্খলছাড়া হারাবার আছে সব
চারদিক থেকে একটাই কলরব
কান ভেদ করে প্রাণের মর্মমূলে
ঘুণপোকাদের বড়দিন মোচ্ছব।

সাথীদের মুখে তাকিয়ে দেখছি তারা
দ্বিভাজিত আজ ভাঙা বিশ্বাস নিয়ে
চরমবাচন শেষ কথা হবে কি না—
প্রাতরাশ সারে সে-মহাতর্ক দিয়ে।

যেমন যেভাবে পারি, এসো, আজ লুঠি
দলে-পিষে-ঠেলে সামনে এগুতে হবে
উড়ছে হাওয়ায়, সোনা করি ধুলোমুঠি—
পাত পেড়ে বসি মাটি-মাছ-উৎসবে।

ধ্বস্ত স্বপ্ন; এরই মাঝে কেউ কেউ
জুড়ে চলে ভাঙা টুকরো সংগোপনে
উপরের জলে নাই-বা উঠুক ঢেউ
নদী বয়ে যায় স্থির মোহানার টানে।

দাঁড়াতে বলেই তুমি

সুনির্মল কুণ্ডু

দাঁড়াতে বলেই তুমি বেপাত্তা হয়েছ—সেই থেকে
বহু সূর্যোদয়... বহু মধ্যাহ্ন-সাঁঝের
আকাশ দেখেছি আমি, শুধু পাখিদের ওড়াউড়িতেই মুখ ঢেকে
সময় পালিয়ে যাচ্ছে, আমার হাতের
লেখার কলমটিও ক্লান্ত না হতেই
বেঁচে থাকবার ইচ্ছে যে-পৃথিবী নিয়ে সে-পৃথিবী এই শ্রাবণেই
সব ধারাবাহিকতা ধ্বংস ধস জঙ্গিহানা সন্ত্রাসের পর
মানুষকে শুধু ছুঁয়ে গেছে—জীবন যেখানে ক্ষুব্ধ...শ্মশান কবর
যেখানে শূন্যতা জেনে সয়ে গেছে ঝড়—সে ঝড়ের ধুলো ও আঁধার
যেহেতু ব্যাপক ছিল—মানুষের মুখের ভাষার
নির্ভরতা বহুলাংশে ছিল সুগভীর,
অনেক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমার নিজস্ব পৃথিবীর
রাত্রি দিন এক হয়ে... সব দেশ এক হয়ে... নদ-নদী-সমুদ্র নিবিড়
শুরুতেই স্থির;
উপেক্ষা বা নিরুদ্দেশ নয়
নিয়েছে নিজের করে সঙ্ঘপদ্ধ মানুষের জয়।

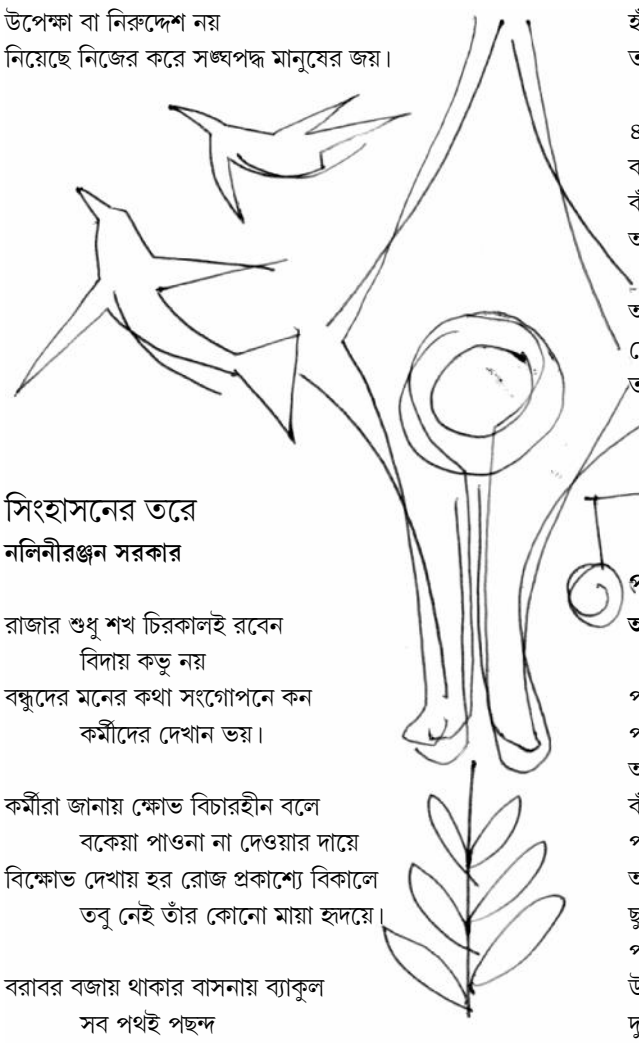

সিংহাসনের তরে

নলিনীরঞ্জন সরকার

রাজার শুধু শখ চিরকালই রবেন
বিদায় কভু নয়
বন্ধুদের মনের কথা সংগোপনে কন
কর্মীদের দেখান ভয়।

কর্মীরা জানায় ক্ষোভ বিচারহীন বলে
বকেয়া পাওনা না দেওয়ার দায়ে
বিক্ষোভ দেখায় হর রোজ প্রকাশ্যে বিকালে
তবু নেই তাঁর কোনো মায়া হৃদয়ে।

বরাবর বজায় থাকার বাসনায় ব্যাকুল
সব পথই পছন্দ
রাজ্য যেন জয়ধ্বনিতে মাতে তাই
গুলিয়ে ফেলেন সব কাজের ছন্দ।

বিশ্বাসের কবিতা

মলয় রায়

১.
এসো, সব ভোরের শব্দই মেপে রাখি।
কখন ডেকে উঠবে রাতভাঙা প্রভাতের পাখি।।

২.
অবাধ্য জমি অবাধ্য আল
মেহনতি মানুষ। তার বিশ্বস্ত কোদাল।
ভিতে কাটে আল তোলে।
শ্রাবণ ভরা দিঘি আমন ভরা মাঠ
হেসে উঠবে প্রসূতির কোলে।

৩.
এ মাটি আমার ঘর।
আপন গাছ। ফোটা ফুল।
হাঁটা পথ। বাতাস প্রতিকূল।
তবু হাঁটি। নিশানা নির্ভুল।

৪.
বাছুরের ক্ষিধে নড়ে ওঠে ছেলেটার মাথায়।
বাঁধনটা খুলে দেয়।
অপত্য স্নেহে দুধ দেয় বাছুরের মা।

অভাব খুঁটে বেঁধে
ছেলের হাত ধরে হেসে ওঠে
তার জন্মভূমি মা।

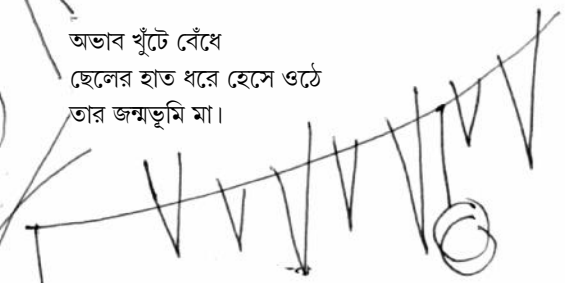

পথে পথে, এই শপথে

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

পথের মাঝে বাঁশি বাজে
পায়ে পায়ে পা মেলানো
আঁধার ভেঙে নতুন সূর্য
বাঁশির সুরে, হৃদয়জুড়ে
পথের সাথী, জ্বালাও বাতি
আলোর স্রোত, সুপ্রভাতে
ছুটছে ঘোড়া, পাগলাঝোরা
পথের ভাষা, জাগায় আশা
উৎসবে আজ প্রাণের সাড়া
দুয়ার খুলে, দ্বন্দ্বভুলে
এই শপথে, পথে পথে
হাতে হাতেই ফোটাবো ফুল
হৃদয়ে সঞ্চয়
আঁধার হলো লয়
আলোরই উৎসব
শাশ্বত বৈভব
দিক্‌দিগন্তে জোয়ার
দুরন্ত ঘোড়সওয়ার
হৃদয়ভরা গান
অমৃত সন্ধান
ঝর্ণাধারায় পথ
নিয়েছি এই শপথ
সবার হাতে হাত
থাকবো রে একসাথ।

তোমাদের জন্যেই প্রতীক্ষায় আছে

সুকমল ঘোষ

শেকড়ের গভীরে যাও, আদিমসত্তার
মাটি থেকে যদি উপড়ে আনতে পারো
বিশল্যকরণী গাছ।
মনের প্রত্যন্ত গুহা থেকে যদি
নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় পাহাড়ি মেঘে
ছড়িয়ে দিতে পারো সম্প্রীতির কুসুমমেঘ;
তাহলে কিছুটা পথ বেয়ে ওদের সাথে
আলাপচারিতার পর্ব শুরু করা যেতে পারে।
জীবনের সব ফসলের সম্ভারও যদি প্রকাশ্য
রাজপথে এনে তুমি বলো—
বাঁচতে চাই না আমি মাতৃভূমির কোলে
আমার মাকে দ্বিখণ্ডিত কিংবা ত্রিখণ্ডিত বা
প্রয়োজনে টুকরো টুকরো করে দাও যদি
তখন কি হাজারো মৃত্যুর বিনিময়েও
কেউ কি মেনে নিতে পারে
একটা প্রাদেশিক সত্তার বিখণ্ডন!

ফিরে এসো
তোমাদের জন্যে অপেক্ষায় আছে
বিশল্যকরণী গাছ
তোমাদের জন্যে প্রতীক্ষায় আছে
সম্প্রীতির কুসুমরঙা মেঘ
তোমাদের জন্যে প্রতীক্ষায় আছে
একই কলসে ভরা
তিস্তা ভাগীরথী অজয়
দামোদর গঙ্গার সম্মিলিত জল।
নাও
দু-হাতের আঁচল ভরে নাও
বাংলার সব নদীর জল বাতাস
আর
একতায় বেঁচে থাকার এক
অফুরন্ত উচ্ছাস।

দরোজাটা খোলা রেখো

দিশা চট্টোপাধ্যায়

বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি
একমনে কমলার খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে
খাচ্ছে ছেলেটা...

আমি যদি মরি
বারান্দার দরোজাটা খোলা রেখো।

বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি
ফসল নিড়িয়ে তুলছে চাষি...

আমি যদি মরি
বারান্দার দরোজাটা খোলাই রেখো।।

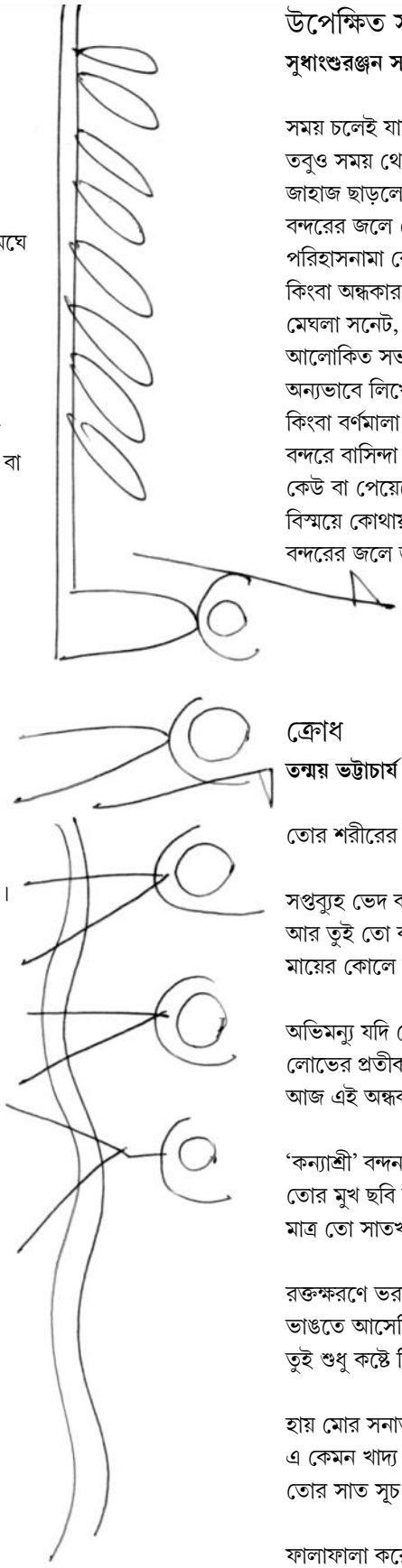

উপেক্ষিত সকালের মেঘলা সনেট

সুধাংশুরঞ্জন সাহা

সময় চলেই যায়, ফেরে না কদাপি।
তবুও সময় থেকে যায় নির্বিকার।
জাহাজ ছাড়লে সময়হীন বন্দর,
বন্দরের জলে তোলপাড় হয় খুব
পরিহাসনামা কেউ কেউ লিখে রাখে।
কিংবা অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে
মেঘলা সনেট, উপেক্ষিত সকালের।
আলোকিত সভাঘরে ফিরে আসে কেউ
অন্যভাবে লিখে ফেলে রোদের সংলাপ
কিংবা বর্ণমালা এক মহাপতনের।
বন্দরে বাসিন্দা হতে চেয়েছে যারাই
কেউ বা পেয়েছে সায়, ব্রাত্যও হয়েছে।
বিস্ময়ে কোথায় কে মেখেছে পরাজয়!
বন্দরের জলে জলে লেখা কথামালা।

ক্রোধ

তন্ময় ভট্টাচার্য

তোর শরীরের নিম্নাঙ্গে সাতখানা সূচ।

সপ্তব্যূহ ভেদ করতে শেখেনি অভিমন্যু।
আর তুই তো কখনও অভিমন্যুর নামও শুনিসনি
মায়ের কোলে মাথা রেখে তার গল্পও শুনিসনি।

অভিমন্যু যদি সে সময়ের হিংসা, দ্বেষ আর
লোভের প্রতীক হয়, তবে তুই, নিষ্পাপ সরল
আজ এই অন্ধকার কুয়াশায় কিসের ফসল?

'কন্যাশ্রী' বন্দনার এই নিখাদ সময়ে
তোর মুখ ছবি হয়ে জায়গা পায়নি বিজ্ঞাপনে
মাত্র তো সাতখানা সূচ, তার কোনো মূল্য আছে নাকি?

রক্তক্ষরণে ভরা হাসপাতালের একাকী শূন্যতা
ভাঙতে আসেনি কোনো মমতার স্বর, শোভন সুন্দর
তুই শুধু কষ্টে ক্লিষ্ট, অপেক্ষায় ছিলিস মৃত্যুর।

হায় মোর সনাতন ধর্ম, তন্ত্রসাধনার স্বীকারোক্তি
এ কেমন খাদ্য তব, ওইটুকু শিশু একরত্তি।
তোর সাত সূচ যেন আমার সাতটা ফাল হয়

ফালাফালা করে দিতে লালসার হিংস্র সময়।।

কবিতার বিচার

গিরীন্দ্রনাথ চাকী

ফুটবো ফুটবো করে ফুলগুলো এখনো ফোটেনি
কাল রাতে এক পশলা বৃষ্টি হল
পলাশের কুঁড়ি মুখে হাল্কা রং ধরেছে
কবি বললো এবার বসন্ত এসে যাবে।

ফেসবুক থেকে তির্যক দৃষ্টি হেনে
নবিশ বললো—এখন কালবোশেখির কাল
মনগড়া বসন্তের কবিতা এখন চলবে না।
আগে মুখ খুলুক শিমুল পলাশ
তাদের ভেষজ রং তামার টাটে ফেলে
তার জলে ভেসে উঠুক শুদ্ধ দিনক্ষণ।

আর কবির ভাবনা?
যেসব সময় আঁচড় কেটে চলেছে
তপ্ত বালির ওপরে
মাথার ওপর সূর্যের প্রখর তাপ
সে বিচার করবে তার ঝিল্লিপোকার মেটাফোর।

কবিতা বলে কবিকে—
আমি তোমার নিরবধি সঙ্গে সঙ্গে আছি
অনন্তকাল ধরে থাকবো
যত দূর যেতে হয় যাবো
উৎসবে-ব্যসনে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারেও আমি অকুতোভয়
আমি ফেসবুক থেকে ভ্যানিস হলেও
তোমার সঙ্গী হবে অগণিত জনমত
হৃদয় আর মানবিকতার প্রতিবাদী মিছিল

শিরিষের ডাল থেকে উড়ে গেল
কলহপরায়ণ এক ঝাঁক সাত ভাইয়ের দল।
ডালে এসে বসলো আত্মমগ্ন
এক বসন্তবৌরি।

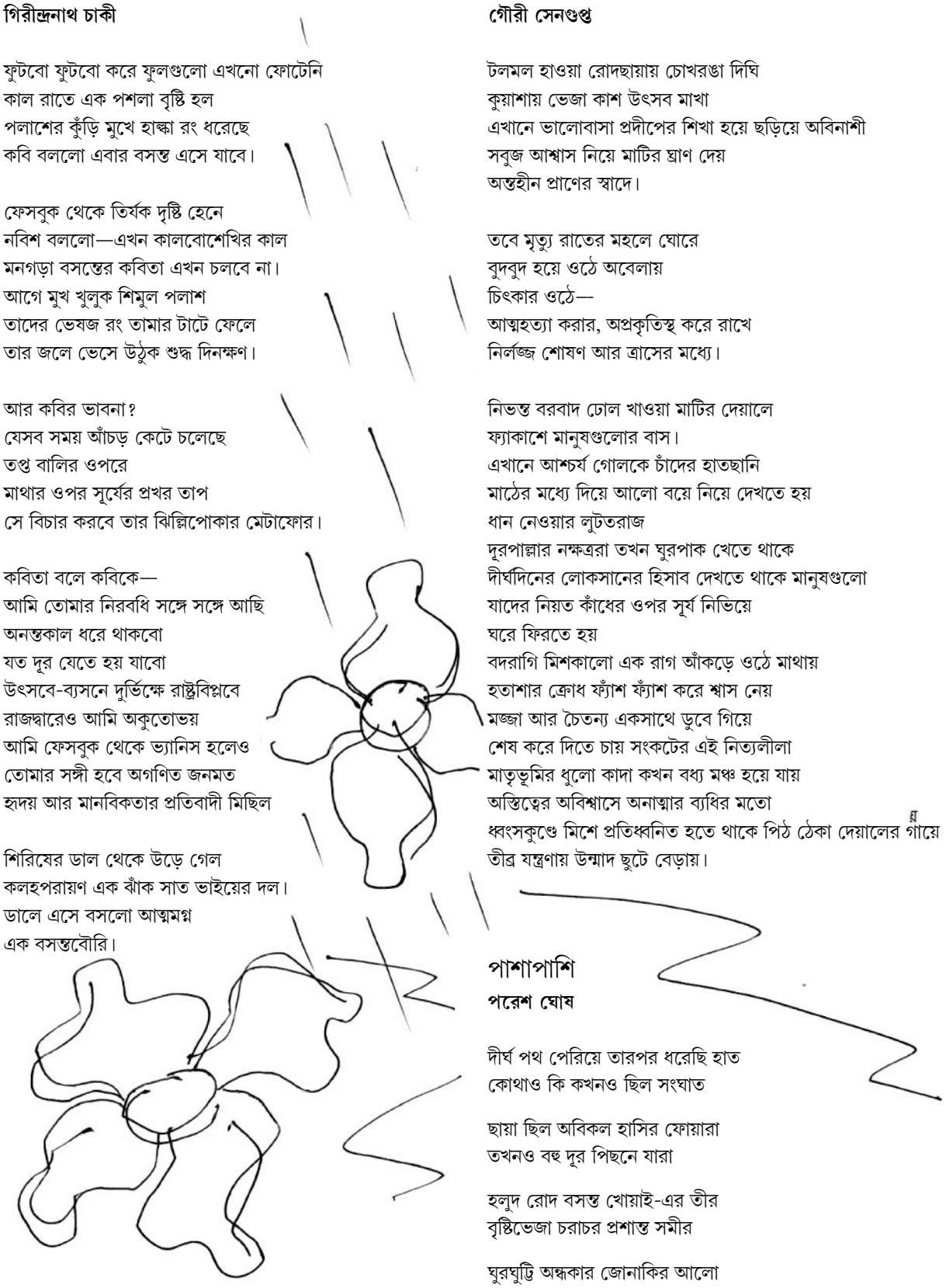

সীমারেখা

গৌরী সেনগুপ্ত

টলমল হাওয়া রোদছায়ায় চোখরঙা দিঘি
কুয়াশায় ভেজা কাশ উৎসব মাখা
এখানে ভালোবাসা প্রদীপের শিখা হয়ে ছড়িয়ে অবিনাশী
সবুজ আশ্বাস নিয়ে মাটির ঘ্রাণ দেয়
অন্তহীন প্রাণের স্বাদে।

তবে মৃত্যু রাতের মহলে ঘোরে
বুদবুদ হয়ে ওঠে অবেলায়
চিৎকার ওঠে—
আত্মহত্যা করার, অপ্রকৃতিস্থ করে রাখে
নির্লজ্জ শোষণ আর ত্রাসের মধ্যে।

নিভন্ত বরবাদ ঢোল খাওয়া মাটির দেয়ালে
ফ্যাকাশে মানুষগুলোর বাস।
এখানে আশ্চর্য গোলকে চাঁদের হাতছানি
মাঠের মধ্যে দিয়ে আলো বয়ে নিয়ে দেখতে হয়
ধান নেওয়ার লুটতরাজ
দূরপাল্লার নক্ষত্ররা তখন ঘুরপাক খেতে থাকে
দীর্ঘদিনের লোকসানের হিসাব দেখতে থাকে মানুষগুলো
যাদের নিয়ত কাঁধের ওপর সূর্য নিভিয়ে
ঘরে ফিরতে হয়
বদরাগি মিশকালো এক রাগ আঁকড়ে ওঠে মাথায়
হতাশার ক্রোধ ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ করে শ্বাস নেয়
মজ্জা আর চৈতন্য একসাথে ডুবে গিয়ে
শেষ করে দিতে চায় সংকটের এই নিত্যলীলা
মাতৃভূমির ধুলো কাদা কখন বধ্য মঞ্চ হয়ে যায়
অস্তিত্বের অবিশ্বাসে অনাত্মার ব্যধির মতো
ধ্বংসকুণ্ডে মিশে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে পিঠ ঠেকা দেয়ালের গায়ে
তীব্র যন্ত্রণায় উন্মাদ ছুটে বেড়ায়।

পাশাপাশি

পরেশ ঘোষ

দীর্ঘ পথ পেরিয়ে তারপর ধরেছি হাত
কোথাও কি কখনও ছিল সংঘাত

ছায়া ছিল অবিকল হাসির ফোয়ারা
তখনও বহু দূর পিছনে যারা

হলুদ রোদ বসন্ত খোয়াই-এর তীর
বৃষ্টিভেজা চরাচর প্রশান্ত সমীর

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার জোনাকির আলো
বিষণ্ণ সময়ে পাশে এই বেশ ভালো।

মানুষই তো পারে

পরিমল ঘোষ

চারিদিকে অন্যায় আর অত্যাচার দেখে
তুমি ভয় পেয়ে গেছ,
বিপন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছ।
পালিয়ে সব সময় বাঁচা যায় না,
তুমি ধৈর্য ধরে স্থির থাকো এবং বিশ্বাস রাখো :
সব মানুষ এখনো খারাপ হয়ে যায়নি,
সততা এখনো বেঁচে আছে।

চারিপাশে সজাগ দৃষ্টি মেলে দেখো
কাছে-দূরে দাঁড়িয়ে আছে কিছু সহমর্মী মানুষ,
দুঃসময়ে এদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়
বিপদে এরা পাশে এসে দাঁড়ায়।

তুমি এগিয়ে গিয়ে তাদের হাত ধরো,
শরীরে ও মনে জোর পাবে।
একবার সোজা হয়ে দাঁড়ালে দেখবে
আরো অনেক মানুষ এসে দাঁড়াবে পাশে,
একে একে মিলবে অনেকগুলো হাত।
জোটবদ্ধ শক্তিই পারে মানুষকে অভয় দিতে,
পারে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে।

পরি

অমিত কাশ্যপ

রবিবার কেমন বসে আছে রাস্তার ওপর
কার্তিকের হালকা রোদ যেন ওর গায়ে
ওই দেখ রোডশোয়ে নেমে পড়েছে কারা
আহাম্মক এখন কি পিকনিক পার্টির সময়

স্কুল খুলে পরীক্ষা পরীক্ষা গেমে
নির্জীব বাবা-মারাও বন্ধুত্ব পাতিয়ে দেখেন
ফষ্টিনষ্টির মাঝে ক্ষুদ্র কোনো ফাটল
লেগে থাকা সেতুর নিচে রক্তদাগ

তুমি ভিক্টোরিয়ার পরির কথা ভাবতে পার
সারা রাত কেবলি তারা গুণে চলে
ওর কোনো তাড়া নেই জেনেও আটকে আছে পায়ের নূপুর
শহর দেখছে ওর শোভন ভঙ্গিমা

ও কেমন তরতর করে জটিল সময় পার করছে

করুণ মাছি

অরূপ আচার্য

কারো কারো আগমন জীবনে খুব অলোড়ন তোলে
প্রিয় কারো ফিরে যাওয়া কখনো মঙ্গলময়।
শূন্য হাত বাড়ালে পেয়ে যাই প্রজাপতির ডানা
মনে পড়ে সেই বিখ্যাত দুপুর
মুখে করুণ মাছি আর হাত ফস্কে হারিয়ে যাওয়া আকাশ

জয়ের দিকে মুখ বাড়িয়ে ছিলাম
কে যেন আমার মুখ সহসা ঢেকে দিল অন্ধকারে।
সকালের বিবর্ণ উঠোনে পড়ে আছে সাপের খোলস
কে যেন বাঁশি বাজিয়ে অনুপম খেলা ভেঙে দেয়।

তার ফিরে যাওয়া উৎসব নিয়ে
দু-একটি কুসুমের জন্ম হয়।

পয়ারের মিল অমিল

দীপেন রায়

একরোখা হলে তাতে কি স্বপ্ন ফোটে!
পথ কেটে দেয় গতি—তাতেই পয়ারের মিল অমিল।
হাজার ফুলের কেয়ারি
কার না মন ভালো হয়ে যায় নিমেষে!

জীবনোপায় ঘোচায় দ্বন্দ্ব সকলের।

অমর তৃষায় আমজনতা এখনও মুখ্য,
অভুক্তদের চপল বাসনা চন্দ্রকলার মতো।
পরস্পরকে গালি দিয়ে খাই প্রাতরাশের অংশ,
অমান্যকে মান্য করি না এমনই ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

যদিও আমরা বশ জল আগুনের কাছে।

পেয়ে বা না পেয়ে খাড়া পর্বত আকৃতি—
আখড়াধারী মন বাঁধা ভিক্ষায়।
প্রবঞ্চকেরা চিরকালই ধরে পোঁ
পোকা মাকড়ও মরে ওষুধে বা জল ঝড়ে।

এঁটোর মতো লেপটে ঘাতক একান্তে।

কার দাপট কোথায় এজমালিটা বা কাদের
জমাট ভাঙে হৈ চৈ-এ আর জলের কার্নিশে।
বোঝে অনেকে কার সীমা কতদূর প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী
ঘাম যে ঝরায় সেও বোঝে আজকাল ক্ষতি তার কতখানি।

হাত ধরাধরি আমরাও চাই খাদ থেকে নিষ্কৃতি।

ভারতবর্ষের চিঠি

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

ভেঙে যাচ্ছে প্রিয় রোদ, ভেঙে যাচ্ছে বিশ্বাসের হাড়
গঙ্গার পবিত্র স্রোতে কার কান্না ভেসে ভেসে যায়?
রক্তধারা কার
পতিতপাবনী খ্যাত গঙ্গাকে শোনায় হাহাকার?

এরকম কথা তো ছিল না
বর্ষা তার গানে গানে, কথা ছিল, নাচাবে ময়ূর
ভূমিলক্ষ্মীর ঠোঁটে জেগে উঠবে সুর
সেই সুরে সকলেই পেয়ে যাবে অন্ন নিরাময়
মানুষ মানুষকে ডেকে শুধোবে কুশল
ভেঙে যাবে ভয়।

বাতাসে লাগে না ঘুণ, বাতাস তো আনন্দের বীজ
অনুচ্চার বর্ণমালা চারিয়ে তোলাই যার ধ্যান
বাতাস করে না তত্ত্ব কারা নেয় ঘুণ পোকার লিজ—
যারা নিচ্ছে, নিতে যাচ্ছে, সংখ্যায় নগণ্যতম তারা।
সিংহভাগ হাত বাড়ায়, মাথা নাড়ে হেমন্তের ধান,
ধান মানে খিদের কামিজ।

শাক দিয়ে মাছ ঢেকে সত্যকে লুকিয়ে রাখবে কে?
বৃক্ষ যদি সত্য হয়, মানুষ বৃক্ষের চেয়ে বড়
মানুষের স্থিতি আছে, গতিধর্ম আছে
উপরন্তু মতি আছে, বৃক্ষ থেকে তাই শ্রেষ্ঠতর
তাই তো জীবনই সত্য, জীবনই কল্যাণ ষোল আনা
জীবনই সুন্দর, যাকে ধান্দাবাজ মূঢ়রা মানে না—

জীবনকে মানে না যারা ধর্মহীন তারাই নাস্তিক
বৃক্ষকে তারাই বলে কাঠ
নির্মাণ জানে না, তারা ধ্বংসের প্রতীক
শস্যকে চেনে না বলে খরাই তাদের চারুপাঠ।

তারাই আতঙ্ক ছোড়ে, ঘুণপোকা আনে—
গঙ্গার স্রোতে ও উজানে
পায়রার পালক কাঁপে, তাড়া করে চিলের মিছিল,
রক্তের ধারাবিবরণী
কেঁদে কেঁদে বয়ে আনে ব্যথাতুর পতিতপাবনী।

এরকম কথা তো ছিল না
তবু কিন্তু ঘটে যাচ্ছে ইদানীং এসব ঘটনা।...

হে প্রজন্ম, ভ্রান্তিলগ্নে বৃক্ষের কাছে তবে যাও
স্থিতি আছে, গতি নেই যার
উদার সত্যের নিচে মুহূর্ত দাঁড়াও
মতিমান মানুষের মতিচ্ছন্ন ভার
নামিয়ে বৃক্ষের কাছে পাঠ নাও সহিষ্ণুতার—
জীবনের ধর্মবোধ বৃক্ষের কাছেই শিখে নাও।।

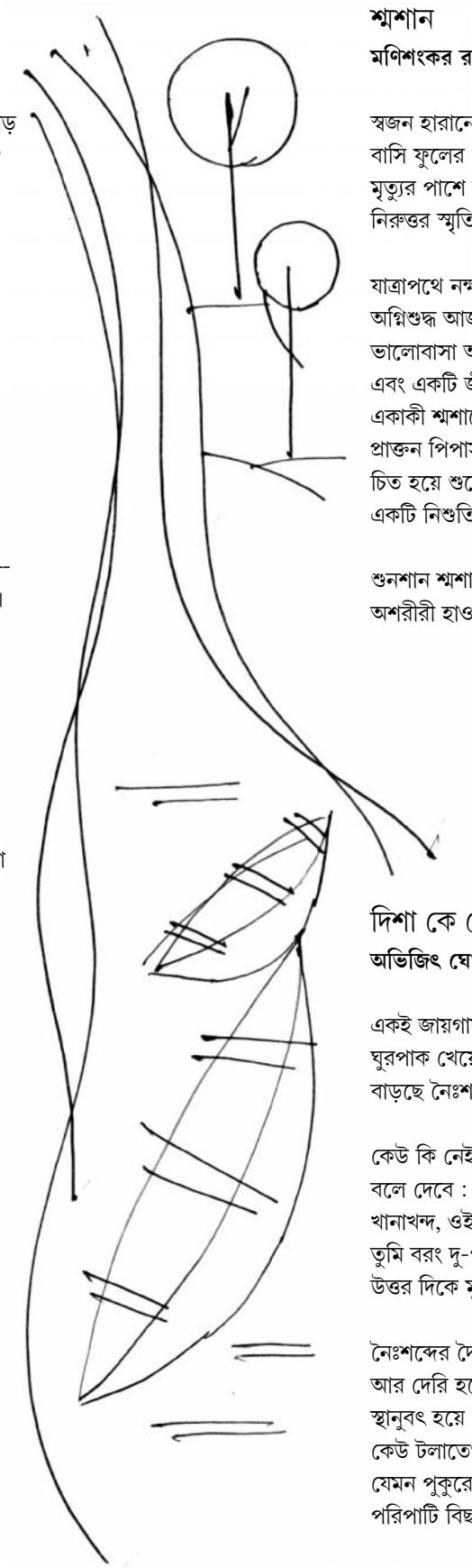

শ্মশান

মণিশংকর রায়

স্বজন হারানো শ্মশান
বাসি ফুলের ওপর ঠাণ্ডা হাত
মৃত্যুর পাশে নতজানু শোকে
নিরুত্তর স্মৃতি জলস্রাবী চোখ

যাত্রাপথে নক্ষত্র সময়
অগ্নিশুদ্ধ আজন্ম ক্রোধ
ভালোবাসা অন্ধ অভিমান
এবং একটি জীবন কাহিনি
একাকী শ্মশানে
প্রাক্তন পিপাসা নিয়ে
চিত হয়ে শুয়ে আছে
একটি নিশুতি রাত

শুনশান শ্মশানের মধ্যরাত
অশরীরী হাওয়ার হাহাকার

দিশা কে দেখাবে?

অভিজিৎ ঘোষ

একই জায়গায় অনেকক্ষণ
ঘুরপাক খেয়েই চলেছি; শুধুই
বাড়ছে নৈঃশব্দের দৈর্ঘ্য।

কেউ কি নেই যে
বলে দেবে : ভাই ওই দিকে
খানাখন্দ, ওই দিকে নয়,
তুমি বরং দু-পা পিছিয়ে
উত্তর দিকে মুখ করে এগিয়ে যাও...

নৈঃশব্দের দৈর্ঘ্য বেড়েই চলেছে,
আর দেরি হলে এখানেই
স্থানুবৎ হয়ে যেতে হবে,
কেউ টলাতেও পারবে না—
যেমন পুকুরের জল অলস হয়ে
পরিপাটি বিছানো চাদরের মতো
শুয়ে থাকে...

চিঠিখানি

পঙ্কজ পাঠক

একটা চিঠির খাম ছিল ভারি সুন্দর, ফুলের ছাপ দেওয়া গোলাপি রঙ
ভোলেনি কখনও অক্ষরের পিঠে অক্ষর সাজিয়ে বালকের সুলিখিত কথামালা
মেহগনি কাঠের ছোট্ট বাক্সে অনেক পুরোনো কাগজের সঙ্গে রাখা ছিল সেটি
তখন ইংরেজ রাজত্ব, শহর কলকাতায় বঙ্গভঙ্গ নিয়ে আলোড়ন চলছে
ছায়াছায়া বনপথে পড়ে থাকা শুকনো পাতার ওপর হাঁটলে মড়মড় শব্দে
নিস্তব্ধতা ভাঙত, পাখিরা উড়ে যেত এ ডাল ও ডাল, কে যেন বলে যেত শীতের আর
দেরি নেই, নকশি, নকশি-কাঁথা বোনার সময় এসেছে, দিঘির পাড়ের তালবীথির ওপর ওঠা
চাঁদ দেখতে দেখতে ঘুমের দেশে গিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল—জমিদারবাড়ির চিলেকোঠার
পরিটাকে ডানা মেলে আকাশে উড়ে যেতে যেতে প্রথমে ফুল, তারপর নক্ষত্র হয়ে যেতে
রাধাকিশোর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মাঝেমাঝে গাইত—ভেঙে ফেল রেশমি চুড়ি...

বিদেশে চাকরি নিয়ে যাওয়ার সময় চিঠিটা নিয়ে গিয়েছিল আর এক নারী
শুধু সযত্নে রেখে গিয়েছিল ঠাকুরদার প্রিয় এসরাজখানি, এখন তার বয়স অনেক
দুধের মতো সাদা চুল, সেই শুধু জানে নিভৃত অবকাশে কেন ওই চিঠি পড়ে বারবার।

ভারতের খোঁজে

মিলনেন্দু জানা

খুঁজতে খুঁজতে
এই সেই খোঁজা-ভারত।
ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি,
এই আমার স্বদেশ—
প্রেমই আমার গঙ্গাপদ্মা,
'অসংগতি'—বিদেশ।
চাষার ছেলে,
ভাঙা দালানেই আমার প্রথম কান্না—
এবং পানু মেথরানির হাতে আমার নাড়িকাটা
চক্রবর্তী কাকা আমার অন্নপ্রাশনের হোতা, আর
সায়রা-শাশ্বতীরা স্কুলের বান্ধবী, সেই সঙ্গে
উদ্দাম মিছিলে পা মেলাতে মেলাতে আমি
খুঁজে পেয়েছি আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থানও।

শৈশবে মায়ের হাত ধরেই
আমি বুঝতে শিখেছি
গীতা-বাইবেল-কোরাণ-কবীর—
ঠাওর হয়েছে—ভারত এক সুদীর্ঘ খোঁজ।
কেলেঘাই আর কপালেশ্বরীর জলে
আজ গঙ্গা-কাবেরীর ঢেউ—
কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর দীর্ঘ পথে
আজও আওয়াজ শুনি, 'জনগণমন অধিনায়ক...
আমি মানুষ—
ভালোবাসা আমার ধর্ম;
আমি মানুষ
মাটিই আমার মা।

স্বদেশ

রথীন কর

কলরোল বন্ধ কর
বধির হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ

সমাজ এগিয়ে চলে
'হোয়াটস্ অ্যাপে'
'ওয়েলেক্সে' বেচে দাও
বেচে দাও
যা কিছু পুরোনো
সমাজ সংসার
আসবাব বাড়ি হাতঘড়ি
রবীন্দ্র গানের সিডি
কবিতার খাতা
অসহায় স্বাধীনতা
সব সব—

পাতা ছেঁড়া মানচিত্রে
শুয়ে থাকে বিবস্ত্র স্বদেশ আমার।

লণ্ডভণ্ড

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

রাস্তায় বেরিয়ে তুমি কী দেখছো? রক্ত পড়ে আছে, পাশে
ছেঁড়া ওড়না, কাঁটাঝোপ, সেই শুধু জানে এই হিংস্রতার ক্ষত
জীবাণুবহুল হাওয়া চারিদিকে দুরারোগ্য ব্যাধি ওড়ে, ভাসে
তবু তুমি ঘাড়নিচু, চুপচাপ রাস্তা পেরিয়ে যাবে নির্বোধের মতো?
প্রতিবাদ গোঙা হলে উল্লাসপ্রবণ হাতে রক্ত, খুন ধর্ষণের দাগ
ক্রমশ তীব্র হয়, হেসে ওঠে সন্ত্রাসের ভয়াবহ ছায়া
অন্ধপ্রস্তাব ছুঁয়ে আগামীতে মিশে যায় বিষাক্ত পরাগ
কেন নতজানু হব, উচ্ছন্ন সময়, আমাদের রক্তকোষ এতই বেহায়া?

বেপথু যৌবন খুঁজে মদপুষ্ট অনাথ আশ্রয়
ঘামে নয় কান্না ভেজা জামা ব্যক্তিগত বালিশের নিচে স্বপ্ন জল
অস্থিরতা ভেঙে চুরে পেরিয়ে এসেছি কত লণ্ডভণ্ড বিপন্ন সময়
আরও তীব্র তীক্ষ্ণতর হোক সামষ্টিক মানুষের স্বরচিত যত কোলাহল।

শেখ জয়নাল আবেদীন-এর তিনটি কবিতা

ভার

অধর্ম ধর্মের বেশে রণক্ষেত্রে রক্তমুখী আজ
বশ্যতা স্বীকার কর অন্যথায় দিতে হবে প্রাণ
নেই পথ পালাবার দ্বার চেপে নিজে যমরাজ
বাড়ছে পাপের ভার প্রতিদিন গৃহ কম্পমান।।

ভিক্ষুক

এসেছে কুটির দ্বারে ছদ্মবেশী গেরুয়া বসন
চন্দনে চর্চিত দেহ উত্তরীয় যেন তপোধন
একুশে সীতার চেনা পরধনে লোভী এ রাবণ
হাসেন বাল্মীকি মুনি—হতে দাও স্ববংশে নিধন।।

আঁতাঁত

বাইরে খেউড় চলে পেলে যেন হাতে মাথা কাটে
কোমরে পরায় দড়ি প্রতিবাদে হাঁটেও মিছিলে
অন্তরে আকুল রাধা কৃষ্ণশোকে বিরহিনী কাঁদে
পাঠায় ফুলের তোড়া মালপোয়া সাজায় টেবিলে।

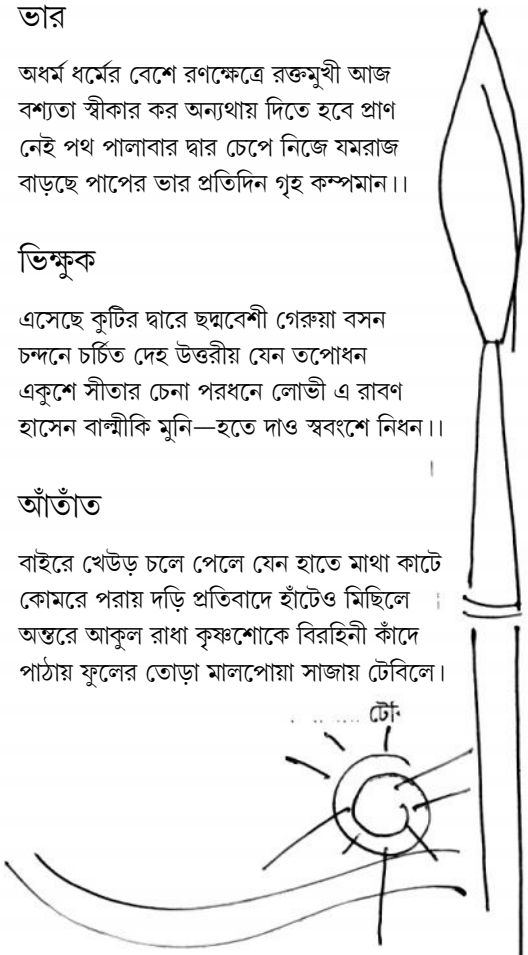

মানবতার বিজয়কেতন

বিকাশ বিশ্বাস

ধর্মান্ধতার গাঢ় অমানিশা যাদের
নিরাপদ আশ্রয়
মৌলবাদী বিশ্বাস যাদের মজ্জায়
চেতনালোকের আলোয়
তারা তো কম দেখবেই!
ভেদাভেদের বর্ম পরে
রক্তহোলির স্বপ্ন দেখা
পাষণ্ডদের রণহুঙ্কার থেকে
আপামর জনগণ বাঁচুক
মানবরক্ষার শপথে।
ভাষাধর্ম রুচি রং নয়
সম্প্রীতির আবহ সঙ্গীতে
পত পত করে উড়ুক আকাশে
মানবতার বিজয়কেতন।

কবি সুকান্তের চাঁদ

সংঘমিত্রা চক্রবর্তী

সেই কবে থেকে কবি সুকান্তের ‘এঁটো করা
পোড়া, ঝলসানো, বাসি দু-টুকরো রুটি’র মতো পুরোনো চাঁদ নিয়ে মজে আছি
এবার একটা নতুন পালিশ করা দাগহীন, উজ্জ্বল নকশা চাই
ওই ঘন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়া একখণ্ড ছেঁড়া অংশ নয়
একটা বিরাট আকাশের সঙ্গে মানানসই করে আঁকতে হবে গোলগাল
বেশ ছিরিছাঁদ আছে এমন একটা ছবি
যেন দু-দিনেই আকর্ষণ হারিয়ে না যায় বিষয়ের
যেন নতুন চোখের ছেলে-মেয়েরাও মোলায়েম জ্যোৎস্না দেখে
বাহ্ বাহ্ করতে করতে আবেগ উজাড় করে ফেলে
আর মোবাইল ভুলে ব্যবহার করে রং ও তুলি!

আমাদের আবার একজন যামিনী রায় চাই
অন্ধকারের বুকে এমন আলোর ফোয়ারা ছোটাবে ‘যেন ম্যাজিকের টাচ’
যেন আকাশ একটি ডিজাইন করা রঙিন শেল্‌ফ
থরে থরে সাজানো এখানে তারাদের জুয়েলারি আর্ট
মিনে করা নক্ষত্রের দ্যুতিগুলো যেন সুন্দরের নাকছাবি!

আর কিছুটা বাঙালি বউদের লাল টিপের মতো ছোটোখাটো
সূর্যের সাইজ হলে উত্তাপ কমবে!

সমস্ত ভারতবর্ষ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে

তাপস রায়

পূর্বাভাস ছাড়াই ঝমঝম করে কথা বেজে উঠতে পারে
আর ওই ভিজেওঠা, তুমি দেখো
ইজেল ফেরত এই এতদিনকার পোড়ো গ্রামের ভিতর
নদী নামিয়ে আনে, তারপর তার ওই উছলে থাকা
সবুজ আলোয় ভরিয়ে দেয় চারপাশ—
তোমার ভালো লাগছে তো

আমাদের বাউলপনায় লাউলতাটির ওরকম সুর বইয়ে দেয়া
চোখে পড়তে পারে শ্যামাপাখির কোমর দোলানো
ভোরের বন্দনায় স্নিগ্ধ হয়ে আছে
চির আশ্রয়ের ভাবনা না রেখেই একটি ধুলোপথ
তোমার উঠোনে এসে চনমন
কী যেন মুহূর্ত বড়ো হতে হতে ঘনপল্লব সহ আমের বৃক্ষ
রোদ্দুর প্রশমিত করে অত উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে

নাও, নাও ফিরিয়ে দিও না এইসব উপহার

প্রশ্নচিহ্নে কি রাখা যায়?

তন্ময় ঘৃতকৌশিক চক্রবর্তী

আনন্দ যজ্ঞের প্রাঙ্গণে রেখেছো শীতল দৃষ্টি তোমার..
লাবণ্যময় বন্দনায় সাজিয়েছে উপাচার যারা..
আসন ঘিরে নির্বিশেষে জ্বেলেছে প্রদীপ..
অবতীর্ণ পরমসত্তায় রেখেছে যুক্তিসিদ্ধ শ্লোক...
রেখেছে সংশ্লেষের পরিসর নিদর্শনের নির্মাণে আর পুঁতিদানায়..
শঙ্খ-উলু-গঙ্গা উপাচারে দেখছে তোমার মোহন মায়া..
নিতান্ত গৌণ উপবাসে খুঁজছে তোমায় অন্তর-অতল..
প্রশ্ন রাখেনি কতটা কঠিন ছিল উপুড় করা বেলে পাথরখানি..
দুচোখে ভাসিয়ে রেখে পুরোনো প্রেমিক..
অদৃশ্য অমোঘ স্থাপনে রেখেছে তারা সম্পূর্ণ ত্যাগ..
দূর থেকে ভেসে আসছে অলৌকিক খোল-করতাল মাখা সুগম কীর্তন...
কান্না জন্ম-জলে ভিজে যাচ্ছে ঝোলা মাতাল অহং..
দুহাতে সেই ত্যাগ-নির্মোহ-দুস্তর-পারাপার শব্দ সাজিয়ে..
পৌষালী চোখে তখনও তুমি ভেবেছ এসব ভাব-বিনিময় ভক্তি-ভক্তের..
কত বড় ভুল তা তুমি বুঝবে কানাই স্পর্শ রেখে সমৃদ্ধির ফিকে রং..
যারা সাজিয়ে দিয়েছে দুর্গম দূরান্ত জীর্ণ সঙ্গত সংগীত...
ঐ যে বারবার ভেঙে যাচ্ছে নিদর্শন রেখাদাগে তোমার আকর্ষণ..
তুমি বিশ্বাস করো এখনও তা...
নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই নিদর্শন জেগে উঠছে অন্বেষণ তোমার উৎসবে...
এত সহজে তুমি ভুলে যাও কথার পিঠে রাখা কথার শরীরে...
কী করে ভুলে গেলে এই তুমি বারবার স্মরণে রেখেছো তোমার মতামত...
বলেছো ন্যায়-টুকু একান্তে জরুরি বিষম...
তুমি যে দেখেছো তাদের রেখে আজ্ঞাচক্রে তৃতীয় নয়ন..
রেখেছো স্থাপন যন্ত্রণাবিদ্ধ মুক্তির পথে...
একে তুমি বলেছো ঈশ্বরত্ব..
বলেছো চরাচর ব্যাপী তোমার বিস্তার..
তুমি কি বেসেছো ভালো ক্রমে অফুরন্ত শ্রেষ্ঠতম মহত্বের ভানে...!!
তুমি কি প্রলয়ংঙ্কর স্বরূপে রেখেছো বিচ্ছিন্ন পরম...
তবে কি চাও বলো ভক্তের কাছে...
অত্যুক্তির চৈতন্যময়তা...
সেতুর আধার...
নাকি...
পদচিহ্নের প্রবেশাধিকার...
আমি যে রেখেছি প্রিয় বুকেতে আমার...
অভিজাত উদ্বুদ্ধে তোমার স্থাপন...
তাকে তুমি কী নামে ভেঙেছো...!!!
জানতে বড় সাধ হয় প্রিয়!!!

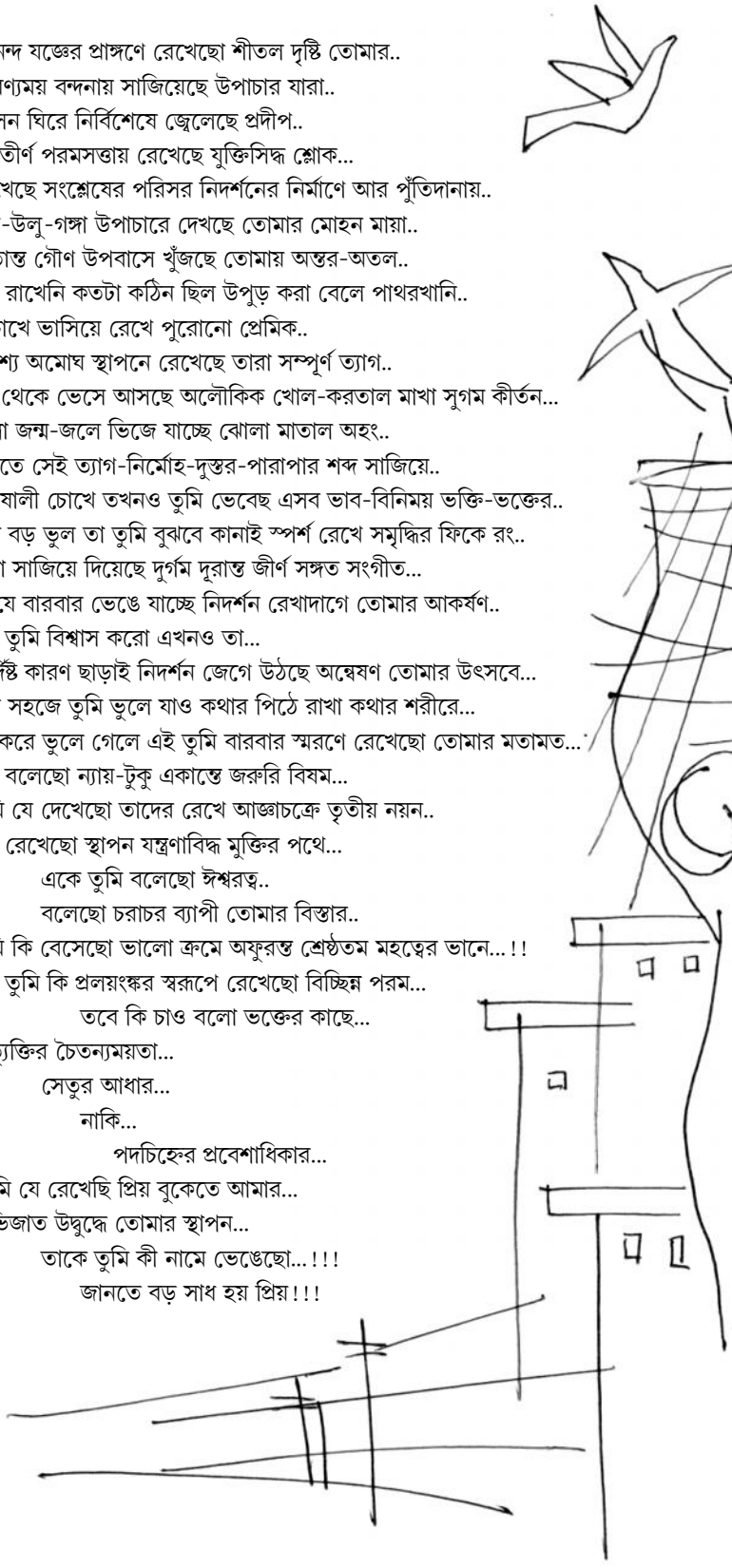

রায়গঞ্জ : ১৫ জুলাই, ২০১৭

পুষ্পজিৎ রায়

রাগ ছুটছে ইটাহারে
ছুটছে করণদিঘি
রাগের রোষে পুড়ছে রোদ
বাতাস ধিকিধিকি
রাগের ছেলে খাচ্ছে ট্রেন
গিলছে ভল্‌ভো বাস
রাগের ছেলে চিবোয় টো টো
লুফ্‌ছে টিয়ারগ্যাস
রাগগুলো তো শুদ্ধ আদিম
অমল অনন্যা
রাগ খুঁজছে বোনকে তার
খুঁজছে নিজের কন্যা।

চড়াই সংবাদ

স্বপ্না রায়

বলছে ডাকি বাবুই পাখি
চড়াই ওরে চড়াই—
ঘুলঘুলি নেই ফ্ল্যাটবাড়িতে
নেই তো ধানের মরাই।
কোথায় থাকিস? কী খুঁটে খাস?
কোথায় সে তোর বড়াই?
মাপ করে দাও, দাদা আমার,
এক্সট্রিমলি সরি,
দাম বুঝিনি তোমার কুঁড়ের
লজ্জায় তাই মরি।
দুখের কথা কী আর বলি,
জানো তো ভাই সবই,
এটাও জেনো আমরা ক্রমে
লুপ্ত প্রাণী হবই
আর কিছু নয়, মোবাইলের
টাওয়ারটাই জ্বালালে
'চড়াই' এবার দেখবে শুধু
ফেসবুকের ওই ওয়ালে।

ফুটুক সকল ফুল

মানস মণ্ডল

সাত-সকালে ভিজিয়ে দিল
নানুর গাঁয়ের
ছিপ ফেলা এক
চণ্ডীদাস।
ফিরবো বলে, পা বাড়াতেই
থামিয়ে দিল
চৌরাস্তার মোড়ে আঁকা, রবীন্দ্রনাথ।
গল্পগুলি সঙ্গে ছিল, আটকে গেল
লাল-হলুদের সঙ্গীতে-সিগন্যালে
বালাই ছিল মস্ত বড়ো
কী করে আর ওদের ছেড়ে যাই বলো?

আমরা তো চাই ফুল, যতেক রকম ফোটা
পাতার নিচে
হাজার হাজার ঝুপড়ি থেকে
খড়ের গাদায় সুঁচটি খোঁজা

মোটেই কিছু সহজ নয়
যদি না সে নিজেই এসে
নিজেকে খুব নাড়িয়ে দিয়ে
ভীষণভাবে জাগিয়ে দেয়, শেষে

আমি তো ওই, ভোরের কুঁড়ি
ফোটাও দেখি, ফোটাও সকল ফুল
রোজ সকালে সূর্য পেড়ে
ভাঙছি নিজের ভুল।

সাপুড়িয়ার প্রোফাইল

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

জন্মের পর থেকেই জেনে গেছি—
পাখির ঘর ডিঙোনোর উপপাদ্য

আমি তো একবিংশের বুনো দাঁড়াস
নির্বিষ বলে প্রকৃতি জুড়ে কারা যেন
সাজিয়ে রেখেছে তাচ্ছিল্য
হিসহাস শব্দে ছড়াতে পারিনি—
অভিনব সন্ত্রাস

পরমব্রত উপাসনা দিয়ে শুরু করি—
অভিনব যাজন
ক্ষুদ্র বলেই ভুলেছি শালীনপর্বের ইতিহাস
নগ্নমগডালের হা-হুতাশ

সাপুড়িয়া বাঁশি শুনে শুরু করি
তৃতীয় স্বপ্নের অলৌকিক নাচ

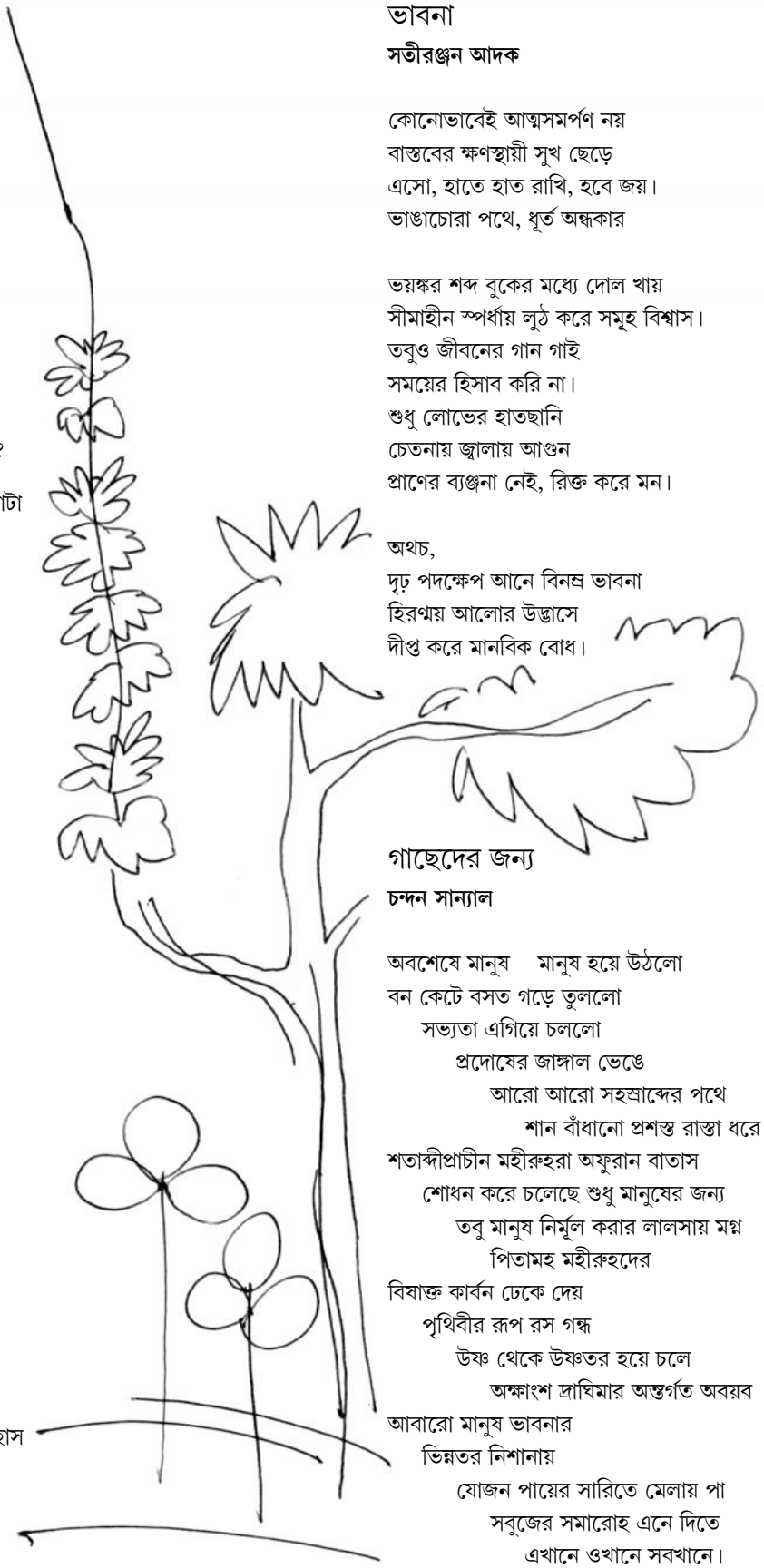

ভাবনা

সতীরঞ্জন আদক

কোনোভাবেই আত্মসমর্পণ নয়
বাস্তবের ক্ষণস্থায়ী সুখ ছেড়ে
এসো, হাতে হাত রাখি, হবে জয়।
ভাঙাচোরা পথে, ধূর্ত অন্ধকার

ভয়ঙ্কর শব্দ বুকের মধ্যে দোল খায়
সীমাহীন স্পর্ধায় লুঠ করে সমূহ বিশ্বাস।
তবুও জীবনের গান গাই
সময়ের হিসাব করি না।
শুধু লোভের হাতছানি
চেতনায় জ্বালায় আগুন
প্রাণের ব্যঞ্জনা নেই, রিক্ত করে মন।

অথচ,
দৃঢ় পদক্ষেপ আনে বিনম্র ভাবনা
হিরণ্ময় আলোর উদ্ভাসে
দীপ্ত করে মানবিক বোধ।

গাছেদের জন্য

চন্দন সান্যাল

অবশেষে মানুষ মানুষ হয়ে উঠলো
বন কেটে বসত গড়ে তুললো
সভ্যতা এগিয়ে চললো
প্রদোষের জাঙ্গাল ভেঙে
আরো আরো সহস্রাব্দের পথে
শান বাঁধানো প্রশস্ত রাস্তা ধরে
শতাব্দীপ্রাচীন মহীরুহরা অফুরান বাতাস
শোধন করে চলেছে শুধু মানুষের জন্য
তবু মানুষ নির্মূল করার লালসায় মগ্ন
পিতামহ মহীরুহদের
বিষাক্ত কার্বন ঢেকে দেয়
পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ
উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয়ে চলে
অক্ষাংশ দ্রাঘিমার অন্তর্গত অবয়ব
আবারো মানুষ ভাবনার
ভিন্নতর নিশানায়
যোজন পায়ের সারিতে মেলায় পা
সবুজের সমারোহ এনে দিতে
এখানে ওখানে সবখানে।

বাংলার মুখ

নিলয় মিত্র

এতো বাংলার মুখ
পরিশ্রুতি হৃদয়
প্রতিবাদে প্রতিরোধে
মিছিলের সম্মিলনে
অসহনীয় বুকে নবান্ন যাবার পথে
ব্যারিকেডের সামনে
সতেজ সটান পাহাড় অরণ্যনদী
পার হয়ে মিথ্যে উৎসবের
রঙিন ফানুস ফাটিয়ে
সমাজচেতনার উজ্জ্বল অনুভূতিতে

ফিরবেই সময়ের সাথে অনায়াসে
প্রতিটি সংগ্রামে জয়ের মুকুট পরে
দাপিয়ে ঘোড়ার মতো
অসংখ্য সূর্যকণার রক্তমাখা ধরে
ঝোড়ো সংগ্রাম পেরিয়ে
ফিরবেই

মানুষ ভালোবেসে
পরিশুদ্ধ জীবনবোধে
ইস্তাহারের শব্দগুলো বুকে নিয়ে
নভেম্বর বিপ্লবের পাঁজরের হাড়ে
স্বাধীন স্বপ্নসমাজে
মানুষের প্রীতহাত ধরে

যাঁদের চিনিনা
দেখিনি যাঁদের কোনোদিন
নিপীড়ন নির্যাতন সন্ত্রাস নৈরাজ্যে
আহত নিহত মানুষের পাঁজর বুকে নিয়ে
জেগে ছিলেন জেগে আছেন
বেদনার অশ্রুতে কারখানায়
গ্রাম শহর বন্দরে রক্তে রৌদ্রে
বৃষ্টিতে শীতে অবিরাম সংগ্রামে

ভাই তাঁরা আমাদের
বোন তাঁরা আমাদের
জনক জননী
পূর্ব ইতিহাসের লড়াকু হৃদয়
এসো নত হাওয়া যাক
সেই সব মহার্ঘ জীবনের কাছে
এসো শুদ্ধতম অঙ্গীকারে।

অন্ধকার

রাজকুমার রায়চৌধুরী

এখন কিছু ছেলে জন্ম নেয় নিষিদ্ধ ছবির ভিতর থেকে। তারা কারো মোবাইল থেকে সংগ্রহ করে বা ছিনিয়ে নেয় আদব কায়দার আশ্চর্য সেই সব নীল ছবি। তারপর ছুটির পরে বা গোপন জায়গায় সৌন্দর্যপিপাসু দৃষ্টিতে সেই সব ছবি দেখে, তাদের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে লাল আগুন, লাফিয়ে ওঠে তাদের যৌনাঙ্গ।

তারা পাঁচিল টপকিয়ে হারিয়ে যায় শহরের ঘরে ঘরে। বড় রাস্তায় সরু গলির আঁধারে। আড়াআড়ি বিশৃঙ্খলার ছায়া পড়ে, তারা ফিসে আসে লোভের চোরাগোপ্তা আঁধার ধরে কালোরাত্রির ভিতর ধারালো দৃষ্টিতে নাইন ক্লাসের শরীরে। বারো ক্লাসের রমণী উদ্যানে। শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে চারদিক থেকে তারা আটকে ফেলে মাকড়সার জালের ভিতর মেয়েটিকে। বিষাক্ত লালায়, অন্ধকার থাবায়, ছেঁড়া মেঘের ভিতর খসে পড়ে মেয়েটির রক্তাক্ত পালক, দ্বিধার প্রান্তে কাঁপে আতঙ্কিত লাল টিপ। জেগে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত তেজ, কেশর দোলানো হিংস্রতা।

শহর ঘুমোয় জমাট অন্ধকারে, দু-একটি প্রশ্ন পড়ে থাকে নির্জন আঙুলের ইঙ্গিতমত লেখায়... তুমুল বৃষ্টিতে সে লেখার একটি অক্ষরও মুছে যায় না, তার ভিতর ওঠে একটি কালো চাঁদ। সেও একাকিত্বে কাঁপে উষ্ণ বিষাদে, স্বপ্ন ভাঙে, নিভে আসে। শুরু হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অধ্যায়, ধর্ষণের ইতিহাস।

বর্ণমালার এই দেশে

পান্নালাল মল্লিক

দিনের পর দিন গদ্যময় হতে হতে
একদিন বর্ণমালার দেশে চলে এলাম।
এদেশের উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর
পশ্চিমে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কালাহান্ডির অসহায় মুখ
পূর্বে হতাশায় গৃহবন্দী বাংলা নামে দেশ,
এই বর্ণমালার এখানে ওখানে বনবাদাড় জলজঙ্গল—
এখানে যে কেউ ঘর বাঁধতে পারে, বোমা বানাতে পারে,
উড়িয়ে দিতে পারে যে কোনো সৌধ, স্মারক, এখানে যে-কেউ
ঘরের মধ্যে ঘর বানানোর স্বপ্ন দেখে, এখানে বসে অবাধে
যে-কেউ ইচ্ছে-পাখির ডানা কেটে চোরা কারবারি করতে পারে—
বর্ণমালার এদেশে কোনো পাহারাদার নেই।

এখানে ঘরের বাইরে এলে পা ভিজে যায় বানের জলে,
কোথাও খরা। আমি বুঝতে পারি বর্ণমালার এই দেশে
এখন আর নিষেধের কোনো আড়াল নেই। সবাই স্বাধীন,
ইচ্ছে মতন ঘুরছে ফিরছে, চেতনার আকাশে নিষ্পাপ
বলাকা উড়িয়ে বিচ্ছেদের রাখি পরিয়ে দিচ্ছে জনে জনে—
যদি আর কোনো কুসুম ফোটে, আর কোনো
ফুল বিকশিত হয় পশ্চিমা বাতাসে।

With Best Compliments of

KHANDRA COLLIERY EMPLOYEES
CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

Reg. No. 477 Dt. 10-04-79

Vill. & P.O. Khandra
P.S. Andal, Dist. Paschim Bardhaman

Sl. No. 134

With best compliments of

AMIYA GHOSH & SK. KISMAT

Mob. 96797241134 (Amiya), 9002973929 (Kismat)

Sl. No. 121

দেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

দেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

সালানপুর ব্লক, পশ্চিম বর্ধমান

Sl. No. 122

বিশ্বায়নকে বৈধতা দিতে উত্তর-আধুনিকতা থেকে উত্তর-সত্য ভাবনার নির্মাণ

সেখ সাইদুল হক

বর্তমান সময়কে অভিহিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে 'উত্তর-সত্য যুগ' বা Post-Truth Era বলে। অক্সফোর্ড অভিধানসমূহ ঘোষণা করছে যে ২০১৬ বর্ষের আন্তর্জাতিক শব্দ হল উত্তর-সত্য (Post-Truth)। উত্তর-সত্য কথাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে 'উত্তর-সত্য রাজনীতি'। অক্সফোর্ড অভিধানসমূহ প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে চালু কিছু রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত শব্দকে (Political terms) তালিকাভুক্ত করে যেগুলি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিমুখকে চিহ্নিত করে বছরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিক্‌নির্ণয় করে। এই বছরে যে যে শব্দগুলি ছোটো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল তার মূল তিনটি হল—১. Alt-Right—একটি দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী যারা চূড়ান্ত সংরক্ষণ বা প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ। এরা মূল স্রোতধারার রাজনীতিকে অস্বীকার করতে চায় এবং বিতর্কিত মন্তব্যগুলিকে অন-লাইন মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনভাবে ছড়িয়ে দিতে চায়। ২. Brexiter—কথাটি এসেছে Brexit থেকে অর্থাৎ ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসা। এটির মাধ্যমে যে ভাবনাকে বোঝানো হচ্ছে তা হল প্রচলিত বা চালু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেওয়া। ৩. Post-Truth বা উত্তর-সত্য। এটার মানে হল জনমত নির্ধারণে বাস্তব ঘটনাবলি বা তথ্যাবলির অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল মানুষের আবেগময়তা ও ব্যক্তিবিশ্বাস (Objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief)।

উত্তর-সত্য ভাবনার সংজ্ঞায়ন

উত্তর-সত্য বা Post-Truth শব্দবন্ধ প্রথম উল্লিখিত হয় ১৯৯২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরপরই। তখন যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিতে এই পদটি ব্যবহৃত হয়েছিল তা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষের ব্যাপক বৈষয়িক উন্নয়ন সত্ত্বেও তার পতন ঘটেছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হল, বাহ্যিক উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে 'সামাজিক আমি' ও 'ব্যক্তি আমি'র পরিসরকে, তার আবেগ-অনুভূতিকে নস্যাৎ করা হয়েছে। এর থেকে সংজ্ঞা টানা হল, জনমত নির্বাচনে এই সব বাহ্যিক উন্নয়ন অপেক্ষা বেশি কাজ করে মানুষের ব্যক্তি-আবেগ ও অনুভূতি। মনে রাখা দরকার, তখন এক-কেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠছে এবং নয়া উদারীকরণ পর্ব শুরু হয়েছে। তারপর এই শব্দগুচ্ছ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভাবনা নিয়ে হাজির হয় ২০০৪ সালে। এটা জনপ্রিয়তা লাভ করে ২০১৬ সালে ব্রেক্সিট ও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালে।

একদিকে ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার ভোটে প্রস্থানপন্থীদের জয়লাভ এবং অপরদিকে আমেরিকার নির্বাচনে সমস্ত রাজনৈতিক বিশ্লেষণকে ভুল প্রমাণিত করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়লাভ। অক্সফোর্ড অভিধান বোর্ডের সমীক্ষায় দেখা গেল এই দুটি ঘটনায় ২০১৬ সালে এই শব্দগুচ্ছের ব্যবহার বিগত বছরগুলির তুলনায় ২০০০ শতাংশ বেশি বেড়ে গেছে। এই শব্দগুচ্ছকে বহুল ব্যবহার করে বোঝানো হল জনপ্রিয়তা নির্ধারণে কাজ করছে মানুষের ব্যক্তি-আবেগের প্রতি আবেদন। ব্রিটেনের মানুষকে বোঝানো হল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে প্রতিটি ব্রিটিশ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আমেরিকার মানুষকে বোঝানো হল আমেরিকাতে আমেরিকানরাই বঞ্চিত হচ্ছেন। মানুষের বড় অংশ যুক্তি-নির্ভরতা বা বাস্তব সত্য অপেক্ষা আবেগকে প্রাধান্য দিল।

অক্সফোর্ড অভিধান বোর্ড এর থেকে সংজ্ঞায়ন করল যে সাম্প্রতিককালে উত্তর-সত্য রাজনীতি (Post-truth politics) বিশ্বজুড়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। একে ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক শব্দ হিসেবে নির্বাচন করে অক্সফোর্ড অভিধান বোর্ডের সভাপতি Casper Grathwohl লিখলেন, ''Fueled by the rise of social media as a news source and a growing distrust of facts offered by the establishment, Post-truth as a concept has been finding its footing for some time... It may become a difining word of our time.''

বর্তমান সময়

বর্তমান সময়কে উত্তর-সত্য যুগ বা (Post-Truth Era) বলে অভিহিত করে পশ্চিমি দুনিয়া থেকে এখন এই শব্দগুচ্ছকে দার্শনিক ভিত্তি দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, এই শব্দগুচ্ছ ২০১৬ সালকে একটি বড় সত্য ভাবনায় প্রতিবিম্বিত করেছে। আর তা হল a year full of soul searching and separation, marked by transition and lines between self and other. অর্থাৎ আত্মানুসন্ধান ও পৃথকীকরণের মধ্য দিয়ে রূপান্তর এবং 'ব্যক্তি-আমি'-র সাথে অন্যদের সম্পর্ক স্থাপন।

অপরদিকে বর্তমান সময়ে এই দার্শনিক ব্যাখ্যার বিপরীতেও মতামত জোরালো হয়ে উঠছে। যেমন বিশিষ্ট মুক্তচিন্তাবিদ ও New College of Humanities-এর প্রচারক অধ্যাপক A.C.

Grayling-এর মতে উত্তর-সত্য ভাবনা হল অপ্রচ্ছন্ন আতঙ্ক (Undisguised horror)। এই শব্দগুচ্ছের বর্তমান দার্শনিক ব্যাখ্যায় সাবধান করে তিনি বললেন, এটা হল 'বৌদ্ধিক সংহতির অসততা' (Corruption of intellectual integrity) এবং 'গণতন্ত্রের বাঁধুনির পক্ষে ক্ষতিকর' (Damage of whole fabric of democracy)। অধ্যাপক গ্রেলিং তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে বললেন, ২০০৮ সালে পশ্চিমি দুনিয়ায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় (Financial crash)-এর পর বিশ্বপরিস্থিতি পাল্টে গেছে। তাঁর মতে এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মূলে আছে আয়ের বৈষম্যের উদ্দাম বৃদ্ধি (Toxic growth in income inequality)। ২০১৬ সালের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, বর্তমান সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ১৯৩০-এর মন্দার পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতে মানুষের প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ক্ষোভ বাড়ছে। আর ক্ষোভের বাস্তব কারণগুলিকে আড়াল করতে আবেগময় যুক্তি খাড়া করা হচ্ছে। মানুষের অন্তর্নিহিত সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে কাজে লাগিয়ে যুক্তিকে আড়াল করে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ক্ষোভকে ব্যবহার করে নির্বাচনে জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য ব্যক্তি-আবেগ ও অনুভূতিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। সত্য-মিথ্যাকে গুলিয়ে দিয়ে দুর্দশার আসল কারণগুলিকে আড়াল করা হচ্ছে। এটাই হল উত্তর-সত্য ভাবনা নির্মাণ। এই ভাবনাকে তাই বলা যায় উত্তর-আধুনিকতা (Post-Modernism) তত্ত্বেরই একটি নবরূপ (New Shape)। আর আমরা জানি উত্তর-আধুনিকতার তত্ত্ব তৈরি হয়েছে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বার্তাকে বৈধতা দিতে।

পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন শব্দটির সঙ্গে আমরা প্রায় সকলেই কমবেশি পরিচিত। গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে বা আরো নির্দিষ্ট করে বলা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দ্রব্য, পুঁজি, সেবা, প্রযুক্তি এবং তথ্য ইত্যাদির বিশ্বজুড়ে অবাধ চলাচলের ভাবনা তৈরি হয়। বিশ্বায়নের ধারণা তখনই দানা বাঁধে। আর নির্দিষ্ট অর্থে এটি ব্যবহার করলেন অর্থনীতিবিদ Theodore Lerrit ১৯৮৩ সালে 'Harvard Business Review' পত্রিকার মে-জুন সংখ্যায়। ১৯৭৩-পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় যখন সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করে তখন সংকট থেকে মুক্তি পেতে বিশ্ববাজারে তাদের আধিপত্যকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া নানা কৌশল অবলম্বন করে। সেই সময় বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে লেরিট ব্যবহার করলেন 'Globalisation of Markets' শব্দগুচ্ছ। বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে অনুঘটকের কাজ করল। পরিকাঠামো পুনর্গঠনের নামে তৃতীয় দুনিয়ার বাজারকে কুক্ষিগত করল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ১৯৯০ সালের পরবর্তী সময়ে বিশ্বায়ন একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করল। সেই পর্যায় হল নয়া উদারীকরণের পর্ব (Neo-liberal regime)। দেখা গেল এই পর্বে লগ্নিপুঁজি আরও আগ্রাসী চেহারা নিয়েছে এবং ব্যাপক অসাম্য তৈরি করেছে। অক্সক্যাম রিপোর্টে জানা যাচ্ছে নয়া উদারীকরণের ফলে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এক শতাংশের হাতে রয়েছে ১১০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। জনসংখ্যার দিক থেকে থাকা অর্ধেক অংশের মোট সম্পদের তুলনায় তা ৬৫ গুণ। Organisation of Economic Cooperation and Development-এর রিপোর্ট অনুযায়ী উদারীকরণের ২৫ বছরের মধ্যে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। উন্নত দেশেও অসাম্য বেড়েছে। বেকারত্ব বেড়েছে। World Economic Studies and Prospects-2004 থেকে জানা যাচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলিতে বেকারির হার ৮.৪ শতাংশে পৌঁছেছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের দেশগুলিতে বেকারির হার ১১ শতাংশ। ২০০৮ থেকে শুরু হওয়া আর্থিক সংকটের পর্বে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া, বিশেষ করে তার পাণ্ডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার দোসর গ্রেট ব্রিটেন নতুন সংকট ও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। সংকট এবং সমস্যা কাটাতে এবং পুঁজিপতিদের বাঁচাতে এইসব দেশসমূহের শাসক শ্রেণি উদ্যোগ নিয়েছে। কর্পোরেট ঋণকে রূপান্তরিত করেছে জনগণের ঋণে। এর ফলে তৈরি হওয়া সংকট থেকে মুক্তি পেতে শ্রমজীবী মানুষের ওপর বোঝা চাপানোর পাশাপাশি সরকারি কল্যাণমুখী প্রকল্পে বরাদ্দ ছাঁটাই করেছে। লড়াই-এর মাধ্যমে অর্জিত মানুষের অধিকারের ওপর নির্লজ্জ আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। আক্রমণ নেমেছে জনতার সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারেও।

বর্তমানে তাই বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে লগ্নি পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম এবং প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলনের ঘটনা ঘটেছে। ব্যয় সংকোচনের বিরুদ্ধে বহু দেশে বিক্ষোভ আন্দোলন হয়েছে। দেশীয় সরকারগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। দক্ষিণপন্থী দলগুলিও একই সময়ে সক্রিয় থেকে পরিস্থিতির ফায়দা তুলছে জাতিবিদ্বেষ তৈরি করে, অভিবাস-বিরোধী মঞ্চ গড়ে। ব্রিটেনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আমেরিকায় অভিবাসীদের বিরুদ্ধে চটকদারি ভাষণ দিয়েছে। এর ফলে তৈরি হওয়া সংকীর্ণমনা স্ব-জাত্যভিমান থেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষে ব্রিটেনের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মত দিয়েছে। চরম প্রতিক্রিয়াশীল জেনেও ধনকুবের ট্রাম্পকে মার্কিন জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নির্বাচনে জিতিয়েছে। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা একেই উত্তর-সত্য যুগের (Post-truth Era) সূচনা বলে চিহ্নিত করে বিশ্বায়নপর্বের বঞ্চনাবোধকে অন্য খাতে বইয়ে দিতে চেয়েছেন। ঠিক যেমনটি তাঁরা করেছেন আগ্রাসী পুঁজিবাদের ন্যক্কারজনক ভূমিকা আড়াল করতে ও বিশ্বায়ন-বিরোধী শ্রেণি-আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে উত্তর-আধুনিকতার তত্ত্ব আউড়ে।

উত্তর-আধুনিকতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে প্রথম পর্যায়ে যেমন সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি ঘটেছে তেমনি এই সময়কালেই পশ্চিমি দুনিয়ার পুঁজিবাদের পুনর্নির্মাণ শুরু হয়েছে। নেতৃত্বে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই পুনর্নির্মাণের যুগটিকে এক অর্থে পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই পর্বকেই উত্তর-আধুনিকতার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের বক্তব্য হল পুঁজিবাদের পুরোনো চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে। পুঁজিবাদ আধুনিকতার স্তর অতিক্রম করে উত্তর-আধুনিকতার স্তরে প্রবেশ করেছে। এই সময়কালে একটি পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক ধারণা হিসেবে উত্তর-আধুনিকতাবাদের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাটি হল ১৯৬৮-র ফ্রান্সে ছাত্র বিদ্রোহ। আমাদের মনে রাখা দরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায় হতে ভিয়েতনাম বিপ্লবের জয়লাভের সময়কাল পর্যন্ত গোটা বিশ্বে মার্কসবাদই সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী মতাদর্শ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিংশ শতাব্দীতে গোটা দুনিয়ার চিন্তার জগতেও প্রভাব বিস্তার করেছে মার্কসবাদ। তাই মার্কসবাদের প্রভাবকে রুখতে তখন আপাতভাবে আধুনিকতার সব খারাপ বহিঃপ্রকাশকে নাকচ করে বিপ্লবী মোড়কে উপস্থাপিত হয় উত্তর-আধুনিকতাবাদ। এটা সমাজতন্ত্রের বিরোধী। কিন্তু আধুনিক পুঁজিবাদের বিরোধী নয়।

১৯৭৩ সালে মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ ড্যানিয়েল বেল তাঁর বই The Coming of the Post-Industrial Society-তে বললেন, পুঁজিবাদ ও শ্রমিক শ্রেণির উভয়ের চরিত্রের পরিবর্তন হচ্ছে। একটি Post-Industrial সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। ফ্রান্সের বিদ্রোহকে স্মরণে রেখে হার্বার্ট মার্কেস-এর মতো কেউ কেউ নয়া বাম (New Left)-এর ধারণা গড়ে তুললেন, যেখানে বলা হল শ্রমিক শ্রেণিকে বাদ দিয়ে বিপ্লবী পরিস্থিতি তৈরি করা যায়। আর্নেস্টো লাকলা এবং সান্তাল মুফো উত্তর-মার্কসবাদ (Post-Marxism)-এর ধারণা নিয়ে এলেন। এঁরা সবাই বললেন, শ্রমিক শ্রেণি বিপ্লবী চরিত্র হারিয়েছে, তারা এখন মধ্যবিত্তের অংশ। মার্কেস একধাপ এগিয়ে বললেন ছাত্র এবং বিপজ্জনক সর্বহারার (মূলত শহরের) অংশ বর্তমান যুগের বিপ্লবী বাহিনী।

এই পটভূমিতে ফরাসি ছাত্র বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী ও পরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রাঁসোয়া লিওতার প্রকাশ্যে মার্কসবাদের বিরোধিতা করে বই লিখলেন Libidinal Economy। তারপর উত্তর-আধুনিকতার দর্শনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে উপস্থাপিত করলেন তাঁর The Post-Modern Condition: A Report of Knowledge বইয়ে। এখানে তিনি উত্তর-আধুনিকতাকে বর্ণনা করেন incredulity towards metanarrative। অর্থাৎ উত্তর-আধুনিকতা কোনো সর্বজনীন বিবৃতি বা ধারণাকে মানে না। এটা যুক্তিবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কিংবা বিবর্তনবাদ—এই ধরনের সর্বজনীন ধারণার বিরোধী। উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের মতে এই ধরনের সর্বজনীন বিবৃতিগুলি টোটালিটারিয়ান, এরা কোনো বিরোধিতা সহ্য করতে পারে না। উত্তর-আধুনিকতাবাদের আর-এর প্রবক্তা জাঁক দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ (Deconstruction) তত্ত্বে বললেন, বাস্তব বা সত্যকে পরিপূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব নয়, কেননা এগুলি আসলে কারোর না কারোর জবানি (Discourse)। এই জবানিকে বিনির্মাণ করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়া সীমাহীন। দেরিদা দ্বান্দ্বিকতা সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণাকে অস্বীকার করে বললেন, দুটি বিপরীতের মধ্যে ঐক্য সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণে সত্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তিনি ব্যাখ্যা দিলেন, বৈপরীত্যের এই সংঘাত হল জবানির সংঘাত। দেরিদার মতে লেখক বা বক্তা গুরুত্বহীন। পাঠক বা শ্রোতার কাজ হল জবানিটিকে অবিশ্বাস করে পাল্টা জবানি নির্মাণ করা। প্রতিষ্ঠিত বা কর্তৃত্বকারী জবানিকে বিনির্মাণ করে নিম্নবর্গীয় জবানি (Subaltern discourse) তৈরি করা। তারপর তাকেও বিনির্মাণ করা। এই প্রক্রিয়া সীমাহীন।

উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী মাইকেল ফুকো বললেন, সমাজে ক্ষমতার অসংখ্য কেন্দ্র আছে যা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, অবদমিত করে রাখে। ফুকোর মতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র একই চরিত্রের—উভয়েই অবদমনকারী। তাঁর ব্যাখ্যা, একটি অংশের অবদমিত মানুষ কেবল তার ইস্যু নিয়ে সংগ্রাম করবে। অন্য অংশ তার পক্ষে এলে হয় সে অবদমিত হবে বা অন্যকে অবদমন করবে। তাই অবদমনের কোনো সামগ্রিক চিত্র নেই। প্রতিটি অবদমনের বিরুদ্ধে মানুষকে আলাদা আলাদা করে লড়তে হবে। সঙ্গে নিতে হবে তাঁদেরই যাঁরা তাঁদের মতপরিচয় নিয়ে আছেন। এই নির্দিষ্ট পরিচয়ের বাইরে অন্য পরিচয়গুলি গুরুত্বহীন।

এই মতবাদ পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির (Identity Politics) জন্ম দেয়। এদের মতে একটি বিশেষ ধরনের নিপীড়ন বুঝতে সক্ষম একমাত্র সেই পরিচিতিসত্তার মানুষেরাই। এদের মতে শ্রেণিও শুধুমাত্র এক ধরনের পরিচিতি সত্তা। এঁরা শ্রেণির ধারণা ও শ্রেণি-সংগ্রামকে নস্যাৎ করে খণ্ডিত পরিচয়ের তত্ত্বকেই সামনে আনেন। এর মধ্য দিয়ে শ্রেণিসচেতনতার বিপদকে প্রতিহত করেন। তাই বলা যায় উত্তর-আধুনিকতা এবং পরিচয়-ভিত্তিক রাজনীতির বিশেষ বিস্তার ঘটেছে আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়নের যুগে। এই পরিচয়-ভিত্তিক রাজনীতি লগ্নিপুঁজির বিরুদ্ধে জাতি, রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্রের জনগণের সংগ্রামকে বিভক্ত করে, কিন্তু বাজারের বিস্তারকে বাধা দেয় না। এরা নস্যাৎ করে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমস্ত অবদমন এবং সমস্ত অবদমিত পরিচয়ের অবসান ঘটবে এই মার্কসবাদী ব্যাখ্যাকে।

উত্তর-সত্য ভাবনা

বিশ্বায়ন ও উত্তর-আধুনিকতার এই যুগলবন্দির মধ্য থেকে তৈরি হয়েছে বর্তমান সময়ে 'উত্তর-সত্য' ভাবনা। বিশ্বায়নের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে ব্যক্তির উন্নয়নের লাগামছাড়া হাতছানি অর্থাৎ আমার উন্নয়ন, আমার প্রতিষ্ঠা, আমার প্রতিপত্তি ইত্যাদি। উত্তর-আধুনিকতা সেই 'আমি'কে নির্দিষ্ট পরিচয়ের 'আমি'তে রূপান্তরিত করে অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিচিতিকে সামনে আনে তা যে-কোনো বর্ণভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক, গোষ্ঠীভিত্তিক হতে পারে কিন্তু শ্রেণিভিত্তিক, শাসক শ্রেণি বা শোষিত শ্রেণি এই ভিত্তিতে নয়। উত্তর-সত্য ভাবনা এই পরিচয়-ভিত্তিক রাজনীতিকে নতুন মোড়কে হাজির করেছে। তুমি ব্রিটেনবাসী, কেন ইউরোপীয় অন্য দেশের স্বার্থে নিজেকে বঞ্চিত করবে কিংবা তুমি আমেরিকাবাসী কেন অভিবাসী বা অন্যদের জন্য সুযোগসুবিধা হারাবে? উত্তর-আধুনিকতা যেমন যুক্তি অপেক্ষা, বাস্তবতা অপেক্ষা একই পরিচয়ের ব্যক্তিবর্গের অবেগকে উসকে দেয়, তেমনি উত্তর-সত্য ভাবনা বিষয়গত কারণগুলিকে বা ঘটনাবলিকে (Objective facts) নস্যাৎ করে প্রতিষ্ঠা করতে চায় মানুষের নিজস্ব আবেগ বা অনুভূতিকে। আর এই আবেগ যুক্তিহীন হলেও এটাই সত্য। কেননা এটা ঘটনায় নয়, অনুভূতিতে সত্য (Personal perception)—তাই এটি উত্তর-সত্য (Post-truth)।

পূর্বেই বলেছি উত্তর-সত্য শব্দগুচ্ছ প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৯২ সালে যখন বিশ্বজুড়ে নয়া উদারীকরণের নাম দিয়ে লগ্নিপুঁজির বিশ্বায়ন শুরু হয়েছে। তখন উত্তর-আধুনিকতার দর্শন বিশ্বজুড়ে বৈশিষ্ট্য লাভ করে বিশ্বায়নকে বৈধতা দিয়ে চলেছে। এই পটভূমিতেই ২০০৪ সালে উত্তর-সত্য যুগের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে প্রথম বই প্রকাশিত হয়। ভুবনীকরণের তখন এক দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে বিশ্বের ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে বিক্ষোভ। তখনই এই নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলা হল—"My opinion is worth than the facts, it's about how I feel about things." অর্থাৎ যে তথ্য বা বলা যায় বাস্তবতা ঘিরে আন্দোলন চলছে তা সত্য নয়—তার ওপরে আর একটি সত্য আছে। আর আছে তোমার হৃদয়ে। সত্য অনুসন্ধানে বাস্তব তথ্যের প্রভাবে না থেকে তোমার আবেগ ও অনুভব দিয়ে ঘটনা পুনর্নির্মাণ করো। কেননা সেটাই প্রকৃত সত্য। ঠিক এমনটাই বলেছেন উত্তর-আধুনিকতাবাদের প্রবক্তারা। তারা বলেছেন পাঠক বা শ্রোতার কাজ নির্দিষ্ট জবানিকে অবিশ্বাস করে পাল্টা জবানি নির্মাণ করা। উত্তর-সত্য ভাবনাও বলছে বাস্তবের সত্যকে অবিশ্বাস করে পাল্টা সত্য নির্মাণ কর। আর সেটা কর তথ্য দিয়ে নয়, তোমার আবেগ ও অনুভব দিয়ে। কেননা যা কিছুর প্রচার চলছে তা এক অর্থে 'Misspeaking' অথবা exercising poor judgement। এদের মতে কোনো বিষয়কেই সত্য কিংবা মিথ্যা, ভালো কিংবা

মন্দ, সত্য কিংবা অসত্য—এইভাবে বিচার করা ঠিক নয়। এতে সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ তাদের গুলিয়ে দাও যাতে আসলটা খুঁজে পাওয়া না যায়। উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা এটাকে অন্য ভাষায় বলবে, কোনো কিছুর নির্দিষ্ট কোনো অর্থ (meaning) নেই কেননা Meaning is always deferred। উত্তর-সত্য ভাবনা বলছে বাস্তবের সত্য সত্য নয়—সত্য আছে তোমার অনুভবে, আবেগে। সেটাই উত্তর-সত্য।

তখন সোস্যাল মিডিয়া কিংবা বলা যায় বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম এতটা শক্তিশালী না হওয়ায় উত্তর-সত্য ভাবনা তত তীব্রভাবে সামনে আসেনি। এখন সোস্যাল মিডিয়ার দৌলতে তা একটা নির্দিষ্ট মতবাদে পরিণত হয়েছে। বা বলা যায় মতবাদে পরিণত করা হয়েছে। আর ২০১৬ সালের ব্রেক্সিট বা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘটনাবলিতে একে জনপ্রিয় ধারণা হিসেবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই সোস্যাল মিডিয়ার প্রভাবটিকেও বিবেচনায় রাখতে হবে।

সোস্যাল মিডিয়া ও উত্তর-সত্য

গত পাঁচ বছর ধরে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে ইন্টারনেট সংযোগ। পৃথিবীতে যত মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হচ্ছে তার অর্ধেকের বেশি স্মার্ট ফোন। সোস্যাল মিডিয়া তৈরি হয়েছে ট্যুইটার, ফেসবুক, হোয়াটস্অ্যাপ, মাইস্পেস ইত্যাদি একগুচ্ছ অন্তর্জাল-নির্ভর প্রয়োগ-ব্যবস্থাপনার ওপর, যা বলা যায় নিহিত হয়েছে Web2.0-এর (World Wide Web–www) প্রযুক্তিভূমিতে। এখানে মূলকথা ব্যবহারকারীর বিষয়-নির্মাণের নিজস্ব স্বাধীনতা এবং ব্যবহারকারী দ্বারা সৃষ্ট বিষয় আদান-প্রদানের স্বাধীনতা। বর্তমান বিশ্বে সোস্যাল মিডিয়ার প্রভাবকে অস্বীকার করা যাবে না, কেননা এটি হয়ে উঠেছে সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা ও রাজনৈতিক প্রচারের অসম্ভব শক্তিশালী হাতিয়ার। লগ্নিপুঁজির ধারক-বাহকেরা এর মাধ্যমেই উত্তর-সত্য ভাবনা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে এবং এর পক্ষে একটি জনমত গড়ে তুলেছে। মনে রাখা দরকার কর্পোরেটরাই মিডিয়াজগৎ নিয়ন্ত্রণ করছে ও সোস্যাল মিডিয়ার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে নিজেদের সপক্ষে। এরা চেয়েছে পরিসংখ্যান (Facts and data)গুলিতে মোচড় দিয়ে নতুন অর্থে তাকে ব্যবহার-উপযোগী করে গড়ে তোলা, কিংবা নতুন পরিসংখ্যান নিজের সুবিধামতো তৈরি করে তার সপক্ষে ব্যাপক প্রচার চালানো। সেটাকেই বলা হচ্ছে ব্যক্তিমানুষের আবেগসঞ্জাত, তার স্বার্থরক্ষাকারী। এইভাবে ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়ার গণভোটে বা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উত্তর-সত্য ভাবনা সুকৌশলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সোস্যাল মিডিয়াতে 'Fake news' ছড়ানো হয়েছে এবং 'Fact' ও 'Fiction'-এর পার্থক্যকে গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাময়িকভাবে তারা সফলতা পেয়েছে। অবশ্য মুদ্রার উল্টো পিঠও আছে। মানুষের মোহমুক্তিও ঘটছে। সেক্ষেত্রেও সোস্যাল মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। যে ব্রেক্সিটকে অবলম্বন করে টেরেসা মে এবং তাঁর দল ব্রিটেনে ক্ষমতায় এসেছিলেন সেই মে ও তাঁর দল ব্রিটেনের পার্লামেন্ট ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি। ট্রাম্পের চিত্তাকর্ষক শ্লোগান আজ আর কাজ করছে না। মোহভঙ্গ হচ্ছে ট্রাম্প অনুরাগীদের। তাই আমাদের দায়িত্ব সোস্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করেই উত্তর-সত্য ভাবনার ক্ষতিকর এবং বিভ্রান্তিকর দিকগুলি নিয়ে প্রচার চালানো। সেই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে সেই প্রচার যেন মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে আহত না করে, যান্ত্রিকভাবে তাকে নস্যাৎ না করে।

আমাদের দেশ

আমাদের দেশে উত্তর-সত্য শব্দটি এখনও ব্যাপক প্রচারিত না হলেও কর্পোরেট মিডিয়ার ব্যবসাদারদের কাছে এটা অপরিচিত শব্দ ছিল না। ২০১৪ সালের লোকসভার নির্বাচনে প্রায় গোটা মিডিয়া জগত, কর্পোরেট হাউস, দেশি বিদেশি বৃহৎ ব্যবসায়ী এই উত্তর-সত্য নির্ভর প্রচারকে হাতিয়ার করে মোদিকে ভগবানের নব অবতার রূপে উপস্থাপিত করেছে, 'আচ্ছে দিন' আনার স্বপ্ন দেখিয়েছে। গণমাধ্যমের পাশাপাশি সোস্যাল মিডিয়াতেও এই প্রচার চালানো হয়েছে। আমাদের দেশেও সোস্যাল মিডিয়ার ব্যাপক ব্যবহার বেড়েছে। বর্তমানে কমবেশি ১২৭ কোটি ভারতীয়র মধ্যে প্রায় ৮০ কোটির কাছাকাছি মানুষ মোবাইল ব্যবহার করে। এর মধ্যে ৩০ কোটির বেশি মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করে। টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টের ভিত্তিতে আমেরিকার প্রযুক্তিবাজার গবেষণামূলক সংস্থা ফোরেস্টার-এর সমীক্ষায় এমন তথ্যই উঠে এসেছে। এই সংস্থার মতে ২০১২ সালে বিশ্বের মোট মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা হবে ৫৫০ কোটি অর্থাৎ বিশ্ব জনসংখ্যার ৭০ শতাংশের বেশি। চীন ও ভারতে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি বাড়বে। ২০২২ সালে ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ মোবাইল ব্যবহারকারী হবে এবং ৬০ শতাংশের বেশি মানুষ স্মার্ট ফোন ব্যবহার করবে। বর্তমানে শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে স্মার্ট ফোনের বাজারে ৭৩ শতাংশ অ্যান্ড্রয়েড দখল নিয়েছে, অ্যাপেল নিয়েছে ২১ শতাংশ এবং উইন্ডোজ ৩ শতাংশ বলে ওই রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে।

গত লোকসভা নির্বাচনের পর IRIS Knowledge Foundation-এর পক্ষ থেকে যে সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে কর্পোরেট হাউস প্রচুর অর্থ ব্যয় করে গণমাধ্যম (প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া) ব্যবহারের পাশাপাশি সোস্যাল মিডিয়াকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে মোদির পক্ষে প্রচারে ঝড় তুলেছে। মিডিয়া ব্যবহারকারী বড় অংশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মোদির পক্ষে জনমত গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রচার ছিল উত্তর-সত্য ভাবনা-নির্ভর। চিত্তাকর্ষক প্রতিশ্রুতি দাও, নিজেকে চা-ওয়ালা বানিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে মিথ তৈরি করো, যাতে মানুষ যুক্তি ও বাস্তবতা ভুলে, ২০০২ সালের গুজরাটের ঘটনাবলিকে ভুলে, আবেগ দিয়ে অনুভব করতে পারে যে মোদি ক্ষমতায় এলে তার সব যন্ত্রণার অবসান হবে এবং দেশে সুদিন আসবে। গত তিন বছরে প্রচারের ফানুস ফেটে পড়েছে জনপথে। তাই দৃষ্টি ঘুরিয়ে দাও। মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন বাড়াও, উগ্র জাতায়তাবাদী প্রচার চালাও এবং নতুন শ্লোগানে মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলো। তাই এখন আর 'সবকা সাথ-সবকা বিকাশ' নয়। এখন শ্লোগান 'Digital India', 'Make in India', 'নগদহীন লেনদেন', 'স্বচ্ছ ভারত' ইত্যাদি। বাস্তব তথ্য থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বলা হয়েছে মোদির হাতেই ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। বলা হচ্ছে উন্নত ভারতের নতুন অবতার মোদি।

আমাদের রাজ্যে

আমাদের রাজ্যেও ২০১১ সালের নির্বাচনে উত্তর-সত্য অভিযান চালানো হয়েছে। বৃহৎ মিডিয়া জগৎ, কর্পোরেট হাউস, দেশি-বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, চিটফান্ডের ধান্দাপুঁজি, সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, মাওবাদীদের একটা সংখ্যা পরিবর্তনের পক্ষে প্রচার চালিয়ে বলেছে, কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, বহু কৃষককে, মানুষকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে,

সংখ্যালঘুদের বঞ্চনা করা হয়েছে। তার সাথে দেওয়া হচ্ছে গণতন্ত্রের, উন্নয়নের এবং কর্মসংস্থানের ঢালাও প্রতিশ্রুতি। জয় হয়েছে উত্তর-সত্যের। বড় অংশের মানুষ ৩৪ বছরের বাম জমানায় যে সুখ ও স্বস্তি পেয়েছে তা ভুলে মনে করেছে রাজ্যে নতুন দিন আসবে। অনেকে, বিশেষ করে মেয়েদের উল্লেখযোগ্য অংশ মনে করেছে একবার দিয়ে দেখি, ভালো কিছু হবে। কিন্তু ভালো যে হয়নি তা তারা বুঝছে। তাই এখন আবার নতুন মিথ নির্মাণ চলছে। গত পাঁচ-ছয় বছরের ব্যর্থতাকে ঢাকতে বাঙালিত্বকে উসকে দিয়ে বিশ্ব দরবারে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কন্যাশ্রী হাতিয়ার হয়েছে। এর পক্ষে সমর্থনও জুটছে। জয় উত্তর-সত্য। সফল প্রচারকে হাতিয়ার করে সুবিধামতো নতুন পরিসংখ্যান নির্মাণ চলছে। তবে এটাই সব নয়। এত চেষ্টাতেও কলঙ্ক মোছা যাচ্ছে না। তাই প্রশাসনকে জো হুজুরে পরিণত করে দলীয় কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। অপরাধকে আড়াল করে, লুম্পেন বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। সরকারি সাফল্য নিয়ে কেউ বেয়াড়া প্রশ্ন করলে কিংবা সমালোচনা করলে পিছনে লাগিয়ে দাও এইসব লুম্পেনদের। পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনকে স্তাবকে পরিণত করে তাদেরকে ব্যবহার করো সমালোচকদের টাইট দিতে। মনে রাখা দরকার উত্তর-সত্য শব্দবন্ধটি হাল আমলের হলেও কৌশলটি পুরোনো। ১৯৩০-এর দশকে বিশ্বমন্দার যুগে ওই কৌশল ব্যবহার করে জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব, জার্মানের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ও বেকারত্বের অবসানের দাবি তুলে হিটলার জার্মানির ক্ষমতায় বসেছিলেন। মোদি-মমতা একই কৌশলকে নতুন আঙ্গিকে ব্যবহার করছেন।

কিন্তু মিথ্যা প্রচার কখনও শেষ কথা বলতে পারে না। অতীতে পারেনি। আজও পারবে না। কেননা উত্তর-সত্য নির্ভর অপপ্রচার, এইসব কিছুদিন মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারলেও তা শেষ কথা বলবে না। বিরোধীদের রক্তচক্ষু প্রদর্শন শাসকদের ক্ষয়কেই ইঙ্গিত করে।

পরিশেষে তাই অধ্যাপক গ্রেলিং-এর ভাষায় বলা যায় উত্তর-সত্য হল সমসাময়িক জীবনে এক ধরনের অসততা এবং প্রতারণা (dishonesty and deception in contemporary life)। তাঁর মতে এটা হল জীবনের পক্ষে ও গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর (corrosive of our public life and democracy)। উত্তর-সত্য কথন (converse) যখন মানুষকে বিভ্রান্ত করে তখন তা কেবল একটি কৌশল থাকে না, তা একটা দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়। এর ফলে উত্তর-সত্য কখনো একটু দুর্বল সামাজিক মিনার (fragile social edifice) তৈরি করে এবং যে কোনো সুস্থ সমাজের অভ্যন্তরে প্রবাহিত বিশ্বাসের যে ভিত্তি (foundation of trust) থাকে তাকে ক্ষয় করতে থাকে। কিন্তু উদ্ভট কল্পনাকে ঘটনা বলে যত চালানো হবে তত সে বাস্তবের মাটি থেকে ওপরে উঠে ভেঙে পড়বে। তাই নির্দ্বিধায় একথা বলা যায়, পুঁজিবাদের পতনকে উত্তর-সত্য ভাবনা রক্ষা করতে পারবে না। আপাততভাবে তার পতন-প্রক্রিয়ায় সামাজিক নিরাময়ের কাজ করতে পারে।

কিন্তু পাশাপাশি এটাও ভাবতে হবে যে, পচনশীল কাঠামো আপনা-আপনি ভেঙে পড়বে না, যদি না ধাক্কা লাগানো যায়। ধাক্কা লাগানোর কাজে গণচেতনা গড়ে তুলতে হবে। গণজমায়েত বাড়াতে হবে। পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানাধীন সোস্যাল মিডিয়াগুলি যেটুকু পরিসর উন্মুক্ত করেছে তাকে ব্যবহার করে চিন্তার জগতে উত্তর-সত্য নির্মিত মায়াজালকে বিদীর্ণ করে প্রগতির পক্ষে এবং প্রকৃত সত্যের পক্ষে প্রচার চালাতে হবে।

সেই সাথে সাথে এটাও মনে রাখতে হবে উত্তর-সত্য ভাবনা ব্যক্তির আবেগ ও অনুভবকে যেভাবে মানদণ্ড করতে চেয়েছে, ব্যক্তিজীবনের এবং সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে তার একটা মূল্য আছে। এটাকে অস্বীকার করলে ব্যক্তি যন্ত্রে পর্যবসিত হবে, শৃঙ্খলায় কারারুদ্ধ হবে। তাই রাজনৈতিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে 'সমষ্টি আমি'র মধ্যে 'ব্যক্তি আমি'র যে একটা নিজস্ব পরিধি আছে তাকে মর্যাদা দিতে হবে। অনেক সময় নিজ ধর্মীয় কিংবা গোষ্ঠীগত কিংবা দলীয় শৃঙ্খলার নামে ব্যক্তির এই পরিধিটুকুকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করা হয়। তার আবেগ-অনুভূতিকে খাটো করা হয়। সেটা বিচ্ছিন্নতাকে ডেকে আনে। গণচেতনা ও গণজমায়েত গড়ে তুলতে বাধার সৃষ্টি করে। ব্যক্তি নিয়েই সমষ্টি। সেই সমষ্টিভাবনা গঠনে ব্যক্তির 'মাথা এবং হৃদয়' অর্থাৎ বুদ্ধি ও অনুভূতি—দুটোকেই মর্যাদা দিতে হবে। তাহলেই পারা যাবে সম্মিলিতভাবে 'উত্তর-সত্য' ভাবনার প্রতারণাকে প্রতিহত করতে।

With best compliments of

Paruldanga Samabay Krishi Unnayan Samity Ltd.

Vill. Paruldanga, P.O. Nasratpur, Dist. Purba Bardhaman, PIN : 713519, M : 09434672990

হামজার সেখ
চেয়ারম্যান

গোপালচন্দ্র ঘোষ
সেক্রেটারি

অজয়কুমার ঘোষ
ম্যানেজার

Sl. No. 109

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সালানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রাম ও পোঃ সালানপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান

Sl. No. 30

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সিএলডব্লু কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

রেজি. নং : ৪৭ (২৪-১-১৯৫২) পোঃ চিত্তরঞ্জন, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান-৭১৩৩৩১

'সমবায় প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়'—রবীন্দ্রনাথ

পরিষেবা

কম সুদে ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান • ৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কনজিউমার লোন • ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত উৎসব লোন • শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা • কম ভাড়ায় পুরীতে হলিডে হোম • এলাকার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান • বিদায়ী সদস্যদের সম্মানের সাথে বিদায় দেওয়া

আমরা আমাদের সদস্যদের আর্থিক মান উন্নয়নের সতর্কপ্রহরী

Sl. No. 31

বিপন্ন সময়, বিপন্ন দেশ

পার্থ মুখার্জি

এই পৃথিবীর যত আলো ও তাপ তার একমাত্র উৎস হল সূর্য। পৃথিবীতে প্রাণের পালনের জন্য যে উষ্ণতা দরকার সেই পরিবেশ মজুত রয়েছে। বায়ুমণ্ডল চাদরের মতো আস্তরণে ঘিরে রেখেছে পৃথিবীকে। বায়ুমণ্ডল ভেদ করে সূর্যের যে আলো পৃথিবীতে আসে তার অনেকটাই সেই চাদর আটকে দেয়। ফলে পৃথিবীতে বহাল থাকে সেই উষ্ণতা, যা ছাড়া বাঁচতে পারে না যে-কোনো ধরনের প্রাণী। ১৮২৪ সালে এই ঘটনার বর্ণনা করেন জাঁ বাসিস্ত জোসেফ ফুরিয়ে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পরিমাণগতভাবে তথ্য অনুসন্ধান করে সুইডিস বিজ্ঞানী আরহেনিয়াম প্রমাণ করলেন বাতাসের কিছু গ্যাস কাচের দেওয়ালের মতো তাকে আটকে রেখে পৃথিবীকে বানিয়ে ফেলেছে 'হট হাউস'।

উষ্ণায়ণ নিয়ে দুনিয়াজুড়ো আলোচনা চলছে। কেন এমন ঘটছে? বিশ্ব পরিবেশ রক্ষায় কী করণীয়? উন্নত দেশ তাদের সভ্যতা থেকে তৈরি বর্জ্য কীভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে চালান করছে, সে নিয়ে চলছে বিশ্বজোড়া তোলপাড় আলোচনা। বিজ্ঞানীরাও দিচ্ছেন পরামর্শ। স্পষ্টতই এর থেকে পরিত্রাণ পেতে দরকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনার একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণও আছে। তাও আজ প্রমাণিত।

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক অভিনব উদ্ভাবন ঘটেছে। এক কথায় বলা যায় প্রযুক্তির জগতে উন্নয়নের বিস্ফোরণ। সত্তরের দশকে মানুষ পা দিয়েছিল চাঁদে। নব্বুই-এর দশকে মঙ্গল গ্রহের মাটি পরীক্ষা করে দেখেছেন বিজ্ঞানীরা। মহাজাগতিক স্তরকে খুঁজে বার করার চেষ্টা এক চিন্তার মহাপ্লাবন। হৈ হৈ করে বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। হাতে গরম ফাস্টফুডের মতো তথ্যপ্রযুক্তির সাফল্যে প্রতিমুহূর্তে খবরের আপডেট। আজ আর এতে কেউ বিস্মিত নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই সাফল্য যখন মানুষের চিন্তাকে নেতিবাচক সংকেত দিচ্ছ, ঠিক তখন ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার প্রভাব মানুষের মধ্যে প্রথিত করার বিপরীতে প্রচার করা হচ্ছে মধ্যযুগীয় ভাবনা। এও এক বিস্ময়।

চিত্র-১ : বর্তমান বিজেপি সরকারের এক মন্ত্রী বিশ্ব উষ্ণায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষণা করেছেন, দেবদেবীর মাথায় জল ঢাললে পৃথিবী শীতল হবে।

চিত্র-২ : গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন রামচন্দ্র যে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন তা আধুনিক যে-কোনো মিসাইলের তুলনায় উন্নত ছিল।

চিত্র-৩ : গান্ধারীর শতপুত্র অন্য কোনো কিছুই নয়, তা ছিল টেস্টটিউব বেবির এক অন্যতম সংস্করণ।

চিত্র-৪ : গণেশের যে ছবি আমরা প্রত্যক্ষ করি তা হল প্লাস্টিক সার্জারির এক অন্যতম সংস্করণ।

চিত্র-৫ : বাজপেয়ি সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী স্বয়ংসেবক মুরলী

মনোহর যোশী বিজ্ঞানীদের সভায় বলেছিলেন, বটগাছের পাতা দুধের সঙ্গে বেটে মহিলাদের ডানদিকের নাসারন্ধ্র দিয়ে যদি টানা হয় তাহলে মায়েরা পুত্রসন্তান প্রসব করবে।

বিজ্ঞানের অভিনব উন্নতির পাশাপাশি মধ্যযুগীয় এই চিন্তার অনুপ্রবেশ যখন ঘটে, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যাঁরা এই মধ্যযুগীয় চিন্তার জনক, তাঁরা কি সত্যিই এই তত্ত্বে বিশাস করেন? উত্তর স্পষ্টতই 'না'। ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার ক্ষেত্রে মানুষের পশ্চাৎপদ ভাবনাকে আরও পিছনের দিকে ঠেলে দীর্ঘ ক্ষমতার অলিন্দে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদকে জনমনে হাজির করাই অন্যতম লক্ষ্য। আমাদের দেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শের কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেশ দ্বিখণ্ডিত হবার পর পাকিস্তান নিজেদের ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করলেও আমাদের দেশ নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করে উদারতা ও আধুনিক মনের পরিচয় রাখতে সমর্থ হয়। ফলত, আমাদের দেশের 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'—এই কথাটির প্রতি সুবিচার করা হয়। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস। প্রত্যেকেই তার নিজের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে চলতে পারে। প্রত্যেকে নিজের ধর্মাচরণ করতে পারে, কিন্তু অপরের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত না করে। কেউ নিজ ধর্মের প্রচারে অপর ধর্মকে আঘাত করলে রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করবে। কিন্তু রাষ্ট্রের নিজস্ব কোনো ধর্ম থাকবে না। রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ। এটাই তো আমাদের দেশের সংবিধানের নির্দেশিকা। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন বিজেপি যদি হিন্দুত্বের নাম করে সংবিধানের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে তখন অবশ্যই উদ্ভূত সমস্যার গভীরতা নিয়ে ভাবতে হয়। কেউ যদি মুসলিম হয়ে বলে আমি নামাজ পাঠ করব, সরস্বতী বন্দনায় অংশগ্রহণ করব না, বা খ্রিস্টান বা শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ যদি অনুরূপভাবে সরস্বতী বন্দনা করতে অস্বীকার করে, তাহলে বিজেপি-পরিচালিত সরকার কি তাকে বলপূর্বক সেই কাজ করতে বাধ্য করবে! যদি তাই সত্য হয় তাহলে তা কিসের ইঙ্গিত বহন করছে? নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাঁরা সরকার চালাতে চাইছেন তাঁদের ফ্যাসিবাদী ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে!

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ভাবনা তো আরএসএস-এর, আজকের নয়। এই ভাবনার ধারক বিজেপি। বাজপেয়ি সরকারের সময়ে এ-ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, কিছু প্রথা পালনেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই রাজনীতির ছোঁয়া লেগেছিল। দীর্ঘদিনের চলে আসা প্রথাকে উল্টে নতুন আঙ্গিকের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষক দিবস ৫ সেপ্টেম্বর নয়, হবে ব্যাসদেবের জন্মদিনে। যেমন নেহরুর জন্মদিনে শিশুদিবস পালনের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনকে বেছে নেওয়া। উত্তরপ্রদেশে জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তে চালু করা হয়েছিল সরস্বতী বন্দনা। অন্য ধর্মের ছাত্রছাত্রীরা তা মানতে নারাজ হওয়ায় তাদের জুটেছিল শাস্তি। এই হচ্ছে আমাদের দেশ। যেখানে আচ্ছে দিনের শ্লোগান বাগাড়ম্বর মাত্র।

আরএসএস-নির্ধারিত শিক্ষাক্রমের একটা সাধারণ ধারণা আমাদের আছে।

১. শিক্ষাঙ্গনকে অতিমাত্রায় ভারতীয়করণ করা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবহার করা : প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বোলপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা করেন তখন নাম দেন বিশ্বভারতী। অর্থাৎ বিশ্বভাণ্ডারে শোধিত যে অমূল্য রতন তাকেও সাগ্রহে গ্রহণ করা। এখানেই আধুনিকতা ও পশ্চাৎপদতার পার্থক্য সূচিত হয়।

২. প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বেদ-উপনিষদ পড়া বাধ্যতামূলক : উল্টোদিকে ১৯৪৮ সালে গঠিত রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সুপারিশে ভারতীয় সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্র সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্যক ধারণা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। মুদালিয়ার কমিশনেও প্রায় একই কথা বলা হয়েছিল। আর.এস.এস সৃষ্ট ধারণার সঙ্গে এই ধারণার বৈপরীত্য প্রবল।

৩. তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সংস্কৃত বাধ্যতামূলক। ভারতবর্ষের বহুত্ববাদী ভাবনার শিকড়ে এটি একটি আঘাত।

৪. স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলিকে একটি নির্দিষ্ট সময় চলার পর সরকারি স্বীকৃতি প্রদান : লক্ষ্য নির্দিষ্টভাবেই সংঘ পরিবারকে তুষ্ট করা।

৫. প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রমে ভেদাভেদ থাকবে না। পরবর্তীকালে বালিকাদের গৃহকোণ সামলানোর পাঠ যুক্ত করা হবে। সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশের এক স্পষ্ট ভাবনা।

আধুনিকতা বনাম পশ্চাৎপদতা, এটি একটি আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। বলা যেতে পারে, আধুনিক ভাবনার যাঁরা জনক তাঁরা কি আজও প্রাপ্য মর্যাদা পাচ্ছেন। এই কথাটির উত্তরের মধ্যে না গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতে বিজ্ঞানীদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ একাডেমি আছে— এলাহাবাদ (প্রতিষ্ঠাতা ড. মেঘনাদ সাহা), বাঙ্গালোর (প্রতিষ্ঠাতা ড. সি.ভি. রমন), দিল্লির ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অব সায়েন্স অ্যাকাডেমি।

এই তিনটি কেন্দ্রের সাথে যুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পুষ্প ভার্গব। ১৯৭৬ সালে সংবিধানে 'সায়েন্টিফিক' শব্দটিকে সংযোজন করার ক্ষেত্রে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৯৯ সালে বিজেপি যখন 'শাইনিং ইন্ডিয়া' শ্লোগান দিয়েছিল তখন সরকারের তরফ থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ানোর হুলিয়া জারি হয়। এর প্রতিবাদে যাঁরা সামিল হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম মুখ ছিলেন পুষ্প ভার্গব। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রিম কোর্টে যান। সেক্ষেত্রে কোর্ট কোনো মত দিতে চায়নি এবং বিজ্ঞানীদের সংগঠনও বলে বিষয়টি বিতর্কিত। সংগঠন কোনো মত দিল না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মতদান চলতে পারে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় বিজ্ঞানীদের সংগঠন যদি বলে বিতর্কিত বিষয় তা হলে তর্ক কোথায় চলবে।

আসলে এই ধরনের দ্বিচারিতার পথ ধরেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা। ভারতে বর্তমান রাজনীতিতে আধুনিকতার ধারণাকে অগ্রাহ্য করে রাজনীতি ও সমাজে হিন্দুদের আদর্শকে নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা বাড়ছে। স্বাধীনতার পরে দেশে সার্বভৌম সরকার গঠিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী ক্ষেত্রে অর্থনীতিতে স্বনির্ভরতার একটি প্রবণতা উল্লেখ করা যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটে তা উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করায় ভারতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। কিন্তু কাজের গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে যায়। ধনতান্ত্রিক পথের চৌহদ্দির মধ্য কাজ সীমাবদ্ধ থেকে যাওয়ার কারণে কৃষি সংস্কারের ব্যাপারে আগাগোড়া দ্বিচারিতা লক্ষ করা গেছে। কৃষকের স্বার্থে কখনোই করা হয়নি ভূমিসংস্কার। জনগণের একটি বড় অংশই চলে গেছে দারিদ্র্যসীমার নিচে। এই সকল কারণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে নৈরাজ্য। এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ভারতের মানুষের মনে নেতাদের সম্পর্কে এক ধরনের অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল। আশা করা গিয়েছিল, বামপন্থী পার্টিগুলি, যারা মৌলিক সমাজ পরিবর্তনের সাধনে অঙ্গীকারবদ্ধ, যাদের কর্মসূচি কৃষকের স্বার্থে ভূমিসংস্কার বাধ্যতামূলক, যেখানে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি, তারা প্রভাব বিস্তার করবে। কিন্তু বামপন্থীরা সেক্ষেত্রে স্বাধীনোত্তর ভারতে কংগ্রেসকে সরিয়ে সারা ভারত জুড়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কেন ঘটলো না? এই বিষয়টি গভীরভাবে বামপন্থীদের অনুধাবন করা জরুরি।

মোট কথা, পরপর এই দুই ব্যর্থতা, প্রথমে কংগ্রেস ও পরে বামপন্থীদের (সাংগঠনিক কারণে), ভারতীয় রাজনীতিতে এক বড় ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি করে। বিজেপি সুযোগ বুঝে এই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসে। যে বিজেপি সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির ওপর নির্ভরশীল, অর্থনীতির ক্ষেত্রে যারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমর্থনপুষ্ট, তারা কি জাতির সামনে অন্য কোনো বিকল্প তুলে ধরতে পারবে? মনে রাখতে হবে এরা কোন ধরনের রাজনৈতিক দল। যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল, নিজেদের নিরাপদ দূরত্বে রেখেছিল। এরাই সেই রাজনৈতিক দল, যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে স্বাধীনতার নতুন অধ্যায় সূচনা করেছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মুখে এখন 'মেক ইন ইন্ডিয়া' শ্লোগান প্রায় 'ব্রেক ইন ইন্ডিয়া'-তে পরিণত হতে চলেছে। দেশে নিরাপত্তার নামে মার্কিন দেশের ছত্রছায়ায় স্থান পাওয়ার উদগ্র বাসনা ভারতের বৈদেশিক নীতিকে কালিমালিপ্ত করেছে।

সাম্রাজ্যবাদের কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ আমাদের সত্তর বছরের স্বাধীনতার ছবিকে ব্যঙ্গ করছে। এমন এক আত্মকেন্দ্রিক সমাজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা চলছে যেখানে আমরা আত্মমগ্ন থাকতে পারি। হয়ে উঠতে পারি আত্মকেন্দ্রিক। আধুনিকতা হল সেই অস্ত্র যেখানে আত্মমগ্নতার বিপরীতে গড়ে উঠবে সমষ্টি চেতনা। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারে বিজেপি এককভাবে ক্ষমতাসীন থাকার কারণে লক্ষ্য গৈরিক সন্ত্রাস। চিরায়ত ভারতীয় সংস্কৃতির মুখে পড়ছে চুনকালি। এখন দরকার সচেতন ও ইতিবাচক উদ্যোগ। চাই এক ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে শাণিত ঘৃণা। গুরুদেবের ভাষায়—''হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা / তোমার আদেশে...''। সাম্প্রদায়িকতা বলুন বা ফ্যাসিবাদী শক্তির কথা বলুন, সবটাই শাসকশ্রেণির অঙ্গ। প্রতিক্রিয়াপন্থীরা সবসময় পুরোনো কায়দায় চলে না। বদলায় ছক, সময়ের পেছনে এরা হাঁটে না, বরং ছুটন্ত সময়ের ঘাড়ে চেপে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়।

কিন্তু এ সবই তো সমস্যা। এই সমস্যাকে মুক্ত করব কীভাবে? কেউ বলছে জনযুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা সাবাড় করে দাও। হ্যাঁ, এই কথার মধ্যে বেশ রোমান্টিক উত্তেজনা আছে। কিন্তু মুশকিল আসানের পথ নেই। বরং দুশমনরা সহানুভূতি পেয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, কেউ কেউ বলেন, স্পেনে ফ্যাসিবাদ ঠেকাতে গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স হয়েছিল, জার্মান ও ইতালির ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে ফ্যাসিবাদবিরোধী গণমঞ্চ। হ্যাঁ, কখনো কখনো এর প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। সাময়িকভাবে এই রোগের কিছুটা নিরাময় হয়। কিন্তু তলায় শেকড় রয়েই যায়, একে উপড়ানো যায় না।

ফ্যাসিবাদ, ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ, নাৎসিবাদ কেবল রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সংস্কৃতি ও দর্শন। মানুষের মগজে বোধ ও বোধের নিবিড়ে সে শিকড় ছড়ায়, পাকে পাকে মানুষকে ভেতর থেকে জড়িয়ে ধরে। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে যতই ঘৃণা থাক, একদিনে তাকে নিরাময় করা কঠিন। প্রয়োজন কষ্টকর বুদ্ধিদীপ্ত সংগ্রাম। তিনটি অস্ত্র—এক ধারালো যুক্তিবাদ, দুই বিজ্ঞানমনস্কতা, তিন দেশের সমন্বয়, ধর্মসংস্কৃতির পরম্পরা রক্ষা। শেষ কথা কে বলবে? চলছে চিন্তার সমুদ্রমন্থন। থাকবে গরল ও অমৃত। কে কী পাবে? তা নির্ভর করবে গণসংগ্রামের চরিত্রের ওপরে। কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের কথায় বলি, ''ভাঙা তো অনেক হলো/শিখে নিতে হবে আজ গঠনপ্রণালী/চাপ চাপ কালি ধুয়ে/ আকাশে ফিনকি দিক সাতরঙা প্রাণের বর্ণালী।'' বিপন্ন সময়ে মানবতার এই আকুতিতে সামিল না হলে হবো পাপের ভাগী।

With best compliments of

MALAKAR ENTERPRISE

CIVIL, MECHANICAL CONTRACTOR AND GENERAL ORDER SUPPLIER

D-25/S, Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211, Paschim Bardhaman
Contact : 9474444867

Sl. No. 96

With best compliments of

D. SARKAR

BARDHAMAN

Sl. No. 150

ভারত-ইজরায়েল সম্পর্কে নয়া মোড় : হিন্দুত্ববাদীদের আন্তর্জাতিক অভিক্ষেপ

মইনুল হাসান

এই প্রথম ভারতের একজন প্রধানমন্ত্রী ইজরায়েল সফর করলেন। স্বাধীনতার সত্তর বছরে একটি অভূতপূর্ব ও বেনজির ঘটনা। ইজরায়েল-এর প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই সফরকে স্বাভাবিক কারণেই বলেছেন 'ঐতিহাসিক'। অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হল পুরো সফরকালে প্যালেস্তাইনের নাম একবারও উচ্চারিত হয়নি। মাত্র কয়েকমাস আগে ভারতের রাষ্ট্রপতি ইজরায়েল সফরে গিয়েছিলেন, তিনি কিন্তু প্যালেস্তাইন যেতে ভোলেননি। শুধু তাই না, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ইজরায়েল সফর করেছেন। তিনিও তাঁর সফরসূচির মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন প্যালেস্তাইনকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সে রাস্তাটাই মাড়ালেন না। তিন দিনের সফরে ঘনঘন সাংবাদিক সম্মেলন হল। নেতানিয়াহু বললেন, দীর্ঘ সাত দশক ধরে এই দিনটির জন্য নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাঁরা তাকিয়ে ছিলেন। আর নরেন্দ্র মোদী বললেন, 'আই ফর আই।' অর্থাৎ ইন্ডিয়ার জন্য ইজরায়েল। গোপনে থাকল যে কথাটি তা হল ভারত প্যালেস্তাইনের জন্য নয়। নরেন্দ্র মোদী ইজরায়েলের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার পর বর্ণনা দিয়েছেন, ''ইজরায়েলের রাষ্ট্রপতি আমাকে এমন উষ্ণতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করেছেন যাতে সমস্ত রকম প্রোটোকল ভেঙে গেছে। এটা ভারতের জনগণের জন্য একটি সম্মানচিহ্ন। (ট্যুইটার—প্রধানমন্ত্রী)। সুতরাং দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানই বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চেয়েছেন এটা সাদামাটা কোনো সফর নয়। বিমানবন্দরে লাল কার্পেট বিছিয়ে যেভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছে তাতে সেটাই প্রমাণ হচ্ছে। ২০০৬ সালেও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী একবার ইজরায়েলে সফর করেছিলেন।

২.

প্যালেস্তাইন আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু দেশ। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে ইয়াসের আরাফতের নাম এখনও উচ্চারিত। ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান এবং বহুস্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অটুট। প্যালেস্তাইনকে প্রথম অ-আরব যে দেশটি স্বীকৃতি দেয় সে হচ্ছে ভারত। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশের বিদেশনীতিতে যে বড় রকমের পরিবর্তন হচ্ছে বা ইতোমধ্যে বেশ কিছু হয়েছে তার প্রমাণ প্রধানমন্ত্রীর ইজরায়েল সফর। বিজেপি দেশের মধ্যে হিন্দুত্ববাদী নীতি নিয়ে চলছে (যার সঙ্গে হিন্দুধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই)। সে তত্ত্বটি একান্তই রাজনৈতিক। এক জাতি, এক দেশ ও এক সংস্কৃতির কথা বলে তত্ত্বটি লাগু করার আপ্রাণ চেষ্টায় রত বিজেপি সরকার। বহুত্ববাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা—দেশের সংবিধান সব কিছু বাতিল করে হিন্দু রাষ্ট্র কায়েম করার পথে এগিয়ে চলো—এটাই হল কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত। দেশের অভ্যন্তরে গৃহীত এই নীতির প্রতিফলন বৈদেশিক নীতিতেও পড়ছে। বিদেশ সফরে গেলেই প্রধানমন্ত্রী বিরাট বিরাট সভা করেন। প্রবাসী ভারতীয়রা সেখানে উপস্থিত হন। সভাগুলি তদারকি করার মূল সংগঠক আরএসএস। সরকারি অর্থে আরএসএস-এর হিন্দুত্ববাদী প্রচার হয়। আর প্রধানমন্ত্রী নিজে ডাকফুঁক আরএসএস প্রচারক। তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিপুল পরিমাণ অর্থ। যার ক্লেদাক্ত আকার দেশের মাটিতে ইতিমধ্যে নগ্নভাবে প্রকাশিত।

এরই সঙ্গে আমরা যোগ করতে ভুলব না যে, ইজরায়েল প্রয়াত আরএসএস নেতা গোলওয়ালকারের আদর্শবাহী স্বপ্নের সংগঠন। নরেন্দ্র মোদী সহ অন্যান্যদের তিনি গুরুজি। তিনিই ছিলেন আর এস এস প্রধান। সেই ছোট্ট বইটি তিনি লিখেছিলেন—'উই, আর আওয়ার নেশন শুড ডিফাইন্ড'। তাতে একটি অংশ—

> The foreign races in Hindusthan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and hold in reverence Hindu religioun, must entertain no idea but those of the glorification of the Hindu race and culture *i.e.*, of the Hindu nation and must lose their separate existence to merge in the Hindu race, or may stay in the country, wholly subordinated to the Hindu nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment—not

> even citizen's right. There is, at least, should be, no other course for them to adopt. We are and old Nations ought to and do deal with the foreign races who have chosen to live in our country.

তিনি মনে করতেন দেশটা হিন্দুদের। অন্যদের থাকার কোনো অধিকারই নেই। থাকলেও দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে থাকবেন। প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলাম এই কারণে যে, সম্প্রতি ইজরায়েলের সংসদ নেসেটে একটি বিল পাস হয়েছে, যাতে ইজরায়েলকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, 'ন্যাশনাল হোম ফর দ্য জিউয়িশ পিপল'। অর্থাৎ ইজরায়েল একান্তভাবেই ইহুদিদের দেশ। অন্য কারো নয়।

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি অন্য কথা বলছে। ২০১৩ সালের আদমসুমারিতে ইজরায়েলে প্যালেস্তাইন-বংশোদ্ভূত মুসলমানের সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৫৮ হাজার। প্যালেস্তাইনের ভূখণ্ড দখল করেই গড়ে উঠেছে ইজরায়েল। সুতরাং সেখানকার মোট জনসংখ্যার ২০.৭ শতাংশ মুসলমান হওয়াটা কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়। এই আইন পাশ হওয়ার ফলে মুসলমানদের পুরোপুরি দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে দেওয়া হয়েছে। আর এস এস-ও ভারতে মুসলমানদের তেমনই করতে চায়। ১৯২৫ সালে এই সংগঠনটি যখন তৈরি হয়েছিল তখন প্রকাশ্যে এই মনোভাবই ব্যক্ত করেছিল। এত বছর পরও তার কোনো হেলদোল হয়নি। এখন বরং তা আরও জোরদার হয়েছে। এই অর্থেও নরেন্দ্র মোদীর ইজহায়েল সফর অর্থবহ যে, দেখতে পারলেন কীভাবে সেখানে মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করা হয়েছে। চক্ষুলজ্জার খাতিরেও তিনি প্যালেস্তাইন গেলেন না। শুধু তাই নয়, নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করলেন না। আর 'সবরকম' সন্ত্রাস মোকাবিলা করতে ভারত ও ইজরায়েল একসাথে কাজ করবে বলে কার্যত প্যালেস্তাইনকে 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়ে ফেললেন।

ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৯৯২ সালে। কিছুটা অঘোষিত। কিন্তু এই বছর সেই সম্পর্কের ২৫তম বর্ষ। এমন সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ইজরায়েলের কাছে বাড়তি পাওনা। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু পাকিস্তান থেকে সন্ত্রাস, বিনিয়োগ থেকে প্রতিরক্ষা সব বিষয়ে ভারতের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইজরায়েল বলেছে, পাকিস্তানের মাটি থেকে উদ্ভূত সন্ত্রাস মোকাবিলায় ভারতকে পুরোমাত্রায় সহযোগিতা করা হবে। উভয় দেশই বহির্দেশের সন্ত্রাসের শিকার। সেই কারণে লস্কর-ই-তৈবা ও হামাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলে উভয় দেশের ধারণা। তারা একই মুদ্রার দুই পিঠ মাত্র। সার্বভৌমত্ব ও আত্মরক্ষার্থে সেটাই নাকি জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু হামাসের নাম উচ্চারণ করার সময় একবারও নরেন্দ্র মোদীর প্যালেস্তাইনের সঙ্গে আমাদের দেশের দীর্ঘ সুসম্পর্কের কথা মনে হয়নি।

৩.

১৯১৭ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত প্যালেস্তাইন ভূখণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীন ছিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে তুরস্কের কাছ থেকে জেরুজালেম দখল করে নেয় ব্রিটেন। সেই সময়ই ব্রিটিশ সরকার এখানে ইজরায়েলের বিভিন্ন দেশে কোণঠাসা হয়ে থাকা ইহুদিদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী আর্থার বেলফোর ঘোষণাটি করেন। সেই কারণে ঘোষণাটিকে বেলফোর ডিক্লারেশন বা ঘোষণা বলা হয়। এই ঘোষণার জন্যই বিগত ১০০ বছর ধরে প্যালেস্তাইনের বুকে ইজরায়েল রাষ্ট্র। নিজ দেশে প্যালেস্তাইনীরাই আজ পরবাসী হয়েছে। ঘটনাচক্রে, প্রধানমন্ত্রী যখন ইজরায়েল সফর করছেন এবং নেতানিয়াহুকে জড়িয়ে ধরছেন তখন বেলফোর ঘোষণা-র শতবর্ষ উদ্‌যাপন চলছে।

১৯৩৩ সাল। জার্মানির ইহুদি-বিদ্বেষী নাৎসি নায়ক হিটলারের নারকীয় আক্রমণের মুখে তখন ইহুদিরা। সেই সময় কেবলমাত্র জার্মানি নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে ইহুদিরা দলে দলে প্যালেস্তাইন-এ আসতে শুরু করে। অবস্থা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় যে, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে প্যালেস্তাইনীরা সংগ্রাম শুরু করে। এই সংগ্রামকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্তাইনীয়দের ওপর কড়া দমন-পীড়ন চাপিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-৪৫) হিটলারের নাৎসি বাহিনী কয়েক লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করে। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা ইহুদিদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় বসে ব্রিটেন এবং আমেরিকা। তারা রাষ্ট্রসংঘের ওপর জোর জবরদস্তি প্রভাব খাটিয়ে প্যালেস্তাইনের বুকে ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠন করার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। যেমন করেই হোক তাদের অর্থাৎ ইহুদিদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তারা এই ভূমিকা নেয়। ভারত এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেছিল। সমগ্র ইউরোপ রাষ্ট্রসংঘের এই প্রস্তাবকে তৎক্ষণাৎ দু-হাত তুলে সমর্থন করে শুধু তাই নয়, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ব্রিটিশ সেনা বাহিনী দাঁড়িয়ে থেকে প্যালেস্তাইনীদের উৎখাত করে এবং ইহুদিদের পুনর্বাসন দিতে শুরু করে। ১৯৪৮ সালেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনী প্যালেস্তাইন ছাড়ে। সেই রাত্রেই ব্রিটেন ও আমেরিকা ইজরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

রাষ্ট্রসংঘের হিসাব মতো মোট ভূখণ্ডের ৫৫ শতাংশ ইজরায়েল ও ৪৫ শতাংশ প্যালেস্তাইন পাবে। কিন্তু ৮৮ শতাংশ জায়গা দখল করে আছে ইজরায়েল।

১৯৬৭ সালে ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ হয় কয়েকটি মুসলমান দেশের। ৬ দিন ব্যাপী চলা এই যুদ্ধে ৭ লক্ষের বেশি প্যালেস্তাইন নাগরিককে উৎখাত করে জেরুজালেম সহ বিশাল ভূখণ্ড নতুন করে দখল করে নেয় ইজরায়েল। মুসলমানদের প্রথম কিব্‌লা ও তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদ আল আক্‌সা দখল করে নেয় ইজরায়েল। গুরুত্ব ও মর্যাদার ব্যাপারে কাবা শরিফ, মসজিদে নববী'র পরই আল-আকসার স্থান। এখানে এখন মুসলমানদের কোনো অধিকার নেই, ইজরায়েল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আজও ৭ লক্ষ প্যালস্তাইন জনগণ উদ্বাস্তু হয়ে আশেপাশের দেশগুলোতে রয়েছে। তারা ফিরতে পারছে না। ভারত তার বিদেশনীতিতে কতখানি পরিবর্তন এনেছে এর থেকেই তা বোঝা যায়। প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকালে এসব নিয়ে কোনো কথাই হল না। যদিও অতীতে বরাবর আমাদের দেশ প্যালেস্তাইনীদের লড়াইকে সমর্থন করেছে।

ইজরায়েল ছাড়া কোনো দেশ এই মতে বিশ্বাস করে না যে, জেরুজালেম তাদের রাজধানী এবং এখানে তাদেরই পূর্ণ অধিকার আছে। রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন কেউই ইজরায়েল কর্তৃক পূর্ব জেরুজালেমের ওপর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। ১৯৮০ সালে তৈরি করা আইনকেও নয়। আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ২০০৪ সালে তাদের অভিমত দিতে গিয়ে জানিয়েছে যে ইজরায়েল যে প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডে প্রাচীর দিচ্ছে তা অন্যায়। প্যালেস্তাইন-এর ভূখণ্ড দখল করা হচ্ছে।

২০০৫ সালের হিসাব মতো জেরুজালেমে ৭ লক্ষ ১৯ হাজার মানুষ বাসকরেন। যার মধ্যে ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ইহুদি, যারা মূলত

পশ্চিম জেরুজালেমে বাস করেন। ২ লক্ষ ৩২ হাজার মুসলমান, যাদের বাসস্থান মূলত পূর্ব জেরুজালেমে।

২০০০-০১ সালে ক্যাম্প ডেভিড ও তাবা শীর্ষ আলোচনার সময় আমেরিকার পক্ষ তেকে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে জেরুজালেমের আরব অংশ প্যালেস্তাইনকে এবং ইহুদি-সমৃদ্ধ অংশ ইজরায়েলকে দেওয়া হবে এবং ঐতিহ্যপূর্ণ অংশগুলি উভয়ের অধীনে থাকবে। উভয়পক্ষই এটা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি।

৪.

নভেম্বর ১৯৪৭। বিশেষ ধারণার জন্য একটু পিছয়ে যাওয়ার প্রয়োজন। রাষ্ট্রসংঘের সভাতে দীর্ঘ আলোচনা হল প্যালেস্তাইন ভাগ করার। তিন খণ্ডে ভাগ হবে—একটি আরব রাষ্ট্র, একটি ইহুদি রাষ্ট্র ও জেরুজালেম শহর। পরের দিন থেকেই হিংসা ছড়িয়ে পড়ল। আরব লিগ আরবদের সমর্থন করল, মুক্তিবাহিনী তৈরি হল, পবিত্র যুদ্ধ হিসেবে এই যুদ্ধকে অভিহিত করা হল। নেতৃত্ব দিলেন আবদ্-আল-কাদির আল-হুসেনি ও হাসান সলিমো। ১৯৪৮ সালেই ইহুদি বাহিনী এই লড়াইতে জয় পেতে লাগল, প্রচুর বিদেশি সৈন্য ও সাহায্য পেল। নতুন নতুন জায়গা দখল করতে লাগল। বহু আরব প্যালেস্তাইনি শরণার্থী হয়ে গেল। রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে ভারতই একমাত্র অ-আরব দেশ যারা এমনভাবে প্যালেস্তাইন ভাগের বিরোধী হল। সেদিন ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক নেতা যিনি ইহুদিদের নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন সমর্থন করে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তিনি বিনায়ক দামোদর সাভারকার।

ইহুদিদের তিনি খুব পছন্দ করেন তার জন্য আলাদা ইহুদি রাষ্ট্র হোক—ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই সেরকম নয়। আবার এমনও নয় যে আরবদের খুব ঘৃণা করছেন। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে আরবদের বেশিরভাগ মানুষই মুসলমান। তাদেরই তিনি বিরুদ্ধে, সুতরাং একটা ইহুদি রাষ্ট্র হোক, এই মত দ্বারা তিনি চাহিত হয়েছিলেন। অনেকেই ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলেন। অনেকে ইচ্ছে করেই সেটা করেন। আরব এবং মুসলমান সমার্থক হয়ে যায়। একটু খোঁজ নিলেই জানা যাবে যে, চার্লস এইচ মালিক, এডওয়ার্ড সাঈদ, হাসান আশরাঈ—এরা সকলেই স্বনামধন্য মানুষ। প্যালেস্তাইনের পক্ষে সারা পৃথিবীতে মতামত তৈরিতে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। এরা আরব, কিন্তু খ্রিস্টান।

হিন্দুত্ববাদীদের কাছে আরব মানেই মুসলমান। এরা জানতেই চাইছে না যে, পৃথিবীতে বহু অমুসলমান মানুষ আছেন যাদের মাতৃভাষা আরবি। সাভারকার এই মতেরই পুরোধা। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট ঘটনা বলব। প্রায় সারাজীবন সরকারি কলেজে অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষের কাজ করেছেন অধ্যাপক সাবির আলি। ইতিহাস, দর্শন ও আরবি ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত মানুষ। কলকাতায় নিজের বিশাল বাড়ির ৫ তলায় এককালে হাজার হাজার পুস্তকের সঙ্গে সময় কাটাতেন। আমার সঙ্গে পরিচয় যখন হল তখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত। প্রথম দিন তাঁর বাড়ি দিয়ে দেখলাম একটি ব্ল্যাকবোর্ড। তাতে আরবি লেখা। জিজ্ঞাসা করাতে আমি জেনে আশ্চর্য হলাম যে তিনি নিয়মিত অরাবি শিক্ষার ক্লাস নেন। কারা ছাত্র? ১৫ জন। নাম শুনে আশ্চর্য হলাম। সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও বিভিন্ন দূতাবাসের মানুষ। আমাকে নিয়ে ছাত্র হল ১৬ জন। একমাত্র আমারই মুসলমান বাড়িতে জন্ম।

হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী গোলওয়ালকর একথা সগৌরবে বলেছেন যে ইহুদিরা তাদের জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা সবই রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের জাতীয়তা সম্পূর্ণ করতে, শুধু দরকার একটি স্বাভাবিক ভূখণ্ড। প্যালেস্তাইনের জমি দখল করে এই তথাকথিত 'ভূখণ্ড'-ই ইজরায়েল। ১৯২৩ সালে সাভারকার তাঁর 'হিন্দুত্ব' বইতেই লিখেছিলেন—

> যদি জায়নবাদীদের স্বপ্ন পূরণ হতো, যদি প্যালেস্তাইন ইহুদিদের একটি রাষ্ট্র হতো, তবে আমরাও আমাদের ইহুদি বন্ধুদের মতো সমান খুশি হতাম।

তাছাড়া ১৯৪৭ সালেই সাভারকার বলেন যে—

> ঐতিহাসিকভাবে এটা গুরুত্বের সঙ্গে বলা উচিত যে, মহম্মদের জন্মেরও আগে দু-হাজার বছর থেকে প্যালেস্তাইন ইহুদিদের স্বদেশ।

১৯৪৮ সালে প্যালেস্তাইন প্রতিষ্ঠার পর সাভারকার আবার বলেন—

> 'শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দুর্ভোগ, আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের পর ইহুদিরা এখন শীঘ্রই প্যালেস্তাইনে তাদের স্বদেশকে পুনরুদ্ধার করবে, যা নিঃসন্দেহে তাদের পিতৃভূমি।

১৯৬৭ সাল থেকে কার্যত পুরো প্যালেস্তাইন অধিকৃত। প্যালেস্তাইন ভূখণ্ড আছে। কিন্তু পুরোপুরি রাষ্ট্র নেই। ১৯৯৩ সালে অস্‌লো চুক্তিতে অধিকৃত এলাকার কিছু অংশে প্যালেস্তাইন অথরিটির মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের কিছুটা অধিকার মিলেছে মাত্র। সেইটুকুই রয়েছে। আজও গড়ে ওঠেনি স্বাধীন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র। ১৯৯৩ সালে অস্‌লো চুক্তি হয়। ইজরায়েল-এর পক্ষে সে প্রতিনিধি-দলের নেতা ওয়াই রবিন ও প্যালেস্তাইনের নেতৃত্ব দেন ইয়াসের আরাফত। একটা শান্তিপূর্ণ উপায় খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই মাহেন্দ্রক্ষণে ইয়াসের আরাফত ইজরায়েল-এর অবস্থান স্বীকার করে নিয়ে যে চিঠি দেন সেটাই আলোচনা ও শান্তি খোঁজার ভিত্তি হয়ে ওঠে। এই চুক্তির অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল ইজরায়েল আস্তে আস্তে প্যালেস্তাইন ভূখণ্ড থেকে সরে আসবে এবং প্যালেস্তাইনীরা ইজরায়েল থেকে মুক্ত হবে।

কিন্তু মাঝপথে অসলো চুক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় কারণ ইজরায়েল প্রেসিডেন্ট খুন হন। নতুন প্রেসিডেন্ট ইহুদ বারাক এ-ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ২০০০ সালের ক্যাম্প ডেভিড আলোচনার ব্যাপারে আমেরিকা হস্তক্ষেপ করে। শেষ পর্যন্ত ইজরায়েল রাষ্ট্রপতি কোনো লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ রবার্ট মালে বলেন যে ইজরায়েলের দিক থেকে সদিচ্ছা না থাকলে শান্তি আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। নতুন করে ক্যাম্প ডেভিডে যে আলোচনার প্রক্রিয়া চলছে তা ব্যর্থ হবে। এও বলেন যে আমেরিকা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সেই সময় ইজরায়েলকে আমেরিকার পক্ষ থেকে বলা হয় যে, হয় তারা বিকল্প প্রস্তাব দিক্, অথবা শান্তির জন্য আমেরিকা অন্য রাস্তা নেবে। এতে অনেকখানি কাজ হয়। ২০০০ সালে ক্যাম্প ডেভিড আলোচনা শুরু হয়।

বিল ক্লিন্টন সহ এই আলোচনায় থাকেন ইজরায়েল প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক ও প্যালেস্তাইন-এর প্রেসিডেন্ট ইয়াসের আরাফত। ইজরায়েল প্রস্তাব দেয় প্যালেস্তাইনের অসামরিক এলাকা ৩/৪ ভাগে ভাগ হবে, ডয়েস্ট ব্যাঙ্কের ৯২ শতাংশ পূর্ব জেরুজালেম সহ, এবং পুরো গাজা স্ট্রিপ ইজরায়েলে থাকবে। ইয়াসের আরাফত সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বিল ক্লিন্টন তাঁকে বিকল্প প্রস্তাব দেওয়ার কথা বললে তাতেও তিনি রাজি হননি। ক্যাম্প ডেভিড আলোচনাসভা বতিল হয়ে যায়। যে-সমস্ত সরকারি আধিকারিক সেই সময় আলোচনাতে উপস্থিত ছিলেন এবং নিজেদের ব্যক্তিগত ডাইরি রেখেছিলেন তাঁরা বলেন যে, ইজরাইলের অনমনীয় মনোভাব এ-ব্যাপারে অনেকটাই দায়ী। তারপরও ২০০১ সালে আবার শান্তি আলোচনাসভা হয়েছে। আরব লিগ আলাদা করে শান্তি আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছে—খুব বেশি ফলপ্রসূ হয়নি।

৫.

ভারতের সঙ্গে ইজরায়েল-এর কূটনৈতিক সম্পর্কের এটা ২৫ বছর। কিন্তু ভারতের সঙ্গে বিগত তিন বছরে সম্পর্কটি আরও মাখামাখি হয়েছে। এতদিন অনেক অবৈধ সম্পর্ক পর্দার আড়াল থেকে করা হতো। বাইরে প্রকাশ পেতো সামান্যই। মুসলমান ভাবাবেগ ও প্যালেস্তাইন-এর সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকার কারণে কিছুটা রেখে ঢেকে আসল সম্পর্কটা জিইয়ে রাখা হতো। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী একেবারে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিয়েছেন। ইজরায়েলের অস্ত্রভাণ্ডার যেন ভারতের জন্যই তৈরি। বিগত দেড় দশক প্রতি বছর ১০০ কোটি ডলারের অস্ত্র কিনে চলেছে ভারত। ১৯৯২ সালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ছিল ২০ কোটি ডলারের। ২৫ বছর পর তা বেড়ে ৪২০ কোটি ডলার হয়েছে। গত দশকেই ইজরায়েলের ভারতে রপ্তানি বেড়েছে ৬০ শতাংশ। সেই কারণে ইজরায়েল-এর অর্থমন্ত্রী এলি কোহেন বেশ আনন্দের সঙ্গে বলেছেন—ইজরায়েল-এর রপ্তানি উন্নয়নে প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য ভারত। ইজরায়েল-এর সবচাইতে সমরাস্ত্র বাজার ভারত। এপ্রিল মাসেই ২৬০ কোটি ডলারে বারাক ক্ষেপণাস্ত্র কেনার চুক্তি করেছে ভারত। কিনতে চলেছে নজরদারি ড্রোন। ইসরোর রকেটে ইজরায়েলি গুপ্তচর স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে ভারত। ইজরায়েলের নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে ভারতে এই সংক্রান্ত বিষয়ে।

১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধের সময় ইজরায়েলি গোয়েন্দা বিভাগ মোসাদ-এর সাহায্য নেন অটলবিহারী বাজপেয়ি। তারপর একের পর এক ভারতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কাঠামো পরজীবীর আকার ধারণ করেছে। বহুলাংশে ইজরায়েল-নির্ভর হয়ে পড়েছে। ২০০১ সালে পার্লামেন্টে গুলি চালানো এবং ২০০৮ সালে মুম্বই হামলার ঘটনাতেও মোসাদ-এর দ্বারস্থ হয় ভারত। এমতাবস্থায় ভারতের পুরোনো অবস্থানটা আর একবার স্মরণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। ১৯৭৪ সালে প্যালস্তিনীয় জনগণের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)-কে ভারত স্বীকৃতি দেয়। ১৯৮৮ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আরব দুনিয়ার বাইরে ভারতই প্যালেস্তাইনকে স্বীকৃতি দেয়। প্যালেস্তাইন জাতীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৯৬ সালে প্যালেস্তাইন-এর রামাল্লায় ভারত প্রতিনিধি অফিস খোলে।

রাষ্ট্র হিসেবে ইজরায়েল-এর আত্মপ্রকাশের অনেক আগে থেকে প্যালেস্তাইনী জনগণের ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াকে পূর্ণ সমর্থন জানায় জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩৬ সালে। ওই বছর ২৭ সেপ্টেম্বর ভারতে পালিত হয় 'প্যালেস্তাইন দিবস'।

১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে প্যালেস্তাইন সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের শিরোনাম ছিল 'সন্ত্রাসের রাজত্বের সঙ্গেই প্যালেস্তাইন সংক্রান্ত পার্টিশন প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ'। আরব জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়। পরের বছর দিল্লি অধিবেশনেও প্রস্তাব নেওয়া হয়—ইহুদি ও আরবরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সমস্যার সমাধান করে নেবে। ব্রিটেনের অতি অবশ্যই ওই এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। সেই সঙ্গে ইহুদিদের প্রতি আবেদন, তারা যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয় গ্রহণ না করে।

'হরিজন' পত্রিকার ১৯৩৮ সালের নভেম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয়তে গান্ধিজি উল্লেখ করেন—

> ইংল্যান্ড যেমন ইংলিশদের, ফ্রান্স যেমন ফরাসিদের, প্যালেস্তাইন সেভাবে আরবদের। সে কারণে আরবদের ওপরে অত্যাচার চাপিয়ে দেওয়াটা ভুল ও অমানবিক। প্যালেস্তাইনে যা চলছে তাকে কোনো রকমের নৈতিক আচরণবিধি দ্বারা বৈধতা দেওয়া যায় না।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিও ইজরায়েল আক্রমণের শিকার প্যালেস্তাইনী জনগণ ও আরব দেশগুলির স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে জোরালো ও ইতিবাচক অবস্থান নেন।

৬.

প্যালেস্তাইনের মধ্যেই ফাতাহ ও হামাসের দ্বন্দ্ব আছে। ২০০৪ সালে ইয়াসের আরাফতের মৃত্যুর পর মাহমুদ আব্বাস পিএলও-র চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন। নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার কাজে নিযুক্ত হন। অসলো চুক্তির পর জাতীয়তাবাদী সংগঠন হিসেবে উঠে আসে হামাস। এরা ইজরায়েলের মধ্যে বেশ কয়েকটি আত্মঘাতী

বিস্ফোরণ ঘটায়। কিন্তু সময়ের বিচারে হামাস 'মডারেট' হয়ে ওঠে এবং দুই রাষ্ট্রের সমাধানসূত্র মেনে নেয়। মূল স্রোতের রাজনীতিতে ক্রমে ফিরে আসে। মাহমুদ আব্বাসের পশ্চিমি ঘেঁষা নীতি প্যালেস্তানের জনগণ অপছন্দ করে। হামাসের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

২০০৬ জানুয়ারি মাসের নির্বাচনে ক্ষমতা যায় হামাসের হাতে। প্রচারমাধ্যম বলতে থাকে এরা ইজরায়েল-এর বিনাশ চায়। কিন্তু হামাস বারবার বলেছে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তারা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সহাবস্থান চায়। চার দশকের বেশি সময় ধরে যার বিরোধিতা করে আসছে আমেরিকা ও ইজরায়েল। এই নির্বাচিত সরকারকে স্বীকৃতি দিতেও তারা অস্বীকার করে। হামাসের সরকারকে হঠাতে সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে। ২০০৭ সালে হামাস গাজা ভূখণ্ডের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। ২০০৮-এ ইজরায়েল হামাসকে উৎখাত করতে গাজা আক্রমণ করে।

ইজরায়েল জেরুজালেম ও প্যালেস্তাইন-সহ লেবানন ও সিরিয়ার একটা অংশকে যুক্ত করে 'বৃহত্তর ইজরায়েল' গঠন করা হবে বলে প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আসলে তাদের লক্ষ্য হলো ইউফ্রেটিস থেকে নীলনদ, লোহিত সাগরের তীর থেকে তুরস্ক সীমান্ত—এই বিস্তীর্ণ আরব এলাকা, যা এক সময় অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন ছিল, তা দখলে এনে চূড়ান্ত সীমানা ঘোষণা করা। জায়নবাদী ইজরায়েলের এটাই আধিপত্যবাদ। হামাসকে ধ্বংস করার নামে ২০০৯, ২০১২ ও ২০১৪-তে ইজরায়েল হামলা করেছে।

হামাসের কিছু কাজ বিশেষ আপত্তিকর। কিন্তু ইরাক ও সিরিয়ার আইসিস-এর মতো তথাকথিত ইসলামি আন্দোলন নয়। হামাসের আন্দোলন উঠে এসেছে সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করেই। প্যালেস্তাইনী জনগণের বৈধ অধিকার রক্ষায় জায়নবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে হামাস। আবার এটাও ঠিক কয়েকটি আরব দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে, যারা প্যালেস্তিনীয়দের আন্দোলনকে দমন করতে চায়।

এসব সত্ত্বেও বলতে হবে তাদের দেশে তারা গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত। দুনিয়া তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা যারা নির্বাচন দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁরাও বলেছেন এটি ছিল গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি নির্বাচন। তাহলে হামাসকে এবং তাদের সঙ্গে যারা আছে সকলকে সন্ত্রাসবাদী বলা যায় না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই সফরে গিয়ে কার্যত সেই কথাই বলে এসেছেন।

প্যালেস্তাইনের লড়াই-এর প্রতি ভারতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সমর্থন নিঃশর্ত। কারণ তাদের লড়াই জায়নবাদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। সমস্ত ঔপনিবেশিক জনগণের মতো প্যালেস্তাইনীদের তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার অধিকার আছে। নিজেদের নেতৃত্বকে বেছে নেওয়া, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ আন্দোলনের পথ চূড়ান্ত করার স্বাধীনতা আছে। সমালোচনা করেও আমরা নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বৈদেশিক নীতির এই ঘরানাটি বুঝতেই চাননি।

৭.

আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতেই হবে যে, ইজরায়েল সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ কাফিয়ানি মুসলমানদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে দেখা করেছেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এদের অমুসলমান বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রচারমাধ্যম অত্যন্ত কৌশলে এটা এড়িয়ে গেছে। ইজরায়েলের হাইফা নগরী হল কাদিয়ানিদের ঘাঁটি। ইজরায়েল বরাবর তাদের সাহায্য, সহযোগিতা, সুযোগ-সুবিধা এবং সর্বোপরি পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে চলেছে। এরা ইসলামের অভ্যন্তরীণ শত্রু বলে চিহ্নিত। একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই কাদিয়ানি নেতাদের নিয়ে গিয়ে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন নেতানিয়াহু। নরেন্দ্র মোদি বলেন যে কাদিয়ানিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো। মুসলিম দুনিয়াতে কিন্তু কাদিয়ানিরা 'অমুসলিম সংখ্যালঘু' হিসেবে চিহ্নিত।

কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ভারতে। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার গোলাম আহম্মদ মির্জা এই মতের প্রবক্তা। তাঁর অনুসরণকারীরাই কাদিয়ানি (এলাকার নাম)। তিনিই নিজেকে শেষ পয়গম্বর বা নবী বলে ঘোষণা করেছেন। সেই কাদিয়ানিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক জাহির করে ভারতীয় ও প্যালেস্তাইনী মুসলমানদের কোন বার্তা প্রধানমন্ত্রী দিতে চেয়েছেন সেটা খুবই সহজে অনুমান করা যায়।

৮.

সবশেষে মতাদর্শগত দিকটির প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের সঙ্গে উগ্র জায়নবাদী মতাদর্শের নৈকট্য অত্যন্ত গভীর। যা চোখ এড়িয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার নয়। গোলওয়ালকর যেমন হিটলারের অনুগামী ছিলেন তেমনই জায়নবাদী মতাদর্শকেও সম্ভ্রম করতেন। অভিন্ন সূত্রটি হল মুসলমান-বিদ্বেষ। ভারতে 'হিন্দু রাষ্ট্র' কায়েম করে মুসলমানদের যেমন করে বা যেভাবে দেখতে চাইতেন, ঠিক সেভাবেই আরব ও প্যালেস্তাইনীদের দেখে থাকে ইজরায়েল। এই মতাদর্শকে ভারতের সরকারি নীতি নির্ধারণের জগতে নিয়ে আসা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তো বটেই, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তা গভীরভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

প্যালেস্তাইনের জনগণের অধিকারের সপক্ষে ভারতে সবচেয়ে সোচ্চার বামপন্থীরা। বরাবর প্যালেস্তাইনের প্রতি সংহতি আন্দোলনের সামনের সারিতে থেকেছেন বামপন্থীরা।

ইজরায়েল-এর সঙ্গে মোদি সরকারের জোট প্রকৃতপক্ষে তাদের সাম্রাজ্যবাদী, হিন্দুত্ববাদী বিদেশনীতির প্রতিফলন। আমরা আবার দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করি যে সামরিক, স্ট্র্যাটেজিক, অর্থনৈতিক প্রশ্নে ভারতকে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে। ইজরায়েলের সঙ্গে সমস্ত রকমের নিরাপত্তা ও সামরিক সহযোগিতার নীতি বাতিল করতে হবে। তার কারণ ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজাতে এই অর্থ নিয়েই বোমা ফেলছে ইজরায়েল। দেশকে দাঁড়াতে হবে প্যালেস্তাইন-এর পক্ষে।

তথ্যসূত্র

১. শান্তনু দে-র 'গণশক্তি'তে প্রকাশিত (১৩-০৭-২০১৭) প্রবন্ধ
২. মুদস্‌সির নিয়াজ-এর 'কলম' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৪-০৭-২০১৭) প্রবন্ধ
৩. 'পিপলস্ ডেমোক্রেসি'-র সম্পাদকীয়
৪. 'দেশহিতৈষী'র প্রবন্ধ
৫. অবরোধ প্রতিরোধে প্যালেস্তাইন, এনবিএ প্রকাশনা
৬. বিভিন্ন ওয়েবপেজ
৭. গোলওয়ালকর, 'উই, অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড'—গোলওয়ালকর
৮. সীতারাম ইয়েচুরি, 'হিন্দু রাষ্ট্র কী?'

With best compliments of

M/S TIWARI CONSTRUCTION

Fabricators, Erectors, Mechanical Engineers, Civil Contractors

Specialist in :
Stainless Steel & Pipeline Job, Dealing with Earth Moving Machine,
JCB & Hydraulic Crane Etc.

ESBY Industrial Estate
Sanjib Sarani, Durgapur-713201, Dist. Paschim Bardhaman, E-mail : vinodtiwarig@gmail.com
Phone : 0343-2554757 (R), G.T. : 9002390791
V.T. : 9333950979, R.T. : 9333907643 / 9932697055

WORKS SITE
(1) Graphite India Ltd., (2) Ganga Rasayanie (P) Ltd. (3) Jai Balaji Group, (4) Ultratech

Sl. No. 139

রাজ্যের বাম জোটের ক্রমক্ষয়িষ্ণুতা ও তার পুনর্নির্মাণ : একটি মার্কসীয় বীক্ষণ

তাপস ব্যানার্জি

দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক একটানা একটা বামপন্থী জোট সরকার বিপুল জনাদেশের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে শাসনক্ষমতা বজায় রেখেছিল। হঠাৎ কী এমন ঘটল যে সেই বামশক্তি শুধুমাত্র তার সমর্থনকেই হারাল তা নয়, জনাদেশ এমন স্তরে নামল যে সে রাজ্য বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদাটুকু পর্যন্ত ধরে রাখতে পারল না? এই প্রশ্নকে ঘিরেই পর্যালোচনার প্রয়োজন। গত ৩৪ বছরে এই বাম-গণতান্ত্রিক জোটশক্তি মানুষকে কী দিয়েছে, পেয়েছেই বা কী? আজকে সে শক্তির এই পরিণতি কেন? ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সংশোধন করে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার রাস্তাটাই বা কী? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে ২০১১ সালের আগের ৩৪ বছর ও ২০১১ পরের ৬ বছরে রাজ্য-রাজনীতির একটা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা দরকার।

স্বাধীনতার পর এ-রাজ্যে অনেকবার সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু বাম গণতান্ত্রিক জোট সরকারের মতো এতটা স্থায়িত্ব ও সাফল্য কোনো সরকারই এ-রাজ্যের জনগণকে উপহার দিতে পারেনি। সুষ্ঠু প্রশাসন থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, উন্নয়ন, গণবন্টন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য আশানুরূপ সাফল্য আসেনি। সাধারণ মানুষকে সুখে-শান্তিতে জীবনযাপনের স্বাদ প্রথম এই সরকারই দিয়েছে। সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে রাজ্যের প্রতিটি সাধারণ মানুষ তাদের আত্মমর্যাদাকে ফিরে পেয়েছে এই সরকারের আনুকূল্যে। হতদরিদ্র খেতমজুরটিকে এখন আর তার জোতদারকে ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে ভাবতে বাধ্য হতে হয় না। তারই মতো রক্তমাংস দিয়ে গড়া একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে ভাবে। বাড়ির মহিলাটি এখন আর সাংসারিক ভারবাহী অবলা জীব নয় বা পুরুষের মনোরঞ্জনের বিষয় নয়। তাদেরকে এখন এক একটি প্রতিবাদী মুখ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে শিখিয়েছে এই সরকার। সাফল্যের ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কিন্তু গত ছয় বছরে আমাদের রাজ্যের কী অবস্থা হয়েছে সেটারও একটা পর্যালোচনা দরকার। বর্ণপরিচয়ের রামের মতো সুবোধ বালক হয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই নিজেকে গোপালের মতো কপট বালকে পরিণত করতে বেশি সময় নিল না। তাই তো নির্বাচনোত্তর পর্বেই আমরা শাসকদলের সৌজন্যে পেলাম খুন, জখম, শিক্ষক প্রহার, বিধায়ক নিগ্রহ থেকে শুরু করে পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি কাণ্ড। আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর একই অঙ্গে যে এত রূপ তা আগে বোঝা যায়নি, ক্ষমতায় বসতে বোঝা গেল। কখনো তিনি মধ্যরাতে থানায় গিয়ে পুলিশকে শাসন করে মদ্যপ যুবকদের মুকুব করে দিচ্ছেন, কখনো আবার আমলা সান্ত্রী জুটিয়ে সরকারি মঞ্চ থেকে মাইক হাতে নেচে নেচে অবাধে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বিলি করছেন। আবার ওই একই মানুষ কানের দুপাশ দিয়ে ঘোমটা টেনে মুসলমান রমণীর বেশে ইফতার পার্টিতে বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের সামনে নিজেকে তাদেরই লোক প্রমাণ করতে চাইছেন। ভোট বড়ো বালাই। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারটাই তাঁকে করে তুলেছে বহুরূপী। এগুলি সব হল একাঙ্ক নাটক। দুটি ফুলস্কোপ ছায়াচিত্র পরিস্ফুটনের জন্য স্টুডিওতে অপেক্ষা করছে—একটি নারদা ও অপরটি সারদা-রোজভ্যালি, যাদের উন্মুক্ত উপত্যকায় দুর্নীতির অজস্র কালো গোলাপ ফুটে রয়েছে। মালী, ফুলদানি প্রস্তুত, চয়ন শুধু সময়ের অপেক্ষায়। রাজ্যের দাপুটে মন্ত্রী ও সাংসদ থেকে শুরু করে লোকসভার দলনেতা পর্যন্ত এখন শ্রীঘর আলো করে বসে আছেন। এসব ঘটনা সবই আমাদের জানা। সংবাদপত্রের পাতা, টিভির পর্দা খুললেই এই খবর। তবুও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে আগের থেকে বেশি জনাদেশ নিয়ে আমাদের রাজ্যের বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। মেকানিজম বা কারিগরিটা ঠিক ধরা গেল না। কেন গেল না সেই প্রসঙ্গেরই অবতারণা এরপর।

১৯৭৮ সালের বাম গণতান্ত্রিক জোট সরকারের শুরুটা ভালোই হয়েছিল। সাধারণ মানুষের মননে একটা জায়গা করে নিতে কোনো অসুবিধা হয়নি। নব্বুইয়ের দশকের শুরু অবধি এই ধারাটা বজায় ছিল। কিন্তু তার পরেই শুরু হল একটা ক্ষয়ের ধারা। রাশিয়া সহ পূর্ব-ইউরোপের পতন এই ধারায় কিছুটা ঘৃতাহুতি দিল। বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিকে একটা চরম তাত্ত্বিক সমালোচনার মুখোমুখি হতে হল। এই সমালোচনাকে প্রতিহত করার জন্য আর মার্কসীয় তত্ত্বের জটিল ব্যাখ্যায় না গিয়ে নির্বাচনী সাফল্যকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হল। আর সেটাই হল শেষের শুরু। যেখানে উচিত ছিল মার্কসবাদকে সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক বোধের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা, সেটা না করে 'উন্নততর বামফ্রন্ট' সরকারের মাধ্যমেই মার্কসবাদের উত্তরণ ঘটানোর চেষ্টা হল। সরকারি ক্ষমতার ছত্রছায়ায় থেকে জনগণের মধ্যে 'ওরা-আমরা' বিভাজনের মাধ্যমে দ্বন্দ্বকে প্রতিষ্ঠিত করে আসল মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বকে মতাদর্শ থেকে, অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও, সরিয়ে রাখা হল। সত্যিকারের তাত্ত্বিক উত্তরণের যে একটা রূপ রয়েছে, যেটার মূল প্রতিফলন ঘটে জনগণের সাংস্কৃতিক উত্তরণের মাধ্যমে, সেটাকে নজরে আনা হল না। দ্বন্দ্ব ছাড়া যে উত্তরণ ঘটে না সেটা ভুলে যাওয়া হল। অথচ দ্বন্দ্ব তার নিজের গতিতে ঘটেই চলেছে, সে তো গতিশীল বিষয়, তাকে থামিয়ে রাখা সাধ্যাতীত, তার ফলটাকে ব্যবহার করা যায় মাত্র। যে ফল পাওয়া পাওয়া গেছে, সেটাকে অজান্তেই ঢেলে দেওয়া হয়েছে

সরকার পরিচালনার কাজে, সাধারণ মানুষের চেতনায় নয়। যেহেতু দ্বান্দ্বিক শক্তিগুলোকে ঠিকমতো চিহ্নিত করা যায়নি, সেহেতু দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত শিল্পোৎপাদনের উপজাতের মতো প্রতিক্রিয়াজাত শক্তিগুলোকেও ধরা যায়নি। উচিত ছিল সেই শক্তিগুলিকে চিহ্নিত করে সংশোধনের মাধ্যমে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা, পরবর্তীকালে উত্তরণের ধারায় সামিল করা। তার জন্য দরকার ছিল উত্তরণের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দিকে ফিরে তাকানো, উদ্ভূত শক্তিগুলির ওপর নজর রাখা। কিন্তু তা করা হয়নি। একের পর এক নির্বাচনী সাফল্যেই উত্তরণের প্রতিফলন দেখা হয়েছে, এটা একটা ভ্রান্ত পর্যবেক্ষণ। আজকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো যে দক্ষিণপন্থী দলগুলির আবির্ভাব ও বৃদ্ধি ঘটেছে তার বেশিরভাগটাই কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াজাত শক্তি থেকেই এসেছে। তাইতো দেখা যাচ্ছে রাজ্যের নির্বাচনগুলিতে বামপন্থীদের ভোটের অংশ ক্রমহ্রাসমান, কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের ভোটের শতাংশ বাড়ছে। তবে কি বামফ্রন্টের সংসদীয় রাজনীতি থেকে সরে আসা উচিত ছিল? কখনোই উচিত নয়। গণতন্ত্রে জনগণ থাকবে, নির্বাচন থাকবে, বিরোধিতা থাকবে এবং একটা সত্যিকারের বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির উচিত সেগুলিকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে একটা স্থায়ী ও সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা যা পরবর্তীকালে একটা সার্বিক সমাজ বিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে পারবে।

আবার এই প্রতিক্রিয়াজাত শক্তিকে মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা থেকে বামফ্রন্ট বিরতই থাকছে না, তারা যাতে আরও দূরে সরে যায় সেই প্রক্রিয়াই চলছে। তাইতো সকালবেলার কাজটাতে মানুষ প্রথমেই দেখার চেষ্টা করছে সারদা-নারদা কেলেঙ্কারিতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা কতজনকে চার্জশিট দিল বা সর্বোচ্চ আদালত বেনিয়মের জন্য কতজনকে দোষী সাব্যস্ত করল। আর যদি দেখা যায় কোনো দলত্যাগী বামপন্থী নেতা বা নেত্রী এর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন তাহলে তো আর আনন্দের সীমা থাকে না। এই মানুষগুলির বয়স কিন্তু ১০ বছর নয়, ২০১১ সালের আগের ৩৪ বছরেও এঁরা ছিলেন না। এঁরাই বামফ্রন্টকে ভোট দিয়ে সরকারে এনেছিলেন। তাহলে গত ৩৪ বছর ধরে বামেরা কী করেছে? কী সাংস্কৃতিক মান এদের দেওয়া হয়েছে? আত্মসমালোচনার এই ক্ষেত্রটা বোধহয় এখন তৈরি হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ হঠাৎ করে তৈরি হয় না। আজকের যে দুর্নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এটা দীর্ঘদিনের সযত্নলালিত বিকৃত মানসিকতার ফলাফল। এই প্রসঙ্গে আবার সেই মার্কসবাদের দুটি ধারণার কথা মনে আসছে—আধার (Form) এবং আধেয় (Content)। বিগত দিনের বাম-গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনকালকে আমরা যদি Form বা আধার বলি তাহলে আজকের দুর্নীতির মানসিকতাটাকে আমরা বলতে পারি তার Content বা আধেয়। তাহলেই প্রমাণ হল বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গর্ভেই দুর্নীতির জন্ম হয়েছে।

বর্তমান সংকটে বাম-গণতান্ত্রিক জোটের পুনর্নির্মাণের একমাত্র পথ হল মার্কসীয় দর্শনের ব্যাপকতর চর্চা ও তার প্রয়োগ। নব্বুইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে রাজ্যে মার্কসবাদী পাঠচক্রগুলিতে আর পঠনপাঠন, আলোচনা হয় না। সেগুলি এখন পার্টিকর্মীদের সান্ধ্য মজলিসে পরিণত হয়েছে। স্টার আনন্দ, ২৪ ঘন্টা প্রভৃতি বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমে পরিবেশিত আপাত প্রতিষ্ঠান-বিরোধী সংবাদের চুলচেরা বিশ্লেষণ এই পাঠচক্রগুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। নিয়মিত পার্টি ক্লাসের রেওয়াজও বন্ধ হয়ে গেছে অনেকদিন। তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এলাকাভিত্তিক কালীপূজা, অন্নকূট, দৌড়, রক্তদান শিবির ইত্যাদির মতো কিছু কর্মসূচি—পার্টির পরিভাষায় যা 'জনপ্রিয় কর্মসূচি'—মানুষের কাছে আসার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। অর্থাৎ মার্কসবাদী শিক্ষার এই জায়গাটা দখল করে নিল এলাকার এই 'জনপ্রিয় কর্মসূচি'। আসলে এই জনপ্রিয় কর্মসূচি ভোট-রাজনীতিতে সাফল্য অর্জনের একটা শর্টকাট টোটকা, যার ফলাফলটা স্বল্পকালীন আর অনিশ্চিত। তাই দীর্ঘকালীন সুস্থায়ী ফল পেতে হলে প্রাথমিকভাবে এসব ছেড়ে মার্কসবাদী শিক্ষার ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখতে হবে। মার্কসবাদী শিক্ষা থেকেই ঠিক করতে হবে কোনটা জনপ্রিয় কর্মসূচি আর কোনটা আবশ্যিক কর্মসূচি। মার্কসবাদের বিকল্প এখনও পর্যন্ত যে কিছু নেই সেই সার সত্যটি সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে, নিজেদের বুঝতে হবে। দ্বান্দ্বিকতা বিষয়ক আলোচনাকে উৎসাহিত করতে হবে। প্রতিটি শক্তির—সে শুভ শক্তিই হোক আর অশুভ শক্তিই হোক—গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা দরকার। অশুভ শক্তি বলে তাকে দাবিয়ে রেখে, দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে না দিয়ে, বিকাশ আপনা থেকেই হবে কোনো দ্বন্দ্ব ছাড়াই—এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এর ফলে কিছুটা অশুভশক্তি শুভশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে, কিছুটা সমূলে বিনাশ হবে, পণ্যোৎপাদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত উপজাতের মতো। সবশেষে একটা কথাই বলার যে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উত্তরণ ঘটাতে হলে কাজ করতে হবে মানুষের সঙ্গে, মানুষের জন্য নয় (Work with the people, not for the people)।

With best compliments of

AMBIKA HIMGHAR PVT. LTD

Jewdhara, Kalna, Purba Bardhaman, Phone : 9083265175

Sl. No. 130

বিক্ষোভে, বিস্ফোরণে কাঁপছে পাহাড়

সলিল আচার্য

মানুষকে ভাগ করো। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের রাজনীতিই হল বিভাজনের রাজনীতি। বিচ্ছিন্নতা বাড়ানোর রাজনীতি। সৌজন্যে কর্পোরেট হাউস এবং দেশের ক্ষেত্রে আর এ এস পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত সংঘ পরিবার। তাছাড়া আর এস এস-এর সাথে সহমর্মী আরও কিছু অনামি, বেনামি সংগঠন। পরিস্থিতি ভীতিপ্রদ। ধর্মীয় বিভেদ, জাতপাত, নানান ধরনের সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে 'মালিক পক্ষ' এবং 'শাসক শ্রেণি' গরিব মানুষের ঐক্য ভাঙতে চায়—অবিরত, নানান কৌশলে। শুভবোধ লালন করা মানুষেরা এমন সব বিপদের প্রতিবাদে, প্রতিরোধে সক্রিয়; তাতে প্রত্যক্ষ অবস্থান যেমন বিদ্যমান, আবার পরোক্ষ ভূমিকায় থাকার বিষয়টিও রয়েছে। একদিকে, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি, উদারবাদের বিস্ফোরণ, অন্য দিকে ওসবের প্রভাবে সমাজে ভেদাভেদ বৃদ্ধি নজর কাড়ছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক—সবক্ষেত্রে বিপন্নতার তীব্রতা বাড়ছে। প্রতিবাদী মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। তবুও দেশময় প্রতিবাদীর সংখ্যা বাড়ছে। প্রতিরোধের বাদ্যিও শোনা যায় না, তা নয়।

এমনই এক পরিস্থিতিতে রুজির সমস্যা, রুটির সমস্যা, রুচির সমস্যায় মানুষের কাতরতা বাড়ছে। রাষ্ট্রযন্ত্র ঝাঁপিয়ে নামছে, দাঁত-নখ বেরিয়ে পড়ছে। আবার নিজেদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ অবিমৃষ্যকারিতায় দুর্বল হচ্ছে ঐক্যের বন্ধন। ক্ষুণ্ণ হচ্ছে ঐতিহ্যের উষ্ণতা। ক্ষয় হচ্ছে পরম্পরার মাধুর্য। প্রতিবাদ-প্রতিরোধও আছে।

পাহাড় জ্বলছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রের সরকারের টালবাহানায় অবনতি হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতির। পাশ কাটাবার প্রয়াস নিয়েছে কেন্দ্র এবং রাজ্য—উভয় সরকারই। অচলাবস্থার অবসান ঘটছে না সরকারগুলোর আচ্ছন্নতায়। ঝিমুনি না কাটলে অর্থাৎ সদিচ্ছা না জাগলে পরিস্থিতির আরও অবনতি যে ঘটবে, সে উপলব্ধি তৈরি হয়নি। পরিস্থিতি যে একটু একটু করে সরকারের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে সেটা অবশ্যই ভাববার বিষয়, সরকারের। 'সরকার ভারতে লেগেছে' তেমনটা আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কোনোভাবেই বুঝতে পারছে না। জটিলতা বাড়ছে সময়ের সাথে সাথে। দমননীতি নিয়ে, প্রশাসনকে ন্যক্কারজনক ভাবে ব্যবহারের মধ্যবর্তিতা, দখলদারির মনোভাব নিয়ে চলতে গেলে সমস্যা আরও গভীর থেকে গভীরতর হতে বাধ্য। সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহল বলছে, যে-কোনো ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ হবার পর দুম্ করে চুক্তিভঙ্গ করলে সমস্যা বাড়তে পারে। সেটাই স্বাভাবিক। হয়েছেও তাই। চুক্তিপত্র এখন ছেঁড়া কাগজের টুকরো বা ঘটা করে জমায়েত করে চুক্তিপত্রে অগ্নিসংযোগ করা অপরিমেয় দেশপ্রেমের বিষয় হয়ে উঠেছে। দ্রুত নিষ্পত্তি প্রয়োজন। জরুরি কাজ এখন পাহাড়কে শান্ত করা।

মধ্যরাতে ফের কেঁপে উঠলো পাহাড়। দার্জিলিং কাঁপছে। কাঁপছে কালিম্পং। বিকট শব্দে অস্থির হয়ে উঠছে। আন্দোলনকারীরা বিস্ফোরণের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করছে। লাগাতার ধর্মঘট। জনজীবন একেবারে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। খাবার, পানীয়, ঔষধ, শিশুখাদ্য ইত্যাদি সবেতেই টান পড়তে শুরু করেছে। পাহাড়-সমতলের মানুষের সম্পর্কেও টানাপোড়েনের গল্প বাজার ছেয়ে ফেলছে। আশঙ্কা। আতঙ্ক। ভয়-ভীতি। শিহরণ। কাঁপন। প্রশ্ন উঠছে, যে প্রশ্ন এক পাহাড়ের দেওয়াল থেকে হাজারো পাহাড়ি দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলছে। পাহাড় জ্বলছে। বাইরে থেকে ভাড়াটিয়া শক্তি আশুভ শক্তিতে পরিণতি লাভ করে পরিবেশ বিষিয়ে দিচ্ছে। দায় কার?—দায় মুখ্যমন্ত্রীর। দায় প্রধানমন্ত্রীর। দায় দুটো সরকারেরই। দায়...? তাই হিংসা, নৈরাজ্য, অশান্তি নয়। চাই শান্তির পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। রাজ্য সরকার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ব্যবস্থা করবে না কেন? সংবিধানকেও ঔদ্ধত্যের বশবর্তী হয়ে অমান্য করার অপচেষ্টা চলতেই থাকবে? আন্দোলন হতেই পারে। তবে সেটা অবশ্যই গণতান্ত্রিক প্রথাপদ্ধতি মেনে নিয়ে। তাতে আপত্তির কিছু নেই। ঠিক এর বিপরীতে রাজ্য সরকারের শাসক-দল এবং সরকার যদি গোঁয়ার্তুমি চালিয়ে যেতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং অতি আধিপত্যকামিতার দ্বারা মানুষকে দূরে ঠেলতে থাকে, তার ফলাফল কেমন হতে পারে, স্বাভাবিকভবেই, তার বড়ো উদাহরণ আজকের দার্জিলিং। উদাহরণ আজকের পাহাড়। সরকারগুলোর উদাসীনতার অভিযোগ উঠেছে জনমানস থেকে। নির্বিকার থাকার প্রয়াস মানুষ কিন্তু গ্রহণযোগ্য বলে মানতে চাইছে, এমনটা নয়। পাহাড়-সমতলের ঐক্য ভাঙার এই খেলাও মানতে নারাজ।

মানুষই বলতে লেগেছে—মানুষে-মানুষে লড়িয়ে দেওয়া আর নয়, আর নয়। বন্ধ হোক এই 'মারণ-খেলা'। বন্ধ হোক মৃত্যুর হাতছানি। পাহাড়ের এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের মানুষের ভেতর যুদ্ধ বাধানোর প্রক্রিয়া মানুষ চাইছেন না। প্রতিবাদ হচ্ছে। প্রতিবাদ আরও জোরদার হওয়াই সঙ্গত। এক একটি পাহাড়ি জাতি-উপজাতিকে খুঁজে-খুঁজে উন্নয়ন বোর্ডের নামে 'বেরিতা'

সৃষ্টির জঘন্য কাজ, ঐক্য-সংহতির ক্ষেত্রে, বন্ধুত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিপদকে গভীর করেছে। এই আ-কাজের মাধ্যমে যে অবিমৃষ্যকারী ছোবল পাহাড়ি আমজনতা পেয়েছেন, তা কোনো সুস্থ ভাবনার দ্যোতক কখনোই হতে পারে না। ক্ষতি, ক্ষতি, প্রবল ক্ষতিই হয়েছে। কিছু কিছু নষ্টামির প্রক্রিয়াকে হাওয়া দেওয়া হয়েছে। আজ ওসব নিয়ে কোনো কথা শুরু করতে গেলে, প্রথমেই বলতে হয়, আগে প্রয়োজন শান্তি। আগে প্রয়োজন শান্ত পরিবেশ। পাহাড়ে। লাগোয়া পাহাড়ে। সমতলে। সবখানেই।

যা ঘটলো সাম্প্রতিক সময়ে, তা ছিল অভাবনীয়। রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রিবর্গ তর্জন-গর্জন শুরু করে দিলেন। মিডিয়ার মধ্যবর্তিতায় মানুষ সবটা বুঝল। গর্জনের মর্মবস্তু হল পাহাড়ে কোনো কিছুই সমতল থেকে সরবরাহ করা যাবে না। পাহাড়মুখি খাদ্যপণ্যের গাড়ি, ঔষধের গাড়ি শাসকদল দ্বিধাহীনভাবে, পুলিশি সহায়তায় নির্বিঘ্নে লুঠতরাজে মেতে উঠল। অমানবিকতায় বাতাস ভারি হল। এই কুনাট্য নিবন্ধ লেখার সময়েও প্রবল স্রোত হয়ে বয়ে যাচ্ছে। সর্বাধিনায়ক ও সর্বাধিনায়িকারা কোন্ মায়া বলে যে শীতঘুমে আচ্ছন্ন, বোঝা যাচ্ছে না।

ওপর মহল থেকেই একটা ছোট্ট অংশ (আমলা ও নেতৃত্ব) বলছেন ভীষণ সন্তর্পণে, সমতলের কায়দায় পাহাড়ে জবরদখলের ঘৃণ্য রাজনীতিটা না করলে, পাহাড় এই মুহূর্তে জ্বলে উঠত না! অপরাধী খুঁজে পেতে অসুবিধে হচ্ছে না!

বাংলার শুভবোধসম্পন্ন যে-কোনো রাজনীতির মানুষই সম্ভবত সহমতেই আছেন যে দার্জিলিং-এর পার্বত্য এলাকার মানুষের বিশেষ কতগুলি আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও পরিকাঠামোগত বিশেষ সমস্যা রয়েছে—যেগুলোর সমাধান হওয়া ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিশ্রুতি যাঁরা দিয়েছেন বিশেষ বিশেষ সময়ে, বিশেষ বিশেষ ধরনের, কাজ ফুরিয়ে যাবার পর, সেসব নিয়ে আর সময় নষ্ট করতে চাননি তাঁরা। ফলে, যন্ত্রণার পাথর আয়তনে বেড়েছে। দৈর্ঘ্যে-বহরে বেড়েছে। সন্দেহপ্রবণতা বিপদ তৈরি করেছে। বেড়েছে বৈরিতা। বাংলার অঙ্গচ্ছেদের আয়োজনে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন তেনারা। এবং তা সুপরিকল্পিতভাবেই। চালচলনে, বার্তা, বিবৃতি, ভাষণে তা আর চেপে রাখা যাচ্ছে না। সুস্পষ্ট ভাবে মনের কথাটি, মুখের কথার ঠিক উল্টোটি, মানুষ প্রত্যক্ষ করছে। রাজ্য সরকার কেন বড়ো গলা করে বলবে না—রাজ্যের বাইরে গিয়ে নয়, রাজ্যের ভেতরে থেকেই সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিল বলে, সর্বোচ্চ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পাহাড়ের জন্য কার্যকর করতে হবে, যার সাহায্যে মানুষ খেয়েপরে বেঁচেবর্তে থাকতে পারবেন সম্মানের সঙ্গে। 'শান্তিনিকেতন' হয়ে উঠতে পারবে 'আজকের আগ্নেয়গিরি'। সেই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন হয়ে উঠবে উচ্চ ক্ষমতাশালী। যতদূর জেনেছি, বামপন্থী মানুষজন এইরকম একটা ব্যবস্থার কথা বলছেন। দাবি তুলেছেন। অন্যান্য বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তিও তেমনটাই আপাতত রোগের 'দাওয়াই' বলে মনে করছেন। দায়িত্ব নিতেই হবে, দ্রুত, রাজ্য সরকারকে। দায়িত্ব নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেও। তা না হলে মৃত্যুর এক বিভীষিকার নাম হবে দার্জিলিং। সৌন্দর্যের রানির চোখে ক্ষোভের ক্ষত—সমতলের মানুষও আর প্রত্যক্ষ করতে চায় না। চায় রক্তপাত বন্ধ হোক, স্থায়ীভাবেই। মানুষের বেঁচে থাকার মতো বাস্তব পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনা হোক বুদ্ধিমত্তার সাথে।

আলাদা রাজ্য তো পথ নয়। মিলেমিশে থেকে থেকেই বিকাশ হোক, সুপরকিল্পনা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে। এতে তো কোনো অপরাধ নেই। তবে হবে না কেন? হচ্ছে না। আর সেই কারণেই যত ঝঞ্ঝাট। যত কলরোল। কত রক্ত। কত মৃত্যু। কত জাতীয় সম্পদ ধ্বংস। আসামীর কাঠগড়ায় এখন রাজ্যের তথাকথিত পরিবর্তনের সরকার।

১৯৮৮ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপাক্ষিক আলোচনা, চুক্তি ও আইন তৈরি করার মধ্য দিয়ে গঠন করেছিল দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (DGHC)। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন শুরু হয়েছিল। কুড়ি বছর চলার পথে কিছু কিছু সময়ে, কিছু কিছু বিষয়ে সামান্য সমস্যা তৈরি হলেও, আলোচনার মাধ্যমে তার নিরসন হয়েছে। হ্যাঁ, সংশ্লিষ্ট সকলেরই জানা আছে যে, ২০০৫ সালে রাজ্য সরকার এই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে আরও ক্ষমতাশালী করে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছিল। বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি কেন, সে কথা একটু চর্চা করা দরকার। ফের নতুন করে পাহাড় অস্থির হয়ে ওঠে, মানে তাকে অস্থির করে তোলা হয়। পেছনে থাকে আজকের রাজ্যের শাসকদল। পরিবর্তনের সরকারকে তৈরির জন্য অশান্ত পাহাড় তখন 'তেনার' দাবার ঘুঁটি। অন্যদিকে ঘোলা

জলে মাছ ধরার জন্য আজকের কেন্দ্রে আসীন দলটি। ২০১১ সালে ঘোমটা বা মুখোশটা আর থাকলো না। বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচনী জোটবদ্ধ তখন বিমল গুরুংরা ঘাসফুলের সান্নিধ্যে। তৈরি হয়েছিল নির্বাচনী আঁতাত। এখন অন্য কথা বললে হবে? এখন ক্ষমতার অলিন্দে বসে রাষ্ট্রশক্তিকে কাজে লাগিয়ে গুলি করে মানুষ মারলেই হবে? বোঝাপড়া মোতাবেকই 'গোর্খাল্যান্ড' দলটিকে আজকের রাজ্য সরকার মেনে নিয়ে, চুক্তি করে। লিখিতভাবেই পৃথক রাজ্যের দাবির স্বীকৃতির কথা সবাইকে জানিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। (...keeping on record the demand of the DJM for a separate state of Gorkhaland...) সময়টা ২০১১। কী দাঁড়ালো? ২০১১-র চুক্তিপত্রেই মান্যতা দেওয়া থাকল পাতলেবাস থেকে ভিন্ন রাজ্য স্থাপনার জন্য...! সুতরাং আজ গলার রগ ফুলিয়ে গলাবাজি করে—'বাংলাকে ভাগ করতে দেবো না' যথার্থই যে দ্বিচারিতা সে-কথা ঠারেঠোরে রাজ্য শাসক দলের নেতারাই ইতিউতি বলতে লেগেছেন।

প্রসঙ্গত, একটু দেখে নেওয়া যাক, ১৯৮৮ সালে বাম সরকার চুক্তিতে কী বলেছিল। আদৌ কি তখন ২০১১-র মতো পাহাড় নিয়ে আলাদা রাজ্য তৈরির পরোক্ষ প্রতিশ্রুতি চুক্তিতে ছিল? '১৯৮৮ সালের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে তৎকালীন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শর্ত ছিল পৃথক রাজ্যের দাবির প্রত্যাহার, চুক্তিতে তাই উল্লিখিত ছিল...GNLF agrees to drop the demand for a separate State of Gorkhaland। দুটো সরকার, দুটো চুক্তিপত্র, মূল নীতিগত ফারাক পাঠকবর্গ নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছেন—দুটো সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। ভাঙনের বিপক্ষে এবং ভাঙনের পক্ষের শক্তিকে মানুষ প্রকাশ্যে দেখতে পাচ্ছেন। যাঁর অনুপ্রেরণায় রাজ্যে আজকে সব কাণ্ডকারখানা সুসম্পন্ন হয়ে চলেছে, তাঁকে উদ্দেশ্য করে কথা দিয়েছিলেন জনৈক পাহাড়ি নেতা (যারা আজ আন্দোলনে মত্ত)—''আপনি যতদিন মুখ্যমুন্ত্রী থাকবেন, ততদিন আমরা গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুলে, আন্দোলন করে, আপনাকে বিব্রত করব না।'' সেই নেতারা প্রতিদানে প্রতিদিন কী উপলব্ধি করছেন?

আজ যারা উত্তাল করে তুলেছে পাহাড়কে, আন্দোলনের নামে কঠিন পরিস্থিতি রচনায় ব্যস্ত তাদের নেতাদের নির্বাচনী সাহায্যে জঙ্গলমহল ব্যবহারের কথা মানুষ কিন্তু ভুলে যায়নি। মানুষের স্মৃতিশক্তি এতটাই দুর্বল তা মনে করা উচিত হবে না। ফলে তৃণমূল নেত্রী আগুন জ্বালানোর কাজ যেভাবে করেছেন, সেই আগুন নেভাতে হবে তঁকেই। বল এখন তাঁর কোর্টে। কেন্দ্রের সরকারের সাথে তাঁর কি বোঝাপড়া আছে জানি না, তবে এটা জানি তিনি স্বস্তিতে নেই। দায় এখন সামলাতে হবে তাঁকেই। পাহাড়ের আগুন ডুয়ার্সে নেমে আসছে—এটা এক্ষুনি না নেভালে সমস্যা আরও গভীরতর হয়ে যাবে, সময়ের টানেই। আর এস এস ঘোলা জলে জাল মারছে। তারপর...।

রাজ্য বামফ্রন্টের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। বক্তব্যে জানা গেছে : 'পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড গঠন বা রাজ্যকে ভেঙে ভেঙে ছোটো করে রাজ্য গঠনের বিরোধী। রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যই আশির দশকে হিংস্র গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের বিরোধিতা করে কেবলমাত্র সিপিআই(এম)-এর আড়াইশোর বেশি কর্মী ও নেতা শহিদ হয়েছিলেন। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে তবুও কিন্তু নীতির প্রশ্নে আপস করেনি সিপিআই(এম) ও বামপন্থীরা। আবার একই সঙ্গে দৃঢ়ভাবে চেয়েছে গোর্খা জাতিসত্তার বিকাশ ও ছোটো ছোটো পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি সহ আর্থ-সামাজিক বিকাশ। জাতিসত্তার বিকাশের অর্থ পৃথকীকরণ বা আলাদা রাজ্য গঠন নয়। রাজ্যের মধ্যেই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনই সঠিক পথ। এই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাকে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া, যা অতীতে বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছিল। কিন্তু ছোটো ছোটো জাতি, উপজাতি ও জনগোষ্ঠীর যে আবেগ আছে সেই প্রশ্নে সংবেদনশীলতার সাথেই পরিস্থিতি বিচার করতে হবে। স্বায়ত্তশাসনই বাস্তবোচিত পথ। ভাষাগত সংখ্যালঘু হিসাবেও দার্জিলিং-এর গোর্খাদের চিহ্নিত করা এবং তাঁদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বল যখন রাজ্যের কোর্টে, রাজ্য সরকারকেই তখন পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। আশা যেন নিরাশায় পরিণত না হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। এদিকে, রাজ্য সরকার জানিয়েছে আগ বাড়িয়ে মোর্চাকে আলোচনায় ডাকবে না। আন্দোলনকারীদের তাক করে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দেওয়া হয়েছে। আর, ঐক্য-সংহতি রক্ষার প্রশ্নে সবারই পদক্ষেপ থাকা জরুরি। মোদ্দা কথা হল—আমরা জ্বলন্ত পাহাড় দেখতে চাই না। চাই শান্ত স্বাভাবিক জনজীবন পাহাড়ে এবং সমতলে। শান্তি-সম্প্রীতির অঙ্গন হয়ে উঠুক পাহাড় এবং লাগোয়া সমতলও। আর নয় উত্তেজনার প্রহর গোনা। স্পন্দিত হোক পাহাড়-সমতল নতুন উদ্যমে, স্বাভাবিক ছন্দে। ফিরুক পরিস্থিতি। সবারই তা কাম্য। 'পাহাড় হাসছে' আবার বলা শুরু হবে কবে থেকে? না, এখন বলা যাচ্ছে না। অচিরেই যাতে সে কথা বলা যায়, তার ব্যবস্থা করতেই হবে। করতে হবে রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকারকে এবং পাহাড়ের মানুষের শুভবুদ্ধিতে। শুভ বোধের দ্যোতনাই গড়ে তুলবে নতুন পাহাড়। নতুন জনপদ। নতুন সৌন্দর্যের রানি। এটাই এখন কাঙ্ক্ষিত।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শারদ উৎসব সহ সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানে পরিতৃপ্তির শেষ কথা

ফ্রেন্ডস ক্যাটারার

(আমাদের কোনো শাখা নেই)

ধাত্রীগ্রাম, বর্ধমান, যোগাযোগ : ৯০৯৩৬০৯০৪৮, ৯৪৩৪৫৭৬৪২৯

Sl. No. 48

With best compliments of

SRB REFRACTORIES ENTERPRISE LTD.

61, Kankulia Road, Flat No. 202B, 2nd Floor, Kolkata-700 029, WB
Mob. 9832195056, 9647901550, E-mail : sgupta.srbc@gmail.com

Specialist in

MAKING ALL TYPES OF BAKING, RE-BAKING FURNACES, TUNNEL, GRAPHITISATION UNIT, CIVIL, ANNUAL MAINTAINANCE OF ANY TYPES OF FURNACES, CASTING REFRACTORY SPECIALIST.

Sl. No. 140

এক মা আর তাঁর একটা চিঠি

অরিন্দম কোঙার

জন্মশতবর্ষ

মুক্তা কুমার-এর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। হুগলি জেলায়। গণআন্দোলনের স্রোতধারায়। স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে বিপ্লবী সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করার প্রক্রিয়ায়। এই জন্মশতবর্ষ বর্ধমান জেলাতেও আয়োজিত হতে পারে, এমনকি রাজ্যস্তরেও। অথচ প্রশ্ন থেকেই যায়। কে এই মুক্তা কুমার? কেনই বা তাঁর জন্মশতবর্ষ?

পারিবারিক পরিচয়

বর্ধমান জেলার এক অবস্থাপন্ন পরিবারে জন্ম মুক্তা রায়ের। পরিবারটা থাকতেন বর্ধমান শহরে নিজস্ব বাড়িতে (ইন্দ্রভবন)। কাছেই ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির অফিস ও কমিউন। এখানে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের অন্যতম প্রভাত কুণ্ডু। এই প্রভাত কুণ্ডু দমদম সেন্ট্রাল জেলে বন্দি থাকাকালীন পুলিশের গুলিতে নিহত হন ১৯৪৯ সালের ৯ জুন। এই সঙ্গে আরও দুজন পার্টিকর্মী শহিদ হলেন—সুমথ চক্রবর্তী ও মুকুল চক্রবর্তী। রায় পরিবারের সঙ্গে পার্টি অফিসের বাসিন্দাদের, বিশেষ করে হরেকৃষ্ণ কোঙারের স্ত্রী বিভা কোঙারের বেশ যোগাযোগ ছিল। তখন রায় পরিবারের প্রধান ছিলেন মুক্তা কুমারের দাদা ডা. বিষ্ণুপদ রায়। অসুখ-বিসুখে তিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন। মুক্তা কুমারের এক মেয়ে মিতালী কুমার লিখেছেন, ''মামার বাড়ির কাছেই ছিল পার্টি অফিস। বাবা যখনই বর্ধমান যেতেন, মামার বাড়ি ঘুরে সোজা চলে যেতেন পার্টি অফিস। সেখানেই সরোজ মুখার্জি, বিনয় চৌধুরী ছাড়াও আবদুল্লাহ রসুল, কালো চৌধুরী, কৃষ্ণ হালদার, হরেকৃষ্ণ কোঙার, মনসুর হবিবুল্লা এঁদের সাথে বাবার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। রাজনীতি ছাড়া বাবা সাহিত্য চর্চাও করতেন। তাই শাহেদুল্লাহ্ সাহেবের সাথে তাঁর হয় গভীর বন্ধুত্ব। বলা বাহুল্য, এঁদের সকলকেই আমরা মামা বলতাম। কারণ, মামার বাড়ির সাথে এঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই যোগাযোগ ছিল। বাবা-মা, বিশেষত বাবার সাথে এঁদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠায় আমাদের ভাই-বোনেদের মধ্যে যাঁরা বড়ো তাঁদের সকলেরই হুগলি এবং বর্ধমান উভয় জেলার নেতা ও কর্মীদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ হয়েছিল।'' (*আমাদের কথা*) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দয়াল কুমারের 'বিংশ শতাব্দী' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্। ১৯৪৮ সালে পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে পুলিশ পার্টি অফিসটা বন্ধ করে দেয় ১৯৪৯ সালে।

বাবা ইন্দ্রনারায়ণ রায় ও মা সুরেশ নন্দিনীর এগারো সন্তান (দুই কন্যা)-এর মধ্যে এক কন্যা মুক্তা। তাঁর ৮ বছর বয়সে বাবা মারা যান, তবে তিনি আদর-যত্নেই বড়ো হন। বর্ধমান মহারানি বালিকা বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই ১২ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর আবার তিনি বর্ধমান পৌর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। মুক্তা রায়ের জন্ম ১৯১৬ সালের ২৯ আগস্ট (১৩২৩ বঙ্গাব্দের ১৩ ভাদ্র)। স্বামী দয়াল কুমারও অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান ছিলেন। বিয়ের পর তাঁরা শেষ পর্যন্ত বসবাস করতে থাকেন চন্দননগরের বুড়ো শিবতলায়। তাঁদের ১০ সন্তান এবং বিস্ময়কর হচ্ছে বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে সকলেই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন বা আজও আছেন এবং সমাজতন্ত্রের জন্য বিপ্লবী পথ নিয়ে তাঁদের কারও কারও মধ্যে বিতর্ক ছিল বা আছে।

রাজনৈতিক পরিচয়

দেশে তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে। পিতৃ পরিবার সেই সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাড়িতে চরকায় সুতো কাটা হতো। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই আঁচ বালিকা মুক্তা রায়ের গায়েও লেগেছিল। তাঁর নিজের কথায়, ''বর্ধমানে বিজয়চাঁদ রোডের উপরেই আমাদের পৈত্রিক বাড়ি। শহরের সব ধরনের মিছিল শোভাযাত্রা ইত্যাদি আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। এই সব দেখে এবং সেই সঙ্গে শ্লোগান ও দেশাত্মবোধক গান মনকে খুবই আলোড়িত করত। পরিষ্কার ভাবে কিছু না বুঝলেও, সক্রিয় ভাবে কিছু না করলেও ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে উঠেছিল। টাউন হলে মহাত্মা গান্ধি, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতারা যখন আসতেন সেই সব মিটিং-এ যেতাম। আমরা স্কুলের কয়জন বন্ধু একসঙ্গে যেতাম, এবং স্বদেশি আন্দোলনের সাহায্য তহবিলে, অলঙ্কার টাকা পয়সা যে যা পারতাম দিতাম। প্রায় নিয়মিত চরকায় সুতো কাটতাম, জেলায় চরকায়

সুতোকাটা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলাম।" (*পঁয়ষট্টি বছর ধরে একসঙ্গে*) তারপর তো ১৯২৮ সাল থেকে দয়াল কুমারের সঙ্গে সহযোদ্ধা মুক্তা কুমার। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামী দয়াল কুমার। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, জাতীয়তাবাদ বিপ্লবী আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন। দয়াল কুমারের রাজনৈতিক জীবনের এইভাবে উত্তরণ ঘটে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন ১৯৩৮ সালে। পার্টি যখন বেআইনি, সেই সময় ১৯৩৮ সালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর দুমাস ধরে পার্টির দ্বিতীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ফরাসি-অধিকৃত চন্দননগরে। এই সম্মেলনে পাহারা দেওয়া ও সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্য যাঁরা দিনরাত পরিশ্রম করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন দয়াল কুমার। তাঁর অনুকরণযোগ্য অনেক দিকই এখানে উল্লেখ করা যায় এবং সময়-সুযোগে করা উচিত, কিন্তু আমাদের আপাতত বিরত থাকতে হচ্ছে মুক্তা কুমারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার জন্য।

ঠাকুরদার সম্পত্তি ত্যাগ করে অনিশ্চিত অসচ্ছলতার জীবন বেছে নিয়েছিলেন দয়াল কুমার। সঙ্গে ছিলেন মুক্তা কুমার। যোগ্য সহধর্মিণী, সহকারিণী, সহযোদ্ধা। আদর্শ দম্পতি, যথার্থ কমিউনিস্ট দম্পতি, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে অবিচল সহযোদ্ধা। আজীবন এই সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছিল। কোথাও একটুকু টোল খায়নি। উল্লেখ্য, দয়াল কুমারের মৃত্যু হয় ১৯৯৫ সালের ১৭ মার্চ আর মুক্তা কুমারের ২০০১ সালের ২৯ জুলাই।

হুগলি জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা মহীতোষ নন্দী। তাঁর স্মৃতিচারণায় কুমার দম্পতি যা বলেন, তা অনুলেখক মানস দাসগুপ্তর কলমে, ''মহীতোষ নন্দী ও কমল চট্টোপাধ্যায়—দু-জনেই তখন কলেজের ছাত্র। আমাদের বাড়িটা তখন প্রায় খালিই ছিল। ওরা দুই বন্ধু তখন প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতো। কমিউনিস্ট মতাদর্শ নিয়ে আলোচনা করত। দয়াল কুমার ও মুক্তা কুমার এই আলোচনা শুনতেন। মুক্তা কুমারকে ওঁরা বই-টই দিয়ে পড়াশুনা করার উৎসাহ দিতেন। দয়াল কুমার যখন দু-বছরের জন্য জেলে তখন মহীতোষ নন্দীর দাদা সন্তোষ নন্দী (গোপাল) গোপন দলিলপত্র মুক্তা কুমারকে দিতেন পড়াশুনা করার জন্য (জেল থেকে দয়াল কুমারই এই নির্দেশ দেন)।" রাজনৈতিক কাজ যেমন সারা জীবন চালিয়ে যান মুক্তা কুমার, সেই সঙ্গে তেমনি রাজনৈতিক চেতনায় নিজেকে সমৃদ্ধ করার কাজও চালিয়ে যান। তাঁর নিজের ভাষায়, ''দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা এবং দয়াল কুমারের একান্ত চেষ্টায়, শিক্ষা, সাহচর্যে আমার কৈশোরের দেশপ্রেমের আবেগ তখন রাজনৈতিক সচেতনতায় সমৃদ্ধ হয়ে, শোষণহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্যের আদর্শে রূপায়িত হয়েছে। পারিবারিক সমস্ত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই আমাদের যৌথ রাজনৈতিক চলমান জীবন।" (*পঁয়ষট্টি বছর একসঙ্গে*) এই রাজনৈতিক সচেতনতা তিনি অন্যদের মধ্যেও সঞ্চারিত করার কাজও চালিয়ে যান। পার্টিসভায়, নারী সংগঠনের সভায়, বাড়ির আশেপাশের আটপৌরে মহিলাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়। আসলে মুক্তা কুমার নিজেই তো ছিলেন আটপৌরে—পোষাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে, কথাবর্তায়, আলাপ-আলোচনায়। বাংলা প্রদেশে নারী আন্দোলনের এক অগ্রণী নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের অভিজ্ঞতায়, ''আর একজন কর্মী ছিলেন মুক্তা কুমার। নিত্য কষ্টের সংসার, স্বামীও রুগ্‌ণ। ছেলেমেয়ে নিয়ে কী করে যে উনি সংসার চালাতেন ভেবে পেতাম না। কিন্তু ইনিও নিরলস কর্মী। তিনি ছিলেন চুঁচুড়ার শাখা-সমিতির পরিচালিকা। কখনও রাগ করে কথা বলতে শুনিনি। সমিতির নানা কাজ, ঘরে বাইরে বিক্রয় প্রভৃতি কাজের মধ্যে সংসারের চাপের কথাটা তার মুখে আমি কোনোদিনই শুনিনি।" (*সেদিনের কথা*)

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মুক্তা কুমার

১৯৪৩-৪৪ সাল। ব্রিটিশ শসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় জমিদারি-মজুতদারি-মহাজনি ব্যবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে বাংলা প্রদেশের মানুষের ওপর দুর্ভিক্ষ চেপে বসে এবং লক্ষ মানুষের প্রাণ যায়। সেই পটভূমিকায় ১৯৪৩ সালে স্থাপিত হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদিকা হন মুক্তা কুমার। এই জেলার আর-এক পুরোধা নেত্রী সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়। স্বামী কমল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আর-এক আদর্শ কমিউনিস্ট দম্পতি। সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়ের সেদিনের অভিজ্ঞতা : ''১৯৪৩ সাল ছিল দুর্ভিক্ষের সময়। মুক্তা কুমার এলাকার মেয়েদের নিয়ে, সমিতির পরিচালনায় 'দুগ্ধদান কেন্দ্র' খুললেন। অর্থ সংগ্রহ, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দাঙ্গার সময়, মুসলিম পাড়ায় (কাজীপাড়া) গিয়ে মেয়েদের সাহস দিলেন। ছেলেদের সাথে দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করলেন। এইভাবে নিজের এলাকায় সমিতি গড়ার কাজ শুরু করে, ক্রমে ক্রমে সারা শহরে, পরবর্তীকালে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সমিতি গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এই কাজেও আমি তাঁর সঙ্গে সর্বদা থেকেছি।" (*মুক্তা কুমার আর আমাদের মধ্যে নেই*) ১৯৭১ সালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি থেকে আত্মপ্রকাশ ঘটে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির হুগলি জেলা কমিটির আবার সম্পাদিকা মুক্তা কুমার। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত। তারপর সভানেত্রী আমৃত্যু। স্বাভাবিকভাবেই তিনি এই নারী সংগঠনর রাজ্যস্তরের নেত্রী ছিলেন, কখনও অন্যতম সম্পাদিকা, কখনও সহ-সভানেত্রী। মৃত্যুকালে রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্যা ছিলেন।

কমিউনিস্ট পরিচয়

মুক্তা কুমার অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যা হন ১৯৪২ সালে। পার্টির হুগলি জেলা পরিষদের সদস্যা ছিলেন, আবার মত্যদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র আত্মপ্রকাশ ঘটলে, তিনি সেই পার্টিরও হুগলি জেলা কমিটির সদস্যা হন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে জেলা কমিটির সদস্যা আর থাকেন নি, তবে তিনি পার্টির চুঁচুড়া জোনাল কমিটির সদস্যা ছিলেন।

কমিউনিস্ট সত্তা

কমিউনিস্ট পার্টি চায় নতুন সমাজ। একেবারে বিকল্প সমাজ—শোষণ-বঞ্চনা-নির্যাতন-নিপীড়নমুক্ত সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ। নতুন সমাজে নতুন মানুষ। নতুন সমাজ রীতিমতো লড়াই করে কায়েম করতে হয়। কিন্তু নতুন মানুষের দৃষ্টান্ত পুরনো সমাজে দেওয়া যায়। কমিউনিস্ট সত্তার মধ্য দিয়ে দেওয়া যায়। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য আর কমিউনিস্টের মধ্যে ফারাক আছে অনেকটাই। মুক্তা কুমার কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য তো অবশ্যই ছিলেন, তার থেকেও বড় কথা যে তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট। পরিবারে অস্বচ্ছলতা, স্বামী কিংবা কোনো ছেলে জেলে অথবা কোনো মেয়ে থানা লকআপে, কিন্তু তাতেও অবিচল, ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে সমষ্টিগত স্বার্থ, অনমনীয় আদর্শবোধ, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, শ্রেণিশত্রুর প্রতি ঘৃণা, আত্মপ্রচার বিমুখতা, বিনয়ী কিন্তু সংগ্রামে অচঞ্চল—সুতরাং তিনি অনন্যা, তিনি কমিউনিস্ট।

সংবর্ধনা সভায় তিন নেত্রী : (বামদিক থেকে) সাধনা পাত্র, মুক্তা কুমার, ইন্দ্রসুধা ঘোষ

তাঁর ছোটো ছেলে অধৃষ্য কুমার এক দিনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে লিখছেন, ''সম্ভবত তখনও আমি দশে পা দিইনি। সকাল থেকে খাবার বলতে কিছুই বাড়িতে নেই। আমার পরে ইতিমধ্যেই বিন্টু আর রিন্টু, বোধহয় সাত আর পাঁচ বছরের হবে। বাবার লেখা ছোট্ট চিরকুট নিয়ে গড়বাটী লক্ষ্মী নিয়োগীর রেশন দোকান সংলগ্ন গমকল থেকে দু কিলো গরম আটা (ধারে বা দয়া/সহানুভূতির দান পুরোটা ঠিকঠাক বুঝতাম না সেই বয়সে, তবে বাবার চিরকুটের অনুরোধ নিয়ে খালি হাতে ফেরত এসেছি বলে মনে পড়ে না।) নিয়ে বাড়িতে এসে দেখি আমাদের রান্নাঘরের দরজায় অপরাধী মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে ভুপেনদার বোন গীতা, ইজের পরে তালিমারা ফ্রকে পুরো লজ্জা ঢাকতে না পেরে হাতে চটাওঠা কলাইয়ের পাত্রটা বুকের কাছে ধরে আছে। মা আমার হাত থেকে আটার চটের ব্যাগটা নিয়ে আমাদের কলাইয়ের মগে করে তিন চার মগ আটা গীতার পাত্রে দিয়ে বলল, ''নিয়ে যা এতে একবেলা একটু কিছু হবে, মা-কে বলিস আমার ঘরে গুড় একদম নেই।'' গীতা চলে যাওয়ার পর মা কিছুটা স্বগতোক্তি অথবা কিছুটা আমাকে কৈফিয়তের সুরে বলল আমাদের তো কাল আটা ছিল, ওদের কাল সারাদিন কিচ্ছুই খাওয়া হয়নি।'' (*কিছু টুকরো ছবি, চিরকুট, মুক্তা কুমার, বামপন্থার শেকড়ের সন্ধান*) বাংলায় সংগঠিত নারী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা কনক মুখোপাধ্যায় মুক্তা কুমারের মৃত্যুর পর লেখেন, ''একজন আদর্শবাদী একনিষ্ঠ কর্মী কীভাবে তাঁর রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনের সমন্বয় ঘটাতে পারেন—মুক্তাদি ছিলেন তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি ছিলেন দশটি সন্তানের জননী, অনেক অভাব অনটনের মধ্যে তাদের মানুষ করে তুলেছিলেন আর তাঁর গোটা পরিবারই ছিল পার্টির পরিবার। তাঁর ছেলেমেয়েরাও সকলে এই রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে বড়ো হয়েছে এবং সকলেই কোনো না কোনোভাবে পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাঁর কন্যা মিতালী কুমার গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির অন্যতম নেত্রী। একজন আদর্শ মা, আদর্শ কমিউনিস্ট নেত্রী মুক্তা কুমারের উদাহরণ বিরল। ১৯৫৫ সালে আমাদের সমিতির অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে তিনি সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিলেন 'বিশ্ব মাতৃ সম্মেলনে' যোগ দিতে। সেখানে তিনি মা হিসাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। সংসারের কোনো বাধা বিপত্তিতেই মুক্তাদির কর্মজীবন ব্যাহত হয়নি।'' (*নারীমুক্তি আন্দোলনে মুক্তা কুমার একটি নাম*) হ্যাঁ, মুক্তা কুমার হয়ে উঠেছিলেন দশ নয়, অসংখ্য ছেলেমেয়ের মা। সেইজনই তো তিনি সুইজারল্যান্ড থেকে পূর্বতন জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী আক্রমণে নিহত বাবা-মায়ের ছেলেমেয়েদের দেখে লেখেন, ''মনে হলো যেন তাদের সেই উজ্জ্বল চোখের মাঝে হারানো মা-বাবার স্মৃতি ভেসে উঠল। অতীতে হারানোর স্মৃতি মাখা আবেগে ভরা দৃষ্টি এবং এই কথা কয়টি, ভারতীয় মায়েদের মাতৃহৃদয়কে উদ্বেলিত করে তুললো, পারলাম না কোনো মতেই আমাদের চোখের জলকে চেপে রাখতে। মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়ে বুকে চেপে ধরলাম এই মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ভারতীয় মায়েদের পক্ষ থেকে জবাব দিলাম—আমাদের স্নেহের ছেলেমেয়েরা, জানি তোমাদের কথা। কত আন্দোলন করেছি যুদ্ধের চাপিয়ে দেওয়া সর্বনাশ থেকে তোমাদের বাঁচাবার জন্যে।'' (*কোনোদিন ভুলবো না*) মা—সর্বজনীন মা—গোর্কির 'মা'।

গোর্কির 'মা'

গোর্কির 'মা'-তো কেবল একা 'পাভেল'-এর মা ছিলেন না, তিনি হয়ে উঠেছিলেন রাশিয়ার সব শ্রমিকের মা। সংগ্রামের ময়দানে মা। মুক্তা কুমারের মাঝেই মাঝে মাঝে আমরা এমন 'মা'-দের পাই। ছোটো ছেলে অধৃষ্য কুমার জেলবাসের জন্য বারে বারে লেখাপড়ার ছেদ ঘটাতে বাধ্য হয়ে শেষে ১৯৭৯ সালে এম.বি.বি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, মা মুক্তা কুমার সেই খবর পেয়ে ১২.০৭.১৯৭৯ তারিখে ছেলেকে লেখেন, ''জীবিকার সংগ্রামে অর্থ উপার্জন অপরিহার্য। কিন্তু অর্থ উপর্জনের মাঝে নিজের সত্তাকে অতীতকে হারিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না, হারানো বন্ধুদের কথা মনে রেখে, শোষণহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্য সামনে রেখে, উত্তরোত্তর জীবনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবে এই আশা রেখে আমার আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছা জানালাম।'' এরপর আর কিছু লেখার থাকে না, থাকে করার, মায়ের আশাকে বাস্তবে রূপ দেবার।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ
পড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে
শত্রু-দুর্গ গুঁড়া!
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।

—নজরুল ইসলাম

জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী

ছোটোদিঘারী

Sl. No. 77

তথাকথিত ‘মমতা ম্যাজিক’ দিয়ে মোছা যাবে না বামফ্রন্টের অবদানকে

হরিহর ভট্টাচার্য

১৯৭৭ সালে রাজ্যস্তরে ক্ষমতায় আসার পর একটানা ৩৪ বছর পশ্চিমবঙ্গের সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার শুধু বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনই নয়, বিশ্ব উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম রেকর্ড স্থাপন করে। উপর্যুপরি গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছ-বার বামফ্রন্ট পশ্চিমবাংলার সরকার চালানোর দায়িত্ব পায়। সনাতন মার্কসবাদে এ এক বড়ো বিস্ময়। এই অভিজ্ঞতার সুযোগ কার্ল মার্কস বা লেনিনের কাছে ছিল না। ১৯৯১-এ পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ের পরেও পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট পরপর দুটি নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং ২০০৬ সালে বামফ্রন্টের সাফল্য সর্বকালের রেকর্ড ছাপিয়ে যায়। ঐ নির্বাচনে বামফ্রন্ট পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় ২৯৪ এর মধ্যে ২০৬ টিতে জেতে। কিন্তু ২০১১-তে কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের কাছে বামফ্রন্ট হেরে যায়—যেটাও এক বিশ্বরেকর্ড। মনে রাখতে হবে, ঐ নির্বাচনে বামফ্রন্টের ভোটের অংশ ছিল প্রায় ৪০ শতাংশ. কিন্তু আমাদের দেশে নির্বাচন পদ্ধতির জন্য সেটা বিধানসভার আসনে প্রতিফলিত হয় না। উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের মাপকাঠিতে বাম সরকারের কার্যকালে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে ছিল না।

অপপ্রচার ও কুৎসা

২০১১-র পর থেকে একদল বুদ্ধিজীবী ও প্রধান সংবাদমাধ্যম একটানা অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করে গেছে এই বলে যে বামফ্রন্ট তথা সিপি.আই.(এম)-এর শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গ যেন সুদূর অতীতে কোথাও তলিয়ে গেছে; রাজ্যটা যেন বহু দশক/শতাব্দী পিছিয়ে গেছে। অতি সম্প্রতি একটি ইলেকট্রনিক পত্রিকা ‘The Wire’-এ সঞ্জীব মুখার্জির (২০১৭) প্রবন্ধটি[১] ঐ অপপ্রচার ও কুৎসার নবতম সংযোজন। প্রাচীন রোমানরা বিশ্বাস করত, ‘যে বিজয়ী, তার সবকিছু’। আধুনিক গণতন্ত্রে এই প্রাচীন ধারণাটি যে রূপ ধারণ করেছে তা হল যে-দল ক্ষমতায় আসে সে যা-কিছু মন্দ তার সব দায় পূর্বতন সরকারের ওপর চাপিয়ে দেয়।

১৯৭৭ সালে যখন বামফ্রন্ট অমতায় আসে তার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য ছিল, যদিও তার প্রেক্ষিত ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথম যুগের বামফ্রন্ট পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের ওপর দায় চাপিয়ে বসে ছিল না—জরুরি অবস্থা উত্তর পশ্চিমবাংলায় রাজনৈতিক গণতন্ত্র উদ্ধার করার কাজটা ছিল প্রাথমিক কর্তব্য। ২০১১-এর কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস জোট যখন ক্ষমতায় আসে তখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিল

এবং গণতান্ত্রিকভাবে বিরোধীদের ক্ষমতায় আসতে বাধা ছিল না। অবস্থাটা এখন আমূলভাবে পাল্টে গেছে।[২] আজ যাঁরা এই বামবিরোধী অপপ্রচার করে শাসকদলের কিছু আনুকূল্য লাভের আশায় থাকেন তাঁরা স্বভাবতই একটি শাসনকালের দোষগুণসমন্বিত বস্তুনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণে অপারগ।

ভদ্রলোক নেতৃত্বের 'অভদ্রলোকোচিত' কাজকর্ম

এটা এক ঐতিহাসিক সত্য যে বাংলার বামপন্থী আন্দোলনে বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির নেতৃত্বের প্রাধান্য ছিল এবং এখনো আছে। প্রধানত তিনটি উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়ের—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য—সমাহার এই ভদ্রলোক শ্রেণি। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের প্রয়োগে বাংলার গ্রামীণ জীবনে তথা ভূমি কাঠামোয় বিরাট পরিবর্তন হয়; উনিশ শতকে দেখা গেল, এক শ্রেণির জমিদার / ভূস্বামীর জন্ম হয়েছে—যারা ঐ আইনের সুযোগ নেন, এবং শহরের অধিবাসী হয়েও গ্রামের বিপুল পরিমাণ জমির মালিক হন। তাঁরা অবশ্য জানতেন না তাঁদের জমিদারি ঠিক কোথায় এবং কোন জমির তাঁরা মালিক—কারণ তাঁরা ওই জমি ক্রমান্বয়ে অন্যের হাতে হস্তান্তর করেন নির্দিষ্ট খাজনা বাবদ। এইভাবে বাংলার ভূমিব্যবস্থার উচ্চ-নীচ স্তরবিন্যস্ত—বড়ো, ছোটো জমিদারের আর্বিভাব ঘটে। প্রখ্যাত মার্কিন ভারতবিদ ব্লুমফিল্ড (Bloomfield 1968)[৩] বিস্তারিতভাবে-এ বিষয়ে প্রামাণ্য গবেষণা করেছেন। বাংলার রাজনীতিতে এই শ্রেণির বিভিন্ন অংশ নেতৃত্ব দিতে থাকে। এক অংশ কংগ্রেস রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেয়; একটা অংশ সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেয়। একটা অংশ ১৯৩০-এর দশকে জেলখানায় মার্কসবাদে দীক্ষিত হয় এবং পরে বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতৃত্ব দিতে থাকে। পশ্চিমবাংলার বামপন্থী আন্দোলনের এক আদর্শ ভদ্রলোক ছিলেন প্রয়াত জ্যোতি বসু, যিনি তথাকথিত 'অভদ্রশ্রেণির' রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। এই ভদ্রলোকশ্রেণি কিন্তু কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসেরও নেতৃত্বে আছে—যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন 'মতাদর্শ'গত কারণে : ব্যানার্জি, বসু, সেনগুপ্ত, দত্তগুপ্ত, চ্যাটার্জি, ভট্টাচার্যদের পশ্চিমবাংলার সব দলেই নেতৃত্বের ভূমিকায় দেখা যাবে আজ। বহুদিন আগে মার্কাস ফ্রান্ডা (Marcus Franda)[৪] বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে ভদ্রলোকশ্রেণির যোগ ও তার রাজনৈতিক তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল বামপন্থী ভদ্রলোক নেতৃত্ব ও তাদের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার কী করে গেলো? বামফ্রন্ট সরকার যে দুটি 'অভদ্রলোক'-জনিত কাজ করে গেলো এবং যে দুটি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটালো তা হল : জমিদারি প্রথার অবলোপ, বর্গাদারদের আংশিক মালিকানাস্বরূপ নাম রেকর্ড করা এবং ভূমিহীনদের উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন করে দেওয়া। বহু দেশি ও বিদেশি গবেষণায় এটি স্বীকৃতি পেয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলস্বরূপ যাঁরা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত হন এবং গ্রামবাংলার শাসন ও উন্নয়নের দায়িত্ব নেন তাঁরা কিন্তু তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণি ছিলেন না। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিলেন সাধারণ নিম্নবর্গের। এ বিষয়ে যে সব গবেষণা হয়েছে সেখানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই, গ্রামীণ বাংলার ত্রি-স্তরীয় দলব্যবস্থা-নির্ভর গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালুর গোটা কৃতিত্ব বামফ্রন্টের। এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে।[৫] এবং নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা সারা ভারতের একটি মডেল হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৮৯ সালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সংবিধানের ৬৪তম সংশোধন বিল (পঞ্চায়েত সংক্রান্ত) লোকসভায় পেশ করার সময় পশ্চিমবাংলার মডেলটিকে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি দেন। মজার ব্যাপার হলো এই দুটি ক্ষেত্রেই একশ্রেণির ভদ্রলোকের স্বার্থে আঘাত লাগে। ১৯৭৮-পূর্ব পশ্চিমবঙ্গের বাংলার ভূমিব্যবস্থা ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে দাপট ছিল কংগ্রেস নেতৃত্বের, যাঁরা বিশাল পরিমাণ জমির মালিক ছিলেন এবং ভোট রাজনীতির চাবিটি ছিল তাঁদের হাতে। আমূল ভূমি-সংস্কারে গ্রাম বাংলায় কারা উপকৃত হলেন? বলাই বাহুল্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ—যারা ঠিক 'ভদ্রলোক' ছিলেন না। উনিশ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকের ভাষায় তাদের 'ছোটোলোক' এবং 'অভদ্র' হিসেবে গণ্য করা হতো। ২০১১-পরবর্তী সময়ে ভূমিব্যবস্থায় নতুন করে করার কিছু ছিল না—প্রয়োজন ছিল শিল্পায়ন। যেটি হবার নয় এবং যা এখন দশাগ্রস্ত।

উন্নয়ন কোথায়?

'উন্নয়ন' শব্দটির এত অপপ্রয়োগ হচ্ছে যে অনেক সময় মনে হয় শব্দটিতে যেন 'গ্রহণ' লেগে আছে। গোটা দেশে মুক্ত অর্থনীতির জয়জয়কার; আর্থিক বৈষম্য লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে; জনকল্যাণ রাষ্ট্রটি পর্দার আড়ালে না কি মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। অথচ অহরহ বলা হচ্ছে উন্নয়ন হচ্ছে। এটা ঠিক যে দেশের জিডিপি বাড়ছে, এবং এক ধরনের 'উন্নয়ন' হচ্ছে—যার সুফল কুড়োচ্ছে উচ্চবিত্তরা। প্রদীপের নীচে গাঢ় অন্ধকার থেকেই যাচ্ছে।

এখন প্রচলিত মাপকাঠিতে দেখা যাক বাম সরকারের আমলে উন্নয়ন হয়েছিল না রাজ্যটি অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল।

প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ রাজীব মালহোত্রা (২০১৪) সর্বপ্রথম আন্তঃরাজ্য উন্নয়নের এক তুলনামূলক তথ্য প্রদান করেছেন। তাঁর তুলনার একক ১০,০০০ (দশ হাজার) জনসংখ্যা এবং সময়কাল ১৯৮১-২০১১। বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করে তিনি একটি সমষ্টিগত বড়ো সূচক তৈরি করেছেন যাকে তিনি নাম দিয়েছেন 'পাবলিক পলিসি কার্যকারিতা' (পিএফআই)—এই সূচকের অর্ন্তভুক্ত হয়েছে অন্যান্য নানা চল (Variable)। মালহোত্রার পিএফআই সূচক অনুযায়ী পশ্চিমবাংলার তুলনামূলক অবস্থানটি বোঝা যায়।

সারণি-১

রাজ্য	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
অন্ধ্রপ্রদেশ	০.১৮১	০.২০৯	০.২২৯	০.২৬৮
গুজরাট	০.২৪৭	০.২৫৫	০.২৯১	০.৩০৫
কর্নাটক	০.২১৪	০.২৩৭	০.২৮৪	০.৩৩৭
মহারাষ্ট্র	০.২১৪	০.২৪৪	০.২৬১	০.৩১৪
তামিলনাড়ু	০.১৯৯	০.২৩১	০.২৫৬	০.৩১৩
পশ্চিমবঙ্গ	০.১৯২	০.২৩৮	০.২৫৫	০.২৫১
সর্বভারতীয়	০.২০৫	০.২২৮	০.২২৮	০.২৮৫

সূত্র : মালহোত্রা (২০১৪), পৃষ্ঠা ১৪৮-১৪৯

সারণি ১-এর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮১-২০১১ পশ্চিমবাংলার সার্বিক উন্নতি হয়েছে, যদিও ভারতের সবচেয়ে উন্নত রাজ্যগুলির তুলনায় পশ্চিমবাংলার অবস্থান নিচে ছিল। মালহোত্রার (২০১৪) পরিসংখ্যানকে UNDP-র মানব উন্নয়ন সূচকের সঙ্গে তুলনা করা প্রয়োজন, বিশেষ করে এই কারণে যে, UNDP-র ২০১০ সালে তার মানব উন্নয়নের মাপকাঠির সঙ্গে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জুড়ে দেয় যার সাহায্যে রাজ্যগুলিতে অসাম্য কমিয়ে কতটা মানব উন্নয়ন হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সারণি-২

মানব উন্নয়নের নিরিখে ১৮টি রাজ্যভিত্তিক তুলনা

রাজ্য	এইচ. ডি.ই (১)	আই. এইচ.ডি. আই	Rank	Rank
অন্ধ্রপ্রদেশ	০.৪৮৫	০.৩৩২	১২	১১
গুজরাট	০.৫১৪	০.৩৬৩	৮	৭
মহারাষ্ট্র	০.৫৪৯	০.৩৯৭	৪	৪
তামিলনাড়ু	০.৫৪৪	০.৩৯৬	৪	৪
পশ্চিমবঙ্গ	০.৫০৪	০.৩৬০	৯	৮

সূত্র : UNDP (hdr.undp.org/context/inequality-adjusted-human development-index-ihdi) (24/8/1017) P. 18
HDI = Human Development Index
IHDI = Inequality-adjusted HDI

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের ২০১০-এ এইচ.ডি.আই (HDI) দেশের 'উন্নত' রাজ্যগুলির সঙ্গে তুলনীয় ছিল। দুই, পশ্চিমবাংলায় 'সাম্যভিত্তিক' কার্যাবলীর জন্য (Equality Function, অর্থাৎ নানাবিধ সরকারি কার্যাবলি যা অসাম্য কমতে সাহায্য করে) পশ্চিমবঙ্গ ঐ ১৮টি রাজ্যের মধ্যে তার র‍্যাঙ্ক (rank) ৯ থেকে ৮-এ তুলতে সক্ষম হয়।

অবশ্য গুজরাট এবং তামিলনাড়ুও একধাপ এগিয়ে যায়। যদিও মহারাষ্ট্রের র‍্যাঙ্কের কোনো পরিবর্তন হয়নি। IHDI-র মাপকাঠিতে পশ্চিমবাংলার সূচক হয়ে ওঠে ০.৩৬০ সেখানে গুজরাটের সূচক হয় ০.৩৬৩, তামিলনাড়ু ০.৩৯৬ এবং মহারাষ্ট্র ০.৩৯৭। ২০১০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলা তার 'সাম্যভিত্তিক কার্যাবলীর কারণে গুজরাট অপেক্ষা ভালো অবস্থায় ছিল।

সারণি-৩

মাথা পিছু আয় (পি.পি.পি সূচক ভিত্তিক) ২০০৮

রাজ্য	পিপিপি (মার্কিন ডলারের হিসেবে)	IHDI অনুযায়ী সূচক
গুজরাট	৩৭৮২.৮৭	০.৪৮৪
কর্ণাটক	৩২৬৯.৭৬	০.৪৬১
মহারাষ্ট্র	৩৯১৩.১৪	০.৪৮৯
তামিলনাড়ু	৩৮৩৫.০৫	০.৪৮৬
পশ্চিমবঙ্গ	৩৪১৪.০৯	০.৪৮৬
সর্বভারতীয়	৩৩৩৭.৩৩	০.৪৬৮৫

সূত্র : UNDP (২০১১) পূর্বোক্ত

সারণি ৩-এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার স্থান দেশের উন্নত রাজ্যগুলির সঙ্গে তুলনীয় ছিল। 'অসামা' সূচকটির সঙ্গে যোগ করে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবাংলার স্থান কর্ণাটক ও সর্বভারতীয় স্তরের ওপরে, এবং মহারাষ্ট্রের প্রায় সমান।

সবশেষে আরও একটি মাপকাঠি ব্যবহার করবো। দারিদ্রদুরীকরণ আজ সারা পৃথিবীতে এক উন্নয়নমূলক সরকারি কাজ হিসেবে স্বীকৃত। The TATA Statistical Outline (২০১৪-১৫) অনুযায়ী পশ্চিমবাংলায় ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০১১-১২ সময় পর্যন্ত দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর হ্রাস পেয়েছে : ১৯৯৩-৯৪ (৩৯.৪%); ২০০৪-০৫ (৩৪.৩%) এবং ২০১১-১২ (১৯.৯%)। ঐ একই সময়ে সর্বভারতীয় অবস্থানটি যথাক্রমে ছিল এইরূপ : ৪৫.৩%; ৪১.৮% এবং ২১.৯%। ২০১১-১২-র হিসেবটিকে বাম সরকারের কৃতিত্ব হিসেবেই ধরতে হবে।

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি

উন্নয়নের তারতম্য সহজে দৃশ্যমান হয় না। আবার অবনমন যতটা তাড়াতাড়ি প্রকাশ পায়—উন্নয়ন তা পায় না। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলার অবনতি অতি সহজেই দৃশ্যমান হয় এবং জনমানসে অতি সহজে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। খুন, রাহাজানি নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নরহত্যা ইত্যাদিতে খুব সঙ্গত কারণে বেশি স্পর্শকাতর। আজ বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের যুগে এইগুলি ক্ষণেকের মধ্যে সারা দেশ তথা বিশ্বব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রাজনীতিবিদ্ ও শাসকদলে ভোটভাগ্য নির্ধারণ করে দেয় ঐ ঘটনাবলি। পশ্চিমবাংলায়—'নন্দীগ্রাম', 'সিঙ্গুর' ও 'নেতাই'-এর ঘটনা বামফ্রন্ট তথা সিপিআই.এম-এর ২০১১-র ভোটভাগ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা ২০০৮ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে বামদলগুলির জনসমর্থনের ভিত ধসিয়ে দিতে থাকে। ভারত সরকারের গৃহমন্ত্রণালয় 'জাতীয় অপরাধ ব্যুরো'-র তথ্য এবং মালহোত্রার (২০১৪) হিসেব অনুযায়ী, পশ্চিমবাংলায় ২০১১-এর পূর্বে দুই দশক ধরে আইন-শৃঙ্খলার বিশেষ অবনতি ঘটে। মালহোত্রা (২০১৪) আইন-শৃঙ্খলার পরিমাপের এক সমষ্টিগত সূচক তৈরি করেন, যাকে তিনি আইনের শাসনের (Rule of Law Index ROLI) সূচক হিসেবে ব্যবহার করেন। এই সূচকটি আবার একাধিক চলের ওপর নির্ভরশীল—পুলিশ-জনতা অনুপাত, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ, মামলার নিষ্পত্তি ইত্যাদি। ROLI অনুযায়ী পশ্চিমবাংলার স্থান দেশের 'উন্নত' রাজ্যগুলির তুলনায় কোথায় ছিল তার একটা পরিচয় মেলে।

সারণী-৪

রাজ্য	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
অন্ধ্রপ্রদেশ	০.২১৬	০.০৪৪	০.০৮৯	০.০৮৪
গুজরাট	০.১১৯	০.০৮৪	০.০৮৪	০.০৮১
কর্নাটক	০.১১৮	০.১০৫	০.১৪৮	০.১৪৭
মহারাষ্ট্র	০.০৮৬	০.০৭৪	০.১০১	০.১০৯
তামিলনাড়ু	০.১০৪	০.১০১	০.১১১	০.১৮৭
পশ্চিমবঙ্গ	০.১২৬	০.১৫৮	০.০৯৪	০.০৬৯
সর্বভারতীয়	০.১২৬	০.১১৫	০.১১৭	০.১১২

সূত্র : মালহোত্রা (২০১৪), পৃ. ১৪৮-৪৯

সারণি ৪ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ১৯৮১-১৯৯১ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার আইনের শাসন দেশের 'উন্নত' রাজ্যগুলির অনেক ওপরে ছিল। পশ্চিমবাংলার স্থান সর্বভারতীয় সূচকেরও অনেক ওপরে ছিল। কিন্তু ১৯৯১-র পর থেকে পশ্চিমবাংলার অবস্থান ভয়ঙ্কর অবনতির দিকে চলে যায়। ২০১১-তে যা প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকে। এই সারণি থেকে আরও একটি সত্য সামনে আসে : ১৯৮১-২০১১ পশ্চিমবাংলা সহ দেশের উন্নত রাজ্যগুলির উন্নয়নের সঙ্গে আইনের শাসনের সম্পর্কটা ছিল বিপরীতমুখী। এই বিষয়গুলি অর্থাৎ কেন উন্নয়ন ও আইনের শাসনের বিপরীত সম্পর্ক, এ বিষয়ে স্বতন্ত্র ভাবনা ও অনুসন্ধান দাবি করে। গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ বা তামিলনাড়ুতে আইনের শাসনের নিদারুণ অবস্থা সত্ত্বেও সেখানে সরকার বদলে এই কারণটি তেমন প্রভাব ফেলে না। মনে রাখা দরকার, ২০০২-এ কুখ্যাত দাঙ্গা সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সাল পর্যন্ত সেখানে সরকার চলিয়েছেন। সিঙ্গুর ছেড়ে টাটারা গুজরাটের সানন্দ-এ গিয়ে অতি দ্রুততার সঙ্গে নেনো গাড়ি কারখানা তৈরি করে ফেলে। গুজরাটে জমি অধিগ্রহণে প্রতিবাদ সরকার কঠোর হাতে দমন করে। পশ্চিমবঙ্গে তৎকালীন বাম সরকার তা করেনি।

২০০১-পরবর্তী সময়ের নির্ভরশীল তথ্য এখনো দুর্লভ। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' (১৪ মার্চ ২০১৪)-এ প্রকাশিত তথ্য অনযায়ী পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। ঐ পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী দাঙ্গার বাৎসরিক গড় সংখ্যা ২০১২ পর্যন্ত ছিল ২৫, যেটা ২০১৩ (অর্থাৎ এক বছরে) বেড়ে দাঁড়ায় ১০৬। এন.ডি. টিভি সূত্র অনুযায়ী, পশ্চিমবাংলার ১০ জেলা ২০১১-এর পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সাক্ষী হয়েছে। (https://www.ndtv.com/topic.dhulagaeh-violence) (Sighted on 18/05/2017)

উপসংহার

পশ্চিমবাংলায় বাম সরকারের সময়কালে যে উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন হয় তা কোনো 'ম্যাজিক' বা ভেলকিবাজি করে সম্ভব হয়নি। সেভাবে কোথাও তা সম্ভব নয়। দীর্ঘ গণআন্দোলনের ঐতিহ্যের ওপর ভর করে এবং একগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট নীতির রূপায়ণে বদ্ধপরিকর বাম নেতৃত্ব, দলগুলি ও তাদের সুবিশাল কর্মিবাহিনীর যৌথ প্রয়াসে তা সম্ভব হয়েছিল। আইন-শৃঙ্খলা জনিত খারাপ রেকর্ড নেতৃত্বের দুর্বলতার পরিচায়ক, সন্দেহ নেই। ২০১১-পরবর্তী সময়ে যদি এই রাজ্যে উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন হয় তা হবে বাম সরকারের তৈরি করা ভিতের ওপরেই—যদি ক্রমশ সে ভিতটা নষ্ট করে দেওয়া না হয়। শঙ্কার জায়গাটা হলো, যত বেশি কোনো দল ব্যক্তিনির্ভর হবে, সে দল তত বেশি তার প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি হারাবে। এবং সরকার যত বেশি ব্যক্তিনির্ভর হবে, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি তত বেশি তাদের স্বাতন্ত্র্য, শক্তি ও মর্যাদা হারাবে। কোনো রাজ্য বা দেশে ব্যক্তি-নির্ভর উন্নয়ন ও গণক্ষমতায়ণ হয় না, হলেও সে দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

তথ্যসূত্র

১. 'Mamata Magic and the Masses in the Age of Popular Democracy', *The Wire* 10th July 2010.

২. এখন সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন যেন এক অলীক কল্পনায় পর্যবসিত হয়েছে। সম্প্রতি দুর্গাপুরের পৌর নির্বাচনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানা গেছে যে যারা বাইরে থেকে ভোট করাতে এসেছিল তারা শাসকদলের এক প্রার্থীকেও ভাগিয়ে দেয় এই বলে যে তার কেন্দ্রেও 'ভোট করানো' হয়ে গেছে। (ব্যক্তিগত সূত্র)

৩. J.H. Bloomfield (1968), *The Elite Conflict in a Plural Society:* Twentieth Century Bengal (Bombay: Oxford University Press)

৪. Marcus F. Frada (1972), *Radical Politics in West Bengal* (Mass, USA : MIT Press)

৫. Atul Kohli (1987) The State and Poverty in India (Cambridge : Cambridge University Press); T.J. Nossiter (1988) *Marxist State Governments in India* (London : Printers); H. Bhattacharyya (1988) : *Micro-Foundations of Bengal Communism* (New Delhi : Ajanta); and also his (2002) *Making Local Democracy Work in India* (New Delhi : Vedams); J.K. Lieten (1996) Development Devolution Democracy : Village Discourse in West Bengal (New Delhi : Sage) and Pranab Bardhan and Dilip Mukherjee (2007) eds. Decentralization and Local Governance in Developing Countries : A Comparative Perspective (New Delhi : OUP); and H. Bhattacharyya (2013) ''Marxsit Democratic Problematic' and 'The Decline of the Left in West Bengal''; *Democracy in Asia* (ed.) Priya Sing (New Delhi: Knowledge Publishers)

৬. Rajeev Malhotra (2014) *India Public Policy Report 2014* (New Delhi: Oxford University Press)

সম্প্রদায় থাক, সাম্প্রদায়িকতা যাক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

'সম্প্রদায়' ও 'সাম্প্রদায়িকতার' সংজ্ঞার্থ নিয়ে অনেকের মধ্যেই ধন্দ রয়েছে। আভিধানিক অর্থে 'সম্প্রদায়' গড়ে ওঠে বৃহত্তর সমাজে একই স্বার্থের ও বৈশিষ্ট্যের কারণে একতাবদ্ধ বা সম্বন্ধযুক্ত জনসাধারণকে নিয়ে। আর 'সাম্প্রদায়িকতা' হল গড়ে-ওঠা এইসব সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণের আনুগত্যের নীতি। কিন্তু 'সম্প্রদায়' ও 'সাম্প্রদায়িক' শব্দের এরকম অর্থে আমরা ভারতবাসী অভ্যস্ত নই। ভারতে 'সম্প্রদায়' ও 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দের একান্ত নিজস্ব একটা অর্থ রয়েছে। 'সম্প্রদায়' বলতে আমরা বুঝি প্রধানত ধর্ম-সম্প্রদায়কে। যেমন—হিন্দু সম্প্রদায়, মুসলিম সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায়, খ্রিস্টান সম্প্রদায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শিয়া সুন্নি সম্প্রদায় ইত্যাদি। আর 'সাম্প্রদায়িকতা' বলতে বুঝি 'ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে—যুগ যুগ ধরে সুখে দুঃখে লড়াইয়ে আন্দোলনে পাশাপাশি বাস করে আসা ধর্মসম্প্রদায়গুলির মানুষদের মধ্যেকার সুপ্ত ধর্মগত ভেদবুদ্ধি বিদ্বেষকে জাগিয়ে তুলে উত্তেজনা সৃষ্টি করাকে। যার ফলশ্রুতিতে দেখা দেয় ধর্মসম্প্রদায়ে ধর্মসম্প্রদায়ে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষে মানুষে, প্রধানত ভারতের দুই প্রধান ধর্ম সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ, সংঘাত, দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে এই সংকীর্ণ ধর্মীয় মনোভাব লক্ষ করেই স্বামী বিবেকানন্দ সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পার্থক্য টেনে বলেছেন—''সম্প্রদায় থাক, সাম্প্রদায়িকতা কখনও নয়।'' আমরা সাম্প্রদায়িকতার যে ইংরেজি করি 'Communalism', ইংরেজি অভিধান 'Oxford Advanced Learning Dictionary' সাম্প্রদায়িকতার এরকম ইংরেজিকে সম্পূর্ণ 'ভারতীয় ইংলিশ (Ind E) বলেছে। তাতে বোঝায় নির্দিষ্ট কোনো, বিশেষ করে ধর্মীয় কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকার প্রবল সংবেদন বা বোধ। এই বোধ এক ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষকে অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি চরম হিংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক দিকে চালিত করতে পারে (a strong sense of belonging to a particular, especially religious community, which can lead to extreme behaviour or violence towards others)।

ভারতের রাজনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে গোরক্ষা, গো-মাংস, ধর্মীয় শোভাযাত্রা, একটি গল্প, শিশুদের একটি খেলনা, সিনেমার চিত্রনাট্য, রামের জন্মভূমি, বাবরি মসজিদ এরকম সবই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বিষয় হয়ে ওঠে। ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ওঁৎপেতে থাকা ধর্মতন্ত্রীরা, মৌলবাদীরা, স্বঘোষিত ধর্মগুরুরা, সর্বোপরি রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীরা নিজেদের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেকার ধর্মমোহকে, তাদের মধ্যে নানা কারণে সৃষ্ট নানান অসন্তোষকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে এরকম উত্তেজনা সৃষ্টি করে। উত্তেজনাকে সাম্প্রদায়িক পথে চালিত করে। মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটায়, খুন-খারাবি, দাঙ্গা বাধায়। উসকানিদাতা নেতানেত্রীদের হাতে ধর্মীয় বিশ্বাসে অন্ধ, যুক্তি বিচারবোধহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষ পুতুল হয়ে পড়ে। আর তাদের দিয়ে হিংসা দাঙ্গা বাধিয়ে ফায়দা লোটে উস্কানিদাতা স্বার্থান্বেষীরা। সাম্প্রদায়িকতার এই কুৎসিত বর্বর খেলার মাঠে সব সময় প্রধান ভূমিকায় খেলে রাজনীতি। এই খেলায় তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের সঙ্গে নিয়ে কখনও প্রত্যক্ষে খেলে, কখনও খেলে পরোক্ষে। ধর্মগুরুরা এইসব রাজনীতিগদের ক্ষমতায় আসতে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করে দেয়। প্রতিদানে এইসব রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা ধর্মগুরুদের পাশে থাকার নিশ্চয়তা দেয়। এর সদ্য তিন প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বঘোষিত ধর্মগুরু গুরমিত রামরহিম সিং-এর ঘটনা। এই গুরু ২০১৪ সালে হরিয়ানা বিধানসভার নির্বাচনে, ২০১৫ সালে দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর ভক্ত অনুগামীদের। ভোটে জয় এনে দিতে গুরু ভালো রকমের ভোটব্যাঙ্ক হতে পারে বুঝে বিজেপি-র বড় বড় নেতারা তার ডেরায় ছুটে যান। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ সাক্ষী মহারাজ, রামরহিম গুরুকে মহান নেতা বলে বন্দনা করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বচ্ছ ভারত আহ্বানে গুরু রামরহিম সিং সাড়া দেওয়ায় প্রকাশ্যে গুরুর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং প্রণাম জানিয়েছেন।

সাম্প্রদায়িকতা এভাবেই সমাজের বন্ধনকারী শক্তিকে, মানুষে মানুষে মিলনধর্মী স্বভাবকে বিনাশ করে। দীর্ঘকাল ধরে ভারতের সমাজ ও রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির প্রশ্ন যে উদ্বেগজনক হয়ে দেখা দিয়েছে, তা এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির সুযোগকে স্বার্থান্বেষীদের কাজে লাগানোর কারণেই।

অথচ সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে ধর্মব্যাপারের প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা নেই। ধর্মবিশ্বাসী মানুষ যেমন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হতে পারেন, আবার সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে কুৎসিত, বর্বর, শত্রুমনোভাব আখ্যা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী হতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও সাম্প্রদায়িকতার ভেদমূলক সংকীর্ণ মনোভাবকে নিন্দা করে বলেছেন—''ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা এককথায় শত্রু।'' রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিজীবনে ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও সাম্প্রদায়িকতাকে ''অতি কুৎসিত, অতি বর্বর উৎপাত'' আখ্যা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করেছেন এবং দেশবাসীকে আক্রমণ করার ডাক দিয়েছেন। গান্ধিজি সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ''হিন্দু এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার কোনোটাই যথার্থ নয়। সাম্প্রদায়িকতার মুখোশের আড়ালে রয়েছে রাজনৈতিক এবং সামাজিক স্বার্থের খেলার প্রতিক্রিয়া।'' নজরুল ইসলাম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঘড়্গহস্ত ছিলেন। ভারতে হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে রাজনীতির খেলা খেলেছে ব্রিটিশ সরকার তার মসনদ পাকা রাখতে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিদ্যমান পুরাতন ভেদকে নির্লজ্জভাবে বড়ো করে তুলেছে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। পরাধীন ভারতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ফলে বার বার দাঙ্গা হয়েছে। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯২২-২৭ এই ক-বছরে ১২২টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল। এই দুই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গার চূড়ান্ত দুর্ভোগ ভোগ করেছে ১৯৪৬-এ ১৬ থেকে ২০ আগস্ট পাঁচদিন ধরে কলকাতা (যা 'কলকাতা হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত)। এই হত্যাকাণ্ডের এক প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন যুগলচন্দ্র ঘোষ। তিনি দেখেছেন মৃতদেহগুলি বেলচা করে ট্রাকে তোলা হচ্ছে। এক অনুষ্ঠানে তিনি স্মৃতিচারণ করেছিলেন—''...আমি দেখলাম চারটি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকটিতেই মৃতদেহের স্তূপ অন্তত তিন ফুট উঁচু হয়ে আছে। গুড়ের মতো লরির মৃতদেহ থেকে রক্ত বেয়ে বেয়ে পড়ছে।... একটা খুন করতে পারলে দশ টাকা, আর আহত করতে পারলে পাঁচট টাকা।'' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এ হেন বীভৎসার নজির অতীতে মেলে না।

সাম্প্রদায়িকতার কারণ সন্ধানের এবং সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা সমাধানের উপায় নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পুরোধারা তাঁদের ভাবনাচিন্তার কথা শুনিয়েছেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িকতার মূলে নানা কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসাম্যকে। সাম্প্রদায়িক উৎপাতের সমাধান করতে হিন্দুমুসলমানকে অন্নে, বস্ত্রে, শিক্ষায় স্বাস্থ্যে গোড়ায় মেলাতে হবে। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে অধিকারের সমকক্ষতা সুনিশ্চিত করে এবং তাদের সমপর্যায়ে উন্নীত করে উভয়ের মিলন ঘটাতে হবে।

স্বাধীন ভারত সে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। বরং স্বার্থবাজ রাজনীতিকরা ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে জড়িয়ে দিয়ে এক দূষিত কূপ খনন করেছে। এই দূষিত কূপ থেকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার কালো বিষাক্ত ধোঁয়া উঠে সহিষ্ণুতা ও শুভবুদ্ধির ভারতীয় নির্মল আকাশকে ঢেকে দিয়েছে। স্বাধীন ভারতে ১৯৬১-র জব্বলপুরের দাঙ্গা, ১৯৭১-এ মহারাষ্ট্রের দাঙ্গা, ১৯৭৮-এর আলিপুর দাঙ্গা, ১৯৮১-র হায়দ্রাবাদের দাঙ্গা, ১৯৮৭-র মিরাট ও দিল্লির লজ্জাজনক মূঢ়তার দাঙ্গা, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ফলে ১৯৯৩-র দাঙ্গা, ২০০২-এ সবরমতি ট্রেনের কামরায় রামসেবকদের পরিকল্পিতভাবে অগ্নিদগ্ধ করে মারার নিষ্ঠুর ঘটনা ও গুজরাত জুড়ে সংখ্যালঘুদের পরিকল্পিত হত্যার বীভৎসতা, আমেদাবাদের দাঙ্গানগর আখ্যালাভ—এসবই ভারতের সহিষ্ণুতার গৌরবী ঐতিহ্যে কালি দিয়েছে। সে কালি ভারতের মুখময় লেপে দিয়েছে দেশের বর্তমান রাষ্ট্রশক্তি। ভারত সরকার ভারত দেশটাকে হিন্দুধর্মের মিলে মেলাতে চাইছে। স্বার্থবাজ রাজনীতিকরা ধর্মতন্ত্রী নেতাদের হাত ধরে ভারতের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে রাখঢাক না রেখে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের কর্মসূচি নিয়েছেন। ভারতের সাধারণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চরিত্র থেকে শক্তি সংগ্রহের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে বর্তমান রাষ্ট্রশক্তি। ক্রমশই ভারতবাসী প্রধান দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্রতর হয়ে উঠছে বিদ্বেষ-বিরোধ-হিংসা। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ মাথা তুলছে। তার পদদলনে পিষ্ট হচ্ছে মানবাত্মার সম্প্রসারণ। ভারতের সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার এই দূষিত আবহের জন্য সম্প্রতি, ২০১৭ সালেই, বিশ্বের দরবারে রাষ্ট্রপুঞ্জের মঞ্চে তীব্র ভাষায় ভারত সরকারের সমালোচনা করা হয়েছে। 'ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ ওয়ার্কিং গ্রুপ'-এর বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধি অ্যাটর্নি জেনারেল মুকুল রোহতগিকে মনে করিয়ে দিতে হয়েছে—ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতের কোথাও রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই। ধর্মনিরপেক্ষ এই দেশে সংখ্যালঘুদের অধিকার সুনিশ্চিত করাটা ভারতের মৌলিক নীতির মধ্যেই পড়ে। এই ঘটনায় বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে আমাদের এই সময়ের ইতিহাসের মুখে কালির পরত কি পুরু হয়ে পড়েনি?

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আকাঙ্ক্ষীরা মনে করেন, সাম্প্রদায়িকতার মতো কুৎসিত বর্বর মুখোশধারী শত্রুদের দমন করতে অন্যতম ফলদায়ক উপায় হল—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার দুর্ভোগ এবং সাম্প্রদায়িকতার তাস-খেলোয়াড়দের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করা। যুক্তিবিচারবোধ জাগিয়ে তোলা। সর্বোপরি জনসাধারণকে তাদের আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সর্বজনীন স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে সামিল করা।

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

সেখ আব্দুর রহমান

খানা জংশন, গলসী, বর্ধমান

Sl. No. 147

অরণ্য-যুদ্ধ অরণ্য-বাণিজ্য

শ্যামল চক্রবর্তী

লগ্নিপুঁজির ভুবন কতটা বিষময় তার প্রথম প্রমাণ আমরা যে দেশটিতে দেখেছিলাম তার নাম মেক্সিকো। স্তূপাকারে ডলার আসছিল সে-দেশে। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ মেক্সিকোর সরকার তাদের দেশের মুদ্রার মান ডলারের তুলনায় অর্ধেক করে দিল। মুখ থুবড়ে পড়ল সারা দেশ। পৃথিবী দেখল, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের আশীর্বাদধন্য একটি দেশ কেমন দ্রুত জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে যাচ্ছে। এই কুকর্মে আমেরিকার ভূমিকা ছিল প্রধান। দোসর ছিল কানাডা। মেক্সিকো মুদ্রার মান অর্ধেক হয়ে যাওয়ার ফলে প্রকৃত মজুরি কমে গেল। মানুষের জীবনযাত্রা হয়ে পড়ল দুঃসহ। জিনিসপত্রের দাম শতকরা ৩৫ ভাগ বেড়ে গিয়েছিল। কর্মহীনরা বেড়ে গিয়েছিল দ্বিগুণ। যুদ্ধ, বোমাবর্ষণ বা রক্তপাত কোনো কিছু নেই। একটা দেশ ভেতর থেকে লগ্নিপুঁজির হিংস্র আক্রমণে ভেঙে পড়ল। এমন সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ার কাহিনি রয়েছে অনেক দেশেরই। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ যোসেফ স্টিগলিৎজ এমন বিপদের কথা মানুষকে জানাতে বেশ কটি বই লিখেছেন।

লাতিন আমেরিকার একটি দেশ মেক্সিকো। উত্তর দিকে তার সীমানা হল আমেরিকা। ডোনাল্ড ট্রাম্প উঁচু দেওয়াল তুলে সীমান্ত বন্ধ করার হুমকি দিয়েছেন কিছুকাল আগে, খবরের কাগজে আমরা সকলে দেখেছি। সীমানার দৈর্ঘ্য ১৯০০ মাইল। ট্রাম্প বলেছেন এক হাজার মাইল দেওয়াল তুলতে হবে। বাকি ৯০০ মাইল বন-জঙ্গল-পাহাড়। দেওয়ালের দরকার পড়বে না। মনের আকাঙ্ক্ষা তার, 'কারুকার্যময়' দেওয়াল তুলবেন। পয়সা দেবে কে? ট্রাম্পমশাই বায়না ধরেছেন, মেক্সিকোকে কিছু টাকা দিতে হবে। মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি ওই 'প্রলাপ' হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। খরচ পড়বে কত? যারা এমন কাজ জানেন বোঝেন তাঁরা বলেছেন, পঁচিশ বিলিয়ন ডলার তো বটেই।

দেওয়াল মাহাত্ম্যে আপাতত দেওয়াল তুলে দিই। ভিন্ন কথায় যাই আমরা। ২০১০ সালের হিসেব মতো মেক্সিকোর জনবসতি বারো কোটি। অনেক ঝড়-জল-যুদ্ধ পেরিয়ে আজ থেকে একশো বছর আগে ১৯১৭ সালে মেক্সিকোর সংবিধান তৈরি হয়েছে। পুরোনো দেশ। জীববৈচিত্র্যের ভাণ্ডার। জীববৈচিত্র্যে প্রথম ব্রাজিল, দ্বিতীয় কলম্বিয়া, তৃতীয় ইন্দোনেশিয়া। তারপরই মেক্সিকো। মেক্সিকোর মুকুটে কী কী পালক শোভা পাচ্ছে প্রথমে আমরা বলে নিই। পৃথিবীতে মোট যত জীবপ্রজাতি আছে তার শতকরা বারো ভাগের কাছাকাছি রয়েছে মেক্সিকোয়। সংখ্যায় বলতে গেলে দুই লক্ষেরও বেশি। সরীসৃপ সংখ্যায় প্রথম ৭০৭টি সরীসৃপ প্রজাতি রয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রজাতিতে স্থান দ্বিতীয়। উভচর প্রজাতিতে স্থান চতুর্থ। স্তন্যপায়ী প্রজাতি রয়েছে ৪৩৮টি। উভচর প্রজাতি হয়েছে ২৯০টি। যে-কথা না বললেই নয়, উদ্ভিজ্জ প্রজাতির সংখ্যায় মেক্সিকো চতুর্থ। সেই সংখ্যা ছাব্বিশ হাজারের মতো। রকমারি জীবন নিয়ে গর্ব করতে চাইলে আর কোনো কিছুর দরকার পড়ে না। তবে গর্ব তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে যদি সেই বৈচিত্র্য রক্ষা করা যায়। কিন্তু রক্ষা করা যাচ্ছে না। পশ্চিমের দেশ খাবে ভিটামিন ও প্রোটিনে ভর্তি ফল অ্যাভোকোডো। বছরের বারো মাস মেক্সিকোতে এই ফল পাওয়া যায়। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই ফলের বাগান তৈরিতে। গোপনেও ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে জঙ্গলের জমি কিনে গড়ে উঠছে অ্যাভোকাডো ফলের বাগান। বছরে আড়াই ভাগের মতো বনজঙ্গল ধ্বংস হচ্ছে। ফলের বাগানে পোকার আক্রমণ রুখতে প্রয়োগ করা হচ্ছে তীব্র ও বিষাক্ত রাসায়নিক। এর ফল হচ্ছে মরাত্মক। আশপাশের মানুষ ও শিশুরা দুরারোগ্য অসুখের কবলে পড়ছে। পাইনের জঙ্গল দিন দিন সাফ হয়ে যাচ্ছে। ড্রাগ মাফিয়ারা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে সবকিছু। একটা অ্যাভোকাডো ফলের গাছ গভীর জঙ্গলের একটা গাছের চেয়ে কম করে দ্বিগুণ জল গ্রহণ করে। কখনও এক-দুই বছরে তার ফল বোঝা যাবে না। গভীর অরণ্যের যে জলের চাহিদা সেই জল যখন পাওয়া যাবে না, অরণ্য শুকিয়ে যাবে। অরণ্যে যে পশুপাখি, পোকামাকড়, জন্তুজানোয়ার থাকে তাদের বসতির চেহারা বদলে গেলে তারা আগের মতো আর থাকবে কেমন করে? মেক্সিকোর একটা প্রতিষ্ঠান হিসেব করে দেখেছে—২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ১৭০০ একর জঙ্গল নষ্ট হয়েছে। সরকারি আইন আছে। পাইন জঙ্গল কাটবার কথা নয়। যারা সমাজে সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখায় মেক্সিকো তেমন লোকেদের বাইরে নয়।

২০১৪ সালের 'লাতিন টাইমস্'-এর এক প্রতিবেদনে দেখা গেল, আমেরিকা বছরে ১,১৩৭,৭৪৯,৯৪১ পাউন্ড অ্যাভোকাডো খায়। এর শতকরা একষট্টি ভাগ মেক্সিকো থেকে রপ্তানি হয়। বিশাল বাজার। মেক্সিকোর যেখানে সবচেয়ে বেশি অ্যাভোকাডো-র ফলন হয় সেখান থেকে বছরে ৯৮৬ মিলিয়ন পাউন্ড অ্যাভোকাডো জাহাজে করে আমেরিকায় যায়। এর জন্য বছরে ১৫২ মিলিয়ন ডলার ড্রাগ-মাফিয়াদের তোলাবাজি দিতে হয়। মাফিয়াদের সিন্ডিকেট বাহিনী ঠিক করে দেয় প্রতি কিলোগ্রাম ফলের জন্য ৮থেকে ২৩ সেন্ট তোলাবাজি দিতে হবে। একবার দু-জন চাষি প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁদের দুজনেরই ফল বাক্সজাত করার গুদাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এই খবর বড়ো করে 'El Economista'-য় বেরিয়েছিল। ড্রাগ-মাফিয়া কোম্পানির নাম জানাজানি হয়ে যায়। হইচই হয় বেশ কিছুদিন। তারপর যা হয় এদের বেলায় সকল দেশে, আলাপ আলোচনা থিতিয়ে যায়। 'ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল' এই খবরটি ছাপিয়েছিল। টহলদার বাহিনীর হাতে দু-চারজন মারধর

খেয়েছে। স্থানীয় লোকজনেরা চাঁদা তুলে এই বাহিনী তৈরি করেছিল। হলে কী হবে! সরকার যে-বিষয়ে সচেতনভাবে উদাসীন সে-বিষয়ে গুণ্ডাবাহিনীর বিরুদ্ধে চাইলেই তো এগোনো যায় না। পাইনের জঙ্গল সাফ করে অ্যাভোকাডো-র চাষ হচ্ছে যেমন, পরিবেশের আরও একটা বড় বিপদও হচ্ছে। পাইন গাছ কেটে তার কাঠ দিয়ে অ্যাভোকাডো রপ্তানির বাক্স তৈরি হচ্ছে। বছরে এর জন্য যে বহু গাছ কাটতে হয় তা আমরা অ্যাভোকাডো রপ্তানির পরিমাণ থেকেই বুঝতে পারি।

লাতিন আমেরিকার অনেক দেশের মতো মেক্সিকো মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের এক মৃগয়াক্ষেত্র। বৃষ্টিস্নাত আমাজন অরণ্যের প্রায় সবটুকুই লাতিন আমেরিকার নানা দেশে পড়েছে। সেখানে রয়েছে প্রচুর কাষ্ঠল উদ্ভিদের ঘন জঙ্গল। এসব উদ্ভিদের দিকে মুনাফালোভীদের নজর সব থেকে বেশি। মধ্য মেক্সিকোর সিয়েরা মাদ্রে এক পাহাড়ি এলাকা। প্রচুর তার জীববৈচিত্র্য। সেখানে রয়েছে প্রচুর কাষ্ঠল উদ্ভিদ। সেই এলাকায় তারাহুমারা সম্প্রদায়ের নেটিভ মানুষেরা বহুকাল ধরে বাস করেন। পৃথিবীতে অনেক আদি সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন যাঁদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অসামান্য নৈপুণ্য দেখা যায়। তারাহুমারা সম্প্রদায়ের মানুষেরা অনেক লম্বা পথ অনায়াসে দৌড়ে যেতে পারেন। ভাবতে অবাক লাগে, দুদিনে এঁরা দুশো মাইল পথ দৌড়তে পারেন। স্পেন যখন মেক্সিকোর দখল নিয়েছিল, তারাহুমারাদের সংস্কৃতি বদলাতে পারেনি। পাদ্রিরা তাদের ধর্মান্তরিত করতে পারেনি। শাসকদল চেষ্টার ত্রুটি রাখবে কেন? তারাহুমারা মানুষেরা যেখানে থাকতেন সেখানে সতেরো শতকে খনি তৈরি করে। কিছু কিছু তারাহুমারাকে মজুরের কাজ দেয়। এমনকি কিছুদিন পরে পাদ্রিদের দিয়ে গির্জাও তৈরি করে। স্থানীয় মানুষেরা রাগে ফুঁসছিলেন। ১৬১৬ সালে আক্রমণ করে সাতজন পাদ্রিকে এঁরা মেরে ফেলেন। টানা এক দশক সেখানে গির্জা বন্ধ ছিল।

শাসক দলের আক্রমণ থামেনি। এরা খনির এলাকা বাড়িয়েই চলেছে। নতুন পাদ্রিদের নিয়ে এসেছে। এদের নিয়ে নানা জায়গায় গির্জা তৈরি হয়। তারাহুমারা বিদ্রোহীরা একটি গির্জা ভেঙে দেয়। দুজন বিদ্রোহী ধরা পড়ে যান। তাঁদের জীবন কেড়ে নেওয়া হয়। ছলে বলে কৌশলে উপনিবেশ শাসকেরা কিছু মানুষকে নিজেদের দলে টেনে নিলেও বেশিরভাগ সেই দলে ভেড়েনি। সমতলের তারাহুমারা মানুষেরা নিজেদের সমর্পণ করে। পাহাড়ি এলাকায় বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ জারি থাকে। এদের নেতা ছিলেন তেপোরাকা নামে একজন। গির্জা ধর্মের আফিম ছড়াতেই থাকে। স্প্যানিশ শাসকেরা তেপোরাকার খোঁজে নানা জায়গায় তল্লাশি চালায়। ১৬৯০ সালে তাঁকে ওরা মেরে ফেলে। এক সময় সমতলেও মিশনারিদের দাপট কমে আসে। ধর্ম যখন প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেঁকে বসে একবার, কাউকেই রেহাই দেয় না। বিশ শতকে আবার ধর্ম প্রতিষ্ঠানের চক্রান্ত বাড়ে। কখনও কখনও দেখা যায় এদের চক্রান্ত আর বহুজাতিকের আগ্রাসন-চক্রান্ত মিলে মিশে যায়। মিশনারিদের মধ্যে ভালো লোকজন কেউ কেউ ছিলেন। কয়েকজন মাফিয়াদের হাতে জীবনও দিয়েছেন। তবু লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশে দেশে মিশনারিদের চক্রান্তের কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না। ব্যতিক্রম তো সব জায়গাতেই থাকে।

মেক্সিকোর সবচেয়ে বড় রাজ্যের নাম চিহুয়াহুয়া। আয়তনে ব্রিটেনের চেয়ে সামান্য বড়ো। চোখে পড়ার মতো জীববৈচিত্র্যের ভাণ্ডার রয়েছে সেখানে। এই রাজ্যের সমতল এলাকা থেকে ধীরে ধীরে তারাহুমারা মানুষজনেরা পাহাড়ি এলাকায় বসতি গড়তে বাধ্য হয়েছে। তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার অবদান! আদি মানুষজনদের

তারাহুমারা সম্প্রদায়ের দুজন মানুষ

পিছিয়ে যেতে বাধ্য করে। অনেক জনজাতি সভ্যতার নিষ্পেষণে পৃথিবীতে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আশঙ্কা হয়, তারাহুমারা মানুষেরাও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না তো? কেন বলছি আমরা এমন? ২০০৬ সালে দেখা গিয়েছে, এমন মানুষের সংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ হাজার থেকে সত্তর হাজারের মতো। অনেকে গুহায় থাকে। পাহাড়ের বেরিয়ে থাকা ছাদের তলায় জায়গা নেয় অনেকে। পাথর বা কাঠের তৈরি ছোটো ছোটো ঘরেও থাকে। এদের নিজেদের কথা বলার ভাষা আছে। যদিও স্প্যানিশ ভাষা ধীরে ধীরে টুঁটি চেপে ধরছে। ভাষার রাজনীতি যেমনটা চলে, চলছে তেমনটাই। শহরে যারা ইঁদুরদৌড়ে ছুটছে তাদের জন্য গান গাওয়া হয়—'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও'। অথচ এমন গান প্রয়োজন পৃথিবীর সকল আদিবাসী মানুষের। চিহুয়াহুয়া রাজ্যের সিয়েরা মাদ্রে এলাকায় এককালে কাষ্ঠল উদ্ভিদের যে ঈর্ষণীয় অরণ্য ছিল আজ তার চেহারা দেখলে অরণ্যপ্রেমীদের মন খারাপ হতে বাধ্য। ২০০০ সালে এই এলাকার ওপর একটা বিস্তারিত সমীক্ষা হয়েছে। সেখানে এলাকার পরিচয় রয়েছে এরকম—''নানা বৈপরীত্যের সহাবস্থান এই এলাকায়। খনি, অরণ্য ও পর্যটন বাণিজ্যের পাশাপাশি ড্রাগ মাফিয়াদের অবাধ রাজত্ব। অরণ্য ও পাহাড়ি এলাকা মিলিয়ে লোকবসতি প্রায় দুলক্ষ আশি হাজার। এদের শতকরা কুড়ি ভাগ আদি জনজাতি নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে চাইছে। এই জনজাতিদের শতকরা বিরানব্বুই ভাগ তারাহুমারা সম্প্রদায়ের মানুষ। খনি ও অরণ্য বাণিজ্য যখন সবরকমের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, ওই মানুষেরা অস্তিত্বের বিপন্নতা অনুভব করে। কখনও কখনও প্রতিবাদে সামিল হয়।"

১৮৮৪ সালে মেক্সিকোতে অরণ্য আইন তৈরি হয়েছিল। সেই আইন ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষার পক্ষে যথাযথ। সরকারের

চরিত্র বদলাতে লাগল। নিয়মও বদলাতে থাকল। এখন এমন নিয়ম, বাইরের যে কেউ এসে জনজাতিদের জমি-জিরেতে থাবা বসাতে পারে। জায়গা জমি কিনতে পারে। খনি তৈরি করতে পারে।

যে সমীক্ষার কথা আমরা বলছিলাম সেখানে পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে, উদার অর্থনীতির প্রভাবে ১৯৯২ সাল থেকে নিয়মকানুনের বাধা আরও আলগা হতে শুরু করল। NAFTA-র অঙ্গুলি হেলনে (যারা ১৯৯৪ সালে মেক্সিকো সংকট ডেকে এনেছিল) ১৯৯৭ সালে আইনের বদল হয়। অবাধ বাণিজ্যের মৃগয়াক্ষেত্র চাই। সম্পদের নির্বিচার লুণ্ঠন চাই। রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, 'Ongoing shift in the government's economic paradigm toward liberalization, recruitment of foreign investment, and market-based mechanisms of environmental regulation.' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। জনজাতি মানুষেরা অরণ্যসম্পদকে নিজেদের আপনজন বলেই ভাবে। সে ভাবনা থেকে তারা নিজস্ব নিয়মে অরণ্যসম্পদ কাজে লাগায়। নষ্ট হতে দেয় না কখনও। সেই সর্বনাশ সাধন করেছে নয়া উদারবাদ। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ সালের ভেতর মেক্সিকোর ওই এলাকায় বহুগুণ কাঠ চেরাইয়ের কারখানা বেড়ে যায়। জনজাতির অরণ্য সংস্কৃতি আড়ালে চলে যায়। অকেজো হয়ে যায়। ১৯৯৭ সালে দেখা গেল, যে পাইন আর ওকের জঙ্গল দেশের ৯৩,৫৬০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছিল তার মাত্র ০.৬১ শতাংশ পড়ে আছে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই বাস্তব সত্য। সে-সময় লিখিত প্রতিবাদ জমা পড়েছে অনেক। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে নানা সংগঠনের পক্ষ থেকে 'তথাকথিত উদারবাদী' আগ্রাসন বন্ধ করার জন্য মোট ৪১১টি প্রতিবাদপত্র জমা পড়েছিল। শুধু পাইন আর ওক যে নিশ্চিহ্ন হয়েছে এমনটা নয়। সে এলাকায় রয়েছে খাবার মতো সাড়ে তিনশো রকমের উদ্ভিদ, ওষুধ তৈরির কাজে লাগে এমন ছশো রকমের উদ্ভিদ। এরাও সব হারিয়ে যাচ্ছে। পর্যটন বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে উঠছে বিশ্বব্যাঙ্কের বদান্যতায়। 'ইকো ট্যুরিজম' বা 'অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম'-এ কারোরই আপত্তি থাকার কথা নয়। বিশ্বব্যাঙ্ক চাইছে ভিন্ন ট্যুরিজম। পাঁচতারা হোটেল। পানীয় জলই মেলে না যেখানে, এক একবার বাথরুমে ফ্লাশ করে ছয় গ্যালন জল খরচ—এসব বহুজাতিক পর্যটন সংস্কৃতির অঙ্গ। এক সময় অরণ্য সম্পদ বেচাকেনার ছোটো মাঝারি অনেক কারখানা ছিল। নব্বুইয়ের দশকের পর তিন রাঘববোয়াল 'COPAMEX', 'GIDUSA' ও 'এম্প্রেসাস লা মডার্না' সব আত্মসাৎ করে নেয়। ওরাই এখন মেক্সিকোর অরণ্য-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য গুণ্ডাবাহিনী চাই। প্রশাসনে বশংবদ লোকজন চাই। রাষ্ট্রকর্তা বা কর্ত্রীর আদর্শ জনবিরোধী ও দুর্নীতি-অভিমুখী হলে তো সোনায় সোহাগা। কারও প্রতিবাদ সেই সাম্রাজ্যে যদি 'বাড়াবাড়ি' রকমের হয়ে যায় তবে তো তাকে মেরে ফেলতেই হবে। লগ্নিপুঁজির সহজ সরল নিদান। এই যে পাহাড়ি এলাকার কথা এতক্ষণ বললাম আমরা, সেখানে এমন ধ্বংসকাণ্ডের প্রতিবাদ করছিলেন এক তারাহুমারা মানুষ। নিজের সম্প্রদায়ের মানুষদের সংঘবদ্ধ করছিলেন। স্থানীয়ভাবে যে লোকটি চোরাকারবারে জড়িত ছিল তার কানে এই আন্দোলনের খবর পৌঁছে যায়। তাহলে কাজ কী? প্রতিবাদীকে চিরতরে সরিয়ে দাও। হলও ঠিক তাই। যখন এই ঘটনা ঘটছে, তাঁর কুড়ি বছরের ছেলে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে। নানাভাবে হারিয়ে যেতে পারত এই ছেলে। নিজেকে হারাতে দিল না। বড়ো হল। প্রতিজ্ঞায় অঙ্গীকারবদ্ধ হল, যতদিন বাঁচবে বাবার আদর্শ বুকে নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবে। বাবার মতোই হয়তো বা তাঁর জীবনের পরিণতি হবে, একথা ভেবে মুখ ফিরিয়ে থাকার মালমশলা জমেনি

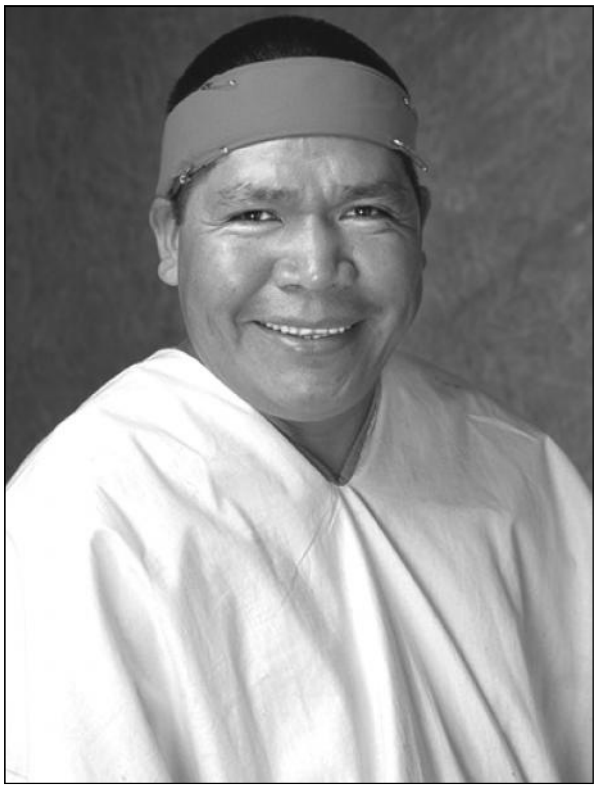

ইসিড্রো বালড্রেনেগা লোপেজ

তাঁর মস্তিষ্কে। কে তিনি? কী তাঁর নাম? ইসড্রো বালডেনেগ্রো লোপেজ। ১৯৬৬ সালে তাঁর জন্ম। ১৯৯৩ সালে যখন লোপেজের বয়স সাতাশ বছর, তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলেন। অরণ্যের সম্পদ রক্ষা এই সংগঠনের প্রধান কাজ। ধীরে ধীরে এঁদের আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। দেশবিদেশে সংবাদমাধ্যমের নজরে আসে। ২০০২ সালে বছর জুড়ে একাধিক আন্দোলন সংগঠিত করেন তিনি। যারা কাষ্ঠল সম্পদ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের সামনে অবরোধ তৈরি করেন। সাময়িক হলেও সরকারের টনক নড়েছিল। কিছুদিন এসব কাঠ পাচার বন্ধ থাকে। মুনাফা যেখানে বড়ো কথা, সেখানে এসব অসামাজিক কাজ চিরকাল বন্ধ থাকে না। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের পত্নীদের নিয়ে তিনি ২০০৩ সালে একটি বড়ো মিছিলের আয়োজন করেন। সরকার উদাসীন। বাধ্য হয়ে আদালতে যেতে হয়। আদালত কাঠচোরাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

লোপেজ কি এভাবেই মুক্ত থেকে যাবেন? ছক সাজানো হল। অস্ত্র রাখার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। নিষিদ্ধ ওষুধ চালানকারী হিসেবেও তাঁকে অভিযুক্ত করতে হবে। লোপেজের বাড়িতে একখানা অস্ত্র ও খানিকটা নিষিদ্ধ ওষুধ রেখে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। হলও ঠিক তাই। এই দুই অভিযোগে ২০০৩ সালেই তিনি গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। পনেরো মাস একটানা জেলে থাকতে হল তাঁকে। তাঁর গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে দেশ-বিদেশে প্রতিবাদ শুরু হয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মামলায় পক্ষ নিয়ে লড়াই করে। ফলে লোপেজ ২০০৪ সালে ছাড়া পেয়েছেন। ২০০৫ সালে তিনি গোল্ডম্যান পরিবেশ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন। একে পরিবেশের নোবেল পুরস্কার বলা হয়। যখন তিনি পুরস্কার আনতে গেলেন তখন এক প্রশ্নের উত্তরে লোপেজ জানিয়েছিলেন, ''পাহাড়ে

আন্দোলন করতে গেলেই কমপক্ষে তিন চারজনকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। গলা চড়িয়ে তারা বলে, আমার নাম ওদের এক নম্বরে রয়েছে।" আশ্চর্য, রাষ্ট্রযন্ত্র ঘুমোয়, প্রশাসন-কর্তারা ঘুমোয়। তিনি আরও বললেন, ''জেল থেকে ছাড়া পেলেও আমি নিজের লোকজনদের কাছে যেতে পারছি না।" এক সময় লোপেজ ভেবেছিলেন, থাকবার জায়গা বদলে আর কোথাও চলে যাবেন। তারপর মনে হল তাঁর, এত লোকজন নিয়ে তিনি যাবেন কোথায়? থাকবেন এখানেই, লড়াই করবেন। লোপেজ যখন লড়াই করছেন, অনেকে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বাবা যখন খুন হয়ে যান, কেউ তাঁর পাশে দাঁড়াননি। হয়তো ভয়েই, প্রাণ হারাবার ভয়ে। ২০০৩ সালে একবার একটি একুশ হাজার একরের জঙ্গল কেটে গাছ নিয়ে যাওয়ার আয়োজন শুরু হয়েছিল। লোপেজ ও তাঁর সহযোদ্ধারা পথ অবরোধ করেন। কোনো মাল বইবার গাড়িকে তাঁরা জঙ্গলের ভেতর ঢুকতে দেননি। কিছু মানুষ পথ অবরোধ করেছেন। কিছু মানুষকে নিয়ে তিনি রাজধানী শহরে মিছিল করেছেন। সরকার যে সে-সময় তাঁদের দাবি মেনেছিল তা আগেই আমরা বলেছি। কোনো হিংসার পথে যাননি লোপেজ। ধর্নায় বসেছেন। পথ অবরোধ করেছেন। তিনি বলতেন, যে কোনো বড়ো আন্দোলনে মানুষকে ধৈর্য ধরতে হয়। অহিংস পথে তিনি সহিষ্ণুতা রক্ষা করেছেন। শেষ পর্যন্ত লোপেজ নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না। এককালে গোল্ডম্যান পরিবেশ পুরস্কার পেয়েছিলেন হন্ডুরাসের পরিবেশকর্মী বার্টা কাসেরেস। তিনি খুন হয়ে যান। প্রকৃতি ও মানুষের শত্রুরা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ২০১৭ সালের ১৫ জানুয়ারি লোপেজকে খুন করে। এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন লোপেজ। সেখানে তাঁকে খুন করা হয়। পুলিশ বলেছে একজনকে নাকি চেনা গিয়েছে। ধরা যায়নি। চোখের সামনে ঘুরে বেড়ালেও অনেককে অনেক সময় পুলিশ ধরতে পারে না, তাই নয় কি?

ইসিড্রো বালডেনেগ্রো লোপেজের বাবা জুলিও বালডেনেগ্রো ১৯৮৬ সালে খুন হয়েছিলেন। বাবার আদর্শ ও তারাহুমারা মানুষদের শান্ত জীবনযাত্রা বাঁচিয়ে রাখতে নব্বুইয়ের দশকে কয়েকজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে লোপেজ 'সিয়েরা মাদ্রে অ্যালায়েন্স' নামে একটি সংগঠন গড়েন। তিনটি বিষয়ে এঁরা কাজ করেন। জনজাতি মানুষের অধিকার রক্ষা, জৈবসাংস্কৃতিক সংরক্ষণ ও লুপ্তপ্রায় জনজাতির পুনর্জীবনের কাজ। এমন কাজ করতে গেলে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার কথা বলতেই হয়। তখনই বাধে সংঘর্ষ। খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হয়। নিজস্ব সংস্কৃতির বৈচিত্র্য যেন ছড়িয়ে না যায় বিশ্বায়নের আগ্রাসনে, সেদিকেও মনোযোগের দরকার পড়ে প্রতিনিয়ত। নানা আন্দোলন ও প্রতিবাদ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এঁরা সরকারের ও বাইরের মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই মানুষেরা অনেক সময় কতটা তাদের চাইবার অধিকার সেকথাও জানেন না। সেই চেতনা গড়ে তোলবার কাজ তাই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাজ করতে গিয়ে এঁরা বুঝেছেন, কাজে পেশাদারিত্বের যথেষ্ট প্রয়োজন। আইনবিদ, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও চিকিৎকদের নিয়মিত সহায়তা ও পরামর্শ নিয়ে তাঁরা এগোন। দায়বদ্ধতা আর পেশাদারিত্ব এই দুয়ের মিলনে একটা সংগঠন উৎকর্ষ লাভ করে। দেশে দেশে যাঁরা পরিবেশ আন্দোলন করেন তাঁদের কাছে 'সিয়েরা মাদ্রে অ্যালায়েন্স' কোনো অপরিচিত নাম নয়। লোপেজ যখন জানুয়ারি মাসে খুন হলেন তার আগে একই এলাকায় আরও চারজন খুন হয়েছেন। তাঁদের খবর বিশেষ পাওয়া যায় না। গোল্ডম্যান পরিবেশ পদক পেয়েছেন বলেই হয়ত বা দেশ বিদেশ তাঁর নাম জানতে পেরেছে। যেমন জানতে পেরেছিল হন্ডুরাসের বার্টা কাসেরেসের নাম। লোপেজ খুন হবার পর তাঁর এক নিকটআত্মীয়া সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, ''তাঁকে মেরেও ওদের হুমকি থামছিল না। আমরা যারা তার আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব, বেশ কিছুদিন আমাদের ঘর ছেড়ে পালিয়ে থাকতে হয়েছিল।" লোপেজের মৃত্যু নিশ্চিত করতে আততায়ীরা ছ-খানা গুলি পরপর চালিয়েছে।

লোপেজের মৃত্যুর মাত্র দিন পনেরো পেরিয়েছে। তারাহুমারা সম্প্রদায়ের আরও এক পরিবেশকর্মী যোয়কন ওন্তিভেরোস রামোজ-কে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন মানুষ। তারপর তাঁকেও ওরা গুলি করে মেরে ফেলল। তখন তাঁর বয়স ছিল বিয়াল্লিশ বছর।

একটি লেখায় ক-জন পরিবেশ শহিদের কথা বলব আমরা? 'গ্লোবাল উইটনেস' বিস্তারিত সমীক্ষা করে আমাদের জানিয়েছে, ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের ভেতর শুধু মেক্সিকোতেই তেত্রিশজন পরিবেশকর্মী খুন হয়েছেন। সত্যি বলতে কী, এঁদের 'পরিবেশ শহিদ' বললে সবটা হিংস্রতা ধরা পড়ে না। কর্পোরেট বাণিজ্যের লালসার শিকার এঁরা সকলে। 'পরিবেশ শহিদ' বললে উচ্চারণে কেমন যেন এক স্নিগ্ধ আবহ তৈরি হয়। আমরা তা চাই না।

২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে লোপেজ নিহত হয়েছেন। মার্চ মাসের মাঝামাঝি একজন খুনি ধরা পড়েছে বলে দাবি করেছে প্রশাসন। তার নাম রোমিও। বয়স একুশ। সে নাকি বলেছে, একটি ৩৮-সুপার পিস্তল থেকে গুলি চালিয়েছে সে। কেন? লোপেজের সঙ্গে বহুকাল ধরে 'ব্যক্তিগত' শত্রুতা ছিল। লোপেজের বুকে, পেটে ও ডান পায়ে গুলি চালিয়েছে। নিছকই 'ব্যক্তিগত' শত্রুতা? তার বাইরে কিছু নয়? দিনের পর দিন যিনি হুমকি পেতেন, জেল থেকে বেরোবার পর যাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজনদের কাছে যেতে দেওয়া হত না, সে কি 'ব্যক্তিগত' শত্রুর হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্যে? ধনকুবের ব্যবসায়ী ও মাফিয়ারা তাদের কুকর্মকে আড়াল করতে চাইছে না তো? সেখানকার বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন, আড়ালে আছে কোনো বড়ো হত্যাকারী। সে নিজের হাত 'ময়লা' করার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই রোমিওকে খুনের কাজ সমাধা করতে পাঠানো হয়েছে। রহস্য লুকিয়ে আছে আর কোথাও, অন্য কোনোখানে। সিয়েরা মাদ্রে অ্যালায়েন্সের প্রধান ছিলেন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ইজেলা গন্‌জালেজ ডায়াজ। তিনি সরাসরি বললেন, ''রোমিও হয়তো ইসিড্রো-কে খুন করেছে। তবে এই খুনের মাথা আর কেউ।" তিনি দাবি তুলেছেন, ''আমরা তাঁর মৃত্যুর তদন্ত চাই। পরিবেশ বাঁচাতে আরও যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের জীবনহানিরও তদন্ত চাই।"

যে এলাকায় জন্মেছেন ইসিড্রো লোপেজ সেই এলাকাতেই জন্মগ্রহণ করেন এডউইন বাস্তিলজ গার্সিয়া। লোপেজের চেয়ে দু-বছরের বড়ো তিনি। ১৯৬৪ সালে জন্ম। বাবার মৃত্যুদৃশ্য লোপেজকে সংগ্রামের দায়বদ্ধতায় অঙ্গীকারবদ্ধ করেছিল। গার্সিয়া দায়বদ্ধতা অর্জন করেন জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। লেখাপড়া করার সুযোগ হয়েছে তাঁর। বিশ্বব্যাঙ্কের অরণ্য সৃজন অভিযানের যে বিশাল কর্মযজ্ঞ তার একজন আঞ্চলিক প্রকল্প আধিকারিক হিসেবে জীবন শুরু করেন। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সেখানে কাজ করেছেন। বিশ্বব্যাঙ্কের বনসৃজন নীতি তাঁর ভালো লাগেনি। কিছুদিন তিনি এখানে ওখানে চাকুরি করেন। এমনকি এক বছর সিয়েরা শহরে একটি বড়ো কাঠচেরাইয়ের কোম্পানিতেও এক বছর কাজ করেন। প্রতিদিন তাঁর নজরে পড়ে কেমন করে বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে তাঁর জন্মভূমি। বনাঞ্চলের মানুষেরা কেমন করে তাদের জীবনযাত্রা থেকে ক্রমাগত উচ্ছেদ হচ্ছে। অপহৃত হচ্ছে মানুষের অধিকার। মেরুদণ্ড ঋজু যাঁদের তারা এমন নিষ্পেষণে মূক ভূমিকা

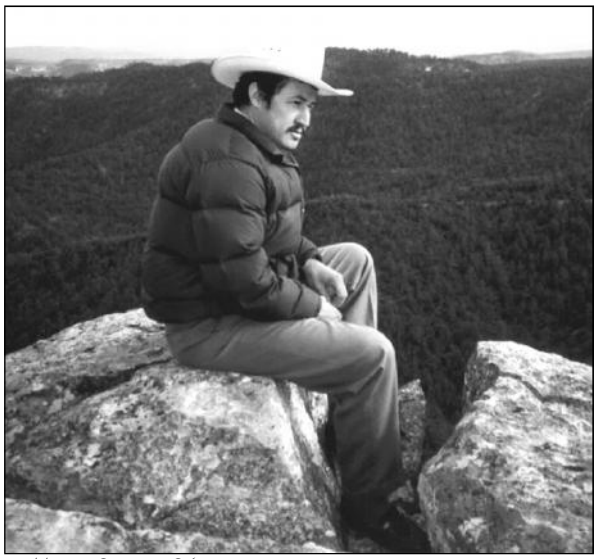

এডউইন বাস্তিলজ গার্সিয়া

পালন করতে পারেন না। যখন তিনি বিশ্বব্যাঙ্কের চাকুরি ছাড়ছিলেন তখন একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এর কাজ হবে পরিবেশ রক্ষা ও জনজাতি মানুষের অধিকার রক্ষা। লোপেজ ও গার্সিয়া দুজনেই ছিলেন তারাহুমারা সম্প্রদায়ের সন্তান। যখন তিনি ও তাঁর সংস্থার সদস্যেরা অরণ্য রক্ষার কথা বলছেন, ড্রাগ কারবারিদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, প্রাণনাশের হুমকি প্রাপ্তি ছিল তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। মারিজুয়ানা আর আফিমের চাষ হত রমরমিয়ে। জঙ্গলের জীববৈচিত্র্য এর ফলে ভীষণভাবে বদলে যেত। প্রশাসনে খবর পৌঁছে দিতেন। প্রশাসন-কর্তাদের আচার আচরণ থেকে অশুভ বন্ধনের আঁচ পেতেন। সর্ষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে, তাকে ধরবে কে? মাঝে মাঝে প্রশাসন সক্রিয় হয়ে জনা কয় মানুষকে গ্রেপ্তার করত। আশ্চর্য হল, এরা সকলে তারাহুমারা জনজাতির লোক। অরণ্যরক্ষার আন্দোলনের অংশীদার ও মানবাধিকার কর্মী।

১৯৯৪ সালে মেক্সিকোতে কী সর্বনাশা কাণ্ড ঘটেছে তা দিয়ে আমরা এই নিবন্ধ শুরু করেছিলাম। ১৯৯৪ সালের ৯ জানুয়ারি 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স' পত্রিকায় অ্যালান ভাইজম্যান একটি প্রতিবেদন রচনা করেন যার শিরোনাম ছিল—'Drug Lords *vs* The Tarahumara: Trafficers Are Invading Mexico's Most Spectacular Forests, Destroying Ancient Trees—and Any Natives who object.' প্রতিবেদনের শিরোনাম অতি স্পষ্ট। এই লেখায় গার্সিয়ার কথা লিখেছেন ভাইজম্যান। বিশ্বব্যাঙ্ক টাকা দিয়ে যখন কাষ্ঠল উদ্ভিদের অপহরণকাণ্ডকে মসৃণ করতে চেয়েছিল তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। গার্সিয়া তখন বিশ্বব্যাঙ্কে কাজ করছিলেন। তাঁর মননেও প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়। তখন তিনি চাকুরি ছেড়ে দেন। বিশ্বব্যাঙ্ক আটচল্লিশ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করেছে। মার্কিনভক্ত রাষ্ট্রপতি মেক্সিকোর পক্ষ থেকে সমান পরিমাণ অর্থ দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। চিহুয়াহুয়ার গভীর অরণ্যে এবার কর্কশ যন্ত্রের আঘাত পড়বে। যারা আফিমের চাষ করছে এবার আর তাদের মাল শহরে আনতে লুকোচুরি খেলতে হবে না। প্রশস্ত পথ দিয়ে অতি সহজে চলে যাবে। দু-একদিন প্রশাসনের হাতে ধরা পড়বে। বাকি দিনগুলি নিশ্চিত। দু-একদিন ধরা না দিলে প্রশাসনের অফিসে তালা ঝুলে যাবে না! পুলিশের হাতে অস্ত্রেরও অভাব। এক 'সৎ' পুলিশ অফিসার নাকি প্রতিবেদককে বলেছিলেন, ''কেমন করে লড়ব বলুন। গাছ বাঁচাতে গেলে তাদের এক একটি অস্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের পঞ্চাশ জন পুলিশকর্মী দরকার। কোথায় পাব আমরা?'' আমাদের দেশে যে বীরাপ্পন দস্যু রাজত্ব করে গেল বহুকাল, কেমন করে তা সম্ভব হয়েছিল, নানা লেখায় আমরা তা পড়েছি।

মেক্সিকো থেকে মোট চারজন পরিবেশকর্মী 'গোল্ডম্যান পরিবেশ পুরস্কার' বা 'গ্রিন নোবেল' পেয়েছেন। প্রথম যিনি পেয়েছেন তিনি এডউইন গার্সিয়া। ১৯৯৫ সালে তিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন। ২০০৫ সালে পেয়েছেন লোপেজ। এডউইন মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। এমন মানুষেরা চলে গেলে পৃথিবী দরিদ্রতর হয়ে যায়। এই লেখার মাঝখানে যে সমীক্ষার কথা আমরা বলেছি,তার শুরুতে একটি উদ্ধৃতি রয়েছে যা দিয়ে আমরা নিবন্ধটি শেষ করব। সরকারের ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে পরিবেশকর্মীরা যে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন এই উদ্ধৃতিটি আমরা সেখান থেকে সংগ্রহ করেছি :

''আমরা আমাদের সম্ভুষ্টি নথিভুক্ত করতে চাই। আমরা অন্যদের জানাতে চাই, অরণ্য দিয়ে সিয়েরার আরও অনেক মানুষ আমাদের মতো করেই ভাবেন। কাঠচেরাইয়ের কথা বলতে বলতে আমরা ক্লান্ত। অবৈধভাবে কাঠ কিনে যারা দেশের বাইরে পাচার করছে, বলতে হতাশ লাগছে যে PROFEPA, SEMARNAP, রাষ্ট্রীয় আইন ও আরক্ষা বিভাগ ও বেশ কয়েকটি মন্ত্রীর দপ্তর এমন দৃশ্য সহ্য করে চলেছে।''

With best compliments of

S.K. TRADER

Burdwan

Sl. No. 144

Happy Puja Greetings from

Balaji Glass Pvt. Ltd.

SALANPUR, PASCHIM BARDHAMAN

Sl. No. 29

ঔপনিবেশিক যুগে বর্ধমানে উচ্চশিক্ষার বিস্তার ও রাজ কলেজ

প্রবাল সেনগুপ্ত

বিদ্যালয়-শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেই নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার ইমারত গড়ে ওঠে। বর্ধমান শহরেও ঔপনিবেশিক যুগে উচ্চশিক্ষার বিস্তার এই পথেই ঘটেছিল। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগেই বর্ধমানে শিক্ষার একটি ধারা প্রবাহিত ছিল। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বর্ধমান শহরে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যথেষ্ট সংখ্যক পাঠশালা গড়ে উঠেছিল। সে সব পাঠশালায় '3Rs' অর্থাৎ 'রিডিং', 'রাইটিং' ও '(অ্যা)রিথমেটিক' শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের 'বাস্তব জগতের' শিক্ষা দেওয়া হতো। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের উইলিয়াম অ্যাডামের রিপোর্ট থেকে আমরা বর্ধমান মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতাধীন সংস্কৃত পাঠশালার অস্তিত্বও বর্ধমান শহরে ছিল—তা জানতে পারি। এর পাশাপাশি মোঘল শাসনের সময় থেকে শহরে মাদ্রাসা-মক্তব কেন্দ্রিক শিক্ষাধারাও বর্ধমান শহরে ছিল। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে শহরে দুটি ভার্নাকুলার বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর মাধ্যমেই বর্ধমানে পাশ্চাত্য ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থা প্রথম প্রচলিত হয় বলে মনে করা হয়।

বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য বর্ধমানের উচ্চশিক্ষা তথা কলেজ শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ। এটা ঠিক, বর্ধমান শহরে উঠতি সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিজাত ভদ্রলোক শ্রেণি তাদের সীমিত স্বার্থে (মূলত নিজস্ব জমিজমার হিসাব রক্ষণ ও প্রশাসনে রাজএস্টেটের হিসাব-নিকাশ ও দৈনন্দিন কাজের প্রয়োজনে), শহরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সীমিত উন্নয়নে ব্রতী হন। এই পর্যায়ে তাঁরা কলেজীয় শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। এর বদলে, শহরের বর্ধিষ্ণু মানুষেরা, নিজেদের 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী' সন্তানদের উচ্চশিক্ষা লাভার্থে কোলকাতা বা নিদেনপক্ষে হুগলি, কৃষ্ণনগর অথবা মেদিনীপুরের ইংরেজ সরকার-সৃষ্ট কলেজগুলিতে পাঠানোই শ্রেয় মনে করেছিলেন।

শহরে কলেজ-শিক্ষার প্রসার ঘটলে, সাধারণ জনতার শিক্ষিত সন্তানদের সঙ্গে ভদ্রলোক শ্রেণির সন্তানদের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনায় বর্ধিষ্ণু সমাজ ভীত ছিল। চিকিৎসক, উকিল, কেরানি বা নিদেনপক্ষে শিক্ষকতার চাকুরিতে যে একচেটিয়া অধিকার তাদের ছিল, কোনো অবস্থাতেই তাকে ক্ষুণ্ণ করতে চায়নি—এই শ্রেণি। শহরে প্রাথমিকভাবে তাই কলেজ শিক্ষার বিস্তারে নিস্পৃহই ছিল তারা। শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণকারী বর্ধমান মহারাজাদের ভূমিকাও প্রাথমিক স্তরে ভিন্ন ছিল না। তাঁদের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার জন্য, সেইভাবে 'উচ্চ শিক্ষিত' মানুষের প্রয়োজনও পড়েনি। ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু বহিরাগত উচ্চশিক্ষিত মানুষ ও বর্ধমানের যে সমস্ত ব্যক্তি কলকাতা ইত্যাদি স্থানে উচ্চশিক্ষায় রত ছিল তাদের দ্বারাই মিটে যেত।

ব্রিটিশ সরকারও প্রাথমিকভাবে তাঁদের আর্থ-রাজনৈতিক

প্রয়োজনে কলেজ শিক্ষাকে কিছু পরিমাণে উৎসাহ দিলেও, ১৮৮০ থেকেই উচ্চস্তরের চাকুরির স্বল্পতা ও সে-কারণে শিক্ষিত বেকার বৃদ্ধির সম্ভাবনায় এক্ষেত্রে 'দ্বার বন্ধের' সংকীর্ণ নীতি নেয়। বেকার যুবকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠবে, একথা বুঝতে পেরে তারা শংকিত হয়ে উঠেছিল। তাদের এই সংকীর্ণতাকে ছদ্ম আদর্শের মোড়কে ঢাকবার জন্য প্রচার করা হতো, 'অনেককে বঞ্চিত করে, স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা বিলাসিতা মাত্র।'

সেই সময় কলকাতাকে বাদ দিয়ে, বর্ধমান বিভাগে মাত্র তিনটি কলেজ ছিল—হুগলি, শ্রীরামপুর ও মেদিনীপুর কলেজ। স্বভাবতই বিশাল বর্ধমান বিভাগের উচ্চাকাঙ্ক্ষী উচ্চশিক্ষালাভে উৎসুক যুবকদের চাহিদা পূরণের বিশেষ সামর্থ্য এদের ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের প্রথম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্ধমান রাজ কলেজের স্থাপনা হয়। এর অব্যবহিত পূর্ব থেকেই বর্ধমান রাজ স্কুল সহ অন্যান্য স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এর মধ্যে কিছু কিছু ছাত্র স্কুল-পর্যায়ের শিক্ষাকে পাথেয় করে, সরকারি-অসরকারি প্রশাসনে 'কাজ' যোগাড় করতে পারলেও, বেশিরভাগের সামনে 'বাধ্যতামূলক উচ্চশিক্ষা' লাভের পথ ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। আর যাই হোক, বাপ-দাদাদের পেশা ব্যবসা বা কৃষিকাজে ফেরা তাদের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। এই মনোভাবের ভালোমন্দ বিচার অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ। স্বভাবতই ধীরে ধীরে হলেও, বর্ধমানে কলেজ-শিক্ষা প্রসারের দাবি জোরদার হতে থাকে।

এদিকে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রাজ স্কুলটি ১৮৫৪-তে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৮৮০-র মধ্যে শুধু এই স্কুলটি নয়, সি.এম.এস., টাউন স্কুল, মিউনিসিপ্যাল স্কুল—শহরের সবকটি বিদ্যালয়ই উচ্চবিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। Feeder স্কুল তৈরির ফলে কলেজশিক্ষার দাবিও জোরদার হয়ে ওঠে। বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখায় বলা হয়, ''বর্ধমানকে লোকে যে কারণে অবজ্ঞা করে থাকে, সে কারণটি হল বিদ্যার অভাব। এখানে মহারাজার স্কুল, মিশনারি স্কুল, ২০টি গুরুমহাশয়ী পাঠশালা—সবই আছে, তথাপি এই অভাব রয়ে গেছে।'' অভাব দূর করবার উপায়ও বাতলেছেন 'সোমপ্রকাশ'-এর সম্পাদক—''উপায়টি হল, কৃষ্ণনগরের মত বর্ধমানেও একটি সরকারী কলেজ স্থাপিত হওয়া উচিৎ।''

বিদ্যোৎসাহী বর্ধমানাধিপতি মহতাব চন্দ্ যখন শাসনক্ষমতায় আসীন (১৮৩২-৭৯), তখন তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও বর্ধমানে কোনো কলেজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। আসলে এই বিষয়ে মহারাজার সবিশেষ চেষ্টা থাকলেও, রাজবৃত্তের অন্তর্গত ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় নিজেদের শ্রেণিস্বার্থেই বর্ধমানে কোনো কলেজ স্থাপনের বিরোধী ছিল। প্রচেষ্টা তাই ফলবতী হয়নি। পরবর্তী রাজা আফতাবচন্দ্ ১৮৮১-তে ক্ষমতায় আসীন হন। মহারাজার স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সেই সময় নতুন ভবনের নির্মাণ শুরু হয়। অনেকে বলেন, নতুন কলেজ স্থাপনের কথা মাথায় রেখেই নতুনগঞ্জের এই প্রসাদতুল্য ভবনটি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধা ঠেলে, আফতাবচন্দ্-এর অর্থানুকূল্যে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর রাজ স্কুলেরই সম্প্রসারিত অংশে রাজ কলেজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার তৎকালীন লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর স্যার অ্যাসলি ইডেন প্রতিষ্ঠানটির দ্বার উন্মোচন করেন। নিজ বক্তৃতায়, সরকারি কোনো সাহায্য ছাড়াই এরকম একটি কলেজ প্রতিষ্ঠাকে তিনি 'বর্ধমান মহারাজের অনন্য কৃতিত্ব' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে মনোনীত হন রাজ স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক ডব্লু বিলিংস। অ্যাসলি ইডেন প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে আরও বলেন, সমবেত প্রচেষ্টায় নয়, মহারাজের একক উদ্যোগে গঠিত এই প্রতিষ্ঠান, দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মহান উৎসাহ ও গুরুত্বদানের এক নিদর্শন। সাম্রাজ্যশাহীর পতাকাবাহী হলেও দূরদ্রষ্টা মানুষটির কথা মিথ্যা হয়নি। কলেজের পরবর্তী ইতিহাস তার প্রমাণ।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে যাত্রা শুরুর পরে, রাজ কলেজে শুধুমাত্র 'F.A' বা 'First Arts' পড়ানো হতো। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্ররাই এখানে ভর্তি হতো। একই বিল্ডিং-এ এবং একই প্রশাসনের অধীনে থাকার কারণে রাজ স্কুলের ছাত্ররাই কলেজে সংখ্যাগুরু ছিল। প্রথম বছরে (১৮৮১-৮২) প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র নয় জন। সেই বছরে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কলেজের এক ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে এবং দুই জন তৃতীয় বিভাগে পাশ করে। প্রথম বিভাগ কেউ না পেলেও, নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছে এই ফলের গুরুত্ব বড় কম ছিল না। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রটির নাম ছিল শশিভূষণ দত্ত। পরের বছরই অবশ্য কলেজের মান ও রেজাল্টের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। সে বছর মোট পরীক্ষার্থীদের ভিতর, প্রথম বিভাগে একজন, দ্বিতীয় বিভাগে পাঁচ জন ও তৃতীয় বিভাগে এগারোজন উত্তীর্ণ হন।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন মিস্টার ডব্লু বিলিংস্। প্রারম্ভিক পর্বে কলেজে মাত্র তিন জন পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন কুঞ্জলাল নাগ, বটকৃষ্ণ সেন ও রামনারায়ণ দত্ত। অধ্যাপকের স্বল্পতা সত্ত্বেও অবশ্য প্রতিষ্ঠানটির পঠনপাঠনে সেরকম কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। একই ছাতায় অবস্থিত কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ তখন কলেজের ছাত্রদেরও পাঠদান করতেন। এই সমস্ত শিক্ষকদের মধ্যে ডব্লু ভি ডান্‌সকুর, জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নৃসিংহ মুরারী পাঁজা, যোগেন্দ্রলাল মজুমদার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

তবে ক্রমান্বয়ে অধ্যক্ষ পরিবর্তন প্রাথমিক পর্যায়ে রাজ কলেজের প্রশাসনিক দুর্বলতাকেই প্রকট কর তুলেছিল। ডব্লু বিলিংস মাত্র এক বছরের মধ্যে অধ্যক্ষের পদ থেকে অব্যাহতি নেন। তার পরের পাঁচ বছরের মধ্যে কুঞ্জলাল নাগ, রামনারায়ণ দত্ত, উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বল্প সময়ের জন্য পরপর অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। অবশ্য যেহেতু অধ্যক্ষ নন—বাস্তবে রাজ এস্টেটের ম্যানেজারই ছিলেন কলেজ পরিকালনার মূল কাণ্ডারী, তাই প্রতিষ্ঠানটির দৈনন্দিন পঠন-পাঠনের কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলেছিল—এটা আমরা অনুমান করতে পারি। সর্বোপরি বর্ধমানের মহারাজার সদাসতর্ক দৃষ্টি তো কলেজের ওপর ছিলই। বর্ধমানে কলেজ শিক্ষর প্রসার তাঁর কাছে ছিল 'প্রেস্টিজ ফাইট'।

প্রথম দিকে এফ.এ. পাঠক্রমে কলা বিভাগের বিষয়গুলির সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বা গণিতের মতো বিজ্ঞানের বিষয়গুলিও পড়তে হতো। প্রয়োজন ছিল ল্যাবরেটরির। রাজ সরকারের আর্থিক সহায়তায় কলেজে একটি উন্নত মানের ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। প্রথম ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন অমরনাথ মিশ্র। কলেজ লাইব্রেরিও প্রথম থেকেই যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। 'রাজ সংগ্রহের দান' ছাড়াও পুস্তক ক্রয় করাও হতো। ১৮৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দে পাঠাগারের পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৪,৩৪২টি। প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন অরুণচন্দ্র রায়। এছাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে পাঁচুকুমার সিংহরায়, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কলেজের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব সামলেছেন।

প্রথমবাধিই সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডে কলেজটি যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিল। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কলেজে বিভিন্ন রকম খেলা, বিশেষ করে জিমন্যাসিয়ামের ক্লাস অনুষ্ঠিত হতো। রাজ কলেজের প্রথম ক্রীড়াশিক্ষক ছিলেন হরিগোপাল ঘোষ। এছাড়া বিভিন্ন সময়পর্বে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন, নয়নচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অনন্তরাম দত্তের মতো শিক্ষকরা। ছাত্রদের বৌদ্ধিক উন্নতির জন্য সময়ান্তরে বিতর্কসভারও আয়োজন করা হতো। এ-বিষয়ে অধ্যাপক লোকনাথ মিত্রের (১৮৯১) বিশেষ উৎসাহ ছিল।

এইভাবে কলেজের গড়ে ওঠার বছরগুলিতে যেমন ক্রমশ ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছিল, তেমনি পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষাধারাও ক্রমোন্নত হয়েছিল। এই পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কলেজের ছাত্রদের পাসের হার বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় চল্লিশ শতাংশে দাঁড়ায়। সেই যুগের নিরিখে এর মূল্য বড় কম নয়। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে এফ.এ. পরীক্ষায় কলেজের ছাত্র ফণীন্দ্রলাল সেন বিশ্ববিদ্যালয়ে নবম স্থান অধিকার করে।

১৯০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজ পর্যায়ে এফ-এ কোর্স বাতিল করে ইন্টারমিডিয়েট কোর্স চালু করে। পূর্বোক্ত কোর্সে কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচির সমন্বয় থাকলেও ইন্টারমিডিয়েটে বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার পৃথকীকরণ করা হয়। রাজ কলেজে প্রথমে শুধুমাত্র কলাবিদ্যা চর্চার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দেই কলেজ পরিদর্শন করতে আসেন পি কে রায় ও পল ব্রসের মতো স্বনামধন্য শিক্ষবিদগণ। তাঁরা অবিলম্বে কলেজে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র পাঠের বন্দোবস্তের পক্ষে রায় দেন। বর্ধমানের মহারাজাকেও তাঁরা এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। অবশ্য বিভিন্ন মহলের অনীহার ফলে ১৯৩৬-এর আগে রাজ কলেজে বিজ্ঞান পড়াবার বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়নি।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে কলেজে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা হয়। সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুযায়ী 'কলেজ কাউন্সিল' থাকা সত্ত্বেও রাজ কলেজের সমস্ত কাজই মহারাজের ইচ্ছা অনুসারে চলতো। রীতি অনুযায়ী বর্ধমানরাজের ম্যানেজারই কলেজের হর্তাকর্তা ছিলেন। এমনকি অধ্যক্ষও তাঁকে সমঝে চলতেন। কিন্তু উক্ত বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী কলেজের পরিচালন সমিতি গঠন করতে রাজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন। এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলে ক্ষেত্রবিশেষে অসন্তোষের ঝড় ও আনন্দের বান ডেকে যায়। এই কলেজে পরিচালন পর্ষদের সভাপতি হিসেবে বর্ধমানরাজের কর্তৃত্ব অটুট থাকলেও, নিত্যকার কাজকর্মে সম্পাদকের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। অবশ্য কর্মসমিতির সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতভেদ হলে পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা রাজার হাতেই ন্যস্ত হয়। যাই হোক, এর ফলে এতদিনকার ম্যানেজারের কর্তৃত্ব নষ্ট হয় এবং শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, ছাত্রাবাস পরিচালনা, ছুটির নিয়মাবলী তৈরি প্রভৃতিতে কর্মসমিতির পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পুনর্গঠিত কর্মসমিতির প্রথম সম্পাদক হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ উমাচরণ মুখোপাধ্যায়। এছাড়া অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় ও মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান মৌলবী আবদুল মণ্ডলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে কলেজে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা হয়। সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুযায়ী 'কলেজ কাউন্সিল' থাকা সত্ত্বেও রাজ কলেজের সমস্ত কাজই মহারাজের ইচ্ছা অনুসারে চলতো। রীতি অনুযায়ী বর্ধমানরাজের ম্যানেজারই কলেজের হর্তাকর্তা ছিলেন। এমনকি অধ্যক্ষও তাঁকে সমঝে চলতেন। কিন্তু উক্ত বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী কলেজের পরিচালন সমিতি গঠন করতে রাজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন।

এদিকে নবপ্রবর্তিত আই-এ পরীক্ষায়ও কলেজের ফল উত্তরোত্তর সন্তোষজনক হচ্ছিল। ১৯০৯-১০ খ্রিস্টাব্দে উত্তীর্ণ ছাত্রের শতকরা হার ছিল বিয়াল্লিশ শতাংশ। ওই সময়ের কৃতী ছাত্র নরেন্দ্রনাথ হাজরা উত্তরজীবনে এই কলেজেই তর্কবিদ্যার অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেছিলেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে সারা কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরিখে রাজ কলেজের ছাত্র শ্রীশচন্দ্র সিংহ দ্বিতীয় ও রাধাশ্যাম মিত্র পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রফুল্লকুমার বসু নবম স্থান পান। আর ১৯১৯-এ কলেজটির ভুবনবিখ্যাত ছাত্র সুকুমার সেন বাংলা-সংস্কৃত-তর্কবিদ্যা ও গণিতে শতকরা আশি নম্বর পেয়ে কলেজ তথা সারা বর্ধমানের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।

কলেজের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে। সেটি হল শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত বিষয়। ঔপনিবেশিক যুগে অন্যান্য স্তরের শিক্ষকদের মতোই অধ্যাপকদের বেতনও খুব কম ছিল। বর্ধমান রাজ কলেজ তার ব্যতিক্রম হয়নি। অধ্যক্ষের মাসিক বেতন প্রারম্ভিক পর্বে ছিল মাত্র তিনশো টাকা। এর সঙ্গে নামমাত্র ভাড়ায় একটি বাসগৃহ তাঁর জন্য বরাদ্দ থাকতো। ইতিহাস ও তর্কবিদ্যার অধ্যাপকদের বেতনক্রম ছিল ১০০-১৩৫ টাকা। ইংরেজি ও গণিতের অধ্যাপকরা একটু বেশি বেতন পেতেন—সাকুল্যে ১৫০ টাকা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে করুণ। মাসিক ৬০ টাকাতেই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হতো।

১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দ কলেজের ইতিহাসে একটি জলবিভাজিকা হিসেবে গণ্য হতে পারে। ওই বছরে প্রতিষ্ঠানটিতে বিএ পাঠ্যক্রম পড়ানো শুরু হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথমিক পর্বে ইংরেজি ও গণিতে অনার্স এবং সংস্কৃত, বাংলা, উর্দু, দর্শন ও অর্থনীতিতে পাস কোর্স চালু করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন দেয়। বিএ পাঠ্যক্রম চালু হবার কিছুকালের মধ্যেই রজেকলেজ বাংলাদেশের একটি প্রথম শ্রেণির ডিগ্রি কলেজে পরিণত হয়। নতুন পাঠ্যক্রম চালু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কলেজে প্রতিভাশালী অধ্যাপকদের নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষে নবনিযুক্ত এই ধরনের অধ্যাপকদের মধ্যে ইতিহাসের সুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ত, অর্থনীতির গিরিধারী চক্রবর্তী, ইংরেজির প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, দর্শনের রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স বিষয়ে কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, গণিত অনার্সে নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল উত্তীর্ণ হন। এছাড়া পাসকোর্সে প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্র সে বছর পাস করেন। নতুন পরিস্থিতিতে কলেজের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কলেজ ও স্কুল আর এজমালি একই ভবনে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে কলেজিয়েট স্কুলকে

রাজ তোষাখানা ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এর ফলে কলেজের স্থানসংকটের সাময়িক সমাধান হয়েছিল, সেই সময়ে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ কলেজে প্রথমাবধি কলাবিদ্যার বিষয়সমূহ পড়ানো হলেও, বিজ্ঞান শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে আইএসসি চালু করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি প্রদান করলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ তা শুরু করার ক্ষেত্রে টালবাহানা করছিলেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ম্যাকডোনাল্ডের মতো বিদগ্ধজনেরা বিভিন্ন সময়ে কলেজ পরিদর্শনে এসে এই অনীহা সম্বন্ধে সমালোচনা করেছিলেন। আসলে রাজ এস্টেটের কোর্ট অব ওয়ার্ডস এই সময় ক্ষয়িষ্ণু আয়ের জমিদারি থেকে কলেজের জন্য আরও অর্থ বরাদ্দে আগ্রহী ছিলেন না। অন্যদিকে, ল্যাবরেটরি-ভিত্তিক বিজ্ঞান বিভাগ স্থাপন করতে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন ছিল—এই টানাপোড়েনেই অনেক দিন পর্যন্ত কলেজের কাছে বিজ্ঞান শিক্ষা অধরাই রয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চাপে, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে রাজ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের কাজ শুরু হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। বিজ্ঞান বিভাগে সেই সময় অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন পদার্থবিদ্যার মোহিনীমোহন ঘোষ এবং রসায়ন শাস্ত্রের বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। ডেমনস্ট্রেটর হিসেবে অনন্তগোপাল লাহিড়ীকে নিযুক্ত করা হয়। অচিরেই এঁদের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরি সমন্বিত একটি আদর্শ বিজ্ঞান বিভাগ কলেজে গড়ে ওঠে। ১৯৩৮-এ আইএসসি-র প্রথম ব্যাচে ১৬ জন প্রথম বিভাগে, ৯ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ৬ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করে। সেই অমলের নিরিখে যথেষ্ট শ্লাঘাজনক ফল বলতেই হবে। এর ঠিক দশ বছর পরে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলেজে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত নিয়ে বি-এসসি ক্লাসেরও সূচনা করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে ১৯৩৯-এ কলেজ থেকে তিনজন ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমোদনক্রমে বাংলা অনার্স পরীক্ষায়ও বসার সুযোগ পেয়েছিল। নতুন নতুন বিভাগ তৈরির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কলেজের ছাত্রসংখ্যাও বাড়ছিল। শ্রেণিকক্ষের অভাবও দেখা দিয়েছিল তার ফলে। নতুনগঞ্জের ভবনে স্থান সংকুলান অসম্ভব হওয়ায় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলেজের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড ব্র্যাবোর্ন-এর কাছে এই খাতে অর্থসাহায্য চাওয়া হয়। সরকারি বরাদ্দ হিসেবে দু-লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মঞ্জুর হয়। জমি দান করেন বর্ধমানের মহারাজা। ১৯৪০-এ গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন নতুন ভবনের। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে শ্যামসায়রের সন্নিহিত স্থানে চল্লিশ বিঘা জমির ওপর নতুন ভবন নির্মিত হলে, কলেজের স্থান সংকুলানের সমস্যা অনেকটাই মিটে যায়। কলেজের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, গত শতকের চল্লিশের দশকে দূরবর্তী স্থান থেকে আগত ছাত্রসংখ্যাও বাড়ে। নতুনগঞ্জের একটি মাত্র হস্টেলে তাদের স্থান সংকুলান অসম্ভব হয়ে পড়লে উইলবাড়ি ও শ্যামসায়রের নিকটবর্তী নলিনীরঞ্জন হস্টেল নির্মাণ করে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হয়। মুসলিম ছাত্রদের জন্য ১৯৪০-এ একটি ছাত্রাবাস স্থাপিত হয়, এর শিলান্যাস করেছিলেন বাংলার তৎকালীন 'প্রিমিয়ার' আবুল কাশেম ফজলুল হক।

নারীদের উচ্চশিক্ষার প্রসারেও জেলায় অগ্রপথিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল রাজকলেজ। প্রতিষ্ঠানটিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম দিকে কোনো ছাত্রী ভর্তি হবার সুযোগ পেত না। তখন বর্ধমানে নারীশিক্ষার চলও সেইভাবে ছিল না। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কলেজের প্রথম ছাত্রী হিসেবে ভর্তি হবার সুযোগ পান লীলা দাশগুপ্ত। তিনি এই কলেজ থেকে প্রথমে আই.এ. এবং পরে বি.এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্রীরা এই কলেজের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন নানাভাবে।

১৯২৮ থেকেই কলেজের নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। স্নাতক শ্রেণি শুরু হবার পর পত্রিকার বছরে তিনটি সংখ্যা মুদ্রিত হলেও পরে এটি বাৎসরিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক হরিশচন্দ্র সরকার। কলেজের সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর অন্যতম ছিল বিতর্কসভা, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। চল্লিশের দশকে এখানকার ইংরেজি বিতর্ক-সভার খ্যাতি, কলেজ অতিক্রম করে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। নৈতিক ও ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত আলোচনাসভা সংগঠনের পাশাপাশি, কলেজের ছাত্ররা ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে 'বিজয় সাহিত্য সভা' নামে একটি সংঘ গঠন করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করে। এ-প্রসঙ্গে কলেজের ছাত্রদের দ্বারা ১৯৪১-এ প্রতিষ্ঠিত 'বর্ধমান সংস্কৃতি সমিতি'র কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যাচর্চার উচ্চকেন্দ্র হিসেবে কলেজে মাঝেমধ্যেই স্বনামখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা বিশেষ বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করা হতো। এইরকম আলোচনাগুলির মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত 'পদার্থের উপাদান' বা বিশ্বভারতীর অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া ভাষণ 'ভারতের বাইরে হিন্দুসভ্যতা'-র কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। কলেজে বিভিন্ন সময়ে এইরকম বক্তৃতা যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম স্মরণযোগ্য।

কলেজে নিয়মিত রচনা প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হতো। স্নাতক স্তরে পাঠ শুরু হওয়ার পর ড্রামা ক্লাবের মাধ্যমে ছাত্ররা নাট্যাভিনয়ও শুরু করে। সরস্বতী পুজোর সময় বাৎসরিক নাট্যোৎসবও অনুষ্ঠিত হতো। কলেজের সঙ্গে যুক্ত শান্তিময় বসু, অজিতকুমার রায়, পাঁচুগোপাল রায় প্রমুখরা যথেষ্ট নাট্যবোদ্ধা ছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রথমাবধি রাজ কলেজে খেলাধূলার ওপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হতো। ১৯৩০-এ কলেজের ফুটবল টিমের খ্যাতি জেলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এর পিছনে প্রতিষ্ঠানটির ক্রীড়াশিক্ষক ও বিশিষ্ট ফুটবল-খেলোয়াড় বিনোদগোপাল রায়ের যথেষ্ট অবদান ছিল। ফুটবলে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে রবি চট্টোপাধ্যায়, সুধীর মুখোপাধ্যায়, কোহিনুর ভট্টাচার্য, আসগর আলি, ধনপতি চন্দ প্রমুখরা উত্তরকালেও খেলাধূলার জগতে অবদান রেখেছেন। রাজ কলেজে ফুটবল ছাড়াও ক্রিকেট খেলার চলও ছিল।

বর্ধমানে ছাত্র-রাজনীতির সূতিকাগার ছিল রাজ কলেজ। ১৯৩৬-এ টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই ছাত্ররা প্রথম কলেজে ছাত্রসংসদ গঠনের দাবি জানায়। সেই সময় পত্রিকা, খেলাধূলা, কমন রুম, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় অধ্যক্ষের মনোনীত তথা তথাকথিত 'ভালো ছেলেরা'ই পরিচালনা করতো। এই মনোনয়ন প্রথার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দাবি ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত ছাত্রসমাজের চাপে ১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষে কলেজে প্রথম নির্বাচিত ছাত্রসংসদ গঠিত হয়। এই সময়ে অবশ্য দেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কালো ছায়া কলেজের আকাশে একটুকরো কালো মেঘের সৃষ্টি করে। ছাত্র ইউনিয়নে কোন সম্প্রদায়ের প্রভাব থাকবে এ নিয়ে দলাদলির সূচনা হয়। মীমাংসাসূত্রও বেরিয়ে আসে শেষ পর্যন্ত। ঠিক হয়, প্রতি এক বছর অন্তর একজন সংখ্যালঘু ছাত্র সাধারণ সম্পাদক ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ছাত্র সহ-সভাপতি

হিসেবে নির্বাচিত হবেন। ওই বছর যেহেতু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের পালা, অজিতকুমার মজুমদার সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৪৯-৫০ শিক্ষাবর্ষে সাধারণ সম্পাদক হন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ফজলে আহমদ। পরে অবশ্য এই নিয়ম, কালের নিয়মেই বাতিল হয়ে যায়।

কলেজের বাইরের বৃহত্তর রাজনীতিতেও কলেজের ছাত্ররা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আমোদবিহারী বসু, সৈয়দ মহম্মদ আজম, বিষ্ণু সাঁই, রাধাগোবিন্দ দত্ত, নারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ ছাত্ররা বৃহত্তর গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে দেবীপ্রসাদ মজুমদার ও মণিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। ১৯৩৬-এর পর বামপন্থী ছাত্র সংগঠন বি.পি.এস.এফ.-এর ইউনিয়নও স্থাপিত হয় কলেজে। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতরঞ্জন কুণ্ডু, শান্তশীল মজুমদার, ধর্মদাস রায়, সনৎ গাঙ্গুলী, প্রশান্তকুমার বসু প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে বর্ধমানে ছাত্র আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। ছাত্রীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। কলেজের ছাত্রী ইন্দিরা সেনগুপ্ত ও জ্যোৎস্না সেনগুপ্ত ছাত্রীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

আমাদের আলোচনার আলোতে দেখা যাচ্ছে যে রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধমান রাজ কলেজের সূচনা হলেও শিক্ষকদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যাচর্চা ও সহপাঠক্রমিক কাজের স্বতঃস্ফূর্ততায়, জেলার প্রথম প্রতিষ্ঠিত এই কলেজটি সর্ব অর্থেই স্বাধীনতাপূর্ব যুগেই একটি 'মডেল কলেজ'-এ রূপান্তরিত হয়েছিল। ইতোমধ্যে স্বাধীনোত্তর যুগে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাভাবিকভাবেই কলেজটির সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে চলা যোগ বিচ্ছিন্ন হয়। নতুনভাবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজ হিসেবে পূর্ব গৌরব বহুলাংশে বজায় রাখে রাজ কলেজ, বহুদিন পর্যন্ত—সে অন্য প্রসঙ্গ, অন্য ইতিহাস।

সাম্প্রতিককালে কিছু আবিলতায় কলেজের ভাবমূর্তি টাল খেয়েছে এটা সত্য। এই কালিমাকলঙ্কের কজ্জলরেখাকে মুছে ফেলে, গৌরবময় ঐতিহ্যের রাজ কলেজ হৃত গৌরব ফিরে পাবে এই আশা করা যেতেই পারে।

তথ্যসূত্র

১. তারকনাথ শেঠ, *বর্ধমান রাজ কলেজ শতবর্ষ সংখ্যা (১৮৮১-১৯৮১)*, ১৯৮২
২. বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল, ১২৫ বর্ষ পূর্তি স্মরণিকা, ১৯৮৩
৩. বর্ধমান পৌর শতবার্ষিকী স্মরণিকা, ১৯৬৫
৪. পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান জেলা সংখ্যা, ১৪০৩ ব.
৫. সুধীরচন্দ্র দাঁ, *বর্ধমান পরিক্রমা*
৬. সুশীলচন্দ্র সেন, বর্ধমানের কথা
৭. যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, *বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি*
৮. নীলা কর, 'শিক্ষার চালচিত্র : বর্ধমান'
৯. JCK Peterson, *Bengal District Gazetteers: Burdwan*, 1997, reprint
১০. Burdwan, S.B. Choudhury *et. al*, *West Bengal District Gazetteers*
১১. সুবর্ণসম্ভার : ৫০-এর আলোকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০

যাঁদের সাহায্য ছাড়া এই প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহ করা যেত না তাঁরা হলেন : নতুনপল্লী, বর্ধমানের ধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং মনীশ সেনগুপ্ত।

With best compliments of

Ratan Dutta

ASSOCIATED ENGINEERS

MECHANICAL CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

Specialist in

Tool Room, Gear, Penion Shaft & Maintenance Works

Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211, Dist. Paschim Bardhaman

Phone : 9932244082, 8001762157

Sl. No. 97

With best compliments of

DAS MOTOR

Raniganj, Dist. Paschim Bardhaman

Sl. No. 123

With best compliments of

Ashok Kumar Nandy

Sure-Kalna, Purba Bardhaman

Sl. No. 112

With best compliments of

UNITED AGRI TECH PVT. LTD.

Galsi (East) NH2, Dist. Purba Bardhaman

Sl. No. 115

With best compliments of

Madhabpur Naba Kajora Colliery Employees Co-operative Credit Society Ltd.

Regd. No. 367/26-04-77
At Naba Kajora Colliery, P.O. Kajoragram, Dist. Paschim Bardhaman

Sl. No. 117

সূর্য উপাসক বর্ধমান

সঞ্জীব চক্রবর্তী

বর্ধমান শহরের মতো প্রাচীন জনপদকে চেনার কাজ বোধহয় কোনোদিনই ফুরোবে না। বর্ধমান মানে কেবল যোগী জয়পাল-পীরবাহরাম সক্কা, শের আফগান-মেহেরউন্নেসা, পাঞ্জাব থেকে আগত ক্ষেত্রী বণিকদের প্রথমে চৌধুরী ও কোতোয়াল এবং পরে অতি ধনাঢ্য ভূস্বামীতে পরিণত হওয়ার রঙিন কাহিনি নয়। এই সাম্প্রতিক ইতিহাসের ইমারতের ভিত্তি যে কত গভীরে প্রোথিত তার ইশারা ইঙ্গিত মেলে খণ্ডিত আকারে। তবে তার কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করার উপাদান রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবর্তনের আবর্তে পড়ে অবলুপ্ত হয়েছে, হারিয়ে গেছে লোকস্মৃতি থেকে।

প্রাচীন বর্ধমানের অভিজ্ঞান ছড়িয়ে আছে অজস্র শিলামূর্তি ও স্থাপত্যের খণ্ডাংশের আকারে। তাদের প্রাপ্তিস্থল বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র বর্ধমান জেলা জুড়েই। এবং আরও বৃহত্তর অর্থে ধরলে সমগ্র রাঢ়ভূমিতে তাদের বিস্তার। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি আক্রমণের পূর্ববর্তী পর্বে সমগ্র রাঢ় অঞ্চল জুড়ে নানা ধারার ধর্মমত অনুসৃত হয়েছিল। সে সময়কার ইতিহাস আর্যাবর্তের পরিশীলিত সমাজ লিখে রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি। স্থানীয়ভাবে বিদ্বৎসমাজ তেমন তাগিদ অনুভব করেছিলেন বলে জানা নেই। মঙ্গলকাব্যগুলি অনেক পরের রচনা।

সেক্ষেত্রে হাতে থকে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। বৈদিক ধারায় মূর্তিপূজা বা দেবালয় নির্মাণ ভালো চোখে দেখা হতো না। মূর্তিকল্পনা ও দেবকুল নির্মাণ বেদবাহ্য আর্যধারা বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির অবদান। প্রাগৈতিহাসিক সমাধিক্ষেত্র, পাথর সাজিয়ে তৈরি ডলমেন কালক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে চৈত্য ও স্তূপে। বুদ্ধ প্রথমে উপস্থাপিত হয়েছেন ধর্মচক্র, ত্রিশরণ চিহ্ন, বোধিবৃক্ষ, হরিণ বা বৃষর প্রতীকে। গ্রিক ভাস্কর্যের প্রভাবে সৃষ্ট গান্ধার শৈলীতে বুদ্ধ মানুষী রূপ নিলেন। সমান্তরালে লোকায়ত মথুরা শিল্পশৈল্পীও পরিশীলিত রূপ পরিগ্রহণ করতে থাকে। ধীরে ধীরে পারস্য শৈলী, গ্রিক শৈলী, দেশজ মথুরা শৈলী ও দক্ষিণভারতের নিজস্ব ধারার সংমিশ্রণ ও সংশ্লেষে ভারতের মূর্তিকলার অগ্রগতি ঘটতে থাকে। উত্তরভারতে তার বিবর্তন ঘটে গুপ্তযুগ পার হয়ে পাল-সেন যুগ পর্যন্ত।

সূর্য সমস্ত আলো, তাপ ও শক্তির উৎস। তাই আর্য ও অনার্য নাগরিক ও কৌমসমাজে সূর্যের উদয় ও অস্ত, ঋতুচক্র, দুটি বিষুব ও দুটি সংক্রান্তির দিনকে ভিত্তি করে অধিকাংশ ধর্মীয় ও কৃষিভিত্তিক উৎসব গড়ে উঠেছে।

পাল-সেনযুগে বাংলার তক্ষণশিল্পীদের হাতে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ধারার মূর্তি যে সূক্ষ্মতা ও লাবণ্য অর্জন করেছিল তার তুলনা দুর্লভ। লামা তারানাথ ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে এসে দুই মহান শিল্পী ধীমান ও বীতপালের নাম উল্লেখ করেন। শিল্প সমালোচকরাও মন্তব্য করেছেন যে কঠিন পাথরও বাংলার শিল্পীদের হাতে পড়ে নমনীয় মোমের মতো আচরণ করতো।

পলিমাটির দেশ বাংলায় পাথর সহজলভ্য উপাদান নয়। মূর্তি নির্মাণের উপযুক্ত পাথর আনা হতো ছোটোনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল থেকে, চুনার থেকে। বিশেষ মূল্যবান ও জনপ্রিয় কালো পাথরের উৎস ছিল রাজমহল পাহাড়। পরিবহণ ব্যয়

ও তক্ষণশিল্পীদের মজুরির দায় বহন করে একটি শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠা করা সাধারণ মানুষের কর্ম ছিল না। তাই একটি শিলামূর্তি হয়ে দাঁড়ায় একটি অভিজাত, সুস্থিত এবং সচ্ছল সংস্কৃতির প্রতীক। অভিজাত গৃহস্থর চাহিদা মেটাতে বাংলার নানা স্থানে শিল্পশালা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বর্ধমান জেলায় একটি প্রাচীন শিল্পশালা ছিল মন্তেশ্বর থানার মধ্যে অবস্থিত পাতুন গ্রামে।

বাংলার মূর্তিশিল্প সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় ১২৫০ খ্রিস্টাব্দের পর। তুর্কি বিজয়ের ঝড় সামলাতে পারেনি সনাতন হিন্দু সমাজ। সুতরাং যেখানেই গুপ্ত ও পাল-সেন যুগের শিলামূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, বা এখনও হয়, আমরা স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই ধরে নিতে পারি যে সেই অঞ্চলে একটি অভিজাত সমৃদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ রচিত হয়েছিল, আদিমধ্যযুগে, তুর্কি বিজয়ের পূর্বে।

বর্ধমান শহরও তার ব্যতিক্রম নয়। সমৃদ্ধ কৃষি এবং নদী ও স্থলপথে যোগাযোগের ফলে বাণিজ্যের যে উন্নতি হয় তার সুফল ভোগ করেছে দামোদর ও বাঁকা নদীর মধ্যবর্তী দোয়াবের মতো চরিত্রযুক্ত ভূমি। এই ভূখণ্ডের বিস্তার ছিল বেলকাশ কাঞ্চননগর বেচারহাট হয়ে কানাইনাটশাল পর্যন্ত। এই অনুমান করা হল ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও কৌম সংস্কৃতির ধারার অজস্র শিলামূর্তি, শিবলিঙ্গ ও স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষের নিরিখে।

ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক ধারার উপাসনা মুখ্যত পাঁচটি রূপ ধারণ করেছে, যথা বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও সৌর। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তে সৌর ও গাণপত্য ধারা সমান জনপ্রিয় থাকলেও তারা স্বতন্ত্রতা হারিয়েছে বর্ধমানে, তথা বাংলায়। বৈদিক সূর্য মিশে গেছেন বিষ্ণুর সঙ্গে। সূর্যকে পৃথকভাবে স্মরণ করা হয় নবগ্রহ পূজার সময়। সর্বাগ্রে পূজা পেয়ে থাকেন গণপতি। গণেশ চতুর্থী উদ্‌যাপন নিতান্তই সাম্প্রতিক সংযোজন। ছটপূজা উপলক্ষে সূর্য পূজাও নিতান্তই সরলীকৃত ব্যাখ্যার ফল। কিন্তু গণপতি পূজার মতো সূর্যপূজাও যে একটি স্বতন্ত্র সমৃদ্ধ ধারা হিসেবে বিস্তার লাভ করেছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ধমান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা বেশ কিছু সংখ্যক ভগ্ন বা প্রায় অক্ষত সূর্যমূর্তি। শৈলীর বিচারে তাদের কালসীমা গুপ্তযুগ থেকে পাল-সেন যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা ও চিত্রবীথিতে সংরক্ষিত ভগ্ন ও অভগ্ন সূর্যমূর্তির সংখ্যা কমবেশি এগারো। দুটি অরক্ষিত সূর্যমূর্তি বর্তমান লেখকের চোখে পড়েছে দামোদরের তীরে কাঠগোলা ঘাটে এবং বেলকাশ গ্রামে। বর্ধমানের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সূর্যমূর্তি প্রাপ্তির তাৎপর্য নির্ণয়ই বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য।

শৈলীর বিচারে তাদের কালসীমা গুপ্তযুগ থেকে পাল-সেন যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা ও চিত্রবীথিতে সংরক্ষিত ভগ্ন ও অভগ্ন সূর্যমূর্তির সংখ্যা কমবেশি এগারো। দুটি অরক্ষিত সূর্যমূর্তি বর্তমান লেখকের চোখে পড়েছে দামোদরের তীরে কাঠগোলা ঘাটে এবং বেলকাশ গ্রামে। বর্ধমানের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সূর্যমূর্তি প্রাপ্তির তাৎপর্য নির্ণয়ই বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য।

সূর্য সমস্ত আলো, তাপ ও শক্তির উৎস। তাই আর্য ও অনার্য নাগরিক ও কৌমসমাজে সূর্যের উদয় ও অস্ত, ঋতুচক্র, দুটি বিষুব ও দুটি সংক্রান্তির দিনকে ভিত্তি করে অধিকাংশ ধর্মীয় ও কৃষিভিত্তিক উৎসব গড়ে উঠেছে। মূর্তিরূপে সূর্যপূজা বিদেশ থেকে আগত নতুন সংযোজন এবং এই উপাসনার ধারার প্রতিষ্ঠাতা ও ধারকরাও বিদেশ থেকে আগত।

এই তত্ত্বের ভিত্তি হল দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। এক, পুরাণ এবং দুই, ইতিহাস। প্রাচীন ভারতের কোনো লিখিত সুসংবদ্ধ ইতিহাস ছিল না। পণ্ডিতেরা প্রাচীন শাস্ত্র এবং সাহিত্য থেকে নানা সূত্র সংগ্রহ করে যুক্তির নিক্তিতে মেপে তাদের ব্যবহার করে থাকেন। বিদেশ থেকে আগত সূর্যপূজার ইঙ্গিত পাওয়া গেল শাম্বপুরাণে। জাম্ববতীর গর্ভজাত অশেষ রূপবান শাম্ব কোনো কারণে পিতা কৃষ্ণের বিরাগভাজন হলেন। ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ পুত্রকে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হবার অভিশাপ দিয়ে ফেললেন। রোগমুক্তির উপায় বলে দিলেন নারদমুনি। তাঁর পরামর্শ অনুসারে দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে মিত্র অর্থাৎ সূর্যের উপাসনায় শাম্ব রোগমুক্ত হলেন। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে অবস্থিত তাঁর উপাসনাস্থল মিত্রবন নামে খ্যাত হয়। রোগমুক্তির পর শাম্ব মুলস্থানপুরে একটি মন্দির নির্মাণ করে সূর্যবিগ্রহ স্থাপন করলেন। কিন্তু স্থানীয় কোনো ব্রাহ্মণ সূর্যপূজার পৌরোহিত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তখন কংসের পিতা মথুরাধিপতি উগ্রসেনের প্রধান পুরোহিত গৌরমুখ তাঁকে শাকদ্বীপে যেতে বললেন। শাকদ্বীপের মগ ব্রাহ্মণরা সূর্য উপাসক। তাঁদের ভারতবর্ষে আহ্বান করার উপদেশ দিলেন তিনি। শাকদ্বীপ অনেক দূরের পথ। শাম্ব কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কৃষ্ণ গরুড়কে অনুমতি দিলেন। গরুড়ের পিঠে চড়ে শাম্ব শাকদ্বীপে গমন করলেন এবং সেখানকার সূর্য উপাসক মোট আঠারোটি পরিবারকে নিয়ে ফিরে আসেন। মহাভারতের একাদশ অধ্যায়ে ভীষ্ম শাকদ্বীপের বর্ণনা করেছেন। মহাভারত ও অন্যান্য সূত্রের বর্ণনা সমন্বয় করে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে শাকদ্বীপ হল বর্তমান পূর্ব ইরান। এখানে অগ্নি ও সূর্য উপাসনা প্রচলিত ছিল। সূর্য এই অঞ্চলে মিথ্র, বিবনহ্বন্ত প্রভৃতি নামে পূজা পেতেন।

সূর্য উপাসক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণরা ছড়িয়ে পড়েন রাজস্থান, গুজরাট, কাশ্মীর ও বিহারের গয়া অঞ্চলে। তাঁদের যেখানে অবস্থান ছিল সেখানে এক একটি বিখ্যাত সূর্যমন্দির গড়ে উঠেছে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বা মগ ব্রাহ্মণদের ঘন সন্নিবেশের কারণে বিহারের একাংশ প্রাচীনকালে মগধ নামে পরিচিত হয় বলে দাবি করা হয়। সূর্যবংশীয় ইক্ষ্বাকুর বংশধরদের রাজধানী হল অযোধ্যা।

এ হল পুরাণ মহাকাব্যের সূত্র। ইতিহাসের যুগেও দেখা যায় ভারতভূমিতে মিহির মিথ্র (মিত্র) পূজা শুরু হয় কুষাণ জাতির আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে। দুই কুষাণ সম্রাট প্রথম কণিষ্ক ও হুবিষ্ক কর্তৃক প্রচলিত অনেক সুবর্ণ ও তাম্রমুদ্রায় মিহির মিথ্রা নাম সম্বলিত দেবমূর্তি উৎকীর্ণ আছে। সূর্যপূজা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে শাকদ্বীপী ম্যাগি গোষ্ঠীর পুরোহিতরাও আসতে থাকেন। শাকদ্বীপী ম্যাগিগোষ্ঠী পরিণত হন মগ ব্রাহ্মণে। মগ ব্রাহ্মণদের বাড়বাড়ন্ত দেখে কুব্জিকা মত নামক প্রাচীন তন্ত্রের গ্রন্থকার ভীতি প্রকাশ করেন যে-সকল মগেরা ভারতে প্রবেশ করেছেন তাঁরা অচিরেই ব্রাহ্মণদিগের সমান হবেন।

শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণরা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁদের প্রভাবেই সূর্য গ্রহরাজ রূপে নবগ্রহের মধ্যে অগ্রগণ্য স্থান গ্রহণ করেন। আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের মতো বিখ্যাত জ্যোতির্বিদরা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। বরাহমিহির তাঁর বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন যে সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা। সূর্যবিগ্রহের প্রতিমালক্ষণ নির্দেশ করেন এইভাবে—

> সূর্যের বিগ্রহ উদীচ্যবেশে সজ্জিত হইবেন এবং তাঁহার পদদ্বয় হইতে বক্ষ পর্যন্ত আবৃত থাকিবে—কটিদেশে বিয়ঙ্গ।

ঠিক যেন যোদ্ধাবেশে কোনো কুষাণ ক্ষত্রপ। ভারতের মূর্তি রচয়িতাদের কল্যাণে উদীচ্যদেশীয় আঙ্গরাখা সংক্ষিপ্ত হয়ে দেশীয় রূপ ধারণ করেছে গুপ্ত যুগের পর থেকে। কিন্তু জানু পর্যন্ত পাদুকা ও কোমরের বিশেষ বন্ধনী সূর্যমূর্তির অভারতীয় শেষ রেশটুকু রক্ষা করেছে।

শাম্ব সূর্যবিগ্রহ পূজা করেছিলেন কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তির জন্য। সুতরাং সূর্যের সর্বরোগহর রূপ এবং নবগ্রহর প্রধান রূপ বৃহত্তর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশে থাকা গ্রহবিপ্র দৈবক প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে। আচার্য বরাহমিহির যাঁদের পংক্তিপাবন ভোজক ব্রাহ্মণ বলে সম্মানিত করেছিলেন, তাঁদের একাংশ বাংলায় ক্ষমতা অধিকারের প্রতিযোগিতায় পিছু হঠে অগ্রদানী, মড়ুইপোড়া ব্রাহ্মণ ইত্যাদিতে পরিণত হয়েছেন বলে সিদ্ধান্ত নেন সমাজ অনুসন্ধিৎসুরা। প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে কুষ্ঠ ও অন্যান্য চর্মরোগের চিকিৎসা করে আসছেন অনেকে। তাঁরা হলেন সর্বরোগহর সূর্যের উপাসকদের অবশেষ। বাংলার সমাজে আজ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের পৃথক করে চিহ্নিত করা কঠিন। বিশুদ্ধতা বজায় আছে কাশ্মীরী পণ্ডিত ও রাজস্থান গুজরাত ও বিহারের কিছু অংশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে।

বর্ধমান শহর ও তার আশপাশ থেকে উদ্ধার হওয়া ভগ্ন ও অভগ্ন সূর্যমূর্তির সংখ্যা দেখে অনুমান হয় যে এখানে শাকদ্বীপ থেকে আগত সৌর উপাসনার ধারা ভালোই প্রভাব বিস্তার করেছিল। তুর্কি বিজয়-পরবর্তীকালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পালাবদলের ঝড়ে পূজার ধারা ও পূজক উভয়েই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সূর্য উপাসনার ধারার অভ্রান্ত প্রমাণ হল দামোদরের তীরে বেলকাশ গ্রামের একটি জীর্ণ কিন্তু বৈভবপূর্ণ একবাংলা দামোদর মন্দিরে রক্ষিত প্রায় অক্ষত এই সূর্যমূর্তিটি। দামোদরের গর্ভ থেকে উদ্ধার করে মন্দিরে মূর্তিটিকে রক্ষা করেন প্রতিবেশী শিবানী রায়।

বেলকাশের সূর্যমূর্তিটি উচ্চতায় প্রায় চার ফুট। পূর্ণাবয়ব মূর্তিটিকে সামান্য দানাযুক্ত পাথরে খোদাই করা হয়েছিল পাল-সেন যুগের শৈলীতে। সূর্য এখানে কিরীটধারী। দুই হাতে ময়ূরমুদ্রায় ধরা সনাল প্রস্ফুটিত পদ্ম। কোমরে কটিবন্ধনী। আজানুপাদুকা পরিহিত পদযুগল। সামনে একচক্র মকরধ্বজ সপ্তাশ্ববাহিত রথে সারথি অরুণ। দুই পাশে প্রথামতো দণ্ডী ও পিঙ্গল এবং ধনুর্বাণহস্তে ঊষা ও প্রত্যুষা। প্রকরণ অনুসারী মূর্তিটি পঞ্চরথ বেদীতে স্থাপিত। দুই পাশে দেবকাষ্ঠের মধ্যে চারজন করে মোট অষ্টগ্রহ। একটু ভালো করে দেখলে তাদের চিহ্নিত করা সম্ভব। সূর্যের মাথার পিছনে তোরণ, তোরণের দুই পাশে দুই বিদ্যাধর, মাথায় কীর্তিমুখ।

বহুধর্মমতে বিশ্বাসী এক সমৃদ্ধ অভিজাত রুচিশীল জনগোষ্ঠীর বাস ছিল দামোদর-বাঁকার অববাহিকায়। এই সূর্যমূর্তিটি প্রাচীন বাস্তুর তালিকাকে দীর্ঘতর ও সমৃদ্ধতর করছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রাচীন বর্ধমানের জনপদের সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র সর্বভারতীয় নয়, এক আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির বহুমাত্রিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছে এই সূর্যমূর্তিটি।

With best compliments of

G.S. SIDDIQUIE

CONTRACTORS AND LABOUR SUPPLIERS

SURESH COMPANY

Station Road, Durgapur-1

Sl. No. 100

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

চাঁদু কুমার

Sl. No. 68

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

জয়দেব বসাক

Sl. No. 67

গান্ধিজি বর্ধমান শহরে

জহরলাল সাঁই

স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গত শতকের প্রথমার্ধে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তি বর্ধমানে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় সব লেখাতেই[১] উল্লেখ করা হয়েছে যে, গান্ধিজি ১৯২৫-এর ৮ মে বর্ধমান টাউন হলে এক জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। অনুসন্ধানে কিন্তু ওই তারিখটির পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়নি। সেই স্মরণীয় ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারকল্পে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আগমন বার্তা

১৯২৫-এর ২ মে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে, বর্ধমান শহরে গান্ধিজিকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য 'বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক ভামিনীরঞ্জন সেনকে সভাপতি করে এক অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে।[২] আরও বলা হয়েছিল যে, বর্ধমান পৌরসভা এখন স্বরাজীদের দখলে, আশা করা যায় পৌরসভার তরফ থেকে গান্ধিজিকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। সম্ভবত বর্ধমানে তাঁর আসার দিনটি তখনও স্থির হয়নি। দিনটি ঠিক হওয়ার পরে ওই পত্রিকায় ১৯ মে আর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়, অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক জিতেন্দ্রনাথ মিত্রর নামে।[৩] সেখান থেকে জানা যায় যে গান্ধিজি ২৫ মে বর্ধমানে আসছেন এবং পরের দিন টাউন হল ময়দানে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। পাশাপাশি অন্য একটি বিজ্ঞাপ্তিতে জেলার যুবকদের কাছে আহ্বান জানানো হয় যে, তাঁরা যেন অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলতে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালনের জন্য অবিলম্বে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেন।

রেলস্টেশন থেকে চাঁদনীর পথে

রাত তখন দশটা। মে পঁচিশ। উনিশশো পঁচিশ। হাওড়া থেকে পাঞ্জাব মেল এসে দাঁড়াল বর্ধমান স্টেশনের প্লাটফর্মে। বিলাসবহুল সুসজ্জিত কামরা থেকে দীর্ঘদেহী গান্ধিজি হাসিমুখে যখন নামছেন তখনই শান্তিনিকেতন থেকে আগত আন্ড্রুজ সাহেব দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন।[৪] সেখানে অভ্যর্থনা করার জন্য উপস্থিত ছিলেন ভামিনীরঞ্জন সেন, সন্তোষকুমার বসু, অমরনাথ দত্ত, মহম্মদ ইয়াসিন ও বর্ধমানের আরও বিশিষ্টজনেরা। চার্লস ফ্রায়ার অ্যান্ড্রুজ (১৮৭১-১৯৪০) জন্মসূত্রে ইংরেজ হলেও ১৯১৫ থেকে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বাস করতেন। ভারতের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত উন্নয়নে গভীরভাবে যুক্ত অ্যান্ড্রুজ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও অনুরাগী। গান্ধি ৩০ মে শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং অ্যান্ড্রুজ সাহেবের বর্ধমানে আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গান্ধিকে আমন্ত্রণ জানানো।

বর্ধমানে গান্ধিজী

১৯২৫ সালের ৮ই মে মহাত্মা গান্ধী বর্ধমান শহরে আগমন করেন। বর্ধমানের মহারাজা স্যার বিজয়চাঁদ মহতার কৃষ্ণসায়রের চাঁদনীতে তাঁহার অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে বংশগোপাল টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় মহাত্মাজীকে চরকা কাটিতে দেখা যাইতেছে। তাঁহার বামে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট নাগরিক ভামিনীরঞ্জন সেনকে অভিনন্দনপত্র পাঠ করিতে দেখা যাইতেছে। মহাত্মাজীর নীচে গান্ধী টুপি পরিহিত গোলাম রহমান (কচি মিঞা), কচি মিঞার ডানদিকে সন্তোষ কুমার বসুর মাথা দেখা যাইতেছে।

সূত্র ঃ বর্ধমান পৌরসভা শতবার্ষিকী স্মরণিকা

ব্যবহারজীবী ও জাতীয়তাবাদী নেতা ভামিনীরঞ্জন সেন (১৮৮১-১৯৩৪) যশোহর জেলায় জন্মগ্রহণ করলেও কর্মক্ষেত্র বর্ধমানের সামাজিক উন্নয়নে তিনি গভীরভাবে নিয়োজিত ছিলেন। ব্যবহারজীবী ও সমাজসেবক সন্তোষকুমার বসু সে-সময়ে বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি একাধিকবার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। বর্ধমান শহরে প্রায় সব স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বিদ্যাসাগর দাতব্য সমিতি প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের গঠনমূলক কাজে তাঁর অবদান আজও স্মরণীয়। আইনজীবী অমরনাথ দত্ত কংগ্রেসের জেলা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। ওই অ্যাসোসিয়েশন-ই ১৯২১-এ বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটিতে রূপান্তরিত হয়। তিনি একাধিকবার বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মহম্মদ ইয়াসিন ছিলেন বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভাপতি। দক্ষ ব্যবহারজীবী এবং সমাজসেবক রূপে তিনি চারবার বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বর্ধমানে গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের পুরোধা হলেও, স্বরাজ্য পার্টির পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সেই রাতে প্লাটফর্মের বাইরে স্টেশন চত্বরে তখন কয়েক হাজার মানুষ সমবেত হয়েছেন গান্ধিজিকে দেখার জন্য। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গরমকে উপেক্ষা করে জনতা যদিও ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ, তথাপি সদর মহকুমা প্রশাসক ও পুলিশ আরক্ষাধ্যক্ষকে পরিস্থিতির ওপর

নজর রাখার কাজে পাঠানো হয়েছিল।[৫] অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য দ্বারা পরিবৃত হয়ে গান্ধিজি প্লাটফর্মের বাইরে একজোড়া ঘোড়ায় টানা গাড়িতে উঠে বসলেন।[৬] কাছেই ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ মিত্র ও যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা। সেখান থেকে যাত্রা শুরু হয় বর্ধমানরাজ-এর সুসজ্জিত অতিথিনিবাস কৃষ্ণসায়রের পাড়ে 'চাঁদনী'র উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণসায়রের দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত এই প্রাসাদোপম বাড়িটি (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্র) দু-দিনের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এই আবাসেই তাঁর রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হয়। গান্ধিজিকে বহনকারী ক্যারেজ চলেছে ধীর গতিতে। জিটি রোড, কার্জন গেট, বিসি রোড ধরে বোরহাটস্থিত 'চাঁদনী'র দিকে। প্রায় আড়াই মাইল রাস্তার দুধারে ঠাসাঠাসি ভিড়, কয়েক হাজার মানুষের সমাবেশ। কিন্তু তা শান্ত, কোলাহলবর্জিত। পুরোনো এই ঐতিহাসিক শহরে তখনও বিদ্যুৎচালিত আলোর প্রচলন হয়নি। রাস্তার দুধারে মহিলা এবং পুরুষ শ্রমিকদের হাতে গ্যাসবাতি দিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড় করানো হয়েছিল আর সেই অ্যাসিটিলিন ল্যাম্প-এর উজ্জ্বল আলোয় সকলেই গান্ধিজিকে দর্শন করেন। মহিলারা শঙ্খধ্বনি করে তাঁকে স্বাগত জানান। অন্যদিকে যাত্রাপথের দুধারে প্রায় সমস্ত বাড়ি, ঘরদোর, দোকানপাটগুলি পতাকা, ফুলের মালা, দেবদারুপাতা ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে শহরকে দর্শনীয় করে তোলা হয়। সেগুলোকেও মোমবাতি জ্বালিয়ে আলোকিত করা হয়। এছাড়াও স্থানে স্থানে উজ্জ্বল আলোর তোরণ তৈরি করা হয়।

হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের (তৎকালীন সময়ে যথাক্রমে মোট জনসংখ্যার ৭৮ ভাগ এবং ১৮.৫ ভাগ) সক্রিয় সহযোগিতায় ও আন্তরিকতায় শহর সেজে উঠেছিল উৎসবের সাজে। গান্ধিজির আগমন ঘিরে সেই উৎসব। গান্ধিজির গাড়ি পৌঁছায় চাঁদনী-তে। শেষ হয় সে উৎসবের প্রথম পর্ব। রাত তখন গভীর। স্টেশন থেকে 'চাঁদনী' পর্যন্ত রাজকীয় পথ-পরিক্রমায় দূরদূরান্ত থেকে আগত কয়েক হাজার মানুষের 'গান্ধি দর্শন'-ই ছিল সে রাতে (সোমবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) এই পর্বের একমাত্র আকর্ষণীয় বিষয়।

জেলা সফরে কেন?

সে-সময়ে গান্ধিজি শুধু বর্ধমান জেলাতেই এসেছিলেন, এমনটা নয়, বাংলার অনেক জেলায় তিনি তখন সফর করেন। বর্ধমানের জনসভায় ভাষণ দেওয়ার পরই দেখা যায় তিনি হুগলিতে প্রবেশ করেন। তারপর ৩০ মে তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আবার জুন মাসে খুলনায়, জুলাই মাসে বাঁকুড়া ও কলকাতায় তাঁকে বক্তৃতা করতে দেখা যায়। আবার ওই বছরই জলপাইগুড়ির জে.ওয়াই.এম.এ ময়দানে স্বাধীনতা আন্দোলনে কর্তব্য সম্বন্ধে ছাত্রদের কাছে বক্তব্য রেখেছেন, চরকা কাটার উপর জোর দিয়েছেন। কেউ কেউ মনে করেন স্বরাজ দলের উত্থান ও প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রভাব হ্রাসের চেষ্টায় তিনি জেলা পরিভ্রমণ শুরু করেন। এ-ধারণা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। গান্ধিজির জেলা সফরের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ : ভারতীয় জনগণকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা, ব্যক্তিগত ইমেজকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং গঠনমূলক কাজের (যেমন হস্তশিল্প, চরকায় সুতো কাটা, সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য দৃঢ় করা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ইত্যাদি) নিবিড় প্রচারসাধন।

জেলা কংগ্রেস কমিটির দুই প্রধান কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ মিত্র এবং যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার আমন্ত্রণে গান্ধিজির বর্ধমানে আগমন। তাঁকে সংবর্ধনা দান প্রসঙ্গে দু-দিন ধরে যে উৎসবের আয়োজন, তাকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে প্রাণপাত করেছেন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক জিতেন্দ্রনাথ মিত্র এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষকুমার বসু। তাঁরা দু-জনেই তখন স্বরাজ্যদলের অন্যতম কর্মকর্তা, পরিবর্তনপন্থী হিসেবে চিহ্নিত। তারও আগে গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে জিতেন্দ্রনাথ বৈদ্যপুর (কালনা) হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু স্বরাজ্য দলের কর্মসূচির প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্য প্রমাণ করে যে তিনি খাঁটি গান্ধিপন্থী ছিলেন না। আসলে তিনি ছিলেন গোষ্ঠী বা দলনিরপেক্ষ কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সৈনিক। তাই গান্ধিজি এবং চিত্তরঞ্জন দাশ উভয়ের কর্মসূচি রূপায়ণে তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী।

গান্ধিজিকে যেভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল

২৬মে, ১৯২৫, মঙ্গলবার সকালে বংশগোপাল টাউন হল সংলগ্ন ময়দানে প্রায় দশ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে গান্ধিজিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কলকাতা থেকে আগত তাঁর সহযাত্রীরা—ড. প্রতাপচন্দ্র গুহ, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং তাঁর নাতনি সকলেই সেদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। পারস্পরিক পরিচয়জ্ঞাপন ও মাল্যদান অনুষ্ঠানের পর বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে গান্ধিজির উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করা হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে রানিগঞ্জের সরস্বতী কর্মমন্দিরের বিশেষ অবদান রয়েছে। সেই সরস্বতী কর্মমন্দিরের পক্ষ থেকে তাঁকে উপহার দেওয়া হয় সূচি শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন—খদ্দরের রুমাল, যেখানে তাদের অভিভাষণটি ছাপা হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান হার্দিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের দিকটি ছাত্রদের দেওয়া ভাষণে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। জেলা বোর্ডের অধীনস্থ করদাতারাও তাঁকে সংবর্ধনা দিতে সমবেত হয়েছিলেন। গান্ধিজিকে কোনো সম্ভাষণ না জানানোয় প্রকাশ্যে তাঁরা বর্ধমান জেলা বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিন্দা করেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান মণিলাল সিংহ শহর থেকে অনেক দূরে ছিলেন, এবং তিনি এ-বিষয়ে কোনো আগ্রহই প্রকাশ করেননি।

নাগরিক সংবর্ধনায় হস্তশিল্পের অন্যতম আর এক নিদর্শন হল পাথরের ফলকে খোদিত গান্ধিজির প্রতিমূর্তি উপহার। পৌরসভায় দেওয়া অভিভাষণে সমাজ-রাজনীতির কোন দিকটি গুরুত্ব পেয়েছিল তা জানা না গেলেও সেটিকে সাহিত্যের এক টুকরো বর্ণময় উজ্জ্বল চিত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে সাংবাদিকদের লেখায়। প্রখ্যাত আইনজীবী, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ভামিনীরঞ্জন সেন তাঁর ভাষণে জেলায় গঠনমূলক কাজের গতিপ্রকৃতির দিকে গান্ধিজির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, ব্রিটিশ শোষণে জেলার ঐতিহ্যপূর্ণ তাঁতশিল্প ধ্বংসের মুখে। ১৮৭২ সালে প্রকাশিত প্রথম জনগণনা অনুসারে বর্ধমান জেলার তাঁতিদের সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার। প্রায় তিন দশক পরে ১৯০১ সালে তাদের তিন ভাগের দুভাগ মানুষকে তাঁত শিল্প থেকে উৎখাত করা হয়। ১৯২৫ সালে দেখা যায় মাত্র ৪০০০ তাঁতি কোনোরকমে ওই জীবিকাতে টিকে রয়েছেন। জেলায় প্রতি মাসে ১ মন সুতো উৎপন্ন হয় ও ৪০০ টাকার খদ্দর বিক্রি হয়। চরকায় সুতো কাটা ও খদ্দর বস্ত্র পরিধান-এর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে জেলায় প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি কংগ্রেসির সংখ্যার ৬০ এবং ১০০।[৭]

গান্ধিজিকে সংবর্ধনা দান প্রসঙ্গে বর্ধমানের ব্যবসায়ী সমাজ নজির সৃষ্টিকারী ভূমিকা পালন করেছিল। উৎসবের প্রথম দিনেই সুষ্ঠু দেখভালের দায়িত্ব ছিল লাল পাগড়ি পরিহিত পুলিশের পরিবর্তে সাদা খদ্দর পরিহিত কয়েকশো স্বেচ্ছাসেবকের ওপর। দুদিন ধরে

তাদের সকলের থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছিল বর্ধমানের ব্যবসায়ী সমাজ। সংবর্ধনার দিন মঙ্গলবার প্রায় দু-হাজার দরিদ্র মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরিশেষে ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিস্বরূপ রামেশ্বর দত্ত এবং বানোয়ারিলাল পাঁজা গান্ধিজিকে ৯ হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দিয়েছিলেন।

চরকা ছিল গান্ধিজির সবসময়ের সঙ্গী। চরকায় সুতোকাটাকে কংগ্রেসিদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করার জন্য ১৯২৪-এর জুন মাসে এআইসিসি-তে তিনি প্রস্তাব আনেন। স্বরাজীদের প্রতিরোধে তা সম্ভব হয়নি। গান্ধির চরকা-বাণীর কথা মনে রেখে জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে চরকায় সুতো কাটার এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। মঞ্চ সংলগ্ন এক প্রশস্ত জায়গায় চরকায় পুরুষ ও মহিলাদেরকে সুতো কাটায় মগ্ন থাকতে দেখা যায়। গান্ধিজি তা ঘুরে দেখে অনাবিল আনন্দ প্রকাশ করেন।

টাউন হলের ভেতরে মহিলাদের এক পৃথক সভাতে গান্ধিজি যোগদান করেন। মহিলারা তাঁদের পরিধেয় স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ৫১ টাকা উপহার দিয়ে তাঁকে সংবর্ধিত করেন। যতদূর জানা যায় স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে ৬ গাছা চুড়ি, ৪টি কানের দুল ও বেশ কিছু আংটি ছিল। মহিলাদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্যের সারাংশ কলকাতা থেকে আগত জনৈক কমলাদেবী বাংলা ভাষায় তুলে ধরেন।

সংবর্ধনার উত্তরে

গান্ধিজি সংবর্ধনার উত্তরে হিন্দিতে ছোট্ট বক্তব্য রাখেন। চরকায় সুতো কাটার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তিনি সকলকে ওই কাজে ব্রতী হতে আহ্বান জানান। দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম উপায় হিসেবে তাঁর ভাষণে চরকা ব্যবহারের উল্লেখ করা হল। সংবর্ধনা প্রদানের বেশিরভাগ সময়টাই তিনি চরকায় সুতো কাটার কাজে মগ্ন ছিলেন। তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''এর মাধ্যমে আমি আপনাদের প্রতি কোনোরকম অসৌজন্য প্রকাশ করতে চাইনি, অন্তরের আহ্বানে আমি এ-কাজ করে থাকি।''[৮] তিনি আরও বলেন, ''আমি উপবাসে একুশ দিন থাকতে পারি, কিন্তু চরকা ছাড়া আমি আধ ঘন্টাও থাকতে পারি না।'' এ প্রসঙ্গে তিনি সবার কাছে বার বার অনুরোধ রাখেন তাঁরা যেন যন্ত্রচালিত উৎপাদিত বিদেশি পোশাক ব্যবহারের পরিবর্তে খদ্দরের বস্ত্র পরিধান করেন।

বর্ধমানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের জন্য তিনি রেলওয়ে ব্যবস্থার প্রবর্তন, স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে অজ্ঞতা এবং চাষিদের আলস্য-প্রবণতাকে দায়ী করেন। বর্ধমানের সমাজজীবন যে অস্পৃশ্যতার মতো এক দুষ্ট ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত নয় এবং সেখানে যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রয়েছে এ সংবাদে তাঁর হৃদয় যে আনন্দে নেচে ওঠে, সেকথা তিনি গোপন করেননি।

২৫মে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে প্রাচ্য রীতিতে শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে গান্ধিজিকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়ে রাজকীয় পথ পরিক্রমায় যে উৎসবের সূচনা হয়েছিল, দ্বিতীয় পর্বে ২৬ মে বিবিধ উপহার ও অভিভাষণে তাঁকে সংবর্ধিত করে দরিদ্রনারায়ণ সেবার মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। কয়েকদিন ধরে কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম, তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের ছোটাছুটি ইত্যাদি দেখে মনে হয়, তমসা-কবলিত তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে বর্ধমানের মানুষ যেন হঠাৎ কর্মচাঞ্চল্যে মেতে উঠেছিল। সেই স্মরণীয় ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ২৭ মে-র 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় যথার্থই শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল : Mahatmaji at Burdwan, Splendid Reception, Streets and Houses Illuminated, Reply to Addresses.[৯] প্রায় একই ভাষায় ২৮মে-র 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় লেখা হয়েছিল : Enthusiastic Reception at Burdwan ''I can not live without Charka'', Gandhi, Reply to Addresses.[১০] বলা বাহুল্য, ওই দুটি সংবাদপত্রে গান্ধিজিকে অভ্যর্থনার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে, প্রধানত সেই কাহিনি-ই পরিমার্জিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে এ-প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. যেসব লেখায় গান্ধির আগমনের দিনটি ৮ মে বলে উল্লিখিত হয়েছে : দুর্গাদাস নন্দী, 'বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের ইতিহাস ১৯২১-১৯৪৭', বর্ধমান সম্মিলনী, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ; শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু, 'ফ্রিডম মুফমেন্ট ইন বার্ডোয়ান', বর্ধমান, ১৯৮৯; শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু, 'স্বাধীনতা আন্দোলনে বর্ধমান', বর্ধমান চর্চা, ১৯৮৯; নারায়ণ চৌধুরী, 'জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্ধমান', বর্ধমান, ১৯৯৬; হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, 'বর্ধিষ্ণু বর্ধমান', ১৯৯৮; সুধীরকুমার অধিকারী, ১৯৯৮; সুধীরচন্দ্র দাঁ, 'বর্ধমান শহরের ইতিবৃত্ত', ২০০২; বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ, 'স্বাধীনতা আন্দোলনে কাটোয়া মহকুমা', ২০০৪; নীরদবরণ সরকার, ২০১৪
২. 'ফরওয়ার্ড' (সি.আর দাশ, সম্পাদিত), কলিকাতা, ২ মে, ১৯২৫
৩. তদেব, ১৯ মে, ১৯২৫
৪. তদেব, ২৭ মে, ১৯২৫
৫. 'অমৃতবাজার পত্রিকা', কলিকাতা, ২৮ মে, ১৯২৫
৬. তদেব, পৃ. ৫, আবদুস সাত্তারের উদ্ধৃতি, ''বিরাট মোটর গাড়িতে মহারাজার-ই চাঁদনিতে যাচ্ছেন।'' সুধীরচন্দ্র দাঁ, 'বর্ধমান শহরের ইতিবৃত্ত', পৃ. ১৬৫
৭. অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৮ মে, ১৯২৫
৮. তদেব
৯. 'ফরওয়ার্ড', ২৭ মে, ১৯২৫
১০. 'অমৃতবাজার পত্রিকা', ২৮ মে, ১৯২৫

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নিউ কুন্তলিকা স্টেশনার্স

দত্ত সেন্টার, বর্ধমান

প্রো. নৃপেন্দ্রকুমার চৌধুরী

Sl. No. 138

Happy
Puja Greetings
from

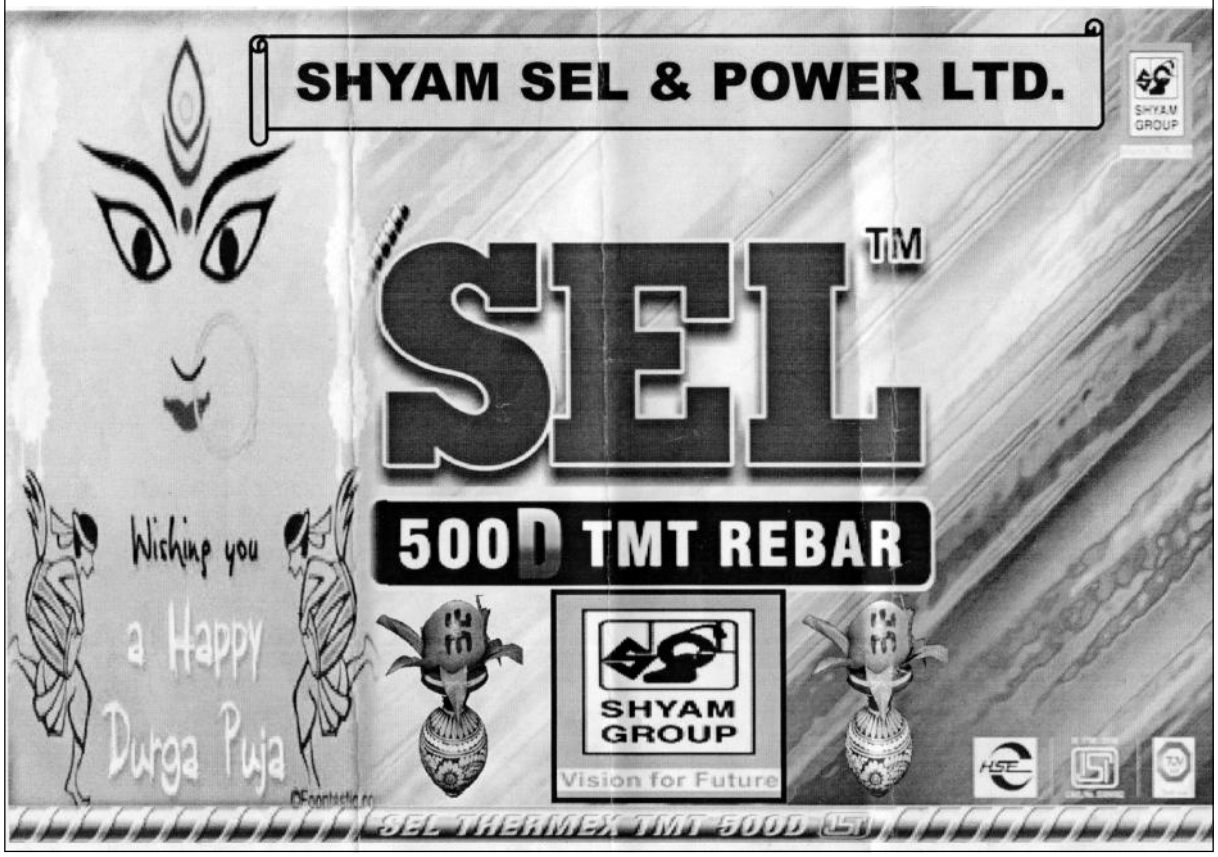

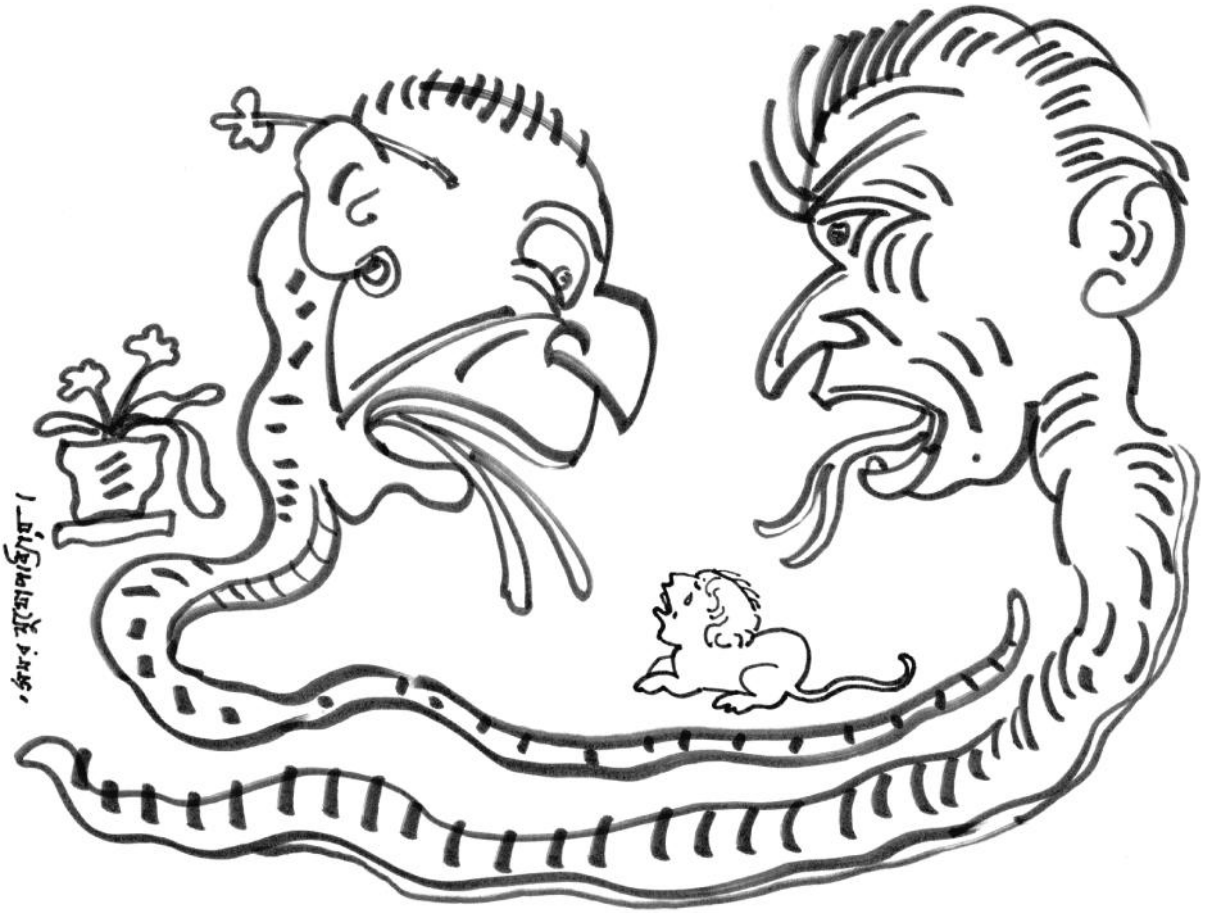

বিষধর

মণি মুখোপাধ্যায়

সাধারণত রোববার বিকেলে পরেশ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিতে একটু এদিক ওদিক যায়। এখন সেটা অনেক কমে গেছে। পরিবেশটা কেমন পালটে গেছে যেন। কোথাও গিয়ে ভালো লাগে না।

আজকে অবশ্য প্রশ্নই আসে না। দুপুর থেকেই আকাশে মেঘ। একটু বিকেল হতেই টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি ঝরছে। সুধা আচারের তেল দিয়ে বড় এক বাটি মুড়ি মেখে সঙ্গে পেঁয়াজি ভেজে নিয়ে এসেছে। খেয়ে বাসুসহ তিনজনে খাটের ওপর জুত করে বসেছে। বাবা আজ ঘরে আছে বলে মেয়ে বাসু খুব খুশি। অবশ্য সুধাও।

একটা পোঁয়াজি তুলে সবে মাত্র দাঁতে কাটতে যাবে পরেশ, তখনই নজরে পড়ল দরজার ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে একটা সাপ ঢুকছে। মাথার দিকে বিস্তার দেখেই বুঝলো, বিষাক্ত সাপ। সে গ্রামের ছেলে, গ্রামেই বসবাস, সাপ চিনতে তার কোনো ভুল হবার কথা নয়।

নরেশ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো, সাপ! সাপ ঢুকছে ঘরে।

নরেশের প্রসারিত আঙুলের দিকে তাকিয়ে সাপটা সুধারও নজরে এলো। সাপের বক্র চলন দেখলেই গা শিরশির করে। ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়।

সুধা সভয়ে বললো, মাগো! কী হবে এখন?

পরেশ ধমক দিল, কোন্‌ আক্কেলে দরজাটা ফাঁক করে রেখে এসেছো! আচ্ছা বুদ্ধি তোমার! টিভিতে দেখছো, কাগজে পড়ছো, আজকাল বিষাক্ত সাপের খুব উপদ্রব বেড়েছে। এখন খেয়াল না রেখে চললে মরতে হবে। সাপটা ততক্ষণে খাটের তলায় ঢুকে গেছে। খাটের তলায় সুধা রাজ্যের জিনিসপত্র ঢুকিয়ে রেখেছে। একবার তার মধ্যে ঢুকে গেলে আর কি দেখতে পাওয়া যাবে!

মেঘলা বলে লাইট আগেই জ্বালানো ছিল। লাইট ওই নামেই। বুড়োদের ছানিপড়া চোখের মতো ঘোলাটে। এই অঞ্চলটার সর্বত্র একই অবস্থা। টর্চটাই বা কোথায় আছে কে জানে! একটা খাটো লাঠি অবশ্য ঘরের কোণায় দাঁড় করানো আছে। এখান থেকে হাত বাড়িয়ে আনা যাবে বলে তো মনে হয় না।

মুড়ি পিঁয়াজি খাওয়া মাথায় উঠলো। বিষাক্ত সাপ কী করে যে এত বাড়লো, কে

জানে! বিভিন্ন জায়গায় রোজই দু-তিন জন করে মারা যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

মাথাটা গুলিয়ে গেল পরেশের।

সে পঞ্চায়েত প্রধানের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হাত জোড় করে কাতর গলায় বললো, ভুল হয়ে গেছে স্যার। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। কড়া গলায় ধমক দিল প্রধান, ভুল বললেই সাতখুন মাপ হয় না। একদিন নিজেও মরবেন, আমাকেও মারবেন।

—আমি ওনার কাছে মাফ্ চেয়ে নেবো, স্যার।

—দেখ, মাপ করে কিনা। যা একরোখা লোক। তায় আবার যুবনেতা। চোখ বুজে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে পান-সুপুরির কুচি খুঁচিয়ে বার করতে করতে বললো পঞ্চায়েত প্রধান সুরাবুদ্দিন মোল্লা। সে ক্লাস সেভেন অবধি পড়েছে। প্রথম বার ভোটে জিতেই সে পঞ্চায়েত প্রধান। পরেশ বি.এ. পাশ। পঞ্চায়েতের কেরানি-কাম-পিয়ন-কাম-বেয়ারা ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম দিনই মোল্লা সাহেব বলাতে চোখ বড় করে তর্জনি তুলে বলেছে, নো নো। এখন থেকে ছার বলবে। ছার অর্থাৎ স্যার শুনতে খুব ভালোবাসে সুরাবুদ্দিন।

ভুলটা পরেশই করে ফেলেছে। এমএলএ সাহেবের তৃতীয় পক্ষের চার নম্বর শ্যালককে সে চিনতে পারেনি। তাই খাতা দেখে বলে ফেলেছে, নামের লিস্টে ন-জন বিধবাই তো মারা গেছে। এরা তো ভাতা পাবে না। শ্যালক টেবিলে থাপ্পড় মেরে চোখ পাকিয়ে বলেছে, টাকাটা তোর বাপের না কি রে!

সুরাবুদ্দিন স্যার কোমল গলায় বলেছে, রাগ কোরো না সোয়াব। বাম আমলের লোক তো, নতুন কাজের ধারা এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। আমি কাল সব ঠিক করে রাখবো। তুমি পরশু এসে নিয়ে যেও।

—কাজকর্ম একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিন সুরাবদা।

পরেশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেরানি। হাজার দশেক টাকা তার মাইনে হওয়া উচিত। কিন্তু সে হাতে পায় চার হাজার টাকা। পার্টি ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদিতে বাদবাকিটা কাটা যায়। শব্দ করার কোনো উপায় নেই।

বিরক্ত পরেশ বলল, চর্চটা আবার কোথায় রেখেছো, কে জানে। এই ম্যাড়মেড়ে লাইটে কি কিছু দেখা যায়!

সুধা জবাব দিল, বোধ হয় তাকের উপর আছে।

—ও বাবা, সে তো একেবারে ওপাশের দেয়ালে। শোন, তুমি মেয়েকে নিয়ে খাটের মাঝখানে সরে এসো। আমাদের খাটটা তো এমনিতেই নিচু। সাপের উঠে আসা অসম্ভব নয়।

ভয়ার্ত সুধা মেয়েকে কোলে নিয়ে খাটের মাঝখানে চলে এলো। পরেশ বললো, দেখি, লাঠিটা আনতে পারি কিনা।

—সাবধান কিন্তু। —সভয়ে বললো সুধা।

খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো পরেশ। বাঁ হাতে খাটের বাজু ধরে ডান হাতটা যথাসম্ভব প্রসারিত করে লাঠিটা ধরার চেষ্টা করতে লাগল। কয়েকবার চেষ্টার ফলে লাঠিটায় তার আঙুলের ছোঁয়া লাগল। তাতেই ঘটে গেল আরও বিপত্তি।

লাঠিটা মেঝের ওপর শব্দ করে পড়ল। নিজেই চমকে উঠল পরেশ।

সব্বোনাশ! সাপটা তো শব্দ শুনেই এদিকে আসবে। এখন মেঝে থেকে তোলা যাবে না। তখনই মনে পড়ল পরেশের, টিভিতে একবার এক সর্পবিশারদের আলোচনা শুনেছিল। সাপের নাকি কান নেই। শরীরে শব্দের কম্পন অনুভব করে। সাপের মস্তিষ্ক এত ছোটো যে কিছুই মনে রাখতে পারে না। সেই জন্য সাপ কখনো পোষ মানে না।

লাঠিটা মেঝেয় পড়ে খাটের দিকেই গড়িয়ে এসেছে। এখন হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। খানিকটা সময় পার করেই তুলতে হবে। তা না হলে তীব্র ছোবলে হলাহল ঢেলে দেবে তার রক্তে। একটু অপেক্ষা করাই ভালো। সুরাবুদ্দিন স্যার বললেন, তুমি যেন হুট্ করে এখনই ক্ষমা চাইতে যেও না। কাঁচা রাগ তো, একটু বাসি হতে দাও।

পরেশ সবিনয়ে জানালো, আপনি যে রকম বলেন, স্যার। আপনার কথা ছাড়া তো আমি চলি না।

পানের ছোপলাগা দাঁত বার করে সুরাবুদ্দিন স্যার বললো, পুরানো অভ্যাসগুলো যত তাড়াতাড়ি ছাড়বে ততই ভালো।

অনিচ্ছার গভীর থেকে তুলে আনা হাসি হেসে পরেশ জানায়, ঠিক বলেছেন স্যার।

সুরাবুদ্দিন স্যার খুশি হন। বি.এ. পাশ ছেলের মুখ দিয়ে স্যার বলিয়ে তার গোপন মালিন্য অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যায়।

তিনি পরেশকে ডেকে তার সামনের চেয়ারটায় বসতে বলেন। পরেশ গুটিগুটি এসে বসে। মাঝেমধ্যে খুব গোপন কথা বলার থাকলে এরকম ডাকেন সুরাবুদ্দিন স্যার। চাপা গলায় বলেন, খুব গোপন কথা। দেখো, চাপা থাকে যেন।

—সে আর বলেত হবে না স্যার। —বশংবদের মতো মাথা কাত্ করল পরেশ।

—সমিতির সভাপতি যদি ইন্দিরা আবাসনের ব্যাপারে কিছু জানতে চায় তবে পরিষ্কার বলবে, ওটা তুমি দেখো না। প্রধানই দেখাশোনা করেন। বুঝলে না, শকুনের নজর পড়েছে।

ঘটলো ঠিক তাই। রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে সভাপতি পদাতিক পরেশকে ডাকলেন, এদিকে শোন পরেশ।

গাড়ির আধ্খোলা কাচের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো পরেশ, বলুন স্যার।

ইন্দিরা আবাসন যোজনার টাকা কারা কারা পেয়েছে গোপনে তার একটা লিস্ট বানিয়ে নিয়ে এসো তো। তোমার কাছেই রেখো। আমার লোক গিয়ে নিয়ে আসবে।

পরেশ অম্লান বদনে বললো, ইন্দিরা যোজনার ফাইলটা তো আমি দেখি না স্যার। ওটা প্রধানের কাছেই থাকে।

তীক্ষ্ণ চোখে পরেশের দিকে তাকালেন জেলা সভাপতি। দাঁতে দাঁত চেপে খুবই বিরক্ত গলায় বললেন, একা গেলবার ধান্দায় আছে। ঠিক আছে। আমিও দেখছি।

ধুলো আর ধোঁয়া উড়িয়ে জেলা সভাপতির গাড়ি চলে গেল।

কিন্তু এভাবে বসে থাকলে তো হবে না। যেমন করেই হোক টর্চটা আনতে হবে। জোরালো আলো না হলে এই আলো-অন্ধকারের কুহক কাটানো যাবেনা। শত্রুকে সুনির্দিষ্টভাবে চেনার জন্য তীব্র আলো চাই। তারপর তুলে নিতে হবে লাঠিটা।

তার খাট নিচু। যে-কোনো মুহূর্তে উঠে আসতে পারে বিষধর। মেয়ে আর বউকে রক্ষা করাও তার দায়িত্ব। মনে সাহস আনার চেষ্টা করলো পরেশ। কোথা থেকে এত বিষধর সাপ বেরিয়ে আসছে! বাইরের বাতাসে হয় তো অনুকূল পরিবেশের ইঙ্গিত পেয়ে গর্ত ছেড়ে উঠে আসছে সব।

সুধা সভয়ে বললো, আমার যে বড় ভয় করছে গো। কী হবে!

পরেশ অভয় দিলো, ভয় পেয়ো না সুধা। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়।

—কিন্তু খাটের নিচে তো মেলাই

জিনিসপত্র। কেথায় ঢুকে আছে, কে জানে! সুধার ভয় তবু কাটলো না।

—টর্চটা আনতে হবে—টর্চটা। দেওয়ালের কোন্ তাকে রেখেছো, খেয়াল আছে?

—যতদূর মনে পড়ে, মাঝখানের তাকেই আছে।

—দেখি। চেষ্টা তো করতে হবে। জবুথবু হয়ে বসে থাকলে চলবে না।

পরেশ সব দৃষ্টিশক্তিকে সংহত করে তীক্ষ্ণ চোখে ঘরের মেঝেটা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করতে লাগল। নামেই বিদ্যুতের বাতি, আলো দিচ্ছে কেরোসিন টেমির মতো। গ্রামের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। তুমি দেখতে না পেলে সেটা তোমার চোখের দোষ।

—দোষ ধরবার বেলায় তোমরা ওস্তাদ। আসল বিষয়টা তোমরা বুঝে উঠতে পারো না। এটাই তোমাদের প্রধান দোষ।

অফিসের চৌহদ্দিতে পা রাখলেই সুরাবুদ্দিন স্যারের কথাগুলি তার কানে ভেসে এলো।

আমাকে দেখেই সুরাবুদ্দিন স্যার বললো, এই তো পঞ্চায়েতের কেরানিবাবু এসে গেছে। সামনা সামনি জিজ্ঞেস করে দেখো?

অপ্রস্তুত নরেশ ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার স্যার?

—ইন্দিরা আবাসনের টাকা পায়নি কেন, জানতে চাইছে। আমি বলছি, টাকা এলেই পাবে। এবার তুমি বলে দাও।

সুরাবুদ্দিন স্যার তাকে ধরতাই দিয়ে দিয়েছে। ঢোক গিলে সে সত্যটাকে চালান করে দিলো উদরে। বললো, সরকারি নিয়ম কানুনে অর্ডার আসতে দেরিই লাগে। দিল্লি সরকারকে আবার নানা রকম হিসেব দিতে হয়।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বললো, তিন চারজন তো পেয়েছে শুনলাম। ওদের পাকা বাড়ি, তাও পেয়েছে।

—ওদের কাগজপত্র হয় তো ঠিক হয়ে গেছে।

একজন বললো, বর্ষা তো এসে গেলো। এখন ঘরে বসে বসে ভিজতে হবে।

আবার মুখ খুলতে হয় পরেশকে, চিন্তা নেই। আপনারাও পেয়ে যাবেন। আমি আবার উপরে চিঠি দিচ্ছি।

গজ্‌গজ্ করতে করতে গ্রামের লোকগুলি বিদায় নিলো। সুরাবুদ্দিন স্যার তার পিঠে প্রশংসাসূচক থাপ্পড় মেরে বললো, সাবাস পরেশ। তুমি পুরোনো ময়লা বেশ সাফ করে ফেলেছো। ভাবছি আগামী বার তোমাকে কাউন্সিলরের জন্য দাঁড় করাবো।

পরেশ দাঁত বের করল মাত্র। সেটা হাসির চেষ্টা না ভয়, ঠিক বোঝা গেল না।

চাবুক মারার মতো শব্দ কানে যেতেই হাতের টর্চ জ্বালালো পরেশ। বিছানাটা ভালো করে দেখল। না, বিছানায় কিছুই তার নজরে এলো না। টর্চ জ্বালিয়ে ঘরের চারদিকটা সে সতর্কভাবে দেখতে লাগল। মৃদু হলেও চাবুক চালানোর মতো শব্দটা শুনতে পাচ্ছে।

আলোটা ঘুরিয়ে কোণার দিকে ফেলতেই সে চমকে উঠলো। একটা নয়, দুটো সাপ কিছু একটা মুখে চেপে দুদিক থেকে টাগ অব ওয়ার চালাচ্ছে। মাঝে মাঝেই পরস্পরের গায়ে লেজের চাবুক মারছে। শিউরে উঠলো পরেশ। এই খেটো লাঠি দিয়ে সাপ দুটোকে মারতে যাওয়া বিপজ্জনক।

আর একটু ভালোভাবে নজর করতেই সে বুঝলো, একটা ইঁদুরকে সাপ-দুটো দুদিক থেকে কামড়ে ধরেছে। কেউ কারুর মুখের গ্রাস ছেড়ে দিতে রাজি নয়। লড়াইটা চলেছে তাই নিয়ে।

হঠাৎই পরেশের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। দুটো সাপই এখন খাদ্য নিয়ে লড়াইয়ে ব্যস্ত। এই সুযোগে যদি তিনজন বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে তবেই একমাত্র বাঁচার উপায়। ভাবা মাত্রই চাপা উত্তেজিত গলায় বললো, সুধা আমার পিছন পিছন মিঠুকে কোলে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলো।

টর্চের আলোয় মিঠু সহ দুজনেই বাইরে বেরিয়ে এলো। দরজাটা বাইরে থেকে লাগিয়ে দিলো পরেশ।

সামান্য দূরেই প্রতিবেশী এবং বন্ধু নকুলের বাড়ি। সোজা মেয়ে বউকে নিয়ে নকুলের ঘরের দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো পরেশ।

বিস্মিত নকুল বললো, হঠাৎ তোরা!

—আর বলিস না। ঘরে দু-দুটো সাপ। এই রাত্তিরে ঘরে থাকা অসম্ভব।

—ভালো করেছিস্। রাত্তিরটা এখানেই থাক। কাল দিনমানে দেখা যাবে কী করা যায়।

—কিন্তু একটা তালা চাই যে।

—সে না হয় আমি নিয়ে যাচ্ছি।

ভিতরের ঘর থেকে তালা দিয়ে এলো নকুল। ঘরের কোণা থেকে লম্বা লাঠিটা তুলে নিয়ে বলল, চল্, আমিও যাই তোর সঙ্গে।

দুই বন্ধু বেরিয়ে যাবার মুখে সুধা বলল, সাবধান কিন্তু।

পরেশ বলল, চিন্তা নেই। তারা এখন ভাগবাটোয়ারা নিয়ে ব্যস্ত। সহজে কেউ ছাড়বে বলে মনে হয় না।

সহজে ছেড়ে দেবো ভেবেছিস্। এত গিলেও হয় না। শালা এখন ভাগ চাইছে। দেবো, ভালো ভাগই দেবো। —উত্তেজিত গলায় বললো সুরাবুদ্দিন মোল্লা।

টেবিল ঘিরে আরো চারজন বসে আছে। এরা সুরাবুদ্দিনের গোপন লোক। টেবিলে মদের বোতল, গোটা পাঁচেক কাচের গ্লাস।

ইতিমধ্যেই দু-রাউন্ড হয়ে গেছে। সকলের মস্তিষ্কই সবিশেষ উত্তেজিত। একজন বলল, চিন্তা কোরো না ওস্তাদ। নামিয়ে দেবো।

বোতল ফাঁকা হবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মাথাও ফাঁকা হতে থাকল। গোপন কথা চলতে লাগল ফিসফাস করে।

এক সময় সুরাবুদ্দিন মোল্লা বললো, তোরা এখন ঘর যা। আমি খানিক বাদে যাবো।

একজন জড়িত গলায় বলল, আর যেন খেয়ো না ওস্তাদ। মোটর সাইকেল চালিয়ে যেতে হবে।

—ঠিক আছে—ঠিক আছে! তোরা এখন কেটে পড়।

আধ ঘন্টার মধ্যে আরো দু-রাউন্ড খেলো। বোতল গ্লাস আলমারিতে তুলে দরজায় তালা দিয়ে মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিল।

পরদিন পরেশ জানতে পারল, কারা যেন তার সুরাবুদ্দিন স্যারকে গুলি করেছে। পেট এফোঁড় ওফোঁড় করে গুলি বেরিয়ে গেছে। হাসপাতালে এখন তখন অবস্থা।

গম্ভীর গলায় পরেশ বললো, একজন ভালো সাপুড়ে না হলে তো এ সাপকে ধরা যাবে না।

নকুল বললো, চল্ দেখি।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নিমো-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের
স্বার্থের কথা মাথায় রেখে নিমো-২ গ্রাম পঞ্চায়েত মানব উন্নয়ন
কর্মসূচি সহ গ্রাম উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর।

Sl. No. 106

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

Arup Arogya Niketan

Surekalna, Purba Bardhaman

Sl. No. 113

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

তেলিনওপাড়া জনকল্যাণ সেবা সমবায় সমিতি লি.

রেজি. নং ৫০কে.টি. তাং : ১৮-০৯-১৯৬১
তেলিনওপাড়া, পোঃ পারুলিয়া, বর্ধমান

- সময়মতো ঋণ পরিশোধ করুন এবং ঋণ গ্রহণ করুন।
- সমবায় কর্তৃক পরিচালিত ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করুন। (সেভিংস, রেকারিং ও টাইম ডিপোজিট পরিষেবা প্রদান করা হয়।
- শস্যবীমা যোজনা প্রকল্পের সুবিধা নিন।

পঙ্কজ দেবনাথ
ম্যানেজার

Sl. No. 110

মহাকবির অভিষেক

স্বপন ঘোষচৌধুরী

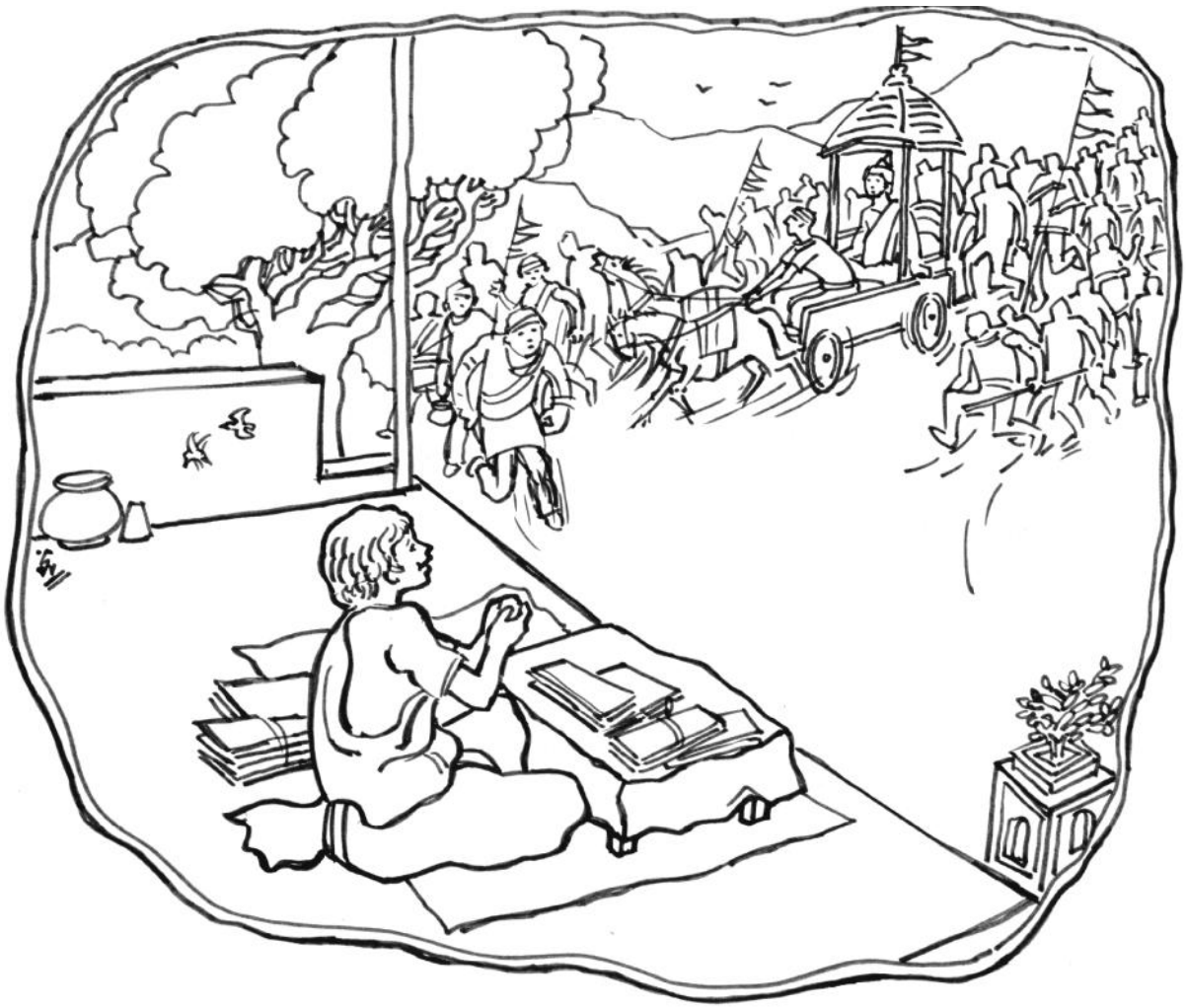

ছোট্ট নদী। একটু জোরে লাফ মারলেই মাঝনদী। আর এক লাফে ওপার। তিরতির করে জল বয়ে চলে, কোথাও গোড়ালি ডোবে, কোথাও হাঁটু। বানবন্যা নেই নদীতে। দু-পাড়ে ঝোপঝাড়, বালির রাশি আর শামুক গুগলির নাচানাচি। তারা নাচে, বাইরের কেউ বুঝতে পারে না। মাহুমা নদীর পূর্বপাড়ে ছোট্ট এক কুড়েঘর বানিয়ে আপাতত বাস করছেন এক যুবক। তাঁর কোনো পেশা নেই। বাবার কিছু সম্পত্তি আছে, প্রতি মাসে বাড়ির কাজের লোক মাস চালাবার রসদ দিয়ে যায়। চাল, আটা, বাজরা জোয়ার গুঁড়ো, মশলাপাতি আর নুন। মাটির হাঁড়িতে চাল, সব্জি, সিদ্ধ করে তাই হয় নিত্যদিনের আহার। পঁচিশ বছরের এই যুবকের নাম আশ্বঘোষ। এই যুবকের পূর্বপুরুষ কয়েকজন কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়ে শুনেছিলেন প্রভু যীশুর আগমনের কথা। সে প্রায় আড়াইশো বছর আগের কথা। তারপর কেটে গেল এতগুলো দিন। আড়াইশো বর্ষা পার হয়ে গেছে এই পুরুষপুর রাজ্যের। কত রাজা এলেন গেলেন। সেসব কথা বাবার মুখে শুনেছেন অশ্বঘোষ। শুনতে শুনতে বুকের ভেতর কখনও বেজেছে বীণার ঝংকার কখনও যুদ্ধের দামামা। কখনও ব্যথিত হৃদয় কেঁদেছে অচেনা অদেখা মানুষগুলোর জন্য। তখন মনের আকাশের সব রঙ বিবর্ণ হয়ে মিশে গেছে কোনো এক কালো কাপড়ের মোড়কে।

এই মাত্র কিছু ভূর্জপত্র সংগ্রহ করেছেন অশ্বঘোষ। ভালো করে রোদে শুকিয়ে সামান্য গরম জলে ধুয়ে আবার শুকিয়ে তার ওপর লিখবেন কাব্য। রচনা করবেন আপন মনের ভেতরের কথা, সুখ, আনন্দ, বেদনা, হাস্য ইত্যাদি। সেজন্যেই

তো বাড়ি ছেড়ে এত দূরে আসা। বাড়ির হৈ-হট্টগোলে এসব হয়না। কানের গোড়ায় শুধু বিষয়-আশয়ের কথা আর লাভক্ষতির কঠিন অঙ্ক কাব্য রচনার ইচ্ছেটাই শেষ করে দেয়।

—আমি অন্য কোথাও যাব।

কনিষ্ঠ পুত্রের এমন কথা শুনে অবাক পিতা। বলে উঠলেন, —অন্য কোথাও যাব মানে?

—নিরালায়।

—নিরালায়! জনারণ্য ছেড়ে বনারণ্যে নাকি?

—না বনেও বন্য প্রাণীদের ভিড়, দৌরাত্ম্য। যাব এক্কেবারে নিরালা, নির্জন স্থানে। যেখানে আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না। যদিও বা থাকে তারা কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না। থাকবে ছোট্ট একটা নদী, দূরে নীরব এক পাহাড় মৌন মুনির মতো চুপচাপ। আর থাকবে অজস্র পাখি, অল্প দু-চারটে হরিণ, সামনের বনে থাকবে নানা রঙের ফুলের গাছ, যে গাছে সারা বছর নানা রঙের নানা জাতের ফুল ফুটবে। ভোর হবে পাখির কাকলি শুনে, সন্ধ্যায় তারা বাসায় ফিরে কলরব করতে করতে এক সময় থেমে যাবে, দুচোখে তাদের ঘুম নেমে আসবে। সেই অন্ধকার আকাশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নক্ষত্র রাশি প্রত্যক্ষ করতে করতে এক সময় আমার দু-চোখের পাতাও মিশে যাবে এক হয়ে।

এ ছেলে কবি না হয়ে যায় না। তখনই সন্দেহ করেছিলেন বাবা যখন শিশুকালে সে বলেছিল, মাছেরা জলে খেলা করে। তাদের খেলা ভেঙে দিয়ে ডাঙায় তুলে তপ্ত আগুনে সেঁকে যারা উদরপূর্তি করে, তারা মানুষ নয় বাবা, রাক্ষস। কোনও প্রাণীর বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়া মহাপাপ। আমি যদি কোনোদিন রাজা হই, সমস্ত দেশ থেকে প্রাণীহত্যা বন্ধ করে দেব। গৌতম বুদ্ধ তো সে কথাই বলেছেন। বলেছেন প্রাণী হত্যা মহাপাপ। অহিংসার কথা প্রচার করে তিনি আজ কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন।

অতএব বড় হয়ে সে যে কবি হবার স্বপ্ন দেখবে এতে আর অবাক হবার কী আছে! লোক পাঠিয়ে ছেলের পছন্দমতো জায়গায় মহুমা নদীর পূর্ব তীরে দু-কুঠুরির ঘর বানিয়ে দিলেন। সামনে বেশ বড় উঠোন, বেড়া দিয়ে ঘেরা ফুলগাছ। কিছু ফলের গাছ। এমন সুন্দর ঘর দেখে লোকে তো অবাক। আর তার জন্য বাড়ি থেকে আহারের জিনিসপত্র আসছে পশুচালিত শকট বোঝাই করে।

জায়গাটা নিজেই পছন্দ করেছিলেন অশ্বঘোষ। এমন নির্জন স্থানই তো চাই। নিস্তব্ধ দুপুরে একমনে কাব্য রচনা করা যাবে। তাই এই নিরালায় বাস করার বাসনা।

দূরের গ্রাম থেকে দু-চারজন মাহুম নদীতে স্নান করতে আসত। দলে দলে নারীরা আসত, পাত্রভরে জল নিয়ে যেত। পুরুষরা দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে অশ্বঘোষের পরিচয় জানতে চেয়েছে। নারী আড়চোখে দেখেছে এই সুদর্শন যুবাকে, কিন্তু বাক্যালাপের সাহস হয়নি।

এখানে-এদেশে নারী-পুরুষে আলাপে কোনো বাধা নেই, তবুও আপন লজ্জায় নত নারীকুল সহসা কোনো পুরষের সঙ্গে বাক্যবিনিময় করত না।

অশ্বঘোষ নিজে সুপুরুষ। একবার দর্শনে নারীরা মুগ্ধ হয়। কিন্তু কেন কে জানে কোনো নারীর দিকে এক পলকের বেশি দু-পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারেন না। কিন্তু অনিরিতা যেন অন্য নারী।

—কী নাম তোমার?

—অনিরিতা। —ঘাড় সোজা করে বলেছিল এবং একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল—তুমি এখানে কেন? কী প্রাপ্তির আশায় এখানে, এ মুলুকে?

—এসেছি দৃষ্টিসুখের প্রত্যাশায়। ইচ্ছে আছে কিছু কাব্য রচনা করব, নিজে নাটক রচনা করব।

কাব্যের 'ক'ও জানে না অনিরিতা। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। সহসা দেখে বনের বাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে নারী আসছে নদীতে জল নিতে। চকিতে হাঁটা দেয়।

জীবনে প্রথম মানবরূপী বনহরিণী দেখলেন অশ্বঘোষ।

কিন্তু এসবের জন্য তো তিনি আসেননি, এসেছেন কাব্য রচনার আশায়। তবে কোনো এক নারীর সান্নিধ্য নাকি সৃষ্টির সমস্ত প্রয়াসের এক অদৃশ্য চালিকা হয়ে বিরাজ করে।

অশ্বঘোষ সত্যিই যেন নতুন করে প্রেরণা লাভ করলেন। কাব্য রচনা শুরু হল। এক সুন্দরীর মুখচ্ছবি আপন মানসপটে স্থাপিত করে একের পর এক ভূর্জপত্র ভরে তুললেন মসীর অক্ষরে। প্রতিদিন মসীপাত্র নিঃশেষিত হতে লাগল। বিরামহীনভাবে চলল কাব্য রচনা। এরই মধ্যে অনিরিতা চলে এসেছে আরও আছে। লোকমুখে দুজনকে নিয়ে রসাল গল্পও শুরু হয়ে গেছে। প্রেমই তো চায় মানুষ। যার মধ্যে প্রেম নেই তার মধ্যে মানুষ নেই। প্রেমহীন মানুষ আর যাই হোক, মানুষ নয়।

দিনের পর দিন চলে যায়। একদিনে শেষ হয় না মহাকাব্য রচনা। সুন্দরের অনুপ্রেরণা রয়েছে যে কাব্য সৃষ্টিতে, সুন্দর মুখের সেই হাসি যখন মিশে আছে কাব্যের প্রতিটি ছত্রে, বর্ণে তখন প্রেম ভালোবাসা, জীবনজিজ্ঞাসা আর স্বার্থত্যাগের কথা। মহাবোধির মহানির্বাণের পর যতদিন অতিক্রান্ত হচ্ছে, ততই মানুষ উপলব্ধি করছে তার প্রেমের বাণীর মর্ম। ততই যেতে চাইছে সেই পরমপুরুষের পদতলে। এই তো মাত্র দু-শতাব্দী পূর্বে আর একজন মহামানব ঈশ্বরপুত্র যীশু বিশ্বজুড়ে বিলিয়ে গেছেন মানবপ্রেমের শাশ্বত বাণী। অশ্বঘোষ ভাবেন আর একটি একটি করে শব্দ চয়ন করেন, বাক্য রচনা করেন।

হঠাৎই শতাধিক সৈন্যসামন্ত নদীতীরে এসে উপস্থিত। তাদের রঙবেরঙের পোশাক। হাতে ঢাল, তরোয়াল, কারও হাতে বর্শা। অশ্বক্ষুরধ্বনি, ধ্বনির সঙ্গে উড়ে আসা ধূলিকণা। অশ্বঘোষ অবাক হয়ে দেখেন। নদীর ঠিক ওপারে তারা থামল। শিবির স্থাপন করল। অবশ্যই রাজার সৈন্য, ভাবলেন অশ্বঘোষ। তবে ওসব নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। তিনি অবগত আছেন পুরুষপুরের রাজাধিরাজ মহামান্য কণিষ্ক খুবই দয়ালু, প্রজাবৎসল, মানবপ্রেমী। অতি সম্প্রতি তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন। অতএব রাজ সৈন্য নিয়ে অহেতুক ভীত হবার কোনও কারণ নেই। উঠোনে এক ছোট্ট বেদিতে বসে আপন মনে কাব্য রচনা করে চলেছেন।

অনিরিতা উঁকি দিল,—কী হল কবি, আজকাল তুমি কি সৈন্য পুষছো নাকি?

—তা পুষতে হয় বৈকি! এত ধনসম্পত্তি প্রহরার জন্য এছাড়া উপায় কী?

—তা ভালো, তবে কিনা এই মৃন্ময় কুটিরে বসে এত মানুষ পোষা কেমন যেন বেমানান!

—বেমানান? তবে আমি বলি, এই এত আগুনঝরানো রূপ নিয়ে একা একা নদীতে জল সংগ্রহ করতে আসাটাও বেমানান।

—তাই বুঝি? আমার রূপের উত্তাপটুকুই দেখলে, মনের চাঞ্চল্য, দৃষ্টির স্নিগ্ধতা, অঙ্গের চপলতা কিছুই নয়?

—ওরে বাবা! এ যে আমার

কাব্যচিন্তাকেও হার মানায়! মসীপাত্র, ভূর্জপত্র আর লেখনী নিয়ে এখনই বসে পড়ো। রচনা করো দেখি এক মহাকাব্য।

দূরের পাখির ডাকের মতো ভাসা ভাসা গলায় বলে ওঠে অনিরিতা, আমি তো রচনা করি না, রচয়িতাকে শুধুমাত্র সাধ্যমতো প্রেরণা দিই। রচনা তোমার কাজ, আমার কাজ দূর থেকে তোমাকে দেখা, তোমার সার্থক রচনার জন্য প্রতীক্ষা করা।

অনিরিতার কথা শেষ হয়েছে সবে, ঠিক তখনই পঞ্চাশোর্ধ সুদর্শন একজন দু-জনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ফর্সা রং, মাথায় ছোট্ট পাগড়ি, গলায় মুক্তোর হার, কানে ঝুলছে দোলক। কাঁচাপাকা শ্মশ্রু এবং গুম্ফ। চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। বিনা ভূমিকায় তিনি বলে উঠলেন—আগন্তুক কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চায়।

অশ্বঘোষ আবেগে আপ্লুত। বিমোহিত। এমন রাজবেশ পরিহিত পুরুষ, যাঁর সঙ্গে রয়েছে শতাধিক সৈন্য, তিনি সামান্য এক কুঁড়েঘরবাসী যুবাকে বাক্য নিবেদন করতে চান? অপার বিস্ময় নিয়ে চেয়ে থাকেন আগন্তুকের মুখের দিকে। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পান। উঠে দাঁড়ান। করজোড়ে প্রীতি বিনিময় করেন এবং প্রায় ছুটে ঘরের ভেতর থেকে নিয়ে আসেন খেজুর পাতার তৈরি একটি বৃহদাকার আসন। সেটি উঠোনে বিছিয়ে আগন্তুককে বসতে অনুরোধ করেন।

আগন্তুক পরম তৃপ্তিতে বসে পড়েন আসনে। এবার তাঁর পরিচয় প্রদানের পালা, আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, পুরুষপুরের বর্তমান রাজা কনিষ্ক।

—এতো সর্বজনবিদিত। আমি তো সর্বজনেরই একজন!

—ভারি চমৎকার বলেছেন। ঠিক যেন কোনও কবির কথা বলে মনে হচ্ছে।

আর চুপ করে থাকতে পারেন না অনিরিতা। কাঁখের কলস নামিয়ে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলে ওঠেন, কবির মুখ থেকে কবির মতো কথাই তো বের হয়, ভদ্রে!

আগন্তুক তাকিয়ে দেখেন মেয়েটিকে। চপলা, চঞ্চলা। যে বয়সে যা মানায়। হেসে বলেন—তাই বুঝি? আমি তাহলে এক কবির সম্মুখে দণ্ডায়মান!

অবশ্যই। সামনে দেখুন ভূর্জপত্র, মসীপাত্র এবং লেখনী।

—তাই নাকি? তা কন্যা আমার সম্মুখে অবস্থিত ওই কবির নামটি জানতে পারি?

—পারেন। কিন্তু আমার কাছ থেকে নয়। বয়োজ্যেষ্ঠর নাম উচ্চারণ করা মহাপাপ! তবে লোকমুখে শুনেছি ওনাকে পরিচিতরা অশ্বঘোষ নামে ডেকে থাকেন!

—অশ্বঘোষ। ভারি অদ্ভুত নাম তো। এখন, এবার তো আমার পরিচয়টা দিতে হয়। আমি বীরাবল্লী। পরিচয়—নৃপতি কনিষ্কর মহামন্ত্রী।

অশ্বঘোষ নড়ে উঠে প্রকট জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। আর অনিরিতা ধপাস করে জলভরা কলসির পাশে বসে পড়ে হাউমাউ করে ওঠে—আমাকে প্রাণদণ্ড দেবেন না প্রভু। না জেনে কত অপ্রয়োজনীয় কথা বলে ফেলেছি, অমার্জনীয় বাক্য বলে ফেলেছি। মার্জন করুন প্রভু।

বীরাবল্লী শব্দ করে হেসে ওঠেন, —শান্ত হও কন্যা, পরম নিশ্চিন্তে থাকো। কারণ পরিচয় প্রদান করা অপরাধ নয়। আর যেসব সরস বাক্যে তুমি তোমার মনের কথা বলেছো, তা আমার পিতৃহৃদয় স্পর্শ করেছে। এরপর ফিরে তাকান অশ্বঘোষের দিকে। বলেন,—কবিকে কবি সম্বোধন করাই শ্রেয়—কী কাব্য রচনা করেছেন প্রত্যক্ষ করে চক্ষুযুগল সার্থক করতে পারি কি?

—অবশ্যই, অবশ্যই।—অশ্বঘোষ ছুটে প্রবেশ করেন গৃহমধ্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে আসনে এক গোছা ভূর্জপত্র হাতে নিয়ে যাতে লেখা আছে কাব্য। এগিয়ে দেন বীরাবল্লীর হাতের সামনে।

বীরাবল্লী হাত পেতে গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে চোখের ইশারায় অনিরিতা চলে গিয়েছিল গৃহের মধ্যে। ফিরে এল পুষ্পপত্রে একরাশ কাটা ফল নিয়ে। বীরাবল্লীর সামনে রেখে বলল,—অনুগ্রহ করে অতিথি সেবার সুযোগ দিন!

মুগ্ধ বীরাবল্লী। রাজপ্রাসাদেই থাকেন দিনের সিংহভাগ সময়। রাজ্যের মানুষজন কেমন, তার কোনো খোঁজই রাখেন না। এই প্রথম এলেন সাধারণ মানুষের মাঝখানে। এক মৃন্ময় কুটিরে এক কবির গৃহে। কবির বান্ধবীর হাত থেকে গ্রহণ করলেন ফলফলাদি। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। হ্যাঁ, এটাই সম্ভব। যে রাজ্যের রাজা হন প্রজাপ্রিয় সে রাজ্যের নাগরিকরা তো এমনটা হবেই! পরম তৃপ্তিতে পুষ্পপত্রে অবস্থিত সমস্ত ফল শেষ করলেন। বললেন, এখানে খাজনা আদায়ে কিছু অসুবিধা হচ্ছিল, রাজাধিরাজ স্বয়ং আমাকে সে ব্যাপারে তদন্ত করতে পাঠিয়েছেন। আমি সাতদিন এখানে অবস্থান করব। এর মধ্যে আশা করি আপনার রচিত কাব্যের খণ্ডাংশ পাঠ করে নিতে পারব। এখন আমি গমন করি।

অশ্বঘোষ এগিয়ে গেলেন মহামন্ত্রীকে বিদায় জানাতে। সায়াহ্নের আঁধার ধীরে ধীরে মুছে দিচ্ছে দিনের সমস্ত আলো।

মাত্র তিন দিনেই অশ্বঘোষের লেখা মহাকাব্যের চল্লিশটি পত্রের পাঠ শেষ করলেন বীরাবল্লী। এবার পাণ্ডুলিপি ফেরত দিতে এসে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। মহাকাব্য রচনাকার কবির দিকে বিস্ময়, বিহ্বল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলে উঠলেন, এ কী পাঠ করলাম কবি। এ আপনি কী কাব্য রচনা করতে চলেছেন। এ মহাকাব্য সম্পূর্ণ হলে জগৎবাসী ধন্য ধন্য করবে।

অশ্বঘোষ অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বীরাবল্লী বলে চলেন,—একটি অনুরোধ আছে, অনুগ্রহ করে রক্ষা করবেন আশা করি।

—এ আপনি কী বলছেন মহামন্ত্রী। মন্ত্রীআজ্ঞা রাজআজ্ঞার সমতুল হয় যখন রাজা থাকেন অনুপস্থিত। অনুরোধ নয়, আপনি আদেশ করুন।

বীরাবল্লী এগিয়ে আসেন, হাত রাখেন অশ্বঘোষের কাঁধে। বলেন, এই পাণ্ডুলিপিটি আমি কয়েকদিনের জন্য নিয়ে যাব। গৌতম বুদ্ধ, তাঁর কথা এমনভাবে কাব্যরূপে অতীতে রচিত হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। আমি মহামান্য নৃপতিকে এই কাব্যের যতটুকু কাছে রয়েছে তা-ই পাঠ করাব। তিনি সংস্কৃতিমনা মানুষ। শিল্প, সাহিত্যে তাঁর প্রবল অনুরাগ। তাঁকে এই কাব্যের অংশটুকু পড়াবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

অশ্বঘোষ তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন এবং বললেন, ওই রচনার লিপি আমি আপনাকে দিচ্ছি। লিপির সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুলিপিও লিখে রাখি, হয়ত পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন লিপিই ভরসা।

—ঠিক কথা। আমাকে তাই দেবেন।—বীরাবল্লী চলে গেলেন। বিদায়ের আগের দিন দেখা করে পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেলেন।

দেখতে দেখতে একশ কুড়িটা দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। শীতের হাওয়া ধীরে ধীরে তার আগমন বার্তা জানিয়ে দিচ্ছে। উত্তর দিক থেকে মৃদু বাতাস খবর দিয়ে যাচ্ছে শীত আগতপ্রায়।

হঠাৎ একদিন দ্বিপ্রহরে অশ্বঘোষ দূর

থেকে বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেলেন। কোনো উৎসব হবে বা তারই শোভাযাত্রা আসছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো অনিরিতা। একেবারে অশ্বঘোষের সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে প্রায় পড়ো পড়ো।

—এ কী, এ কী?—অশ্বঘোষ চমকে ওঠেন।

জোরে জোরে শ্বাস প্রশ্বাস চালাতে চালাতে অনিরিতা যা বললেন তার সারমর্ম এই—পুরুষপুরের রাজাধিরাজ কণিষ্ক স্বয়ং এই দিকে আসছেন। কত সৈন্য, হাতি, ঘোড়া! বাদ্যযন্ত্র। হাতির পিঠে সোনার কেদারায় তিনি বসে আছেন। পিছনে আর একটা অপেক্ষকৃত ছোটো হাতিতে মহামন্ত্রী বীরাবল্লী।

শুনে অশ্বঘোষের হৃদ্‌কম্প শুরু হয়ে গেল। অবিন্যস্ত কেশ, নেহাতই সাধারণ একখানি উত্তরীয়—এ পোশকে কি নৃপতির মুখোমুখি হওয়া যায়!

অনিরিতা তার খোঁপার পিছন থেকে ছোট্ট কাঁকই বের করে অশ্বঘেষের কেশ বিন্যাস করে দিল। উত্তরীয়টা ভালো করে ঘাড়ে জড়িয়ে দিল।

বাদ্যযন্ত্রর শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। কয়েক দণ্ডের মধ্যেই তা পৌঁছে গেল নদীতীরে।

অশ্বঘোষ কম্পিত পায়ে দুরু দুরু বক্ষে এসে দাঁড়ালেন নদীতটে। দুটি হাতি, কয়েকটি ঘোড়া নদীর সামান্য জল অতিক্রম করে এপারে পৌঁছল।

মহামন্ত্রী বীরাবল্লী প্রথমে হাতি থেকে নামলেন। তারপর নামলেন পুরুষপুর নরেশ কনিষ্ক। শালপ্রাংশুর মতো সুঠাম, দীর্ঘদেহী মানুষটিকে দেখে বিস্মিত অশ্বঘোষ। হাঁটু গেড়ে অভিবাদন করলেন নৃপতিকে।

হাসিমুখে এগিয়ে এলেন কনিষ্ক।—আমার যদি ভুল না হয়ে থকে, আমি কবি অশ্বঘোষের সম্মুখে অবস্থান করছি।

সম্মোহনী রূপ, সম্মোহনী ভাষা, বাক্য। কণ্ঠস্বর যেন সুরের ঝংকার। অশ্বঘোষ নির্বাক।

এগিয়ে এলেন কনিষ্ক। বীরাবল্লীকে পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য ইশারা করলেন। অশ্বঘোষের দুই কাঁধে হাত রেখে বললেন—আপনার মহাকাব্যের সম্পূর্ণ অংশ আমি পাইনি, পাঠও করতে পারিনি। আমার কাব্যপাঠের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি, অসাধারণ, অনবদ্য। আপনার লেখনী অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ মহাকাব্যের বাকি যতটুকু রচিত হয়েছে পাঠ করুন।

বিগলিত অশ্বঘোষ বলে উঠলেন,—এ কাব্যটি অধিকাংশ রচিত হয়ে গেছে। আপনি পাঠ করলে আমি কৃতার্থ হব।

ইতিমধ্যে কনিষ্কের জন্য বসার কেদারা এসে গেছে। তাতেই উপবেশন করলেন তিনি।

অশ্বঘোষ গৃহের ভেতর থেকে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি নিয়ে এলেন, তুলে দিলেন কনিষ্কের হাতে।

কনিষ্ক বললেন, আজই আমি রাজধানী ফিরে যাচ্ছি, ঠিক সময়ে আপনার রাজধানীতে যাবার জন্য বাহিনী পাঠাব। আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেবেন না যেন।—তারপর হঠাৎ চোখ পড়ল অনিরিতার দিকে। মহামন্ত্রীর মুখে যে মেয়েটির কথা শুনেছিলেন এ-ই কি সেই মেয়ে? বীরাবল্লীকে কানে কানে সে কথা বলতেই বীরাবল্লী ঘাড় দোলালেন।

সে বারের মতো বিদায় নিলেন কনিষ্ক। যাবার আগে অশ্বঘোষের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন মণিমুক্তা খচিত কণ্ঠহার আর শোভাযাত্রার সঙ্গে অনুগমনকারী এক পরিচারিকা একান্তে ডেকে পাঠালো অনিরিতাকে। ঠাট্টার ছলে বললো, তুমিও প্রস্তুত থেকো।

—মানে?—অনিরিতা বুঝতে পারে না।

—মানেটা পরে বলব। সব অর্থ একসঙ্গে বললে বড্ড অনর্থ বেধে যায়, ওটা তোলা থাক।

মাত্র একশ দিনের মাথায় বীরাবল্লী এলেন—কবি, আমাদের রাজাধিরাজ আপনাকে সসম্মানে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছেন। এই নিন আমন্ত্রণপত্র।

বীরাবল্লী একটি আমন্ত্রণপত্র অশ্বঘোষের হাতে অর্পণ করেন।

অশ্বঘোষ বিহ্বল, বিস্মিত, পুলকিত! মহামন্ত্রীকে অভিবাদন করে নিবেদন করেন, আমি সামান্য মানুষ, কী আছে আমার! নৃপতি স্বয়ং আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, লিখেছেন একটি চমক অপেক্ষা করছে আমার জন্য। আমি অবশ্যই যাব এবং সেই চমক প্রত্যক্ষ করব।

এবার বীরাবল্লী বলেন,—আপনার প্রিয়বান্ধবী অরিনিতাকেও রাজাধিরাজ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি এখনই তাঁর গৃহে যাব, এক মহিলা রাজকর্মচারী সঙ্গে এসেছে। তিনি তাঁর হাতে আমন্ত্রণপত্র তুলে দেবেন, অবশ্যই নির্দিষ্ট দিনে রাজধানীতে যাবার জন্য অনুরোধ করবেন।

—অনিরিতা কেন? ও যে বড্ড ভিতু। রাজগৃহে ও কি যেতে সাহস পাবে?

—পাবে পাবে! আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। রাজা সৈন্য এবং লোকজন পাঠিয়ে মহাসমাদরে অরিনিতাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন। অনুগ্রহ করে তাঁর গৃহের পথের বর্ণনা দিন।

অনিরিতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বীরাবল্লী অশ্বঘোষকে বললেন,—আপনার পিতা- মাতা ভ্রাতা-ভগ্নীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। তাঁদের জন্যও আমন্ত্রণপত্র আছে। আমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে চলুন।

অশ্বঘোষ বুঝতে পারলেন না কী এমন অনুষ্ঠান যার জন্য তাঁর পিতামাতা ভ্রাতা-ভগ্নীকেও যেতে হবে! আগ্রহ থাকলেও কোনও প্রশ্ন করলেন না। এটি ভদ্রতার বাইরে।

রাজধানী পৌঁছে অশ্বঘোষ তো অবাক। বিস্ময়ে চোখের পলক পড়ে না। ইতিপূর্বে রাজপ্রাসাদ দেখেন নি, এখন দেখলেন। দেখে চক্ষু স্থির। পলক পড়ে না। নীল আকাশের নিচে গোলাপি এক বিশাল প্রাসাদ যেন সদ্য প্রস্ফুটিত এক গোলাপ। কী অপূর্ব সে দৃশ্য। বিমোহিত অশ্বঘোষ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগ্নীর সমান অবস্থা। তার চেয়েও বড় চমক ছিল সমাদর। একবেলা বিশ্রামের পর সদলবলে মহামন্ত্রী উপস্থিত হলেন অশ্বঘোষকে রাজসভায় নিয়ে যাবার জন্য।

এমন সমাদর পেয়ে অশ্বঘোষ যেন মাটিতে মিশে যেতে চাইছেন। কেন এই সমাদর!

বীরাবল্লীকে অনুসরণ করে অশ্বঘোষ তার গৃহের আপনজনদের সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন বিশাল এক সুসজ্জিত কক্ষে। নৃপতি কণিষ্ক স্বয়ং সিংহাসনে আসীন। অশ্বঘোষ তাঁকে অভিবাদন করে চারপাশে তাকিয়ে দেখেন কক্ষটি মানুষজনে পরিপূর্ণ। একজন পুরোহিত শ্বেতশুভ্রবসন পরিধান করে হাতে একটি পুষ্পপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

বীরাবল্লী অশ্বঘোষকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন সেই পুরোহিতের সম্মুখে।

হঠাৎ নৃপতির ঘোষণা,

—ভদ্রমোহদয়গণ, যে জন্য আপনাদের আজকের এই সভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছি, এখন সেই কার্য শুরু হবে। আমার সম্মুখে

দণ্ডায়মান অতিথির পরিচয়, তিনি একজন কবি। তাঁর রচনাপ্রতিভা এক বিস্ময়। তাঁর কাব্য পাঠ করে আমি মুগ্ধ। আমার রাজসভার বিশিষ্ট পণ্ডিতগণও মুগ্ধ ও বিস্মিত। তাই আমি রাজ্যের অধিপতি সম্রাট কণিষ্ক ঘোষণা করছি, আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান কবিকে আমার রাজসভার সভাকবি রূপে বরণ করছি।

সভাজুড়ে কণিষ্কর জয়ধ্বনি শোনা গেল।

কণিষ্ক সিংহাসন থেকে নেমে অশ্বঘোষের হাত ধরলেন। তাঁকে নিয়ে বসালেন সভাকবির নির্দিষ্ট আসনে। তুমুল হর্ষধ্বনিতে ভরে উঠল সভাগৃহ।

অশ্বঘোষ হতবাক। এমনটা যে হবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি।

এরপর আরও এক চমক। কনিষ্ক আহ্বান করলেন মনজিতা নাম্নী এক মহিলাকে। নির্দেশ দিলেন মাহুম নদীতীরের গ্রাম থেকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা অনিরিতাকে রাজসভায় উপস্থিত করার জন্য।

অনিরিতা সলজ্জ বদনে, নতশিরে উপস্থিত হল রাজসভায়।

কণিষ্ক ঘোষণা করলেন, কবি বা অন্য যে-ই হোন, বড় হতে গেলে কারও না কারো অনুপ্রেরণা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে থাকে। আমার রাজ্যের সভাকবি অশ্বঘোষের মহাকবি হওয়ার পশ্চাতে অনিরিতার প্রত্যক্ষ অবদানের বিষয়টি আমার গোচরে এসেছে। তাই অনিরিতার অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাকে অশ্বঘোষের হাতে সমর্পণ করতে চাই। আগামী পূর্ণিমা তিথিতে এ-বিবাহ সম্পন্ন হবে। রাজ্যজুড়ে উৎসব পালন করা হবে।

অশ্বঘোষের চার পাশের সমস্ত কিছু যেন প্রবল আলকোচ্ছ্বাসে ডুবে গেল। তিনি আর নিজের মধ্যে আছেন কিনা বুঝতে পারলেন না। দু-হাত জোড় করে সূর্যদেবকে নিবেদন করলেন তাঁর একান্ত প্রণাম—হে তেজোময়, সর্বশক্তিমান, সর্ব আলোকদাতা, জীবনদাতা—তোমার এই জাগতিক তাপ বিচ্ছুরণে মানবকুল কোটি কোটি বছর ধরে সম্মুখের পথে পাড়ি দেবে। জীবন-জিজ্ঞাসা প্রতিনিয়ত তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তোমায় শতকোটি প্রণাম!

সভাগৃহ জয়ধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনিতে ভরে উঠল। বৃন্দবাদন ছড়িয়ে দিল সুরের মূর্চ্ছনা।

অশ্বঘোষের দুচোখে টলটল অশ্রু।

সভাকবি হয়ে তাঁর লেখনীতে কাব্যের শতধারা। প্রথম মহাকাব্য বুদ্ধচরিত, দ্বিতীয় সৌন্দরনন্দ এবং তৃতীয় শারীপুত্ত প্রকরণ যা নাটকের ভাগ হিসেবে আজও চিরভাস্বর।

With best compliments of

PRACHESTA SELF HELP GROUP

(Lic. No. 19026/06-07, Dt. 26-06-2006)

All Sorts of Civil, Construction/Mechanical Jobs, Labour & General Order Supplier

Regd. Office : B.B.D. Nagar, Sagarbhanga, P.O. Durgapur-11, Dist. Paschim Bardhaman
Camp Office : Qr. No. Q-2, Sagarbhanga Colony, P.O. Durgapur-11, Dist. Paschim Bardhaman
Mob. 9832749263, Ph. 0343-6453962

Sl. No. 102

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কালেখাঁতলা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ পারুলিয়া, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪৫৪) ২৬৪২২২, E-mail : prodhan.kale2@gmail.com

পঞ্চায়েতের আহ্বান

১. নিয়মিত পঞ্চায়েত কর জমা দিন ও এলাকার উন্নয়নে হাত বাড়ান। ২. 'পঞ্চায়েতের সম্পদ আপনারই সম্পদ' তা রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার। ৩. জন্ম-মৃত্যুর ঘটনা ২১ দিনের মধ্যে নথিভুক্ত করান। ৪. জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান স্কিমের সুযোগ নিন। ৫. 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' তাই প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার আঙিনায় আনতে হবে। ৬. এলাকার সমস্ত ভূমিহীন খেতমজুরদের ১০০ দিন কাজের সুনিশ্চিতকরণ, ৭. ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন। ৮. এলাকার সমস্ত জনগণকে সার্বিক স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা প্রদান। ৯. গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় আরও অধিক সংখ্য প্রকল্প গ্রাম বাংলার জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ১০. স্বচ্ছ ভারত অভিযান সফল করুন। ১১. সকলে বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার তৈরি করুন ও ব্যবহার করুন। অন্যকে খোস্থানে মলমূত্র ত্যাগের কুফল সম্বন্ধে সচেতন করুন।

জয়ন্তী মজুমদার (কুরী)
উপপ্রধান

শিপ্রা দাস
প্রধান

Sl. No. 105

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শুভম কনস্ট্রাকশন

প্রো. বিধানচন্দ্র রায়
শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারি, উখরা, পশ্চিম বর্ধমান

Sl. No. 135

With best compliments of

BOHULA COLLIERY EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

Reg. No. 443 Dt. 22-03-96
Bohula Colliery, P.O. Bohula, Dist. Paschim Bardhaman

Sl. No. 132

শিমূলে পলাশে রঙ

তপোময় ঘোষ

পাড়ার মাধুপিসির কাছে টিউশনি পড়ে বনি। বাড়ির কাছেই। কষ্ট করে বেশি দূর যেতে হয় না। পিসি পড়ায়ও ভালো। বেশি জন পড়েও না। বনি, শ্যামলী আর ছবি। এই তিনজন। অন্যান্য স্যারদের ব্যাচে যা ভিড়! বসার জায়গা পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে মাধুপিসির কাছে পড়তে যাওয়া লাখো গুণে ভালো।

পড়ানোর নাম করে অন্যান্য হুজুগও মাধুপিসির নেই। ওই তো সন্দীপকাকুর কাছে যারা পড়ে, প্রত্যেককে সেদিন একশ টাকা করে দিতে হয়েছে, পিকনিক করতে যাওয়ার জন্য। সঞ্জীবস্যারের ব্যাচ বড়দিনে হাজারদুয়ারি গেল বেড়াতে। মোটা চাঁদা দিতে হল পড়ুয়াদের। সাধনস্যারের ছাত্রদের মাঝে মধ্যে প্রণামী দিতে হয়। কিন্তু মাধুপিসির ওসব কোনো কিছু নেই। আর এসবের জন্যেই পিসিকে বর্ণালীদের এত ভালো লাগে।

পাড়ার মেয়ে মাধবী যেটুকু জানে সেটুকুই তার ছোট্ট ছোট্ট ছাত্রছাত্রীদের শেখায়। কোনো ফাঁকি নেই। ধৈর্য ধরে, নিষ্ঠা ভরে সেটুকুই সে সঞ্চারিত করে দেয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। সত্যিকারের পিসিমনির মতো পরম মমতায়।

মাধুপিসির জীবনও খুব সরল ও অনাড়ম্বর। অবশ্য তারও অনেক ইতিহাস আছে। মাধুপিসি তো এখন বিধবা। শাঁখা পরে না। সিঁদুর নেয় না। সাদা ধবধবে সিঁথি। সর্বদা মলিন মুখে যেন বিষাদ প্রতিমা। তার করুণ অথচ শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টির মধ্যে বিরাজ করে কেমন একটা হাহাকার। কেমন একটা অস্ফুট বেদনা।

স্বামী-পুত্র হারা এই বিধবার জীবন সত্যিই বর্ণহীন। বিবর্ণ। বর্ণালী তার মায়ের কাছে শুনেছে মাধুপিসির খুব ভালো ঘরের ভালো বরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। শ্বশুরবাড়িতে দুবছর ঘরসংসারও করেছিল। তার শ্বশুরবাড়ি ছিল শ্রীনিকেতনের পাশে কোনো একটা গ্রামে। সেখান থেকে শান্তিনিকেতন খুব কাছে। নিত্য নৈমিত্তিক যাতায়াত।

শহর বোলপুরে উচ্ছৃঙ্খল ট্যুরিস্টদের একটা গাড়ি মাধুপিসির বরকে চাপা দিয়েছিল। বেচারা সাইকেলে চড়ে বাজার যাচ্ছিল। মর্মান্তিক পথ-দুর্ঘটনায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিয়ানের হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছিল। তাতেও মাধুপিসি ভেঙে পড়েনি।

শ্বশুরবাড়িতেই ছিল। একটা ফুটফুটে ছেলে ছিল তার। ঘটনাচক্রে ছেলেটিও নিউমোনিয়ায় মারা যায়। পিসি তখন আর স্থির থাকতে পারেনি। পাগলের মতো হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে তার বাবা, দাদারা তাকে এখানে এনে রাখে। সেই থেকে মাধুপিসি করুণ রসে চোবানো।

সন্ধ্যেবেলায় পিসি যে গান করতে বসে সেখানেও সেই করুণ রাগিনী। নিয়তি তাড়িত জীবনের দুঃখ বেদনা সুর হয়ে আকাশে বাতাসে মেশে। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তের বহুল প্রচলিত বিরহব্যথিত গানগুলিই ব্যক্ত করে দেয় তার হৃদয়কথা। সন্ধ্যা-প্রতিমা-যূথিকার গানগুলিও যেন তার মনের কথার বাহন। প্রতিদিন ওই ঘণ্টা-দেড়েকের সুর বিতান তার মনকে একটু মুক্তি দেয় বৈকি!

একদিন বনি বলল, পিসি, আমাকে গান শেখাবে?

—না রে, আমি শেখানোর মতো অত গান জানি না।

—তুমি যতটুকু জানো ততটুকুই শেখাবে। আমি আসবো। নাছোড় বনি এখন প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় হারমোনিয়ামের পাশে এসে বসে। ডিসটার্ব করে না, শুধু গান শুনে যায়।

—তোর পড়াশোনা নেই? যা পড় গে। প্রতিদিন সন্ধ্যাটা নষ্ট করতে আসছিস! মা-বাবা বকে না?

—না। তোমার কাছে এলে কিচ্ছু বলে না।

সত্যিই, এতটাই নিশ্চিন্ত মাধুর ছাত্রছাত্রীর মা-বাবা, অভিভাবকরা যে, তার কাছে এলে খারাপ কিছু হবে না। একটা বড় ভরসার জায়গা তৈরি করেছে মাধু। তার জীবনযাপন, ত্যাগ-তিতিক্ষা দিয়ে এই আস্থা সে অর্জন করেছে। শেষ গানের রেশ নিয়ে অনেকটা সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে বনি।

দুই

ওরাও আটঘাট বাঁধছিল। ছকুর দীর্ঘদিনের সাধ অন্তত একবার মাধবীর ঠোঁটে ঠোঁট দেবে। বুকে জড়িয়ে ধরবে। তারপর যা হয় হবে। ওকে ইশারায় ইঙ্গিতে অনেকদিন ধরে বুঝিয়েছে, সে তাকে চায়। মাগীর দেমাক দেখে তা ভাঙার জেদ চেপেছে ছকুর। এখন তার দোসর হতে চেয়েছে কাজীপাড়ার মানিক।

তাদের দুর্মর আকাঙ্ক্ষা মাধুকে ভোগ করার। তার কাছে উপগত হওয়ার একশভাগ ফাঁকফোকর খোঁজে ওরা। রাস্তাঘাটে, মেলায় খেলায় স্টেশনে বাসস্ট্যান্ডে ওৎ পেতে থাকে। কিন্তু মাধু যে ওইসব পথ ক্রমশ মাড়ানো বন্ধ করেছে...

কিন্তু ওদের পথ যে খোলা। গাঁয়ের অলিগলি রাজপথ সব ওদের দখলে। গত কবছর অজয়-গঙ্গার বান মাঠ ভাসায় নি। সামান্য ভাসালেও ফসল পচিয়ে চাষীদের সর্বস্বান্ত করেনি। পর পর ক বছর ধান পেয়েছে গাঁয়ের চাষীরা। ফলত গাঁয়ে এবার প্রচুর পাকা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সম্পন্ন চাষীরা নিজের টাকায় করছে। আর গরিবদের কেউ কেউ সরকারি যোজনায় 'ইন্দিরা আবাসন' প্রকল্পে পেয়েছে। গীতাঞ্জলি প্রকল্পও...

আর সেইসব আবাসনের ইঁট-বালি-পাথর সরবরাহের বরাত পেয়েছে সদ্য রুলিং পার্টিতে যোগ দেওয়া মানিক। ছকুর সঙ্গে তার দোস্তি বেড়ে বেড়ে এখন চব্বিশ ঘণ্টার শয়নে স্বপনে। মাধুর প্রতি উলুক ঝুলুক, ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিপাত। আক্রমণের শুভ লগ্নের অপেক্ষায়। ব্লু-প্রিন্ট বারবার তৈরি হয়, আবার বাতিল হয়। মেয়েটা সত্যিই অন্যরকম। কোনো প্ল্যানেই একশ ভাগ বাগে পাওয়ার বালাই নেই। সর্বত্র প্ল্যান পণ্ড হওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা। ছটফট করে ছকুর দল।

অবশেষে এল আবার একটা চান্স। এ পাড়ার কালুর মায়ের 'ইন্দিরা আবাসন' স্যাংশান হয়েছে। ইট বালি এবার এই গলিতেও পড়বে। ইট বালি দেখে নিতে আসার সুযোগ পাবে মানিক কাজী। ইট তো ভাটা থেকে গোনাগুনতি হয়ে আসে। তবুও ছকু গুণছে। পারলে বালিও গোণে। ট্র্যাক্টরের ডালায়, টিনে বা অন্য কোনো মাপক যন্ত্রে নয়—একটা একটা করে।

তিন

বিরাশি বছরের কালুর মায়ের ভোটার লিস্টে বয়স হয়েছিল মাত্র তিরিশ বছর। তা সেই ভুল সংশোধন করতে তার লেগে গেল আরও দুতিন বছর। বি.পি.এল তালিকার খুকুরানি পালের নামের সোনার সঙ্গে বয়সের সোহাগা মিশতেই 'গরিব মানুষের ঘর তৈরির' কোটায় তার নাম পঞ্চায়েত অফিস হয়ে ড্যাং ড্যাং করে এক্কেবারে বিডিও সাহেবের টেবিলে। আর যায় কোথা, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং বিডিও সাহেবের সবুজ কালির 'সই'-এ ইটের ঘরের ছাড়পত্র। সত্তর হাজার টাকা সোজা সেঁধিয়ে গেল বুড়ির অ্যাকাউন্টে। হ্যাঁ, বাড়ির পাশে গঙ্গাটিকুরীর ইউকো ব্যাঙ্কের হিসাবে।

পঞ্চায়েত-সদস্য কমল চৌধুরী যেদিন এই শুভ সংবাদটা দিয়ে বুড়িকে একটু হাসিয়ে যায়, তার পর দিন সন্ধ্যায় চৌধুরীর পার্টির ছেলেরা এসে বলে গিয়েছে, 'খুকুরানি পাল, কুড়ি হাজার লাগবে।'

—'পার্টির লোকে কুড়ি হাজার টাকা চেয়েছে। ' বলে গোটা গাঁ গাবিয়ে ছাড়ল বুড়ি। ছেলেগুলোর ওপর আপাতত চরম রাগতে হল কমল চৌধুরীকে। কেন যে এমন কাঁচা কাজ করে ফেলে তার ছোলেরা। অবশ্য পরোক্ষ নির্দেশ তো আছেই। টাকা তো চাই-ই। টাকা ছাড়া দল চলবে কী করে? যাক্ না বুড়ি যেখানে খুশি। বিডিও আমাদের ঘোড়ার ডিম করবে।

কালুর মায়ের সাতকুলে কেউ নাই মনে হলেও একটা ভাইপো আছে বাপের বাড়িতে। তাকেই ঘরটা দেখে শুনে করে দেবার ভার দেবে ভেবেছিল বুড়ি। ভাইপো সুদেব একদিন এসেও ছিল। ভিটের কোন দিকে কোন দুয়ারি ঘর করলে ভালো হয় পিসিমাকে বুঝিয়েও গিয়েছে সে। কিন্তু...

কমল চৌধুরীর পার্টির ছেলেরা চাইছে ঘরটা তারাই দেখে শুনে করে দেবে। তাদের মধ্যেই কেউ ইঁট বালি শিক সিমেন্ট সাপ্লাই করবে; কেউ মিস্ত্রি দেখে দেবে, কেউ দেবে দরজা-জানলা। সব যেন তক্কে তক্কে আছে! বুড়ির টাকা যখন অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেছে, ভাবনা কী! এ ঘর করতে আর অসুবিধা কোথায়?

সুতরাং ছেলের দল, মানে ছকু, মানিক, ভোম্বল, লটাই, খোকনরা। গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে থেকেই এরা নেতা কমল চৌধুরীর হাত শক্ত করেছে। সবাই তাদের নিজের পাড়ার ভোটারদের ভোট ম্যানেজ করেছে। কখনও নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে, কখনও দল বেঁধে পাড়ায় বলে বেড়িয়েছে, কাকু ভোটতলায় খুব ঝঞ্ঝাট, ওখানে যেতে হবে না। কাউকে বলেছে, জ্যেঠিমা, ওখানে খুব টেনশান আছে, যে কোনো সময়ে বোমা পড়তে পারে। কী দরকার ভোট দিতে যাওয়ার। এসব কথা উড়িয়ে যারা বুথ-মুখো হয়েছিল, তাদের আঙুলে কালি দিয়ে, নিজেরাই ছাপটা দিয়ে দিয়েছিল। ফলে কমল চৌধুরী রেকর্ড ভোটে জিতে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য বনে গিয়েছিলেন। এভাবে জেতানোর প্রতিদানটা ইঁট-বালি-শিক-সিমেন্টে তুলবে না তো কী করবে? হ্যাঁ উসুল তুলতেই হবে।

কুড়ি হাজারটা তো পার্টি বলেছে। ওটার ভাগ কমল চৌধুরীরা করবেন। ছকু, মানিকদের কিছু করতে গেলে তার বাইরে করতে হবে। আর সে চেষ্টাতেই ওরা মগ্ন। তার সঙ্গে আরও একটা কু-মতলব তো আছেই। সেটা ওই মাধু...

চার

কালুর মায়ের বাড়ি থেকে তিনটে গলি দূরে মাধবীদের বাড়ি। এই দুই বাড়ির মাঝখানে বর্ণালীদের বাড়ি। ছোট্ট মেয়েটা এখান থেকেই মাধুপিসিদের বাড়ি পড়তে যায়। সে-ও চোখে পড়ে যায় ছকুদের। শ্যেন দৃষ্টি তো! কিচ্ছু করার নেই! ছকুরা এখন বাংলার মেয়েদের ভাগ্যবিধাতা! হ্যাঁ, কচি-কাঁচাদেরও।

বনি সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা মাধবীদের বাড়ি আসে যায়, পথে যে কোনো বিপদ ঘটতে পারে, সে ধারণাও করতে শেখে নি। আদতে শেখার বয়সটাও তার হয় নি। কিন্তু তার জন্য তো আর তাকে ছাড় দেওয়া যায় না। ছকুদের ভাবনায় মাধবীর প্রায়োরিটি ফার্স্ট, তারপরে এটাকেও... বিকৃত ভাবনার স্বর্গভূমি এখন এ রাজ্য। ভাবতে ক্ষতি কী? শুধু ভাবনা? কাজে করলেও ঘোড়ার ডিম! একটাই জীবন ভোগ করতে হবে। এরা সেই ভোগের সামগ্রী! ওঁৎ পেতে থাকে ছকুরা।

তারপর একদিন সন্ধ্যারাতে সেই মহাক্ষণ উপস্থিত হয়। বুড়ির বাড়িতে সিমেন্টের ভ্যানটা একটু বেশি সাঁঝেই ঢোকায় শুকুল ভাই। বলে, চাকা পাংচার হইয়েছেলো...। ছকু সিমেন্ট নামিয়ে বুড়িকে বুঝ করে দেওয়ার ছুতোয় পাড়াতেই ঘোরাফেরা করছিল। মানিকও আর একটু দূরে...

দশ বছরের মেয়েটা এ পথে আসতেই ছকু তার পথ আটকে বলে, কোথা যাবি? সে বলে মাধুপিসির কাছে।

—চল আমিও যাবো। তোর পিসি এখন কী করছে?

—জানি না। কে তুমি?

—আমি, তোর পিসির বর। চল্ চল্...

ভয়ে অথবা উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে জোরে চিৎকার করে ওঠে বর্ণালী। ও বাবাগো... ও মা গো... পিসি... ও, মাধুপিসি... বাঁচাও...

মাধুও যেন ওঁৎ পেতে ছিল বঁটি নিয়ে। আর ছিল পাড়ার অনেকগুলো কচি-কাঁচা। দৌড়ে পালাতে তাদের কয়েক সেকেন্ড লাগলো। মিনিটের ভগ্নাংশে ঘেরা হয়ে গেল শয়তান ছকুকে। এবার বড়দের উপস্থিতি উদ্দাম জনস্রোতে। খবর এলো ওদিকে মার খেতে খেতে মানিক আওরাচ্ছে, '...আমি নই, আমি নই... আমি সিমেন্ট...'

ক্রুদ্ধ জনতা তার সে কথায় কান দেওয়ার সময় পাচ্ছে না। ছকুকে আরও বেশি উত্তম মধ্যম দেওয়ার মধ্যেই তারও কৈফিয়ৎ—আমি কালুর মায়ের ঘর...

—নিকুচি করেছি তোর কালুর মায়ের ঘরের...' আবারও চড় থাপ্পড়, কিল, ঘুষি...

ঘটনাক্রম থামে কমল চৌধুরীর উদ্ধত উপস্থিতিতে। মানুষজন টের পেয়ে যায়, সহজে তারা মুক্তি পাবে না—প্রতিশোধ হবে। আগামীতে সর্বনাশ করে ছাড়বে এই অক্ষ। দ্রুত অবরুদ্ধ হয়ে যান স্বয়ং চৌধুরীও। অনেক রাত্রে মুচলেকা দিয়ে তার ছাড় হয়।

চৌধুরীর ফোনে সকালে পুলিস এলো গ্রামে। দেখল, গ্রামে শিমুলে পলাশে রঙ দুলছে।

With best compliments of

SRMB

Leasership through innovation

SRMB SRIJAN LIMITED

DURGAPUR WORKS
Sagarbhanga, Durgapur 713211, Dist. Burdwan
Phone + 91(0343) 6450788 / 645 0877
Fascimile : +91 (0343) 255 9206 / 255 9205

Sl. No. 95

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পঞ্চায়েতের সার্বিক উন্নয়নে চাই সকলের সহযোগিতা।
প্রতি ঘরে শৌচাগার আমাদের অঙ্গীকার।

গোপগন্তার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

ক্ষুদিরাম কোঁড়া
উপপ্রধান

শম্পা ক্ষেত্রপাল
প্রধান

Sl. No. 104

With best compliments of

A
Well Wisher

Kuchut– Rajbari

Sl. No. 143

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

মহাশক্তি কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি.

শুঁড়েকালনা, জামালপুর, বর্ধমান

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 111

বর্ণপরিচয়

মানিকলাল অধিকারী

আফ্রিন স্কুল কামাই করে না। ক্লাস টেনে ওঠার পর সব শিক্ষকমশাইরা বলে দিয়েছেন—''এবার তোমরা আর মাত্র কয়েকটা মাস পরেই জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসতে যাচ্ছ। এ সময় স্কুলে না এলে তোমাদেরই ক্ষতি।''

আফ্রিন তাই স্কুল কামাই করে না। কিন্তু আজ আফ্রিনের স্কুল ছুটি। শুধু আজই নয়, গত সাতদিন ধরে স্কুল বন্ধ। কারা যেন হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা এসে তাদের স্কুলের লাইব্রেরিটা পুড়িয়ে দিয়ে গেছে।

আফ্রিনরা তখন ছিল বাংলার ক্লাসে। মাস্টারমশাই উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে পড়াচ্ছিলেন 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ'। হঠাৎই শোরগোল। চিৎকার, চেঁচামেচি, আর্তনাদ, ছুটোছুটি। পেট্রলের গন্ধে গোটা স্কুলবাড়িটার বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে ভেসে আসছে কাগজ পোড়ার গন্ধ। বোমা ফাটার শব্দ উঠছে খেলার মাঠটার ওপার থেকে। এক দমবন্ধ করা পরিবেশ। বোমার শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল দূরে। স্কুলের করিডোরে তখন শুধু হেডমাস্টারমশাইয়ের নির্দেশ—''তোমরা টেনশন করো না। ক্লাসেই বসে থাকো। শুধু কয়েকজন বড় ছেলেমেয়েরা এস। এখনো চেষ্টা করলে হয়ত লাইব্রেরিটা কিছুটা বাঁচানো যাবে।''

ছেলেরা হইহই করে বেরিয়ে পড়ল। তাদের পেছন পেছন আফ্রিনও। পুকুর থেকে রিলে পদ্ধতিতে জল এনে প্রয়াস চলছে লাইব্রেরির আগুন নেভানোর। তাকে অক্ষর চিনিয়েছিল তার মামা। আজ এই অক্ষর-সাম্রাজ্যকে অগ্নিগ্রাস থেকে রক্ষা করতে এই সামান্যতম প্রচেষ্টার সুযোগ পেয়ে তার চোখে জল এল। যখন আফ্রিন তার কাজে তন্ময় হয়েছিল, এমন সময় নজরে এল লাইব্রেরির প্রবেশদ্বারে, যেখানে

বিদ্যাসাগরের প্রস্তরমূর্তি ছিল, তার মাথা কেউ বা কারা কেটে ফেলেছে। আর সেই কাটা মাথা লুটিয়ে আছে ধুলোয়।

আফ্রিনের অক্ষরজ্ঞান হয়েছিল 'বর্ণপরিচয়' থেকে। আর এই বর্ণপরিচয় থেকেই তার পরিচয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে। জন্মের পর যে মানুষটাকে খুব কাছের মনে হয়েছিল সেই মামার কথাবার্তা তার হেঁয়ালি লাগত—'দেখিস আফ্রিন, এই বর্ণপরিচয় থেকেই একদিন তোর পরিচয় হবে অনেক বর্ণের সঙ্গে। বর্ণের আরেক নাম শ্রেণি। মানুষের অনেক বর্ণ। আর এই বর্ণহীন এক সমাজব্যবস্থাই আমাদের লক্ষ্য।'

সব কথা তার বোঝার জন্য যে মামা বলত না, তা আজ আফ্রিন বোঝে। মামা আজ হারিয়ে গেছে। তা না হলে আজ আফ্রিন তাকে জিজ্ঞাসা করত, 'বিদ্যাসাগরের বর্ণ কী? যারা বিদ্যাসাগরের মাথা কেটে ধুলোয় ফেলে গেল তারাই বা কোন বর্ণের? তারা কি বিদ্যাসাগরের বই থেকে বর্ণের সঙ্গে পরিচিত হয় নি?'

আর বেশি ভাবতে পারেনি আফ্রিন। এসব এলোমেলো চিন্তার স্রোতে তার দু-চোখ উথলে উঠেছে তখন। সামনের সব কিছু ঝাপসা। অস্পষ্ট। তাই দেখতে পায়নি তাদের আরবির শিক্ষক রমজান স্যারকে। ঘোর ভেঙেছিল আরবি স্যারের ধমকে—'তুই এখানে কী করছিস? বাপ মরছে খেটে আর মেয়ের সেদিকে হুঁশ নেই। মেয়ে হবে বিদ্যেধরী। বাপের সঙ্গে জন খাটতে গেলেই তো তার অনেক বেশি কাজে লাগত।'

আফ্রিন কখনই কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে নি। আজও পারল না। আরবি তার সাবজেক্টও ছিল না। সে বেছে নিয়েছিল সংস্কৃত। সংস্কৃতের স্তোত্রগুলো তার কাছে আবহমান সঙ্গীতের মত মনে হতো। সে-কথা বলেও ছিল রমজান স্যারকে। আরবি স্যারের তার বিরুদ্ধে এটাও রাগের একটা কারণ। তাছাড়া স্কুলে আসা যাওয়ার পথে রকের ধারে স্কুলছুট ছোট্টুলাল, জয়ন্ত, জাভেদ, জাফরদের আড্ডা থেকে যেসব মধুর সম্ভাষণ এবং প্রস্তাব পেয়ে থাকে অহরহ তার মধ্যে যে আর্‌বি স্যারের আত্মজটিও আছে।

লাইব্রেরির আগুন নিভে গেছে। তার সমস্ত শরীরে লেপ্টে আছে জলে ভেজা শাড়ি। জলে কাদায় মাখামাখি। তার যে স্কুলে আসার একটাই শাড়ি। কাল স্কুলে আসবে কী করে? তা ছাড়া ভেজা শাড়ির আড়াল থেকে শরীরের সমস্ত খাঁজগুলো যেভাবে প্রকট হয়ে পড়েছে. সে কীভাবে ঘরে ফেরার পথে ছোট্টুলাল, জয়ন্ত, জাভেদ, জাফরদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করবে?

কোনো রকমে নিজের ক্লাসরুমে ফিরে গেল। শূন্য ক্লাসরুমে যতটা সম্ভব শাড়িটা ঠিকঠাক করে আঁচলটা গুঁজে নিল কোমরে। বইগুলো বুকের কাছে জড়ো করে রওনা হল বাড়ির দিকে। দাঁড়িয়ে পড়তে হল হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরটা পেরিয়ে যাওয়ার সময়। ঘরের দেওয়ালে আটকে গেল তার চোখ। আটকে গেল তার চোখ আলকাতরা দিয়ে তড়িঘড়ি কিছু অবিন্যস্ত অক্ষর বিন্যাসে। 'সাম্রাজ্যবাদীরা নিপাত যাক। বুর্জোয়ারা নিপাত যাক। আমেরিকার দালালরা নিপাত যাক। শ্রেণিশত্রুরা ধ্বংস হোক।' সাম্রাজ্যবাদী কারা? কাদের বুর্জোয়া বলে? শ্রেণিশত্রু বলতে কী বোঝায়? আমেরিকার দালাল কারা এবং কেনই বা তারা আমেরিকার দালালি করে? আফ্রিন এসব জানে না। তবে এসব কথাগুলো তার কাছে অর্থবহ না হলেও তার কানে অচেনা নয়। মামা অনেকবারই তার সামনে এসব কথা উচ্চারণ করেছে আফ্রিনের প্রতিক্রিয়ার কথা না ভেবেই। মামা তো প্রায়ই বলত তার কাছে আসা লোকজনদের। 'কমরেড্, আমাদের সাবধান থাকতে হবে শ্রেণিশত্রুদের থেকে। আর এই শ্রেণিশত্রুরা আছে আমাদেরই চারপাশে।' তাদের বাড়ির পাশে কবরখানার দেওয়ালের গায়েও এই ধরনের লেখা সে দেখেছে।

সে প্রায় বছর দশ কি বারো আগের কথা। আফ্রিন তখন বেশ ছোটো। সদ্য বাবার সঙ্গে মামাবাড়ির পাট চুকিয়ে ফিরে এসেছে। ইজাজুল সকালবেলায় বেরিয়ে যাওয়ার পর সারাটা দিন তার আর কিছু করার থাকে না। সে শুধু বারান্দায় বসে মানুষ দেখে। মানুষ দেখা তার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখে তারই বয়সী ছেলেমেয়েদের স্কুল যেতে। আফ্রিনের কষ্ট হতো। মামা বাড়িতে থাকার সময় সেও মাদ্রাসায় যেতো। ক্লাস ফোরে উঠেই চলে আসতে হল। এখানে কে তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবে?

এভাবেই দিন কাটছিল। তবে, ঐ যে পথচারী মানুষদের দেখাটা তার নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই ইজাজুল কাজে বেরিয়ে যাবার পর সেদিন সে এরকমই এসে দাঁড়াল বারান্দায়। দৃষ্টি এ-মানুষ সে-মানুষ ঘুরতে ঘুরতে পথ প্রান্তর ছাড়িয়ে ছুঁয়ে গেল গুটি কয়েক অল্পবয়সী ছেলেকে। আফ্রিনের মনে হল ওদের কতই বা বয়স! বড়োজোর স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে। কিন্তু, কবরখানার দেওয়ালে ওরা করছে কী? হয়ত, নেশাটেশা করার জন্য স্কুলের ক্লাস কেটে এখানে এসেছে। বারান্দা ছেড়ে ঘরের ভিতর জানালার পাশে এল আফ্রিন। সেখান থেকে কবরখানার দেওয়ালটা চলে আসে কাছে। জানালার পাশে এক প্রাচীন জামরুল গাছ। জামরুল গাছের আড়ালে নিজেকে অদৃশ্য রেখে বাইরেটা হয়ে ওঠে দৃশ্যমান। সেই সঙ্গে দূরে শহরের দিকে চলে যাওয়া পাকা রাস্তাটাও বেশ পরিষ্কার দেখা যায়।

আফ্রিন অবাক হয়েছিল। চারজন ছেলে। ওদের কাছে হাতে লেখা কিছু পোস্টার। রঙ আর তুলি নিয়ে ওদেরই একজন একমনে দেওয়ালে লিখে চলেছে, 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য...।'

দূরে কালো বিন্দুটা এগিয়ে আসছে। চারটে ছেলে নিবিষ্ট হয়ে তাদের কাজ করছে। কালোবিন্দুটা এগিয়ে আসছে ক্রমশ। তার পূর্ণাঙ্গ অবয়বে আফ্রিনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হল। মনে পড়ল তার মামার কথা। একদিন মধ্যরাত্রে মামাকে খুঁজতে এসে ঘর বাড়ি তছনছ করেছিল পুলিশেরা। মামাকে অবশ্য ওরা খুঁজে পায় নি। কীভাবে যে মামা টের পেয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে পালিয়ে ছিল, কেউ জানে না।

অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠল আফ্রিন, 'পালাও, পালাও। পুলিশ।'

হাতের জিনিসপত্র কবর খানার ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনটে ছেলে প্রায় ফিস ফিস করে বলল, 'পুলিস। অনিকেত। পালা।'

ওরা দৌড়াল। অনিকেত কিন্তু দৌড়াল না। সে তুলে নিল বেশ কিছু ঢিল। আফ্রিন ভাবছে ও কি ঢিল নিয়ে পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করবে নাকি? থরথর করে কাঁপছে সে ভেতরে। নির্বাক। অদৃশ্য। অপেক্ষা করছে। এক্ষুনি পুলিস এসে কালো ভ্যানে তুলে নেবে অনিকেতকে। অথচ অনিকেতের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। নির্বিকার। একের পর এক ঢিল তুলে ছুঁড়ে মারছে জামরুল গাছে। পটাপট পড়ছে জামরুল। সেগুলো তুলে জড় করছে রাস্তার পাশে। আবার তুলছে ঢিল। অব্যর্থ তার টিপ। কখন যে পুলিসভ্যানটা এসে দাঁড়িয়েছে কবরখানার কাছে, সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই অনিকেতের।

ভ্যান থেকে নেমে পড়ল সশস্ত্র

পুলিস। তাদের হাঁক ডাক হুঙ্কারে একটুও ভাঙল না অনিকেতের মনঃসংযোগ। একমাত্র ঢিল সংগ্রহ করে জামরুল পাড়া ছাড়া পৃথিবীর আর সব কাজই তার কাছে গৌণ এই মুহূর্তে।

'এই যে শোন।' এই প্রথম দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে অনিকেতের ছোঁড়া ঢিল জামরুলের গায়ে না লেগে গিয়ে পড়ল নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলে। অনিকেত ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলল, 'আসছি। দাঁড়ান। এই থোকাটা পেড়ে নিই।'

নির্বিকার অনিকেত তার একটা ছোঁড়া চটের ঝোলায় সমস্ত জামরুল ভরে নিয়ে এসে নামিয়ে রাখল পুলিস ভ্যানের সামনে। হাতের জামরুলে কামড় বসাতে বসাতে বসল, 'বেশ মিষ্টি কাকু। খান।' বিপ্লবী ধরতে আসা সরকারের পুলিসদের সেদিন জামরুলেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। নিজেদের মধ্যে দু-চারটে বাক্য বিনিময় আর চারপাশটা চোখ বুলিয়েই পুলিস ভ্যানটা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। অনিকেত তখন জামরুল গাছের নীচে ছায়ায় একটা গামছা পেতে বসে তার বাঁশিতে তুলল রাখালিয়া সুর। আরো কিছুক্ষণ থেকে পুলিসভ্যানটা চলে গেল। বাঁশি থামিয়ে সেদিকেই চেয়ে থাকল অনিকেত। তারপর, বেশ খানিকক্ষণ পর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল কবরখানার প্রাচীরের গায়ে তারই অসম্পূর্ণ দেওয়াল লিখনের কাছে। সম্পূর্ণ করল বাকি কথাগুলো।

জামরুল গাছের আড়ালে থাকা ঘরের ভেতরে জানালার পাশ থেকে আফ্রিন পড়ে ফেলল সব কথাগুলো। 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা। চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য/কাট ফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।' পড়ল। আবার পড়ল। একবার, দুবার, তিনবার...। এক অদ্ভুত অজানা আবেগে তার শরীর আন্দোলিত। কিন্তু, একী! কী করছে অনিকেত! সে 'প্রিয়' শব্দটা মুছে সেখানে লিখল 'কমরেড্'। একটু থামল। পড়ল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। আবার 'কমরেড্'-কেই 'প্রিয়' বানাল। তারপর উঁচু প্রাচীর টপকে সহজেই পৌঁছে গেল ওপারে। তার বন্ধুদের ফেলে দেওয়া হাতে লেখা কাগজের পোস্টারগুলো সংগ্রহ করে এপারে ফিরে এল একই পন্থায়। এবং যেখানে যত ফাঁকা দেওয়াল ছিল বেছে নিয়ে সাঁটিয়ে দিল হাতে লেখা পোস্টার। আফ্রিন তার মাদ্রাসায় শেখা বিদ্যা কাজে লাগিয়ে কোনো রকমে বানান করে পড়তে পেরেছিল কয়েকটি পোস্টার। 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক। পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক। পুঁজিবাদী দালালরা দূর হটো।"

আফ্রিন ঘরের ভিতর। বাইরে বেরিয়ে এল দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে। বাইরে দাঁড়িয়ে অনিকেত। বলল, 'ধন্যবাদ'।

কী বলবে বুঝতে না পেরে আফ্রিন বলল, 'কেন? ধন্যবাদ কেন?'

'কেন, তুই সেটা ভালোই বুঝতে পারছিস।'

আফ্রিন বলল, 'কবরখানার চাবি থাকে আমাদের কাছেই। আপনি ওভাবে লাফিয়ে প্রাচীর ডিঙোলেন কেন? হাত পা তো ভাঙতে পারত।'

'যে প্রাচীর যত উঁচু, যত কঠিন সেটা ভাঙতেই তো চাই আমরা। আর সেটা আমরা ভাঙবই। আজ তুই ওভাবে সতর্ক না করলে পালাতে গিয়ে পুলিসের গুলিতে মরে যেতেও তো পারতাম।'

আফ্রিন সে কথার উত্তর দেয় নি। বেশ বুঝতে পারছে এদের জাতটা তার অজানা অচেনা নয়। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই তো এরকম কিছু মানুষের সঙ্গে তার চলাফেরা, এরকম কিছু মানুষের পাশে দিন গুজরান। হঠাৎই অনিকেত বলল, 'তুই কোন ক্লাসে পড়িস রে?'

'পড়ি না।'

'মানে?'

'আগে যখন মামাবাড়িতে থাকতাম তখন মাদ্রাসায় পড়তাম। ক্লাস ফোর পর্যন্ত।'

'এখন?'

আফ্রিন মাথা নীচু করে থাকে। নিরুত্তর। অনিকেত হঠাৎই বলে, 'এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারবি?'

'জ...ল।' আফ্রিন ইতঃস্তত করে। 'আমরা যে মুসলমান।'

'তাতে কী হল? তুই মানুষ তো? না কি কবরখানার পাশেই তোদের বাস। ভূত কিংবা পেত্নী নোস তো?'

পথের মাঝে আপন মনে হেসে উঠল আফ্রিন। এবং সশব্দে। আর বুকের কাছ থেকে বইগুলো হুড়মুড় করে পড়ল রাস্তায়। কতদিন আগের কথা। তবু ভাবতে কী ভীষণ ভালো লাগে আফ্রিনের।

With best compliments of

ELCON ENGINEERING

ELECTRICAL CONSTRUCTION, ELECTRICAL CONSULTANCY & TESTING

5/9, Guru Nanak Road, Durgapur-713204
Mobile : 9434388560, 9832167426
E-mail : elcon.engg@gmail.com

Sl. No. 99

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পঞ্চায়েতের এলাকার সার্বিক উন্নয়ন এবং সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান
কর্মসূচির বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধপরিকর।

খানো গ্রাম পঞ্চায়েত

খানা জংশন, গলসি, পূর্ববর্ধমান

Sl. No. 146

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পঞ্চায়েতের সার্বিক উন্নয়নে সামিল হোন।
সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচিতে অংশ নিন।

দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

ছবানী হেমরম
উপপ্রধান

মঙ্গল মুর্মু
প্রধান

Sl. No. 148

প্রস্তুতিপর্ব

রূপক মিত্র

রক্তে টইটম্বুর হয়ে মশাটা উড়তেই পারছিল না। দুবার গোঁত্তা খেয়ে সে পড়লো আমার পাঞ্জাবির ওপরে। বেশ কালচে লাল রং লেগেছে ওর গতরে। খুব সহজেই ওকে এক চাপড়ে মারা যায় এখন। আমি কিন্তু হাত তুলতে গিয়েও থেমে যাই। আমারই রক্ত খেয়ে উড়ে যেতে চাইছে ব্যাটা, প্রতিশোধ নেওয়াটাই তো উচিত কাজ ছিল, তাই নয় কি? অথচ কী এক অন্যমনস্ক ভাবনায় আমার মাথা যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। ওই তো এখনো, আমার মেলে রাখা পায়ের হাঁটুর ওপর বসে দম নিচ্ছে রক্তচোষা। এক থাবড়ায় আমার শাদা পায়জামাটা লাল করে ফেলা যায় এক্ষুনি। কিন্তু কিছুই করি না আমি। টলমল করতে করতে উড়ে যায় মশা, যেন শত্রুপক্ষের সাহায্য বোমারু বিমান। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি, অসাড় হাতে নিজের ভেতরটা হাতড়াই, দ্বিধাগ্রস্ততার সুতোটা বোধ হয় খুঁজেও পাই। যাক্, কারুর তো কাজে লাগছি আমি। মানে, আমার এই শরীর, আমার রক্ত, আমার জীবন অণু পরিমাণ হলেও কোনো না কোনো কাজে তো লাগছে। মশা-মাছিও তো এই পৃথিবীর জীবনচক্রের অংশ। এই উদ্ভট ভাবনাটা নিয়ে নিজেরই সঙ্গে গোটাকয়েক বাক্য বিনিময় শেষে আশ্চর্য হয়ে আমি লক্ষ করি, মনে কিছুটা তৃপ্তি বা স্বস্তিবোধ হচ্ছে যেন। সবকিছুরই ব্যাখ্যা আছে পৃথিবীতে, সেটা যে যেমনভাবে পারে করুন। একটুখানি ম্লান হাসি বোধহয় ফুটে উঠলো আমার মুখে। আয়না ছিল না ধারে কাছে, দেখা হলো না সেই হাসির চরিত্রটা ঠিক কেমন।

সারাদিন গুমোট গরম ছিল। রোদে পুড়েছি আজ খুব। রাত নটার পর পনেরো কুড়ি মিনিটের শরৎকালীন বৃষ্টি হলো। তারপর থেকে এলোমেলো বইছে বাউলবাতাস। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আমার পা থেকে মাথা। একটু শীত শীতও লাগছে যেন। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকি অনেকক্ষণ। সত্যি বলতে কি, এটাই এখন সর্বোত্তম বিলাসিতা আমার। কতোরকম যে মেঘ-রোদ্দুর ভেসে যায় মনের আকাশে, খেলা করে স্মৃতির আলোছায়া, ঘন অন্ধকার আকাশে দেখা দেয় ঝিকিমিকি তারাদের মিছিল তখন! বয়েস হয়ে যাচ্ছে তোমার, বুঝেছো—চুপিচুপি নিজেকেই আমি বলি। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে শরীরের রক্তমাংস। সেই রক্তই নির্বিবাদে খেয়ে উড়ে যাচ্ছে রক্তচোষার দল। কোথায় বসেছিল মশাটা? ঘাড়ে, গালে, না কি কপালে? টেরই তো পেলাম না আমি! সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে যাচ্ছে নাকি!

চোখ খুলে চেয়ারে বসেই দুবার আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াই। ঘরের আলোটা বার তিন-চার দপদপ করে জ্বলতে থাকে ফের আগের মতোই। দক্ষিণের জানলার বাইরে, কিছুটা দূরের বকুলফুলের গাছটা ডালপালা নাড়াচ্ছে খুব অন্ধকারে, কেউ দেখছে না। বৃষ্টি হচ্ছে এখনো, ফিসফিস মিহিন, মাঝে মাঝে কয়েক ফোঁটা উড়ে এসে লাগছে আমার মুখে। সেই কবেকার হারিয়ে যাওয়া গান যেন, ফিরে এলো আবার! নাঃ, পুরোপুরি অসাড় তাহলে হইনি এখনো। আশা আছে, ভয় নেই। মুচকি হেসে ফিরে আসি চেয়ারে। মিক্সচারের প্যাকেটটা নিয়ে পরিপাটি বানিয়ে ফেলি একটা সিগারেট। দু-এক টানের পর চিনচিন করে ওঠে মাথা। পুড়ছে জীবন, উড়ছে ধোঁয়া। জীবন আছে বলেই তো পুড়ছে, না থাকলে আর পুড়তো কী? ছাই হলে কি জ্বলতো আগুন? হালকা একটা পালকের স্পর্শ লাগে মনে। কেউ নেই আশেপাশে। নিজেকেই একটা নতুন গল্প শোনানোর তোড়জোড় শুরু করি আবার।

বাইরের বারান্দার ম্লান হলুদ আলোটা জ্বলে উঠলো। রাস্তার দিকের বারান্দা, গ্রিল দিয়ে ঘেরা। আলোর সুইচটা আছে এমন জায়গায়, বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালানো যায়। আমিই ব্যবস্থাটা করেছি, যাতে রাতবিরেতে গ্রিলের চাবি খোলার সুবিধে হয়। পানু, মানে পান্নালাল সেটা জানে। রোজ রাতে এভাবেই আমাকে ডাকে।

—কইগো, দাদা, ঘুমিয়ে পল্লে নাকি—ওর একটু খোনা গলায় পানু হাঁক দেয়।

ঘুমোবো কীরে ব্যাটা, এই তো সবে সন্ধে! রাতের কল্লোল শুধু বলে যায় আমি স্বেচ্ছাচারী। গ্রিলের চাবিটা হাতে নিয়ে দরজাটা খুলি। উসকো খুসকো কাঁচাপাকা চুল, ঘামে ভেজা গাল তোবড়ানো মুখ, সারা শরীরে গরাদ, মানে আমার গ্রিলের ছায়ার চোখুপ্পি দাগ নিয়ে পানু দাঁড়িয়ে। ছাতা-টাতার বালাই নেই, হাফ-হাতা জামাটা ভিজে ভিজে। গরিব লোক আমরা, অতো ভাবলে চলবে না— কথায় কথায় এই সত্যি কথাটা পানু প্রায়ই আমাকে মনে করিয়ে দেয়।

গ্রিলের চাবিটা খুলে আমি বলি, আয়, একটা বিড়ি খেয়ে যা।

—না গো দাদা, অনেক রাত হলো, আমি যাই।

—ধুৎ, কোথায় রাত? আয়।

শুরুতে এইরকম দু-তিনটে কথা প্রায় রোজই হয়। তারপরেও অবশ্য পানু বসে যায় খানিকক্ষণ। না বসে ওর উপায় কী? এক কিলোমিটার হেঁটে এলো, এরপর

আরও দেড় কিলোমিটার পাক্কা। 'শরীরে তো জোর নাই কিছু, একটুতেই হাঁপিয়ে যাই', পানু জানিয়েছে আমাকে।

পায়ে জল কাদা, আজ বারান্দাতেই বসি—পানু বলে।

—সে আর নতুন কথা কী? বারান্দাতেই তো বসিস রোজ। ঘরে আর যাস কবে?

—বারান্দাটা ঘরের থেকে ঠান্ডা থাকে কিনা। আমার গা জ্বালাপোড়া রোগ হয়েচে, বললাম না সেদিন। চাদ্দিক খুব গরম বুইলে, খুব গরম।

বারান্দার দেয়ালে ঠেসান লাগানো নড়বড়ে একটা কাঠের বেঞ্চ আছে। অনেকদিন ধরেই নড়বড় করতে করতে টিকে গেল এখনো। আমাদের মতোই আর কি। সেই বেঞ্চের ওপর পানু আমি রোজ এই সময় বসি। আজও বসলাম। মাথার ওপরে বারান্দার টিমটিমে হলুদ আলোটা জ্বলে। হলুদ আলোটা পাল্টে সাদা করার কথা সেই কতোদিন ধরেই ভাবছি। হয়নি এখনো। ঠিক যেমন, জীবনটাও সেই প্রথম থেকেই একই রকম টিমটিম, পাল্টায় না কিছুতেই।

বিড়ি নয়, পানুকে আজ একটা সিগারেট দিয়ে নিজেও একটা ধরাই। পানু খুশি হয়েছে, ওর মুখ দেখেই বোঝা যায়। ঠোঁটে সিগারেট চেপে গম্ভীর মুখে, থলি থেকে ছোটো একটা পলিথিনের ক্যারি ব্যাগ বের করে পানু বেঞ্চে বসে, জলকাদা মাখা পা ছড়িয়ে। ক্যারিব্যাগটা বেঞ্চে রাখে। আমিও বসি ওর পাশে। এক্ষুণি সিগারেট ধরাবে না পানু, আমি জানি, ঠোঁটে চেপে রাখবে খানিকক্ষণ। বিলাসিতা? একটা সিগারেট পেয়েই যে কোনো মানুষ এমন বিলাসী মেজাজের হয়ে ওঠে, পানুকে না দেখলে আমি কি কখনো জানতাম? সামান্য জিনিসও যে কত মানুষের কাছে দুর্লভ, বীরভোগ্যা এই বসুন্ধরায়। এখন আর অবাক হই না।

—কী এনেছিস আজ? পানুকে শুধোই আমি।

—ওই তো, তিনটে রুটি, কুমড়োর ঘ্যাঁট আর একটু আলু-করলার ছেঁচকি। তারও দাম কুড়ি টাকা, অ্যাঁ? তাও আমি ওই হোটেলেই কাজ করি। কোনো ছাড় নেই।

—তুই কি হোটেলের মালিক? তোর কী করার আছে?

—ছেঁচকিটা ওবেলার, বলেই দিচ্ছি তোমাকে। গরম করে নিয়ে এলাম।

—তুই যে ভাতগুলো নিয়ে যাচ্ছিস, সেও তো বাসি।

—তা তো বটেই। জীবনটাই তো বাসি হয়ে গেল দাদা। তার আবার বাসি টাটকা। ভাতগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকি, ছেলেটা তিড়িং করে ঘুম থেকে লাফিয়ে ওঠে। ভাতের গন্ধ পায় নিশ্চয়। আমার মা ঝিমুনি কাটিয়ে ভাতে জল ঢেলে দেয়। আমিও কলতলায় গায়ে জল ঢালি। এইটে খুব আরামের, বুইলে দাদা, জ্বালা ধরা শরীরে ঠাণ্ডা জল। তারপর জল ঢালা বাসি ভাত দু-চার গেরাস গবাগব গিলেই বিছানায় ধপাস। মা অবিশ্যি কোনো কোনোদিন আলুভাজা কি ডিম ভুজিয়া করে রাখে। আমি সেসব খেয়াল করি না তেমন, সব খাবারই আমার কাছে তখন ভিজে ঘাস। জল ঢেলে গা ঠাণ্ডা হয়েছে না, রাজ্যের ঘুম এসে তখন চিৎ করে দিয়েছে আমাকে।

—রোজই অতো রাতে চান করিস নাকি?

—রোজ। কাত্তিক মাস পর্যন্ত চলবে। ফাগুনের মাঝামাঝি থেকে আবার নতুন দফা শুরু হবে। সকাল থেকে ভাত চাপানো ভাত নামানো, ফ্যান গালা, হাতাখুন্তি নাড়া, বিকেল থেকে রুটি সেঁকা, ভেবে দ্যাখো একবার। সারাদিন উনুনের গনগনে আঁচ। জল না ঢাললে চলে? উনুন তো নেবাতে হবে এক সময়।

অন্যদিন এতো কথা বলে না পানু, আজ বলছে। সাধারণত রোজ দশ পনেরো মিনিট আমরা দুজনে বসে থাকি এই বারান্দায়, কথা হয় টুকটাক, সঙ্গে একটা সিগারেট কিংবা বিড়ি। আজ একটু বেশিই যেন এলিয়ে পড়েছে পানু। জল খেল অনেকখানি। এদিকে বৃষ্টি নামলো আবার। জোর বাড়লো এলোমেলো বাতাসের। আমি ঘরে ঢুকে দক্ষিণের জানালা দুটো বন্ধ করে আসি। আমার রাতের খাবারটা পানু ওদের হোটেল থেকে নিয়ে আসে। কী উপকার যে হয় আমার!

—তাহলে পানু, সারাদিন বারো ভূতের ওই তাণ্ডব করে মাইনে তোমার একশো বারো।

—বারো টাকা বাদ দাও দাদা, মাইনে আমার একশো। হেড রাঁধুনির দেড়শো টাকা রোজ। আমি তো কাঁচা রাঁধুনি, মাইনে তাই বাড়ে না. আমাদের হেড রাঁধুনিকে তো দেখেছো তুমি। বাপরে দাপট, মালিকের ভায়রা ভাই মনে করে নিজেকে।

—তোদের মালিক কিন্তু মিছরির ছুরি। বছর তিনেক তো দুবেলা খেয়েছি তোদের হোটেলে।

—কদিন আগে রাঁধুনি বাদে আমরা কজন মালিককে বললাম, দিনকাল খারাপ, টাকা পয়সা একটু বাড়ান। মালিক এমন করে তাকালো যেন অজ্ঞান হয়ে যাবে। খানিকক্ষণ দম নিয়ে বললো, দিনকাল শুধু তোমাদেরই খারাপ? একই বাজার থেকে আমিও তো মালপত্র কিনি। আমাকে মাগনায় দেয় নাকি ওরা? চোখ নাই তোদের? এখানে না পোষালে বাপু রাস্তা দ্যাখ, হোটেল তুলে দোবো আমি। আর পানু, তুই কী করে এই ছোঁড়াদের সঙ্গে এলি? রাতের বেলা তিনজনের ভাত নিয়ে যাস, তার দাম কত হয় হিসেব কর। বোঝো ব্যাপার।

—ওগুলো তো বাসি ভাত, ফেলে দিতে হবে বলে তোকে দেয়।

—ফেলে অবশ্য দেয় না, অনেক রকম কায়দা আছে সেসব করে চালানো হয়। তাছাড়া ভিখিরি দু-একটা আসে মাঝরাতে, তাদের খাইয়ে পুণ্য হয়।

—সারাদিনের পাপের পর মধ্যরাতের পুণ্য। সব হোটেলই এইরকম নাকি রে পানু, আমিও কি বছরের পর বছর ওইসব পচাধসাই খেয়ে যাচ্ছি?

—তা কেন হবে, ভালো হোটেলও আছে। আমি আমাদেরটার কথা বলছি। তোমার খাবার আমি অবিশ্যি দেখেশুনে নিয়ে আসি। আচ্ছা, একটা কথা বলো তো, তুমি বাড়ি যাও না কেন?

—যাই তো।

—কখন যাও? আমার তো কই খেয়াল হয় না।

—এই তো এক রবিবার আগে গিয়েছিলাম। আবার পরশু শনিবার যাবো। সারাদিন তোর ওইসব ভাত-রুটি, হাতা-খুন্তি আর ধোঁয়া আগুন করে করে মাথাটা যাচ্ছে। কিছুই খেয়াল রাখতে পারছি না।

—তাই হবে। আমি আর বেশিদিন পারবো না, মা বুঝতে পেরেছে। দু-তিন মাস ধরে খালি বলছে, চল পানু, গাঁয়ে ফিরে যাই। আমিও জানি, মা আর বেশিদিন নয়। কাজকর্ম তেমন পারে না। বস্তির ওই এঁদো ঘর, তারও ভাড়া ছশো। চার পাশে ঝগড়া মারামারি, খিস্তি খেউড় লেগেই আছে। ছেলেটা ওসব শিখবে, ওইরকম হয়ে যাবে, মায়ের খুব ভয়। আমি কী করি বলো দিকিনি। সেই বীরভূমে আমার গাঁ, উপায় ছিল না বলেই তো এই নরকে এসে মুখপোড়া ভূত হয়েছি। ওখানে ফিরে যেয়ে খাবো কী? আর আমার সেই বুড়ি মাসি, তারই বা কী হবে, কে ওকে টাকা পাঠাবে? আর তো কেউ নাই ওর।

—কতো বয়েস তোর মাসির?

—আমারই তো চল্লিশ হয়ে গেল। মাসি মায়ের থেকে বড়ো, সত্তর তো হবেই কমসে কম। সব দিকে হাত-পা বাঁধা আমার, কোথায় পালাই বলো দিকি। তোমার অবস্থা এতটা খারাপ নয়, তো তাও এখানে পড়ে আছো, ছুটো বেড়াচ্ছো সারাদিন। বাড়ি যাও, চুপচাপ শুয়ে থাকো কদিন। ভালো লাগবে।

—বুঝেছি, নিজের ইচ্ছেটা আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছিস। তোর কদিন চুপচাপ শুয়ে থাকার খুব ইচ্ছে, তাই তো?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার কোনো ছুটি নাই।

—সেরকম তো হবার কথা নয়। দু-একদিন ছুটি পাবি না, তাই কখনো হয় নাকি? তুই আসলে ভয়ে ভয়ে থাকিস, মালিক সেই সুযোগটা নিচ্ছে।

—হ্যাঁ, খুব ভয় আমার। কাজটা গেলে বাজ পড়বে আমার মাথায়।

—আর শোন, পানু, আমার ব্যাপারে তোর কথাটা ভুল। আমিও শখ করে ঘুরে বেড়াই না, এটা জেনে রাখ। আসলে কী জানিস, অনেকদিন হয়ে গেল, এই ঘরটায় আছি। ভাঙাফুটো, কিন্তু বেশ নিরিবিলি, কোনো উৎপাত নাই, ভাড়াও কম। আর একটা ব্যাপার বলি শোন, একা থাকার একটা নেশা আছে, একবার সেটা ধরে গেলে কাটানো মুশকিল।

পানু মুখ নিচু অবস্থাতেই খিকখিক করে হাসে, হ্যাঁ, বুঝেছি। গা বাঁচিয়ে থাকা।

—ঠিক তা নয়। সংসারেই তো আছি। গা বাঁচানো কথাটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

—না, হলো না। ওটা গা বাঁচানোই। আমি আর পারলাম কই? মা নাতি-নাতনির মুখ দেখবে বলে বায়না ধরল, আমিও অমনি খালি পকেটে টোপর মাথায় বসে পড়লাম ছাঁদনাতলায়। ওটা ভুল হয়েছে। মাঝে মাঝে এখন নিজের ওপর খ্যাপার মতো রাগ হয়। জুতো পেটা করতে ইচ্ছে হয় নিজেকে। শুধু ভুল নয়, পাপ কাজ হয়েছে ওটা। রাতের বেলা মা ছেলেকে কোলে বসায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জল দেয়া বাসি ভাত খায় ছেলেটা, তখনই আমার নিজের ওপর রাগ চাপে, দু-হাতে নিজেরই গলাটা টিপে ধরি মনে মনে। দু-চার গেরাসের বেশি ভাত আর গিলতে পারি না।

বৃষ্টিটা থেমে এসেছে। বাতাস এখনো এলোমেলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর নিচু গলায় পানুকে আমি বলি, কোনোদিন জানতে চাইনি, বউটা তোর পালালো কেন?

—পালাবে না তো কী করবে? পালানোর কথা, পালিয়েছে। বেশ করেছে।

—কেন বেশ করেছে জানতে চাইছি।

পানু চুপ করে থাকে। বলবে না মনে হয়। না বললেও কিছু এসে যায় না আমার। খুব একটা কৌতূহলী লোক আমি নই। বারান্দার টিমটিমে আলো বেশিদূর যায় না। বাইরেটা অন্ধকার। ওটা পাড়ার ছেলেদের খেলার মাঠ। মাঠের শেষে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে কচুরিপানার ডোবা, তারপর রাস্তা। ওই রাস্তা দিয়েই পানু বাড়ি যাবে। মাঠে এখন শুধু ছেলেরাই খেলে না, অনেকগুলো লোভী চোখও খেলতে আসছে ওখানে। ছেলেরা এককাট্টা হয়ে খেলছে ওই লোভী চোখেদের বিরুদ্ধে। কারা জিতবে বলা যাচ্ছে না। আমিও ওই খেলার দর্শক, তবে খুব একটা উত্তেজিত নই। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে কিনা, উত্তেজনা কম।

—বৃষ্টি থেমেছে পানু। বাড়ি যা, রাত হয়েছে।

পানু ওঠে না, মুখ নিচু করে বসেই থাকে আরো কিছুক্ষণ। আমি উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙি। পিছন ফিরে দেখি, পানু মুখ তুলেছে, শূন্য চোখ দুটো যেন ভাসিয়ে দিয়েছে সামনে অন্ধকার মাঠের দিকে। ওর হাবভাব দেখে আমিও কোনো কথা বলি না। আমার তো রাত হয় না। আপাতত কোথাও পৌঁছানোরও তাড়া নেই আমার। দেরি হচ্ছে পানুর। দুজন মানুষ ওর অপেক্ষায় পেটে খিদে নিয়ে ঝিমোচ্ছে। হঠাৎ কেমন এতটা মনখারাপ হয় আমার। নাঃ, ঠিক মনখারাপও নয়, অচেনা, ভোঁতা একটা অনুভূতি। আমিও পানুর মতোই অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে আছি। অন্যমনস্ক চোখে। বছর পাঁচেক আগে ওদের হোটেলে খেতে গিয়ে পানুর সঙ্গে চেনাজানা হয়েছিল। বেশ যত্ন করে খেতে দেয়, এটা চোখ এড়ায়নি আমার। তারপর কথায় কথায় সম্পর্ক একটা তৈরি হয়েছে। আমার রাতের খাবারটা এনে দেবার প্রস্তাবটা পানুই দিয়েছিল। ওর ফেরার রাস্তা থেকে ঠিক পাঁচ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে আমি থাকি। পানু হেঁটেই যাওয়া আসা করে, তার এক নম্বর কারণ ওর সাইকেল নেই। দ্বিতীয় কারণটাই বেশি জোরালো, হাঁটলে নাকি ওর গায়ের মাথার হাড়ে মজ্জায় বাতাস লাগে, তাতে জ্বালাপোড়া কমে। প্রকৃতপক্ষে, পানুর থেকে ঠিক কতটা দূরত্বে আমি থাকি জানি না ঠিকঠাক। কিন্তু যখন পানু রোজ এখানে আসে, প্রায় মধ্যরাতে, সারাদিনের হিসেব নিকেশ তুলে রেখে মানুষ তখন নিজের কাছে ফিরে আসতে চায়। এমন দু-একটা কথা সে বলে তখন, যার কোনো হিসেব নেই। অন্য সময় বলবে না সে তেমন কথা। আস্তে আস্তে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে পানুর সঙ্গে আমার। সম্পর্কটি দু-জন মানুষের। ওর সঙ্গে প্রতিদিনের এই দশ, পনেরো কিংবা কুড়ি মিনিটের বেহিসেবি কথায় কথায়, কোনো কোনো রাতে, ভোঁতা একটা অনুভূতি জেগে ওঠে আমার মনে। সেটা ঠিক কী রকম বা কেন আমি জানি না। থাকুক না কিছু কিছু জিনিস অচেনা, অদেখা বা রহস্যময় হয়ে...

—রাত বাড়ছে পানু, যা।

পানু হাত-পা ছড়ায় একটু। হাত দিয়েই মুখ মুছে বলে, শুধুচ্ছিলে না, বউ পালিয়েছে কেন? অনেক কারণ আছে। একটা দিয়ে শুরু হয়, সেখান থেকে আরো পাঁচটা।

—অসুবিধে না থাকলে একটাই বল।

—নাঃ, অসুবিধে কিসের। এই যে রাত করে ঘরে ফিরি সারাদিন আগুনে পুড়ে, চান করলেই ঘুম আসে, বললাম না? এতেই বউ খেপে যেত। কথাটথা বলতে চাইতো। কে কথা বলবে? আমি তখন মড়া। বউ গালাগালি দিত, চিমটি কাটতো। রাতের পর রাত। শেষকালে একদিন মারামারি হয়ে গেল। আমি মারি নি, ঘুমে কাদা আমি মারবো কী? বউই সাপের মতো হিস হিস করতে করতে মারলো খুব।

—মার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লি?

—হ্যাঁ। এমন খামচা খামচি করেছিল, রক্তারক্তি কাণ্ড। পিঠ, বুক, গলায় রক্ত বেরুচ্ছিল আমার।

—তাও ঘুমোলি? আজব ব্যাপার।

—আমি তো ঠিক মানুষ থাকি না। তাছাড়া আমার কোনো রাগ ছিল না ওর ওপর, ওরই ছিল দুনিয়ার রাগ। ওর কোনো দোষও ছিল না, আমি জানি। জোয়ান বয়েস। আমার থেকে সাত বছরের ছোটো। কী করবে? তারও আগে একটা ব্যাপার ছিল অবিশ্যি।

—সেটা কী?

—আমাকে বোধহয় ওর পছন্দ হয় নাই।

—সন্দেহবাতিকের রুগি নাকি তুই?

—নাঃ, আমার বাতিক নয়। দিনে দিনে একটু একটু বুঝেছি। ওসব বুঝতে আমার ভুল হয়নি। তোমাকে এর বেশি খুলে বলতে পারব না।

—মারামারি করে বউ পালালো?

—মারামারি আবার কোথায়? আমি তো মারি নাই, বউই মেরেছে।

—কতোদিন হল?

—সামনের কার্তিকে পাঁচ বছর হবে। ছেলেটা তখন দু-বছরের।

—বউকে ফিরিয়ে আনতে যাসনি?

—মা আর মামি গিয়েছিল ছেলেটাকে নিয়ে। তিনবার। ফেরে নাই, ঝগড়া করেছে।

—ছেলেটাকেও চায়নি?

—না।

—এটা আমি বিশ্বাস করলাম না।

—করতে হবে না। সব সত্যি বিশ্বাস করতে হবে, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে? আমিও কি করি নাকি?

পানু একটু একটু করে লম্বা হচ্ছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যেন। আমার থেকেও বেশ খানিকটা লম্বা হয়ে গেছে পান্নালাল, দুলছে হাওয়ায়, ছুঁতে গেলেই মিলিয়ে যাবে আকাশে। আমি কথা বাড়াই না।

পানুই কথা বলে, কটা বাজলো?

—পৌনে এগারোটা।

—মনটা আজ খারাপ, দাদা।

—কেন রে?

—হোটেলে একটা মেয়েকে খুব মারছিল একটা লোক।

—স্বামী নাকি?

—ধুৎ, স্বামী! খদ্দের। হোটেলের আশেপাশে, রাস্তায় মেয়েগুলো ঘোরাঘুরি করে দেখ নাই? ওদেরই একজনকে খুব মারছিল। মালিক চিৎকার করছিল, বাইরে যাও বাইরে যাও, চেয়ার টেবিল ভাঙবে। মেয়েটাকে গরুর মতো পেটানোর জন্যে কারুর কোনো কথা নাই কিন্তু। লোকজন ছিল হোটেলে। টানতে টানতে মেয়েটাকে বাইরে আনছিল গুণ্ডাটা, পাশেই আমি রুটি সেঁকছিলাম। মনে হলো উনুনের ওপরেই পড়বে মেয়েটা। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, অ্যাই উনুন সামলে। গুণ্ডা আমাকে লাল চোখ দেখালো, উনুন দেখাচ্ছিস আমাকে, শালা হারামির বাচ্চা, মুখটো তোর গুঁজে দোবো ওই উনুনে।

—মেয়েটাকে ছাড়লো না?

—নাঃ, টানতে টানতে নিয়ে গেল কোনদিকে। সব খুব গরম হয়ে গেছে, বুঝতে দাদা, সবাই খুব গরম। হোটেলে সন্ধের পর থেকে ভাত খাবার লোক নাই। সব গরম গরম খাবার, রুটি, তড়কা, মদ, মাংস। তিনশো চারশো টাকার মদ মাংস খেয়ে গরম গরম লোকেরা ছুটে বেড়াচ্ছে চাদ্দিকে।

—তিনশো চারশো, রোজ? অতো টাকা পায় কোথায়?

—আমি ভেবে পাইনা, অতো টাকা পাচ্ছে কোথায় শালারা। শোনো দাদা, এই গরমে আমি থাকবো না।

—কোথায় যাবি?

—যেদিকে দুচোখ যায়। এই গরম দেশে আমি থাকবো না, দেখে নিও।

—শোন পানু, যদি কোনোদিন গাঁয়ে ফিরে যাস—

—ফিরবো কোথা? ঘরবাড়ি সব লোপাট। ঘুঘু চরছে।

—যদি ফিরে যাস কোনোদিন, নতুন ঘর বানাতে পারিস, আর আমিও যদি ফিরে যাই, তখন নতুন করে দেখা হবে আবার। তোর গাঁ থেকে আমাদের ঘর উনিশ মাইল দূর, মনে রাখবি।

—আবার বলছি শোনো, এই গরমে আমি থাকবো না। তিন সত্যি, থাকবো না।

—হ্যাঁরে পানু, বউয়ের খবর রাখিস না?

—আবার বিয়ে করেছে। অন্ডাল না রানিগঞ্জে, ওদিকে কোথায় থাকে।

ভিড়ের রাস্তায় কে কাকে খুব ডাকছে, অ মানিকদা, অ মানিকদা। আমি মানিক নই, তবু লোকটাকে দেখার জন্য পিছন ফিরি। গলায় বেশ জোর আছে লোকটার। পিছন ফিরে আশ্চর্য হয়ে দেখি, আমাকেই ডাকছে। ইশারায় জানতে চাই, আমি? উজ্জ্বল মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসে বছর পঁচিশের রোগা পাতলা এক যুবক।

মুচকি হেসে বলি, আমি মানিক নই।

চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে ছেলেটা, কী যেন খুঁজছে। আমিও ওর মুখের দিকে সারা শরীরের দিকে নজর রাখতে রাখতে ভাবি, কে জানে কেন আমাকে চিনতে ভুল করে অনেকেই। এটাও সেই রকমই ব্যাপার। এতোই সাধারণ লোক আমি, আলাদা কোনো চিহ্ন নেই, যাতে সহজেই অন্যে আমাকে...

ছেলেটা বলে, তুমি গোবিন্দপুরের লোক নও?

—কোন গোবিন্দপুর?

—শালটে গোবিন্দপুর।

—ওই তো পাশেই, চড়কডাঙা।

—মানিক নও তো কে তুমি?

—ডাকছো যখন, মানিকই না হয় হলাম আমি। তুমিও তো দেখছি আমার পাশের গাঁয়ের সুধাংশু।

দু-বছর আগে ঠিক এভাবেই সুধাংশুর সঙ্গে আমার আলাপ। তারপর থেকে ঘুরেফিরে প্রায়ই দেখা হয় আমাদের। অচেনা থাকলে দেখা হয় কিনা বোঝা যায় না, চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা তো হবেই বারবার। কিছুদিনের মধ্যে খানিকটা বোঝাপড়াও হয়ে গেল সুধাংশু আর মানিকের।

—রোজ শহরে আসি, ডেলি প্যাসেঞ্জার আমি। রবিবার ছুটি। সকাল সাতটার বাসে চেপে আসি, রাত আটটার লাস্ট বাসে ফেরা। একটা চাকরি করি।

—কী কাজ?

—একটা কাপড়ের দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করে খদ্দের ডাকি, তাদের ধরে ভুজুংভাজুং দিয়ে দোকানে নিয়ে যাই। পঞ্চাশ টাকা রোজ। টিফিন একবার দেয় দুপুরে। রবিবার কাম বন্ধ, তংখা বন্ধ।

—ধুৎ, এরকম আবার চাকরি হয় নাকি?

—হয়। আমিই তো করছি। আরো কজন করে। এই শহরে। বিশ্বাস না হয়, দোকানের নাম ঠিকানা দিচ্ছি, আড়াল থেকে আমাকে দেখে এসো একদিন।

দেখে এসেছি। সব সত্যি। সুধাংশু চিৎকার করে। অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ে গলা।

—আমি হলাম চিল্লানোসরাস। চিৎকারকও বলতে পারো।

—কথাগুলোয় কী রকম যেন গন্ধ পাচ্ছি।

—পড়াশুনো সামান্য কিছু করেছি মানিকদা। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ। বই পড়তাম, গানবাজনারও শখ ছিল। পট করে বাবা মরে গেল। বাবাও খুব যে কিছু করতো তা নয়। খুব গরিব আমরা। যে-কোনো কাজ চাই। চেল্লামেল্লি করতে লেগে পড়লাম।

—এটা কোনো কাজ হলো?

—আরে লাখ লাখ লোক দাও দাও বলে চিৎকার করছে চাদ্দিকে। শুনতে পাও না? আমি তবু পঞ্চাশ টাকা করে পাই। মালিক মেহেরবান।

—গানবাজনার শখ ছিল তোর?

—ছিল তো। কেউ কেউ বলেছিল, গানের গলা আছে আমার। এখন আর হবে না। মেহেরবান মালিকের জন্য চেঁচাতে গিয়ে গলা ভেঙে গেছে। এখন আমার গলা নয়, মাথা নয়, পেট আগে। পেটসর্বস্ব হয়ে যাচ্ছি, খুব খিদে পায় মানিকদা।

—জোয়ান বয়েস খিদে তো পাবেই।

—সবরকম খিদে আছে আমার। গান

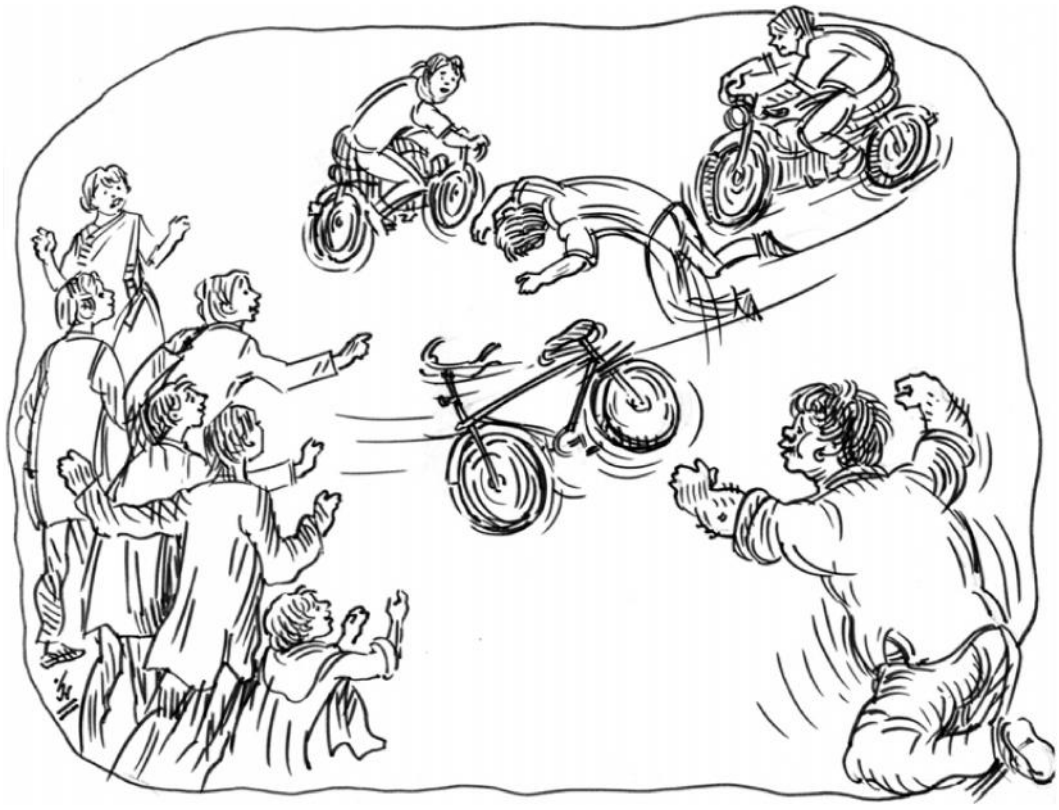

আর হবে না জানি। বাজনা হতে পারে।

—কীরকম?

—ঢাকিরা ঢাক পেটায় খালে বিলে। ঢাক বাজানো বেশ সহজ বটে। নয়তো ঝাপ্পর ঝাঁই তাসাপার্টি। এই দুটো বাজনা সব গান, সব শব্দ চাপা দিয়ে বাজতে পারে। বাজছেও খুব চাদ্দিকে।

—তোর কথা ঠিকঠাক বোঝা যায় না কেন বলতো?

—তুমি সোজাসাপটা লোক, তাই বোঝো না। আমি চিল্লানোসরাস, চেঁচিয়ে পাড়া মাত করি।

সুধাংশুর মোবাইল ফোন নেই। মালিক দিতে চেয়েছিল একটা, কাজের সুবিধা হবে। সুধাংশু নেয়নি।

—খেপেছো? ওতে মালিকের লাভ, আমার নয়। ওতে আরো বাঁধা পড়ে যাবো। যতক্ষণ পারি আমি স্বাধীন থাকতে চাই।

বেশ বড়ো দোকান সুধাংশুর মালিকের। খুবই কষ্টকর কাজ তার। টিফিনের সময় দোকান থেকে কিছুটা দূরে এক জায়গায় এসে ও দাঁড়িয়ে থাকে, সময় থাকলে আমি ওই সময় যাই।

—সারা সপ্তাহ চেঁচামেচি। শনিবার তিনটের সময় দোকান বন্ধ। আমি বাড়ি যাই লাস্ট বাসে।

—কেন রে?

—ঘুরে বেড়াই এ রাস্তা সে রাস্তায়, মার্কেটে। মস্ত বড়ো যে শপিংমলগুলো, সেখানেই বেশিরভাগ দিন যাই। কতরকম জিনিসপত্র, খাবারদাবার, জামা কাপড়। পেটমোটা লোকজনেরা আসে, এতো কিনছে এতো খাচ্ছে তাও হাসি নাই, সব সময় রাগরাগ মুখ। মাধুরী দীক্ষিত, ক্যাটরিনা কাইফরাও আসে। সব দেখি, যা পাই তাই দেখি। আমার এক নতুন বন্ধু সবচেয়ে বড় শপিংমলটায় কাজ পেয়েছে। সে বলেছে, যা ইচ্ছে সব দ্যাখ চুপচাপ, চেঁচামেচি করলেই ধরা পড়ে যাবি। চুপচাপ দেখি, বুকের ভেতরটা চিনচিন করে। মনে হয় পারবো না, একদিন ঠিক চিৎকার করে উঠবো আমার এই ভাঙা গলায়।

—তুই নিজেই তো ফুটপাথে বসতে পারিস, রুমাল, মোজা, গামছা নিয়ে।

—তুমি সোজাসাপটা লোক, ওসব বুঝবে না। খুব কঠিন। আমার ক্ষমতায় কুলোবে না। ওসব স্বপ্ন আর আমি দেখি না। সেদিন একটা ব্যাপার হয়েছে শোনো। রবিবার আমি কথা বলি না, চুপচাপ বোবার মতো শুয়ে থাকি ঘরে, আকাশপাতাল ভাবি। মা, বোন, ভাই সবাই এটা জানে। দু-সপ্তাহ আগে এক রবিবার সকালবেলা ঘরে শুয়ে আছি, গাঁয়ের বন্ধুরা এলো। একজন বললো, তুই মুখ চুন করে ঘুরে বেড়াস, গলা ভেঙে গেছে, কাঠির মতো চেহারা। শহরে গিয়ে আর তোকে চেল্লাতে হবে না, আমার সঙ্গে ঢাক বাজাবি চল। একজন ফাজিল বন্ধু বললো, ঢাক তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে আয়। আমি অবাক হচ্ছিলাম, আমাকেও ওরা চায়! আরও নানান কথা মনে হলো। শেষকালে আমি বললাম, ঢাকের বাদ্যি থামলে মিষ্টি। একথায় একজন খুব তেতে উঠলো, শহরে গিয়ে খুব লায়েক হয়েছিস দেখছি। যা বলছি শোন, ভালো হবে তোর। আমি আবার বললাম, ঢাকের বাদ্যি থামলে মিষ্টি কিনা তোরাই বল। খুব রেগে গেল ওরা, তোকে জব্দ করবো, ফাঁসিয়ে দেবো। আমি হাসছিলাম খুব, আমি কি ঢাক যে ফাঁসাবি? তোর ছালচামড়া ছাড়িয়ে ঢাক বানাবো, বললো ওরা। শোনো মানিকদা, যদি কোনোদিন আমাকে খুঁজে না পাও, বুঝবে আমি ঢাক হয়েছি। যদি কোনো ঢাকের বাজনা তোমার বেসুরো মনে হয়, বুঝবে সেটা আমারই চামড়া দিয়ে তৈরি। তোমার সুধাংশুর বেসুরো আওয়াজ তুমি চিনতে পারবে ঠিক, নিশ্চিত আমি জানি।

ঠিক দুপুরবেলা, তিনজন দামাল ছেলে একটা মোটর সাইকেলে উড়ে যেতে যেতে

হঠাৎ উল্টোদিক থেকে এসে আমাকে মারলো। ঠিক আমাকে নয়, আমার সাইকেলটাকে। আমি কোনো রকমে বাঁচলাম, সাইকেলের সামনের চাকাটা দুমড়ে গেল। দামাল ছেলেরা আমার ওপরেই চড়াও হতে আসছিল, তার আগেই বিপদ আঁচ করে আমি বলে ফেললাম, ঠিক আছে, সাইকেল সারানোর টাকা দিতে হবে না। এরকম হয়।

একজন দামাল বললো, একটু দেখে শুনে যাবে, বুঝলে?

—দেখেশুনেই তো যাই। কী যে হয়ে গেল আজ।

যে দামালটা বাইক চালাচ্ছিল, সে বললো, মস্তি, বুঝলে কাকা। হাতটা একটু পিছলে গেল।

এর মধ্যে দু-চারজন জমে গেছে মজা দেখতে। তাদেরই মধ্যে একজন বললো, পিছলে গিয়ে তোমরা যদি ওপারে চলে যাও, সেটা খারাপ নয়। তা তো যাবে না। আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে, আর পিছলে যাবো আমরা।

একজন দামাল এগিয়ে আসে, তুই আবার কে?

—দেখতে পাচ্ছো না? একজন মানুষ।

—যা ফোট্।

—ফুটবো, তবে একটু দেরি হবে। তোমাদের পরে যাবো।

ঝামেলা খুব বেশি এগোয় না। দামালদের তাড়া ছিল হয়তো। ওরা চলে যেতেই ভিড় পাতলা হয়ে গেল। যে লোকটি কথা বলছিল, সেও চলে গেছে। একদিন না একদিন আবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে। ওর চেহারাটা আমাকে মনে রাখতে হবে।

খুব একটা অসুবিধায় আমি পড়লাম না। পাশেই গাছতলায় একটা সাইকেল সারানোর দোকান। তার থেকে হাত দশেক দূরে একটা চায়ের গুমটি। চায়ের গুমটির বেঞ্চে বসেছিলেন একজন বয়স্ক লোক। ফর্সা রং, রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে। মাঝারি উচ্চতার রোগা মানুষ, ধুতি আর সাদা সার্ট পরা। আমি ওঁর পাশে গিয়ে বসতেই উনি বললেন, যেই তুমি বললে সাইকেল সারানোর টাকা দিতে হবে না, অমনি ওদের ফণা নেমে গেল। কী সব হলো বলো তো? এরা কারা? এদের আমি চিনতে পারছি না। অথচ আমাদের ঘরেরই তো ছেলে সব।

আরো পাঁচ কি দশ মিনিট গোটা কয়েক কথা বলার পর উনি বললেন, আত্মায় বিশ্বাস করো?

আমি মুচকি হেসে চুপ করে থাকি।

—করো না? বিশ্বাস করো বা না করো, কিছু এসে যায় না। অশুভ আত্মায় ভরে গেছে চারপাশ। শুভ আর অশুভর লড়াই আগে ছিল, আজও আছে, চিরদিন থাকবে। এটা তো মানবে সবাই।

সাইকেল সারানো হয়ে গেছে। উঠবো আমি এবার। বয়স্ক মানুষটি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, ওরা সব গেলে কোথায় বলো তো? আমরা তো আছি, সঙ্গে যাদের থাকার কথা ছিল, তারা সব কোথায় গেল?

আবার এক বৃষ্টির সন্ধে। বইছে এলোমেলো বাউল বাতাস। শীত শীত ভাব। থম মেরে বসে থাকতে থাকতে আমি সারাদিনের অদৃশ্য ক্ষতচিহ্নগুলোর রক্তপাত মুছে, আত্মস্থ হবার চেষ্টা শুরু করেছি। রক্তচোষা মশার দল, প্রতিদিনের মতোই, আমাকে ঘিরে গান গাইছে। ওই তো একাট রক্তচোষা বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের গোড়ায় বসে হুল ফোটালো। এরপর রক্ত টানবে। আজ আর নির্বিবাদে উড়ে যেতে দেবো না ওকে। মারবো, নিশ্চিত মারবো রক্তচোষাকে। মশা-মাছি দিয়েই তাহলে শুরু হোক। বাঘ-সিংহ, দত্যি-দানো না হয় আস্তে আস্তে হবে। স্বপ্ন দেখা ছাড়ছি না আমি।

With best compliments of

M/s. DEEP ASSOCIATES

Shankar Plaza, S.P. Mukherjee Road,
Murgasol, Asansol, PIN : 713303

Sl. No. 116

তমসাফাড়া স্ফূলিঙ্গ : শতবর্ষে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১.

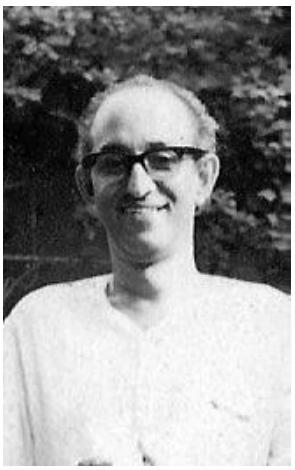

সুন্দরলাল একজন আড়কাঠি। আড়কাঠি কথাটা গল্পের কোথাও নেই, অথচ গল্পটি যেখানে শেষ হয়েছে, তা যে সাঁওতালি মেয়েপুরুষদের সর্বনাশের শুরুচল তা বোঝার জন্য আমাদের আড়কাঠি কথাটা না আনলে চলবে না। সুন্দরলাল প্রায় তিরিশ বছরের এক ছোকরা। ঘরছাড়া। সাঁওতাল পরগনায় সে ডেরা বেঁধেছে। সারল্যের কোড়া চেহারা এখানকার ভূমিজ মানুষগুলোর চালচলনে ঘোরাফেরা করে। সুন্দরলাল তাদের ওপর দখল কায়েম করতে পেরেছে। সে নাকি হাত দেখে যা বলে তা মিলে যায়। শেকড়বাকড় নিয়ে তার জ্ঞানগম্যি অনেক। নানা কঠিন রোগে নাকি তার ওষুধ কাজে লেগেছে। তবে সন্ন্যাসের কোনো ভেক নেই তার। পরিপাটি আঁচড়ানো চুল। পেতলের ডিবেতে ঠাসা পান। পকেটে ঝনঝন টাকা বাজে। অথচ হিমালয় নাকি তার চষা। পাকা সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গপাকা সে। ভূত তাড়াতে জানে, বাণ মারতে জানে, চোখে মুখে ঘোর ঘনাতে পারে। ভবিষ্যৎ তরতর কপচাতে পারে। তাই ভরপুর শরীর সাঁওতাল যুবতীদের নাচের দমডালা অমল খুশিতে নিজেকে না হারিয়ে তাদের শরীরস্বাস্থ্যের দরদামের হিসেব করতে করতে তার মনে হয় বুধনীর চেহারাটার দর উঠবে সবচেয়ে বেশি। সময় নেয় না সুন্দরলাল। টাকা ছড়ায় যুবতীদের ভেতর। দৈববাণীর ভেলকি খেলে কথায়। শহরে নাকি বুধনীর কপাল ফিরে যাবে। মাথাকে নানা পথে খাটিয়ে সে সাঁওতালদের দিন দিনের সমাজসংসারের নানা চলাফেরাকে নানাভাবে অভিভাবিত করতে করতে সেখানকার পুরো জনমনকে সে নিজের কব্জায় আনতে পেরেছে। কোথাও লোভ দেখিয়ে, কোথাও ভয় খাটিয়ে, কোথাও ভরসা দিয়ে যখন সে বোঝে যে মানুষগুলো তার হাতের পুতুল হয়ে গেছে, তখন সে তার ব্রহ্মাস্ত্র ছোঁড়ে। তার ভর-খেলানো গনগনে গলায় যেন রাজ্যের ভয়ালতা ঝলসে ওঠে। দেবতার শাপে গাঁয়ে মড়ক লাগবে। কোনো প্রাণী বাঁচবে না। নাঙ্গা বাবার শিষ্য সুন্দরলালের সঙ্গে তারা সকলে গ্রামছাড়া হয়ে উত্তরে গেলে জায়গা পাবে, জমি পাবে, ঘরসুখে তাদের বাণ ডাকবে। গ্রাম উচ্ছেদ হয়। সুন্দরলালের সঙ্গে সবাই পা ফেলছে। 'সাঁওতাল পুরুষেরা ঘরছাড়ার দুঃখ ভোলবার জন্যই কেউ হয়ত বাঁশিতে সুর দিয়েছে। মেয়েদের মুখে কোনো ক্ষোভের ইঙ্গিত নেই, পথ চলবার আনন্দে তারা লীলায়িত...।' গল্প শেষ হচ্ছে এই বলে, 'আসামের চা-বাগানে কুলি যোগানো যে কি অসম্ভব ব্যাপার, সেটা সাহেব জানে। কালাজ্বরে দলে দলে লোক মরছে, আশপাশ থেকে একটি কুলি আনবারও জো নেই।' সুন্দরলাল অসাধ্যসাধন করেছে। বেয়াল্লিশটা কুলি আর সাহেবের যৌনদাসত্বে ফেলা বুধনীকে নিয়ে তেত্তাল্লিশজনকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জবর কমিশন পাবে।

সুন্দরলাল চা-বাগানের আড়কাঠি। কথাটার আমরা প্রথম সার্থক ঘোরাফেরা পেয়েছি উনিশ শতকের ছয়ের দশকের মাঝবরাবর লেখা এক বিস্ফোরক বইতে। 'কুলি কাহিনী'র লেখক রামকুমার তর্করত্ন। বইটিতে আসামের চা-বাগানের কুলিদের ওপর যে ভয়াবহ শোষণ ও অত্যাচার হয়, তার তথ্যনিষ্ঠ এত ভয়ঙ্কর বিবরণ আছে যে খোদ বিলেতেও তা নিয়ে প্রবল আলোড়ন ওঠে যা সমসাময়িক 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রকাশে হয়েছিল কিনা, তা জানা নেই। তখন থেকেই চা-বাগানের নিযুক্ত আড়কাঠিরা নানা প্রলোভনে, উপহারে গাঁ-ঘরের গেরস্ত মেয়েপুরুষকে আসামে চালান করত। এই গল্পের শেষে মারাত্মক মোচড়ে লেখক চলতে থাকা মেয়ে-মরদের চোখেমুখে নতুন বসতি, নতুন ঘরকন্নার আশাকে গুঞ্জরিত করেছেন, যে গুঞ্জন জবাই হবার মুখে চলছে। আজো অব্দি দাসত্বের সারশাঁস বজায় রেখে খাঁটি খোলসের পর খোলস যদি না পাল্টায় তবে কাগজে আমরা পড়েছি কেন যে ২০১২-তেও জলপাইগুড়ি জেলার কুমালাই চা-বাগান একমাস বন্ধের ফলশ্রুতিতে ১১০০ কর্মী চরম অবস্থায় রয়েছে ও একটা বাচ্চা সহ ৩ জন অপুষ্টিতে মারা গেছে। চোখকে আরও যদি প্রখর করি তবে দেখব সুন্দরলালের মতো নানা ভেকধারী দালাল কত মায়াময় তেজস্ক্রিয়ে শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি স্তরকে টেনে আনছে এই পণ্যসভ্যতার বিকারবিপুল খিদের খোরাক হিসেবে। গল্পটি তাই আজও দগদগে প্রাসঙ্গিকতায় জ্যান্ত হয়ে আছে। গল্পটির নাম 'বীতংস'। লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি এবার একশো বছরে পড়লেন।

২.

আসা যাক আর একটি গল্পে, 'নক্র চরিত'। নিশিকান্ত কর্মকারের ঘর। সলতে কমানো হ্যারিকেন জ্বলতে হয় তাই জ্বলছে। বেশি তেল পুড়বে, তাই সলতে উশকোয়নি সে। খেরো খাতায় তার

হিসেব চলছে। রাত অনেকটাই গড়িয়েছে। দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলতে হাঁটু অব্দি কাদাটে পা নিয়ে চারটে বিকট চেহারার লোক ঘরে ঢুকল। মাইল চারেক পথ ছুটে তাদের আসতে হয়েছে। নইলে আট দশ গাড়ি হাটের লোকের হাতে তারা খুন হত। হাতের পুঁটুলিতে তাদের ডাকাতিতে ছিনিয়ে নেওয়া সোনা রুপোর বেশ কয়েকটা গয়না। একটা কানের গয়নায় এক টুকরো নরম মাংস আর কালচে রক্ত লেগে আছে। নিশি তাদের দুশো টাকা দিল। চোরাই মাল বিক্রির দরকারে তার কাছে আসা ছাড়া তাদের আর কোনো গত্যন্তর না থাকার বাধ্যতাকে কাজে লাগিয়ে নিশি যে তাদের নির্দয় ঠকিয়ে নিল, সেটা বুঝেও কিছু করার উপায় তাদের নেই। কারণ নিশি গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সেখানকার থানা-দারোগার সাথে তার যথেষ্ট খাতির। নিশির যুক্তি, চোরের ওপর বাটপাড়ি করে হাজার টাকার মাল দুশো টাকায় নেওয়ার ভেতর কোনো অধর্ম নেই। নিশির সেবাদাসী বিশাখা এক সময় তার লীলাসঙ্গিনী ছিল। এখন নিশি বয়সের ভারে বুড়িয়ে গেছে। বিশাখা এখনও ভরা যৌবনে। লেখকের কথায়, 'সিন্দুকের জমানো সোনার তালগুলোর মতো রুপোর এই প্রতিমাকে সে পাহারাই দিয়ে চলছে', কিন্তু তাকে নিজের করে চলা অপকীর্তিগুলোকে সামাল দেবার জন্য সে পাহারাদারিকেও দুঁদে হাঙর-লোলুপ ইব্রাহিম দারোগাকে ভেট দিতে ফাঁসাতে হয়েছে। লোভনীয় টোপ খায় বলেই তো চালের লাফিয়ে লাফিয়ে দর বাড়ার চরম ফয়দা লুটতে নিশি চরম অভাব চাপে বেচা বিপুল চাল বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সামান্য দামে কিনে রেখেছে সে। দারোগার ক্ষমতায় সুরক্ষিত হতে হলে বিশাখাকে তো তাকে এখন তখন ছাড়তেই হবে দারোগার খপ্পরে। ফেলো কড়ি মাখো তেল। এক কীর্তন আসরে ভাববিভোরে আপ্লুত বৈষ্ণব নিশিকান্তের মেজাজ কেটে দেয় গাঁয়ের চৌকিদার। ভাতের খিদে এক দম্পতিকে লাশ বানিয়ে ছেড়েছে। প্রেসিডেন্ট দেখলেন, দুটো উলঙ্গ লাশ ঝুলছে। ভাতেরই চরম অভাব, আত্মহত্যার সময় লজ্জাবস্ত্র থাকবে কী করে! প্রেসিডেন্ট প্যাচপেচে আঁধার দিয়ে বাড়ি ফিরছেন। এক বন্ধ কামরায় ইব্রাহিম দারোগার বিশাখাকে নিয়ে হাঙরলীলা। লণ্ঠন জ্বেলে নিশি গোলাঘরে ঢুকল। আটশো মন চাল হাঙরের দাঁতের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। বর্ষার চুঁইয়ে পড়া জলে পঞ্চাশ ষাট মন নষ্ট হয়েছে। নিশি হায় হায় করে উঠল। পরের দিন ঘরটা সারাতে হবে।

পচা চালের গন্ধ পেয়ে নিশির দমকা মনে পড়ল এইরকম গন্ধই সে পেয়েছিল যখন হাট থেকে ফেরার পথে তার চোখে পড়েছিল একটা গলা পচা গরুর শরীর আগলে একটা ঘেয়ো কুকুর বসে আছে আর খুব জোরে চিৎকার করে চারদিক থেকে ভিড় করে আসা খিদে পাগলা শকুনিদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ছবিটা প্রায় এসে পড়া দুর্ভিক্ষেরই জানানি। খিদেয় আত্মহত্যা করা স্বামী-স্ত্রীকে দেখেতে যাবার সময় নিশির মনে হচ্ছিল সেই গভীর রাতে দু-পাশের বাঁশঝাড় থেকে যেন বেরিয়ে আসছে খিদের হাতে খুন হওয়া কতকগুলো ছায়ামূর্তি যারা নিশিকে তাদের খাবার নিয়ে নিজের ভাঁড়ারে জমা করার অভিযোগ জানাচ্ছে। এমনকি ফেরার পথেও নিশি যেন দেখছে শত শত খিদে-খুন উলঙ্গ লাশ।

দুটো সরকারি তথ্য এ-প্রসঙ্গে আমাদের জানা দরকার। প্রথমটা হল মন্বন্তরের বছরে অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে ৭,৬২৮ মিলিয়ন টন ফসল দেশে উৎপাদিত হয়েছিল আর আমদানি হয়েছিল ৭,৮৯২ টন। অথচ ১৯৪১-এ সে পরিমাণ ছিল যথাক্রম ৬,৭৬৮ মিলিয়ন টন ও ৬,৯৯১ মিলিয়ন টন। ১৯৪২-এ তা ছিল ৯,২৯৬ মিলিয়ন টন ও ৯,৯১৪ মিলিয়ন টন। ১৯৪১-এ দুর্ভিক্ষ হল না। হল ১৯৪৩-এ। তাও ১৯৪২ ও ১৯৪৩-এ পরপর ৪১-এর তুলনায় যথেষ্ট ভালো ফসল উৎপাদন ও আমদানি সত্ত্বেও। কারণ কী? গবেষণা বলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচে ব্রিটিশ সৈন্য ও ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য ব্যাপক চাল পাচার, বেশি লাভের আশায় মজুতদারদের অস্বাভাবিক চাল মজুত ও জাপানিরা বাংলাদেশ দখল নিতে পারে—এই আতঙ্কেই ইংরেজদের ব্যাপক নৌকা ধ্বংস ও চাল পোড়ানো। আমরা ভাবতেই পারি সত্তর পঁচাত্তর বছর আগের ঘটনার দগদগে স্মৃতি বয়ে বেড়ানোর দরকার আছে কি? আসা যাক, এবার দ্বিতীয় তথ্যে। 'দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া'-র জুন ২৫, ২০১৭-র রবিবারের প্রথম পাতার শীর্ষ সংবাদ যে যেখানে ঘাসের দাম ২০১১-১২ থেকে ২০১৫-১৬তে শতকরা ১ ভাগ, ফল ও শাকসব্জির দাম শতকরা ১৫ ভাগ ও মশলাপাতির দাম শতকরা ১৮ ভাগ বেড়েছে সেখানে ফসলের দাম শতকরা ৩ ভাগ, তেলবীজের দাম শতকরা ১১ ভাগ ও চিনির দাম শতকরা ১ ভাগ কমেছে। এই হিসেব পাওয়া গেছে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান কেন্দ্রের ২০১৭-র সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান তালিকা থেকে। খবরে বলা হয়েছে, চাষিদের ব্যাপক বিক্ষোভ ও আত্মহত্যার ঘটনার পেছনে ফসলের এই মূল্যহ্রাস বড় কারণ। আগে পিছে হলে কী হবে, দুটো তথ্যই প্রমাণ দিচ্ছে ফসল ভালো হলেও চাষিদের অবস্থা যুগের পর যুগ ধরে ফিরছে না। অভাব অনটনের চাপে চাপে তারা হয় ফেটে পড়ছে নয় আত্মহত্যা করছে। বদলের মধ্যে বিদেশি হাত থেকে ক্ষমতা দেশি হাতে বদল হয়েছে। কিন্তু নিশিকান্ত কর্মকারদের উত্তরধারা যুগমাফিক নানা খোলসে সেই একই সারশাঁসে চাষিদের ছোবড়া করছে। ক্ষমতা বাঁদিকে মোলায়েম ফাঁপা বুলি আর তথাকথিত দাক্ষিণ্য বিলিয়ে ডান দিকেই চলছে।

গল্পটিতে নিশিকান্তের চরিত্র ছবি আমাদের ভাবায়। লোকটার আসলে ঘর নেই, মানে ঘর বলতে যদি আমরা গেরস্ত-সংসার বলে মনে করি। বিশাখা তার রক্ষিতা। গল্পে তার স্ত্রী পুত্রকন্যা আছে, এমন কোনো খেই নেই। সুতরাং ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য সম্পত্তি বাড়ানোর কোনো তাগিদ থেকে সে এমন একের পর এক অপকীর্তি করে যাচ্ছে—এ ভাবনা আমাদের আসছে না। তবে কি অভাব আর অসহায়তাকে শুষে নেবার যে অভ্যাস সে নিজের চালচলনে একদিন পত্তন করেছিল, সেই অভ্যাসই পেকে পেকে একসময় তাকেই দখল করে নিয়েছে? পুঁজিবাদ কি এমনি করেই বর্তমান খেতে খেতে নিজেই নিজের খাদক হয়ে উঠছে? আগামীতে তার কোনো বংশধারাই আর থাকবে না? প্রকৃতির নিয়ম তো তাই বলে। বিকার বিকারেরই বংশ লোপ করে।

৩.

ট্রেনবিভ্রাটে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিহারের রাজগীরে রাত্রিকালীন ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনে উপস্থিত এক স্থানীয় বাঙালি যুবতী ও তার মায়ের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ হয়ে যায় আত্মজবানীতে বর্ণিত লেখক ও তাঁর স্ত্রীর। স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে মেয়েটি তাদের নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যায়। হেতু, লেখক তাকে একটি ধর্মশালার হদিশ দিতে বলেছিলেন। আন্তরিক, প্রয়োজনমাফিক ও নিরাপদ আতিথ্য কোনো পাল্টা দাবি ছাড়াই দম্পতিটি সেখানে পেয়ে যান, মহিলাটির যথাযথ পরিশ্রমনিষ্ঠ অতিথি-সৎকার, কিন্তু প্রতিদান হিসেবে মেয়েটির চরিত্রদোষের উদাহরণ হিসেবে লেখকের স্ত্রীর কাছে নিন্দিত ও লেখকের স্ত্রীর মন্তব্য সমর্থিত হয়। কারণ মেয়েটি তার বিয়ে হয়েছে বললেও তার কপালে সিঁদুর ও হাতে শাঁখা নেই। মেয়েটির বুড়ি মা বিধবা হলেও রাত্রে গোগ্রাসে খিচুড়ি গিলেছে। তাছাড়া কোনো পুরুষ-অভিভাবক ছাড়া যে মেয়ে রাতবিরেতে অজানা অচেনা মানুষকে তাদের বাড়িতে টেনে এনেছে। সুতরাং

আর একটা দিন থাকলেই মেয়েটি তাদের নিশ্চিত কোনো ফাঁদে ফেলবে বলে লেখকের স্ত্রী বিশ্বাস করেন। স্ত্রীর এইসব অকাট্য যুক্তিতে মেয়েটিকে কৃতজ্ঞতা জানাতে না পারায় লেখকের যে মন ভারি হয়েছিল তা আবার ফুরফুরে হয়ে গেল। গল্পটার নাম 'ফলশ্রুতি'। নানা রকমের বাসি চলতি প্রথার অনড় দাসত্বের উত্তরাধিকারত্ব যে আমাদের অনেকের ভাবভাবনাকে একটানা দূষিত করে যাচ্ছে ও উত্তর-প্রজন্মকে অভিভাবিত করার উদাহরণ রেখে যাচ্ছে, গল্পটি সে ব্যাপারে পাঠককে ধাক্কা দিচ্ছে। অকৃতজ্ঞ ও অশিষ্ট সঙ্কীর্ণতা লেখকের স্ত্রীর ভেতর এমন গেড়ে বসেছে যে মেয়েটির চরিত্রদূষণ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না করে বা কোনো দোলাচলে না ভুগে সে স্পষ্ট জজিয়তি করে বসেছে। গল্পের এক জায়গায় অণু অর্থাৎ লেখকের স্ত্রী সম্পর্কে টুকরো শ্লেষ ঝলসে উঠেছে : 'কালো অন্ধকারের দিকে বিভোর চোখ মেলে সে বোধকরি কবিতার খাদ্য খুঁজছিল। গদ্যময় স্বামীর জীবনে কবিস্ত্রীর মতো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কী হতে পারে!' অতিথি-সৎকারপটু সপ্রতিভ কুরূপা মেয়েটি সম্ভবত স্বামী প্রতারিতা। তার ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে একটি বাক্য খরচ করেছেন লেখক। মেয়েটি স্টেশনে তার মাকে বলছে, 'না মা এ গাড়িতেও সে আসেনি।' 'গাড়িতেও' কথাটি ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে তার অপেক্ষার আয়ু দীর্ঘ। হয়তো দিনের পর দিন। হয়তো মায়ের সন্তুষ্টির জন্য এই অভিনয়। শাঁখা সিঁদুর না রেখেও নিজেকে বিধবা না বলে অণুকে সে বিবাহিতা হয়তো সে জন্যেই বলছে। নিঃসঙ্গতার দাহ সাময়িক মেটানোর কারণেও হয়তো সে সেই দম্পতিকে ঘরে এনেছে।

৪.

ভুলুয়া বেজাত কুকুর। রাস্তাই তার ঘর, ঘরফেলা খাবারেই তার দিন চলে। সারাদিন সে এ-পাড়া ও-পাড়া চষে বেড়ায়। কিন্তু তার রাতবাস এক গলির মোড়ে। সে গলিতে চেনা মানুষকেও গলা খাঁকারি দিয়ে ঢুকতে হয়। অচেনা হলে তো তার সমূহ বিপদ। কাজেই রাতে চোর ঢোকার কোনো সুযোগই নেই সে গলিতে। পালিশবুদ্ধি ননিগোপাল দিন দশেক হল মন্দিরাকে পড়াচ্ছে। তুখোড় ছেলে। পুব বাংলার ভিটেছাড়া ছেলে। কাজের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে বিহারের সেই শহরে এসে পড়েছে যেখানে মন্দিরার বাবা এক জাঁদরেল উকিল। তা ভদ্রলোক তো ননির সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুশি হলেন। বললেন, চেষ্টা করে দেখবেন তার জন্যে কাজ যোগাড় করতে পারেন কিনা। তখনকার মতো নিজের মেয়ে মন্দিরার ঘরমাস্টারির কাজে তাকে রেখে দিলেন। জেট্-প্রেমিক ননি পড়ানোর তিন দিনের মাথায় মন্দিরের মুখে চোখ সাঁটাল। চারদিনের দিন তার হাত চেপে ধরল। পাঁচ দিনের দিন মন্দিরা আর তার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়াতে পারল না। ছ-দিনের দিন মন্দিরার কাকিমার চোখে ধরা পড়ল ননির কীর্তি। সাত দিনে শুরু হল ঘর-আলোচনা, ন-দিনের মাথায় মন্দিরার বাবার কাছে সে কথা চলে এল। দশ দিনেই ননির চাকরির অকালছেদ। মাসমাইনে তার হাতে দিয়ে তাকে বিদায় দেওয়া হল। কিন্তু মন্দিরার মন থেকে যাওয়া তো দূর কথা, আরও জাঁকিয়ে বসল ননিগোপাল। অতঃপর চোরাগোপ্তা দেখাশুনো, টুকরো টুকরো চিঠি বিনিময়। ননি নাকি বসে ছিল না। প্রথমে ব্যবসা, পরে কলকাতায় চাকরি। সুতরাং শেষ অব্দি ঠিক হল রাত একটায় ননি আসবে। মন্দিরা তৈরি থাকবে। কলকাতায় পালাবে ননি আর মন্দিরা। ঠিক তো হল। কিন্তু মন্দিরা ভুলে গেল ননিকে মারাত্মক একটা কথা বলতে। রাত একটায় সে গলিতে ঢুকলে ভুলুয়া তো তাকে রেহাই দেবে না। পালাতে পথ পাবে না সে। ধরা পড়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু সে ভুল তো আর ঠিক করা যাবে না। তোলপাড় হচ্ছে মন্দিরার মন। খুব চেয়েছিল সে রাতে সে গলির মুখে ভুলুয়ার অনুপস্থিতি, এমনকি মৃত্যুও। দমকা ভাবছে, ভাতের সঙ্গে সুযোগ থাকলে বিষ মিষিয়ে তাকে মারত। যাই হোক, রাত একটায় প্রচণ্ড চেঁচামেচি, আর্তনাদ ও পলায়ন। প্ল্যান ফেল হল। সারা রাত জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে মন্দিরা। আত্মহত্যাই করত। সাহস হয়নি। আশাও জেগেছে। মিলন তাদের ঠেকায় কে? হয় দিনের বেলাতেই কেটে পড়বে, নয় একটা রুটি দিয়ে কুকুরটাকে ভুলিয়ে নিজেই সে হাজির হবে স্টেশনে। কিন্তু রাতশেষের যে সকাল এল তা তো বোমের মত ফাটল মন্দিরার মনে। কাকার ঘোষণা ননি নাকি তৈরি ছেলে। মারোয়াড়িদের কী সব সাপ্লাই দেবে বলে হাজার আটেক টাকা নিয়ে সটকেছিল। এটাই শেষ নয়। পুরুলিয়ার একটা ভদ্রলোকের মেয়েকে বিয়ে করে তাকে ফেলে তার গয়নাগুলো নিয়ে পালিয়েছে। তবে ননি ধরা পড়েছে সে সকালেই। উল্টো ঝাঁকুনির তোড়ে মন্দিরা ভুলুয়ার মতো তার এত কাছের আর কাউকে ভাবতে পারছে না। একটা বড় পাঁউরুটি নিয়ে তাকে আদরে খাওয়াতে যাচ্ছিল। রাস্তার মোড়েই তখন পড়ে আছে ভুলুয়ার রক্তাক্ত মৃত শরীরটা। মিউনিসিপ্যালিটির লোক তাকে মেরেছে।

গল্পটা প্রকাশিত হয়েছিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র ৭ নভেম্বর, ১৯৫৪তে। মানে প্রায় ৬৫ বছরে পড়বে গল্পটা। নাম, 'প্রহরী'। আজকের মোবাইল-ইন্টারনেটের যুগে গল্পটার চেহারা বিলকুল পাল্টে যেত। ননি-মন্দিরার পালানোই বা ঠেকাতো কে, আর মন্দিরার লল্লাটই বা রুখতো কে। অবশ্য পুরুলিয়ার মেয়েটিকে দিয়েই ননি মানুষ ঠকানোর একটা বাড়তি ফিকিরিকে হাতে কলমে খাটিয়ে জিতেছিল। অবশ্য ভুলুয়া থাকলে সে মেয়েটাও বেঁচে যেতে পারত সেই চিঠি-চালাচালির সেকেলে যুগে। তবে পরিবেশ পরিস্থিতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যত পাল্টে পাল্টে যাক না কেন, এ যুগের মন্দিরার বয়েসকালটা সে যুগের মন্দিরার মতোই গোলমেলে। লেখক কি বলতে চাইছেন এই বয়েসি ছেলেমেয়েদের ঘর-বাইরের চলাচলে ভুলুয়া-টাইপ কিছুটা বাঘা খবরদারি দরকার? আজকের খোপ খোপ পরিবারে নজরদারির এমন বেছানো জাল আছে কি? ইচ্ছে থাকলেও চোখ বলতে তো অধিকাংশ ঘরেই দু-জোড়া—বাবা আর মায়ের। সাধ আর সাধ্যে আকাশপাতাল ফারাক।

ননির ব্যাপারটা ধরা যাক। বাংলাভাগের দগদগে ক্ষত তখনো টাটকা। ননি ঘরছাড়া, গ্রামছাড়া, দেশছাড়া এমনকি সম্ভবত পরিবারছেঁড়া এক টাটকা ছোকরা। মন্দিরার কাছে হাট হয়ে খুলে যাচ্ছে ননির জালজোচ্চুরির কাণ্ডকারখানা। মঁসিয়ে ভেঁদু। সাতশতকের প্রথম দিকের চরম আর্থিক মন্দার সময় যখন নতুন কাজ পাওয়া তো দূরের কথা, কাজ-করা হাজার হাজার মানুষও কাজ হারাচ্ছে, তখন কাজ-হারানো সংসারি ভেঁদু বউ-ছেলের মুখে রুটি তোলার জন্য বেছে নিল এক একা থাকা বড়লোক বিধবাদের সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলার মাধ্যমে তাদের কব্জা করা ও তারপর খুন করে তাদের টাকা পয়সা হাতানো। যাই হোক, ভেঁদু একসময় ধরা পড়ে। তার ফাঁসির হুকুম হয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় এতগুলো খুনের জন্য সে অনুতপ্ত কিনা। উত্তরে সে বলে যে মোটেই সে অনুতপ্ত নয়। উল্টে তার দুঃখ এটাই যে মাত্র কয়েকটা খুন সে ইতিমধ্যে করতে পেরেছে। খুনের সংখ্যা বেড়ে বেড়ে হাজার হাজার হলে সে লাল কার্পেটে প্রবল করতালির ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে গা রাখতে পারত। সিনেমাটা করার জন্য চার্লি চ্যাপলিনকে আমেরিকা থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে। ছোকরা ননির ঘরবেড়, অভিভাবকবেড় উচ্ছেদ করে

যেসব দেশকত্তারা তাকে অকুলে ভাসিয়ে দিয়েছে তাদের বিচার আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা মানে মন্দিরার বাবা কাকার মতো তৎকালীন বড়োরা করেছে কি? ননি তো মাত্র দুটো জায়গায় ঠকিয়ে ধরা পড়ে গারদবাসে গেছে, যারা আপামর ভারতবাসীর সম্মতি অসম্মতির ধার না ধেরে পাইকিরি হারে মানুষকে উন্মূল করে যে মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্রের পত্তন করেছিল, তার আগুন কত প্রাণ আর সম্পত্তি খেয়ে খেয়েও এখনও খাওয়ার নেশা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের লগনচাঁদা রাক্ষস-খিদের উচ্ছেদ তো এখনও হয়নি।

৫.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সেরা গল্পের বইয়ের নাম 'বীতংস'। বীতংস মানে টোপ, ফাঁদ। তার বেশ কিছু গল্পে টোপ ব্যাপারটা মারাত্মক নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় খেলেছে। মূলত আর্থিক শোষণ প্রক্রিয়া আর্থসামাজিক বিপন্নতাকে ঠকিয়ে, খেলিয়ে খোয়াব ঝুলিয়ে ক্রমস্তরিক টোপের যে বিচিত্র ঘোরাফেরা ও শিকার গাঁথার আখ্যান ব্যাখ্যান সৃষ্টি করছে, লেখক সেগুলিকে নানা নান্দনিক স্পন্দনে রেখায়িত করে তুলেছেন। এ গল্পেও ননি টোপ হয়েই টোপ ফেলেছিল। তৎকালীন দেশকত্তাদের দেশপ্রেমের বুলিটোপে মন্দিরার বাপ কাকা গাঁথা পড়েছে বলেই না তাদের ছিছিক্কার ননিতেই ঘুরপাক খেয়েছিল। ভুলুয়াই যথার্থ অভিভাবক। তার বাঘা প্রতিরোধে মন্দিরা বাঁচল, ননিও আর একটা অপরাধ করার সুযোগ পেল না। তৎকালীন অল্প হোক, কিন্তু ভুলুয়ার মতো কিছু না থাক, দেশ-অভিভাবক ছিল যারা আর কিছু না হোক, তথাকথিত দেশপ্রেমের ভুড়ভুড়িতে ভোলেনি। কিন্তু ভুলুয়ার মতোই তাদের হয় মারা হয়েছে নয় মরার চেয়েও খারাপ অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছে। হাল্কা চালে লেখা গল্প। তবে চামড়া স্পর্শপ্রবল হলে বোঝা যায় হাল্কা চালেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কঠিনভাবেই চাবুক চালাচ্ছেন। ক্ষমতালোলুপ মুষ্টিমেয়র দেশভাগ যে ব্যাপক ভারতবাসীর আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ ও সম্পর্কের বনেদের ওপর চরম আঘাত করল, তার ফলশ্রুতিতে বিভাজনের ও বিশ্বাসহীনতার যে রমরমা চলছে তার আদি একটা উৎসটুকুরো 'প্রহরী' গল্পটি।

৬.

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাচর্চায় নজরকাড়া সাফল্য রোজগার করেও নান্দনিক চর্চায় অনন্যকর্মা হয়ে চলার নিদর্শ উদাহরণ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি এ-বছর একশ বছরে পড়লেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম (১৯৪১) হয়ে ছোটোগল্পের গবেষণায় ডি-ফিল পেয়েও গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ও কিশোর-পাঠ্য নানা রচনায় তিনি বহুকর্মা নন্দনকর্মী ছিলেন। তবে গল্প ও উপন্যাসে তিনি দায়বদ্ধ সংবেদন ও প্রখর বুদ্ধিমত্তাকে মিলিয়ে মিশিয়ে যেভাবে শোষণ ও বঞ্চনার রুদ্ধ যন্ত্রণা, ক্ষোভ ও বিস্ফোরণকম্প আবহকে তুলে ধরেছেন তা তাঁকে তৎকালীন দেশ ও পরিস্থিতির সমর্থ অভিব্যক্তির নিদর্শ প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরেছে। অন্যদিকে মধ্যবিত্তের ধূর্ত কপটতা, অভাব ও অশিক্ষাকে আত্মস্বার্থপূরণের সুযোগ হিসেবে কুশলী ব্যবহারকে তিনি নান্দনিক চমৎকারিত্বে প্রকাশ করেছেন। আনন্দ পুরস্কার ছাড়া আর কোনো নামডাকের সাহিত্য পুরস্কার তিনি পাননি। মাত্র ৫২ বছর বয়সে (১৯৭০) তিনি অকালপ্রয়াত হন।

বিগত শতকের তৃতীয় দশক থেকে প্রায় সাত দশক অব্দি বাংলা সাহিত্য মূলত প্রজ্ঞাঋদ্ধ সংবেদনশীলতার যেসব প্রোজ্জ্বল সাহিত্যসম্পদ আমাদের দিয়েছে, তার পরিশ্রমনিষ্ঠা চর্চা না করার

আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হচ্ছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মঞ্চে প্রেমেন্দ্র মিত্র।

ফলে আমাদের সাহিত্যকর্মে নানা উৎকেন্দ্রিকতা উঠে এসেছে যাদের পরীক্ষামূলক নাম দিয়ে আমরা নিজেদের ছলনায় প্রশ্রয় দিয়ে চলছি। আর্থিক ব্যভিচার ও সাংস্কৃতিক নিঃসঙ্গতা—এই দুটো রোগের বিরুদ্ধে আমাদের পূর্ব নন্দনসাধকরা আমাদের সাবধান করেছেন ও নিজেদের সাহিত্যকর্মের ভেতর দিয়ে তাদের লড়াইচলকে লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্যই পরিবেশের প্রবল অসহযোগিতা ও নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের প্রতিকূলতায় নানা দোলাচল, ভুলভ্রান্তি ও বিপথচারিতার অনেক নিদর্শন তাঁরা রেখেছেন। কিন্তু মোটের ওপর তাঁরা সচেতনভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত বা দৃষ্টি-অস্বচ্ছ করতে চাননি। অন্যদিকে নিজেদের আত্মক্ষরণের মাধ্যমে বিভ্রান্তি-পীড়িত নানা ঠিক চলার খেইও তাঁরা আমাদের দিয়েছেন। সবকিছুর মূলে ছিল ব্যাপক মানুষের সঙ্গে তাঁদের মেলামেশার বিপুল খিদে ও সেই খিদের তাড়নায় যোগাযোগের বহরও তাঁরা যথাসাধ্য বাড়িয়ে গেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যে সেই খিদে ছিল ও খিদে মেটাতে গিয়ে মানুষের নানা ভেতরচল যে তিনি আবিষ্কার করেছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে পাঠক হিসেবে আমাদের মনে হতে পারে কথার অমোঘ ব্যবহারে অনেক সময় যে বহু প্রশ্ন করা ও উত্তরসমর্থ ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, তা আবার অনেক সময় মানুষকে পরিষ্কার বোঝানোর অধৈর্যে কথার বাহুল্যে খাটো করেছেন। এ-রোগে কবিরা কমবেশি আক্রান্ত হন, এমনকি রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ পর্যন্ত অনেক সময় নিজেদের মহিমাময় সৃষ্টিঘনতাকে বাড়তি কথার উৎপাতে বিব্রত করেছেন। আর একটা কথা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বহুক্ষেত্রে অবরুদ্ধের বিস্ফোরণ-সম্ভাবনাকে ঘন করেছেন। সমসাময়িক অনেক কথাসাহিত্যিক কিন্তু বিস্ফোরণের অনেক ঘনঘোর চেহারা তুলে ধরেছেন। উদাহরণ হিসেবে সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর', 'ফসিল'—এ-রকম দু-একটা উদাহরণ দিতে পারি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় আসছি না। তিনি তো এ-বাঁকভাঙার নিদর্শ-পথিকৃৎ।

যাই হোক, যেটা দরকার তা হল, শুধু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মানুষদের নমো নমো স্মরণ করলে চলবে না। তাঁদের গভীরভাবে পড়তে হবে ও বর্তমানের রমরমা সাংস্কৃতিক দূষণমুক্তির লড়াইয়ে তাঁদের সদর্থক ভূমিকাকে হজম করে আমাদের মতো সংস্কৃতিকর্মীদের চোখকে আরও পরিশ্রুত করতে হবে ও বুককে আরও সাহস টানায় সমর্থ করতে হবে। বর্তমানের রক্ষায় ও ভবিষ্যতের গঠনে আমাদের নন্দনচর্চার পিতাপিতৃব্যেরা যদি অবহেলিত থাকতেই থাকেন, তবে সে ক্ষতি মূলত আমাদের প্রজন্মপরম্পরার ক্ষতি। তাঁরা তাদের ফসল দিয়ে তাঁদের লাভক্ষতির অনেক বাইরে চলে গেছেন।

স্ত্রীশিক্ষা ও নিবেদিতা

কল্যাণী ভট্টাচার্য

ভগিনী নিবেদিতা এমনই একজন ব্যক্তিত্ব যাঁকে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসী শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করে। দার্জিলিং-এ তাঁর স্মৃতিস্তম্ভে লেখা আছে, ''এখানে ভগিনী নিবেদিতা শান্তিতে নিদ্রিত—যিনি ভারতবর্ষকে তাঁহার সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।'' হিমালয়ের নির্জন ক্রোড়ে, শ্মশানপ্রান্তরে এই স্মৃতিফলকটি নিবেদিতার জীবনের একটি মহান সত্যকে প্রকাশ করছে। এবছর নিবেদিতার জন্মের সার্ধশতবর্ষ। মৃত্যুর পরও ১০৬ বছর কেটে গেছে, কিন্তু ভারতের মঙ্গলের জন্য তাঁর অবদান আজও ভারতবাসীর কাছে অম্লান।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শুধু নিবেদিতা নন, অন্য মহিলারাও আছেন যাঁরা বিদেশি হয়েও এ-দেশকে আপনার করে নিয়েছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যেও নিবেদিতা এক বিরল ব্যতিক্রমী। ত্যাগে, তিতিক্ষায়, সৃজনশীলতার বহুমুখীনতায় নিবেদিতা চিরকালই অনন্য।

এ-দেশের মানুষের জীবনে নিবেদিতার নানা পরিচয়। তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি বিবেকানন্দের শিষ্যা। বিবেকানন্দকে তিনি গুরু বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। গুরুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ভারতবর্ষে আসে। বিবেকানন্দ ধর্ম-জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে আর্ত দরিদ্র মানুষের সেবাব্রত গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতাও একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। গুরু বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বলেছিলেন, ''তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, এদেশের মেয়ের উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।'' নিবেদিতা গুরুবাক্যকে মেনে নিয়েছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানভাবনা ও গবেষণায় তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। অনেক সময় তিনি জগদীশচন্দ্রের লেখার অনুবাদও করেছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনেও নিবেদিতার ভূমিকাকে ভুলে থাকা যায় না। নিবেদিতা নিজেও ছিলেন শিল্পকলার উপাসক, কখনো আবার উদ্যোগী হয়ে শিল্পীকে অনুপ্রেরণা দেন। ১৯০৯ সালে সেকালের বিশিষ্ট ইংরেজ শিল্পবোদ্ধা হেরিংহ্যাম যখন এদেশে আসেন, এদেশের দুই শিল্পী নন্দলাল বসু ও অমিতকুমার হালদারকে তিনি হেরিংহ্যামের কাছে পাঠান। এ বিষয়ে তিনি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। নিবেদিতার জীবনের প্রতিটি কাজই পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। এই সব বিষয়ে বহু বিদগ্ধজন নানা আলোচনা করেছেন। নিবেদিতা শিক্ষা নিয়ে অনেক ভেবেছেন, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা বাস্তবিক পক্ষেই বিস্ময়কর।

একটা সময় ছিল যখন মেয়েদের জীবনকে অশিক্ষার অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সেই ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে যখন সবেমাত্র আলোর রেখা দেখা দিয়েছে—সেই সব দিনে অন্ধকারকে দূর করে নিবেদিতা আলোর দিশারি হতে চেয়েছেন।

উনিশ শতকের সূচনায় বাঙালি মেয়েদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। এই দুঃসহ অবস্থা দূর করবার জন্য সে-কালের সমাজসংস্কারকরা নানা

আন্দোলন করেছিলেন। এর মধ্যে সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন, কৌলীন্যপ্রথা-বিরোধী আন্দোলন, বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন, পণপ্রথা বিরোধী আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শতকের শুরুতে বাঙালি মেয়ের লেখাপড়া শেখার সুযোগ ছিল না। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো সমাজসংস্কারকরা এই অবস্থা দূর করতে চেয়েছিলেন। ১৮৪৯ সালের মে মাসে বেথুন সাহেবের উদ্যোগে কলকাতায় ভদ্রঘরের মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল। বহু বুদ্ধিজীবী বেথুনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে বেথুন স্কুল ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল। মেয়েদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দরজা উন্মুক্ত হল। এইসব স্কুল হয়তো অনেক সময় স্থায়ী হয়নি কিন্তু মেয়েদেরও যে লেখাপড়া শেখার অধিকার আছে, 'লেখাপড়া শিখলে' যে মেয়েরা বিধবা হয়না, সমাজের মধ্যে এই বোধ ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল। নিবেদিতা এদেশে আসার আগেই চন্দ্রমুখী বসু এবং কাদম্বিনী গাঙ্গুলী প্রথম দুই

স্নাতক হিসেবে সম্মানিত হন। পাঁচের দশক থেকে বাঙলি মেয়েদের লেখা বই বেরোতে শুরু করে। কৃষ্ণকামিনী দাসী, বামাসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, মার্থার, সৌদামিনী সিংহ, রাসসুন্দরী দেবী প্রমুখ বাঙালি মেয়েদের লেখা গদ্য বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন হল, এই মেয়েরা কারা? আর এই শিক্ষাই বা কী? এই মেয়েরা হল তথাকথিত ভদ্রলোক বাড়ির মুষ্টিমেয় মেয়েরা আর শিক্ষা হল নাগরিক প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা। এই মুষ্টিমেয় মেয়েদের বাইরে অগণিত মেয়েরা ছিল যারা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

১৮৯৮ সালের ১২ নভেম্বর নিবেদিতা স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর তাঁকে বহু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রথমত অর্থ সমস্যা—নিবেদিতার সঞ্চিত অর্থ সামান্য, তার সঙ্গে কাশ্মীরের মহারাজা প্রদত্ত অর্থ রয়েছে। কিন্তু একটা স্কুল চালাতে গেলে আরও অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে তিনি স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহ করতেন। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি অর্থের কথা ভেবেছেন। কী কঠোর জীবন তাঁর সামনে। বাড়িভাড়া, লোকজন রাখার খরচ, নিজের খাওয়া-দাওয়া ও একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা, স্কুল চালানো—সব খরচই তো আছে। কী পদ্ধতিতে লেখাপড়া শেখানো হবে সেটাও ভাববার বিষয়। ভারতবর্ষে আসার আগেও নিজের দেশে তিনি শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনার শুরু তখন থেকেই। পাশ্চাত্যে নতুন শিক্ষাপদ্ধতির স্রষ্টা হিসেবে 'হেস্তালৎসি'-র নাম বিখ্যাত। পেস্তালৎসির শিক্ষা-বিজ্ঞানকে আরও উন্নত করেন ফ্রবেল। সেই সময়ে, নিবেদিতা এদের অভিনব বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই দুই চিন্তাবিদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিবেদিতা নতুন একটি স্কুলে যোগদান করেন। কিন্তু এদেশে এসে নিবেদিতা দেখলেন ও-দেশের ছাত্রছাত্রীদের অবস্থার সঙ্গে এ-দেশের মেয়েদের কোনো তুলনা হয় না। স্ত্রীশিক্ষা কেমন হবে এ নিয়ে নিবেদিতার আগেও অনেকে ভেবেছেন। তাঁদের অধিকাংশই মনে করেছেন শিক্ষার ক্ষেত্রে স্ত্রীজনোচিত কিছু বিষয় থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বলেছেন, ''মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটি বিশেষত্ব আছে একথা মানিতে দোষ কী?''

নিবেদিতাও তাঁর স্কুলে বিদ্যাচর্চার সঙ্গে রঙ ও তুলির কাজ, গৃহকর্মের কাজ শেখাতেন। সেই সঙ্গে শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা শেখা দরকার বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল স্কুলে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া। শুধু ইংরাজি জানা নয়, প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা প্রয়োজন। খাস কলকাতার বুকে বাগবাজারে নিবেদিতা যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের বর্ণনা থেকে, সে সময়ে সাধারণভাবে স্ত্রীশিক্ষার যে কী হাল ছিল তা অনুমান করা যায়। নিবেদিতার জীবনীকার লিজেল রেমঁ লিখেছেন, ''গুটিকয় রোগা রোগা ছাত্রী নিয়ে নিতান্তই ছোটো বালিকা বিদ্যালয়... তারা এমন লাজুক যে তাদের দিকে তাকালে হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। কিছু যদি বলেছ অমনি মুখ ভার হয়ে চোখ জলে ভরে ওঠে... ছাত্রীরা অনিয়মিত স্কুলে আসে।''

স্কুল চালাতে গিয়ে নিবেদিতা দেখলেন, সমস্যার আর অন্ত নেই। বাল্যবিবাহ নিয়ে আন্দোলন হলেও সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ উঠে যায়নি, মেয়েরা যারা পড়তে আসে অল্প বয়সেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। লেখাপড়ার তখন সেখানেই ইতি। উপযুক্ত পাঠ্য বইয়ের অভাব তো ছিলই, কন্যাসন্তানের জন্য বই কিনে লেখাপড়া শেখাতে অভিভাবকেরা কতটা চাইতেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। নিবেদিতার স্কুলে মুখে মুখে পড়ানো হতো। সেলাই, ছবি আঁকা ও খেলাধূলাও ছিল শিক্ষার অঙ্গ।

নিবেদিতা ছাত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন। তিনি ছাত্রীদের কাছে রান্না শিখেছেন। বাগবাজার পল্লির প্রতি ঘরে ঘরে ঘুরে নিবেদিতা অভিভাবকদের কাছে করজোড়ে তাঁদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পঠাতে অনুরোধ করতেন। একজন বিদেশি, বিধর্মীর স্কুলে মেয়েদের পড়াতে অভিভাবকদের যে প্রাথমিক কুণ্ঠা ছিল নিবেদিতা ধীরে ধীরে তা দূরে সরাতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, হিন্দু মেয়েদের মধ্যে কাজ করার জন্য তাঁর নিজের হিন্দু জীবন যাপন করা প্রয়োজন। নিবেদিতা বাগবাজার পল্লির সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক র‍্যাডক্লিফ এ-সম্পর্কে লিখেছেন, ''বাগবাজার পল্লির শান্ত, গর্বিত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অধিবাসীগণের সন্দেহ দূর করিয়া ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে নিবেদিতার কতদিন লাগিয়াছিল তাহা আমার জানা নাই।... পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তিনি আশ্চর্যভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দু প্রতিবেশীগণ তাহাকে একান্তভাবে আত্মীয় জ্ঞান করিত। বাজারে, পথে, গঙ্গাতীরে প্রত্যেকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল এবং পথ দিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে তাহাকে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত গ্রহণ করিত তাহা প্রকৃতই সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী।''

আরও একটি সমস্যা ছিল : জাতপাতের সমস্যা। যে দেশে জাত-পাতের সমস্যা সমাজের সর্বস্তরে রয়েছে সেখানে একজন বিদেশিকে সেই সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে তাতে আর আশ্চর্য কী! নিবেদিতার স্কুলে 'সন্তোষিণী' বলে একটি মেয়ে পড়তে এসেছিল। মেয়েটির বাবা তাকে তার প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাত্রস্থ করতে চেয়েছিল। মেয়েটি এসে নিবেদিতার কাছে আশ্রয় চাইল। আশ্রয় তো মিলল কিন্তু অসুবিধা হল মেয়েটি যখন বলে বসল—''বামুন ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমি থাকতে পারব না।'' দিনকতক বেঁকে বসল, তারপর আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হল। আর একবার, নিবেদিতার বাড়ির জন্য কোনো পরিচারিকা পাওয়া যাচ্ছিল না। যদিও বা একটি মেয়ে পাওয়া গেল, শর্ত ছিল নিবেদিতা মেয়েটির জলস্পর্শ করতে পারবে না। পরে এই মেয়েটিও নিবেদিতার খাওয়া বাসন ধুয়ে দিত। নিবেদিতা প্রথম যেবার তাঁর স্কুলে সরস্বতী পুজো করলেন সেবার সরস্বতীকে শুকনো ফল দিয়ে পুজো করা হয়েছিল। কিন্তু পরের বার সরস্বতী পুজোয় ছাত্রীরা উদ্যোগ নিয়ে লুচি তরকারি ভোগ দিল। নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন একটু দূরে ছিলেন পাছে ছাত্রীদের সংস্কারে আঘাত লাগে। কিন্তু ছাত্রীরাই জোর করে দুই সিস্টারকে নিয়ে এক সঙ্গে প্রসাদ খেল।

সবচাইতে বড় সমস্যা ছিল শিক্ষয়িত্রীর সমস্যা। যেখানে মেয়েদের বাল্যবিবাহ হয়, লেখাপড়া শেখানোই যেখানে সমস্যা, সেখানে শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যাবে কী করে? এই সমস্যার সমাধান করবার জন্য নিবেদিতা বালবিধবাদের আবাসিক করে নিতে চাইলেন।

বালবিধবাদের লেখাপড়া শিখিয়ে তিনি শিক্ষয়িত্রী করতে চাইলেন। এর ফলে এই সমস্যা একটু কমলো।

নিবেদিতার পত্রাবলী পড়লে মনে হয়, তিনি বোধ হয় আর্থিক দায়িত্ব ছাড়া সব দায়িত্বই ক্রিস্টিনকে দিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, ক্রিস্টিন থাকলেও নিবেদিতাই সব দায়িত্ব নিতেন। স্কুলটি ছিল নিবেদিতার প্রাণের থেকেও প্রিয়। ক্রিস্টিন আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর নিবেদিতা স্কুলের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন সন্তোষিণী, সুধীরাদের হাতে। প্রথম দফায় নিবেদিতা এদের ব্রহ্মচারিণী হিসেবে তৈরি করেছিলেন। এরাই স্কুলটিতে হিন্দুজীবনের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলে প্রতিষ্ঠিত করলেন। যে-সমস্ত বালবিধবারা নিবেদিতার স্কুলে ভর্তি হয়েছিল তারা নিবেদিতার কাছে আশ্রয় পেয়েছিল, তাদের দিকে তিনি বিশেষ নজর রাখতেন। তাঁর উইলেও তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ তিনি ভারতীয় নারীদের মধ্যে জাতীয় প্রণালীতে জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের জন্য ব্যয় করবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

নিবেদিতা শিক্ষা নিয়ে অনেক ভেবেছেন। তাঁর রচিত সমগ্র রচনাবলীর দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, বহু প্রবন্ধে তিনি মেয়েদের কথা লিখেছেন এবং শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনার পরিচয় রেখেছেন। 'The Present Position of Women', 'The Future Education of Indian Women', 'Women in Modern India,' 'Modern Education of the Oriental Women' প্রভৃতি লেখাগুলির মধ্যে নিবেদিতার মেয়েদের নিয়ে ভাবনার, বিশেষ করে ভারতীয় মেয়েদের নিয়ে ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা হবে মূলত শিকড়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ''We must give Indian girls their own colour.'' একজন ভারতীয় মেয়ের ফরাসি শেখা অথবা পিয়ানো বাজানো শেখার থেকে ভারতীয় ঐতিহ্য শেখা বেশি প্রয়োজন। বিবেকানন্দের নারীভাবনার মূল লক্ষ্য ছিল মেয়েদের শিক্ষিত করা। মেয়েরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মেটাতে পারবে। বিবেকানন্দের মতোই নিবেদিতাও মনে করতেন ভারতীয় নারীর আদর্শ হল সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। শিক্ষা সম্পর্কে নিবেদিতার ধারণা ছিল 'True teaching is always self-teaching.'। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অথবা ডিগ্রি অর্জন করাকেই তিনি একমাত্র শিক্ষা বলে মনে করতেন না। সেকালে অনেকেই ডিগ্রি অর্জন না করেও রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ কাহিনি ইত্যাদি শুনে শুনে শিক্ষালাভ করতেন। বহমান এই শিক্ষার ধারাটির প্রতিও নিবেদিতার বিশ্বাস ছিল। ভারতবর্ষের নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশ্রণ প্রয়োজন। অথচ ইংরেজি শিক্ষা অথবা বিজ্ঞান শিক্ষাকে তিনি অপ্রয়োজনীয় মনে করেননি। সেই সঙ্গে আমাদের দেশের রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ ইত্যাদির মধ্যে যে শিক্ষা ছিল তাকেও প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। নিবেদিতার স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক ভাবনায় তাঁর গুরুর প্রভাব অপরিসীম। বস্তুত বিবেকানন্দ যতদিন জীবিত ছিলেন বিবেদিতা সব সময়েই গুরুর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। বিবেকানন্দ মনে করতেন কোনো দেশের উন্নতি কেবলমাত্র পুরুষদের ওপর নির্ভর করে না। নারী-পুরুষের সমানভাবে উন্নতি না হলে একটি সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। ''এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।'' নিবেদিতার মধ্যেও আমরা গুরুবাক্যের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

সবশেষে এদেশে নারী-শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে নিবেদিতার আরও একটি প্রচেষ্টা উল্লেখ করা যায়। ১৯০২ সালের ২ নভেম্বর নিবেদিতা বয়স্ক মহিলাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় খুললেন। এখানে ক্রিস্টিন সেলাই শেখাতেন আর জগদীশচন্দ্রের বোন লাবণ্যপ্রভা পড়ানোর ভার নিলেন। ছাত্রীরা সবাই প্রাচীনপন্থী পরিবারের কন্যা বা বধূ। এখানে যে শুধু সেলাই বা বাংলা শেখানো হতো তা নয়, ইংরেজি শেখানোর ব্যবস্থাও ছিল। তখনকার দিনে বিবাহিত মেয়েরা বাইরে পা দিয়ে বিদ্যার্জন করছেন, এ ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটি একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। নারী-জাগরণের সঙ্গে নারীশিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যতক্ষণ পর্যন্ত মেয়েরা শিক্ষিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না। শিক্ষার অধিকার-বঞ্চিত মানুষ জানেই না কী সে হারাচ্ছে আর কী করেই বা তাকে লাভ করা যায়। নিবেদিতা মেয়েদের সেই দৃষ্টি মেলে দিতে সাহায্য করেছেন। নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি আজ 'নিবেদিতা বিদ্যালয়' নামে বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আজ স্বাধীন ভারতে মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। মেয়েদের শিক্ষিত করবার জন্য যে স্বপ্ন নিবেদিতা দেখেছিলেন, স্বপ্ন-পূরণের যে পথ তিনি নির্দেশ করেছিলেন, মেয়েদের সংগ্রামের ইতিহাসে তা পাথেয় হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র

১. প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, *ভগিনী নিবেদিতা*, নবপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি, ২০১৭

২. লিজেল রেমঁ (অনুবাদ : নারায়ণী দেবী), *ভারতকন্যা নিবেদিতা*, সোমলতা, জানুয়ারি ২০১৫

৩. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *নিবেদিতা লোকমাতা*, আনন্দ পাবলিশার্স, আশ্বিন, ১৪১৬ ব.

৪. দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত, *নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র : এক অচেনা সম্পর্কের সন্ধান*, গাঙচিল, জানুয়ারি, ২০১০

৫. দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত, *নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ : এক বিতর্কিত সম্পর্কের উন্মোচন*, গাঙচিল, জানুয়ারি, ২০০৮

With best compliments of

DEBIDAS SHARMA

CEMENT DEALER

Birla, Ambuja, Lafarge, Concreto, ACC

Mob. 8116887050, 9332673011

Sl. No. 120

With best compliments of

OVER 30 YEARS RESPONSIBLE SERVICE

WORMS & INSECT CONTROL

Govt. Authorised Pest Controller

Specialist in :
Soil Treatment, Whiteants & Insecticidal Treatment
Rodent & Mosquito Control Fumigation Roof Treatment etc.

H.O. : 27, G.T. Road, Lower Chelidanga, Asansol-4, Dist. Burdwan
Resi. : Kalyanpur Housing Estate, Asansol-4, Dist. Burdwan. Mob. 9333109597

Sl. No. 76

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ পানাগড় বাজার, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, ডাক সূচক : ৭১৩১৪৮
দূরভাষ : (০৩৪৩) ২৫২৪৩০৭

জনগণকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামোন্নয়নে, ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এগিয়ে চলেছে। জনগণের পরামর্শ এবং গঠনমূলক সমালোচনা পঞ্চায়েতের প্রাণশক্তি। পরিচ্ছন্নতা, সুস্বাস্থ্যের প্রাথমিক শর্ত। নিজ গৃহ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিষ্কার রাখুন। নির্মল বাংলা গঠনে সহায়তা করুন।

মহঃ মুরশিদ আলি
উপপ্রধান

কাজল বাউরী
প্রধান

Sl. No. 22

নিবেদিতা ও সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

গৌতম রায়

১৯০০ এবং ১৯০১ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন সেগুলির ভেতর থেকে তাঁর ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্পর্কে মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। রাজনীতির সঙ্গে যখন তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, সেই পর্যায়কালে কৌশলগত কারণেই রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্যপদ থেকেও তিনি স্পষ্টতই দূরত্ব রচনা করেন। যদিও প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় আন্দোলনের কোনো ধারার সঙ্গে সংশ্রব না থাকলেও পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি রামকৃষ্ণ মিশন কোনোদিন গোপন রাখেনি। এজন্য মিশনকে কতখানি রাজরোষে পড়তে হয়েছিল টেগার্টের রিপোর্টই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। দেবব্রত, শচীন প্রমুখ বিপ্লবীরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ থেকে সরে এসে পরবর্তীকালে মিশনে যোগ দেন। ফলে ব্রিটিশের সন্দেহ আরও তীব্র হয়।

মিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিন্ন করবার পর জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থী—উভয় গোষ্ঠীর নেতৃত্বের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সংযোগ তৈরি হয়েছিল নিবেদিতার। তবে বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রতি বুঝি বা অতিরিক্তই পক্ষপাতিত্ব ছিল তাঁর। তরুণ সম্প্রদায়ের ভিতর দেশপ্রেমের আগুন জ্বালাতে নিবেদিতা তাঁর গুরু বিবেকানন্দর বাণীকে অবলম্বন করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই সময়ে বহু অগ্নিময়ী বক্তৃতা করেন। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকেও অনুপ্রাণিত করবার ক্ষেত্রে এই সময়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন নিবেদিতা। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে এই সময়কালে নিবেদিতার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সমিতির নানা গোপন সভা-সমিতিতে তখন নিবেদিতার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। অনুশীলন সমিতির ছত্রছায়ায় থাকা বহু তরুণকে এই সময়কালে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করবার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন নিবেদিতা। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাতেই যে এদেশের একমাত্র মুক্তি সম্ভব—একথা নিবেদিতা মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন বলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখে গেছেন। (উদ্বোধন, ১৩৩৫ ব., পৃ. ২০)

স্বামীজির মানসকন্যা নিবেদিতার পত্রাবলী একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বোঝা যায় যে, বিবেকানন্দের মানসলোকে যে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার স্বপ্ন বিরাজমান ছিল, তাকে বাস্তবায়িত করার প্রয়াসে নিবেদিতা আত্মনিবেদিত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে প্রয়োজন হলে সশস্ত্র সংগ্রামের পথই একমাত্র পথ হয়ে উঠুক—এ ব্যাপারে তাঁর পত্রাবলীর ভিতর দিয়ে খুব পরিচ্ছন্ন ভাবেই নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। কোনো কোনো স্তর থেকে পরবর্তীকালে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—তার কোনো প্রমাণ নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে (ভগিনী নিবেদিতা, প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, পৃ. ২৭০)। এ ধরনের

উক্তি সম্পূর্ণভাবে অনৈতিহাসিক। প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর অসামান্য গবেষণা 'নিবেদিতা লোকমাতা'-তে দেখিয়েছেন যে, আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবী ধারার সঙ্গে কতখানি একাত্ম সংযোগ নিবেদিতার ছিল। একথা ভাবলে খুবই খারাপ লাগে যে, অরবিন্দ ঘোষের মতো বিপ্লবীও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব হিসেবে মেলে ধরতে নিবেদিতার ঐতিহাসিক ভূমিকাকে যথেষ্ট খাটো করে দেখিয়েছেন।

মাতৃভূমিতে প্রথম জীবনে নিবেদিতার ভিতরে যে বৈপ্লবিক স্ফুলিঙ্গ ছিল তা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে। অনেক বিপ্লবী তাঁকে সেই সময়ের চরমপন্থীদের ভিতরেও চরমপন্থী বলে মন্তব্য করেছিলেন (শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, পৃ. ৩২৬)। স্বামীজির দেহাবসানের পর সুরেন্দ্রনাথ হালদারের যোগাযোগের ভিতর দিয়ে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার পি মিত্র এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ তৈরি হয়েছিল। এই সময়কালে ব্রিটিশের বহু ষড়যন্ত্রেরও শিকার নিবেদিতাকে হতে হয়েছিল। গ্রেপ্তারি এড়াতে বিদেশ থেকে ফেরার পথে জাহাজে তাঁকে ছদ্মবেশ পর্যন্ত ধারণ করতে হয়েছিল। নিবেদিতাকে এই ছদ্মবেশ সম্পর্কে অনেক পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর পরম হিতাকাঙ্ক্ষী জগদীশচন্দ্র বসু।

জগদীশচন্দ্র বসু ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। এই

সময়কাল থকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চাতে রত ছিলেন এবং তাঁর গবেষণাকর্মে নিবেদিতা বিশেষ রকম সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে রামকৃষ্ণ মিশন বা তাঁদের ভাবানুরাগী সারদা মঠ ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সশস্ত্রধারার সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগকে খানিকটা অস্বীকার করতে চাইলেও (মুক্তিপ্রাণা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ) বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ খুব স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে, অরবিন্দ ঘোষ বরোদাতে শিক্ষকতা করার সময় সেখানে নিবেদিতার ভ্রমণকে কেন্দ্র করে অরবিন্দ এবং তাঁর বিপ্লবী অনুরাগীদের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে উঠেছিল। (গিরিজাশঙ্করের পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ২৮৩)। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ খুব স্পষ্ট ভাষাতেই লিখে গেছেন যে, ভগিনী নিবেদিতা চরমপন্থী নেতা হিসেবে শ্রীঅরবিন্দের অগ্রগামী, (অগ্নিযুগ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮৫)। বস্তুত নিবেদিতার অনুরোধেই ধর্ম ও কর্মযোগিনের কাজ অসমাপ্ত রেখে অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তারি এড়াতে চন্দননগরের পথে পণ্ডিচেরী চলে গিয়েছিলেন।

বাংলার বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সেই সময়ে নিবিড় সম্পর্ক ছিল নিবেদিতার। বারীন ঘোষ লিখেছেন, ''একাধিকবার তাঁর কাছে গুপ্তচক্রের কাজে গিয়ে বাগবাজারের স্কুলবাড়িতে দেখা করেছি।... নিবেদিতার প্রদত্ত লাইব্রেরিই ১০৮নং আপার সার্কুলার রোডের চক্রের ছিল প্রাণ প্রেরণার উৎসমূল।" (তদেব, পৃ. ৬৫) কেবলমাত্র অনুশীলন সমিতিই নয়, যুগান্তর দলের সঙ্গেও যে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তা বোঝা যায় বারীন ঘোষের ০৪-০৫-১৯৫২ তারিখে লেখা একটি চিঠির ভেতর দিয়ে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অক্লান্তভাবে ঘুরে ঘুরে নিবেদিতা যে গুপ্ত বিপ্লবী দলের জন্য সদস্য সংগ্রহ করতেন সেকথা স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ স্বীকার করে গিয়েছেন।

শ্রীমতী ওলি বুলকে নিবেদিতা ১৯০৬ সালের ২মে লিখেছিলেন, ''...এখানে তিন সপ্তাহ ধরে রিক্রুট করছি, এবং কয়েকদিনের মধ্যে কাজ আরম্ভ করার আশা রাখি।" এই সময়কালে পূর্ববঙ্গের বরিশালেও গুপ্ত সমিতির সদস্য সংগ্রহের জন্য যাওয়ার কথা ছিল নিবেদিতার। সেই সময় বরিশালে জাতীয় কংগ্রেসের যে প্রাদেশিক সম্মেলন হয় তাতে চরমপন্থী আর নরমপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ হয়েছিল। সেই পরিবেশের কারণেই যে তখন আর তিনি বরিশালে যাননি তা শ্রীমতী বুলকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। সেই সময়কালে বিপ্লবী সমিতিতে কর্মী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিতা কী কী কৌশল অবলম্বন করতেন তার একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ রেখে গিয়েছেন নিবেদিতার বিশেষ অনুগামী নাগপুরের সি ইউ দেশমুখ।

কেবলমাত্র বাংলার বাইরে নয়, বাংলার ভেতরেও এই গুপ্ত সমিতির কর্মী সংগ্রহের কাজে কী কঠোর পরিশ্রম নিবেদিতা করতেন তার একটি বিবরণ তাঁরই ১৯০৩ সালের ২০ মে-র লেখা থেকে আমরা পাই। এই সময়কালে তিনি গোটা মেদিনীপুর চষে বেড়িয়েছিলেন কর্মী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তিনি লিখেছেন, ''মনে হয়, মেদিনীপরে কাজের কিছুটা ফল হয়েছে।" এই কাজের ফলই কি ক্ষুদিরাম? ক্ষুদিরামের প্রথম জীবনের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না তথ্যনিষ্ঠভাবে। তবে জ্ঞান বসু, নিরাপদ রায়, সত্যেন বসু, হেমচন্দ্র কানুনগো—মেদিনীপুরের এইসব সন্তানরা এই সময়কালে যেভাবে ধারাবাহিকতার সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেন তাতে এই ভাবনাকে একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, ভগিনী নিবেদিতার ১৯০৩ সালের মেদিনীপুরে কর্মী সংগ্রহের সফরের অন্যতম ফসল ছিলেন ক্ষুদিরাম। বিশেষ করে পরবর্তী সময়ে যখন আমরা দেখি হেমচন্দ্র কানুনগো লিখছেন—''She (Nivedita) was a staunch advocae of swadeshi movement, adopted Bandemataram as national cry. She tourned several parts of Bengal and lectured on Swadeshi movement. In 1903 she went to Midnapore, delivered lectures on politics through the medium of religion continually for five days attracting thereby increasing number of audience. She encouraged the society by personal demonstration of short play and other atheletic exercises, presented the works of Mazzini and Prince Kropotkin,'' (Account of Revolutionary Movement in Bengal by Hemchandra Kanungo. এখানে উদ্ধৃত করা হল Ramkrishna Mission, Paper No. 45, Freedom Movement Papers থেকে। হেমচন্দ্রের মূল বই 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'-তে এই নিবেদিতা অংশটি কেন যে নেই তা আজও রহস্যাবৃত)।

হেমচন্দ্রের এই মূল্যয়ান থেকেই এই অনুমান আশা করি কষ্টকল্পনা হবে না যে ১৯০৩ সালে নিবেদিতার মেদিনীপুর সফরের প্রভাব কোনো না কোনোভাবে ক্ষুদিরামের ওপরেও পড়েছিল।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যুবসমাজকে ঔপনিবেশিক শাসনের কদর্যতা বোঝাতে নিবেদিতা যে সফর করছিলেন তার অঙ্গ হিসেবে তিনি ১৯০৪ সালের জানুয়ারি মাসে পাটনা যান। বিহার থেকে প্রকাশিত 'হেরল্ড' পত্রিকা নিবেদিতার এই বিহার সফর সম্পর্কে লেখে—''নিবেদিতা হিন্দুধর্মের সূক্ষ্ম জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যার ভিতরে একটিবারের জন্যেও প্রবেশ করেননি। ভারতবর্ষের মানুষ কীভাবে একটি যথার্থ জাতি হিসেবে সঠিক পদ্ধতিতে প্রগতিশীল ভাবনার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে—তারই বাস্তব দিকনির্দেশ তিনি তাঁর বিহার সফরের যাবতীয় বক্তৃতাবলীকে বিস্তৃত করেছিলেন।" পাটনার সভাতে ভগিনী নিবেদিতা বলেন, ''আমি যদি দেখি বালকদের মুখে অপরিসীম শান্তি বিরাজ করছে, তাহলে কিন্তু শান্তি পাবো না। দুঃখই পাবো। বালকেরা, আমি চাই, তোমরা নিজেদের ভিতরে মল্লযুদ্ধ করো। তরবারি চালানো অভ্যাস করো। বক্সিং অভ্যাস করো। আমি চাই শক্তিধর পুরুষ। কোনো রকম শান্তশিষ্ট গোবেচারা লোক আমি একেবারের জন্যও চাই না।"

নিবেদিতা খুব স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন, ''লড়াই যে করতে পারে, সেই হলো বীর। লড়তে যে ভালোবাসে সে-ই হল বীর। লড়াই করো, লড়াই করো, কেবলমাত্র লড়াই করো। তবে সব সময়ে মনে রাখবে—লড়াইতে যেন নীচতা বা তিক্ততা না থাকে। সংগ্রামের ডাক যখন আসবে—তখন যেন ঘুমিয়ে থেকো না।" (নিবেদিতা রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৩৩-৩৪)

নিবেদিতা কেবলমাত্র ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করবার কাজের ভিতরেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি নিজেও একটি বিপ্লবী দল পরিচালনা করতেন—সেই বিষয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। যদিও বিপ্লবী দলের রীতিনীতি অনুযায়ী তাঁদের কোনো প্রামাণ্য নথিপত্র না রাখবার প্রবণতার কারণেই নিবেদিতার এই বিপ্লবীদলে ঠিক কতজন অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁরা কে কে—সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারা যায় না। তবে নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারা যায় যে, বিপ্লবী ইন্দ্রনাথ নন্দী একটা সময়ে তাঁর দলে ছিলেন। নিবেদিতার দলের সদস্য হিসেবেই জাপানে গিয়েছিলেন অমূল্যচন্দ্র গুপ্ত। ইনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দর অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য। অমূল্যচন্দ্রের সন্ন্যাস নাম ছিল স্বামী শঙ্করানন্দ। পরবর্তী সময়ে

তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনেরই অপর প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী সদানন্দের ভাগ্নে ছিলেন। বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন, অমূল্যচন্দ্র—বিখ্যাত বৈপ্লবিক জাতীয় সঙ্গীত 'আও মর্দানো, হিন্দু জওয়ানো, জলদি তোলো হাতিয়ার, ফৌজ করো তৈয়ার'—জাপান থেকে এনেছিলেন। গানটি লিখেছিল লখনউয়ের একটি ছেলে। তার নাম ছিল প্রসাদ। সে তখন থাকতো জাপানে। সেই গানটি ব্যাপক প্রচারলাভ করেছিল। আলিপুর বোমার মামলার সময়ে বন্দিরা এই গানটিকে ফরাসি লা মার্সেলিজ-এর ধ্যানে গাইতো। (প্যাট্রিয়ট প্রফেট, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ১১৯) রহস্যজনক কারণে স্বামী শঙ্করানন্দের নিবেদিতার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের ব্যাপারটিকে রামকৃষ্ণ মিশন এড়িয়ে যায়। শঙ্করানন্দ পরবর্তীকালে এই বিষয়ে নীরবই থেকেছেন। এমনকি প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর গ্রন্থে এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, শঙ্করানন্দ এই প্রসঙ্গটিকে আদৌ স্বীকার করেন না।

বিপ্লবী সমিতিগুলির সদস্যদের চেতনার মান উন্নয়নে নিবেদিতা খুবই যত্নবান ছিলেন। তাই বহু গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলিকে তিনি রাজনৈতিক বই দিতেন। সেই সঙ্গে দিতেন দেশ-বিদেশের বহু বিদ্রোহ-বিপ্লব সম্বন্ধীয় বই। বিপ্লবী সমিতিগুলিকে নিবেদিতার বই দেওয়ার অনেক বিবরণ পাওয়া যায় বারীন ঘোষের নানা স্মৃতিচারণ থেকে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন—''জোসেফ মাৎসিনীর আত্মজীবনীর প্রথমখণ্ড বিপ্লবী দলকে দিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। সেই বইটি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বইটির ভিতরে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল এবং পরিকল্পনার সুলুকসন্ধান ছিল। এইসব বইপত্তর আমি গচ্ছিত রেখেছিলাম আমাদেরই সহকর্মী কেশবচন্দ্র গুপ্তের (ইনি স্বামী শঙ্করানন্দের বড়ো ভাই) কাছে। কেশব আলিপুর বোমার মামলার সময়ে আত্মগোপন করবার আগে অন্যদের কাছে বইগুলি রেখে গিয়েছিল। গোটা দেশব্যাপী পুলিশের তল্লাশির ফলে এক এক করে বইগুলি বেরিয়ে যায়। এই সময়ে নিবেদিতাই বলতেন, আমার বইগুলো সব এক এক করে আবির্ভূত হচ্ছে।'' (ভূপেন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত বই, পৃ. ১১৯)

অরবিন্দ ঘোষের পরবর্তী সময়ে বাংলার সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী নেতা হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইতিহাসে যিনি 'বাঘাযতীন' হিসেবে খ্যাত। বাঘাযতীনের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল ১৮৯৯ সাল থেকে। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যাদি রয়েছে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫-১৭)। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখার্জির প্রবন্ধ 'স্বামীজী, নিবেদিতা, যতীন মুখার্জী' অবলম্বনে খুব স্পষ্টভাবেই বলতে পারা যায় যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবী ধারার সঙ্গে কেবলমাত্র নিবেদিতা নয়, তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ সংযোগ ও সম্পর্ক ছিল।

নিবেদিতার সঙ্গে বাঘাযতীনের প্রথম পরিচয় প্রলয়ঙ্করী প্লেগের সময়। সেই পরিচয়ের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। বাঘাযতীনের পুত্র তেজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার এক চিঠিতে ১৯৫৬ সালের ৭ জুলাই লিখেছিলেন, বাঘাযতীন গোপনে বহুবার মিলিত হয়েছিলেন বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, ব্যারিস্টার পি মিত্র, সতীশ মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে। স্বামীজি, নিবেদিতা, ব্রহ্মবান্ধব, পি মিত্র, সতীশ মুখার্জী প্রমুখের সঙ্গে বাঘাযতীনের ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা ভূপতি মজুমদার খুব জোরের সঙ্গেই বলে গিয়েছেন। ব্রিটিশের অত্যাচারে আত্মগোপনকালে চন্দননগরের গোন্দলপাড়াতে অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে স্বামীজি ও নিবেদিতার সঙ্গে বাঘাযতীনের ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা ভূপতি মজুমদার আরও স্পষ্টভাবে জেনেছিলেন। বাঘাযতীনের প্রথম বিপ্লবী শিষ্য ভবভূষণ মিত্র ও বাঘাযতীনের সঙ্গে নিবেদিতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং তাঁর ওপর নিবেদিতার প্রভাব বিষয়ে পরবর্তীতে অনেক তথ্য দিয়েছেন। যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম হয় 'বাঘাযতীন', সেই একটা ছোট্ট ছোরা নিয়ে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঘ মারবার পর ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিবেদিতার কাছে বাঘাযতীনের শিষ্য ভবভূষণ মিত্রও বেশ কয়েকবার গিয়েছিলেন। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, এই ভবভূষণ মিত্র ছাড়াও বাঘাযতীনের অন্যতম শিষ্য কুঞ্জলাল সাহা (ইনি মানিকতলা বোমার মামলাতে ধরা পড়েছিলেন) এবং সতীশ মজুমদার নিয়মিত বেলুড় মঠে যেতেন। (Freedom Movement Papers, No. 45, State Archive, West Bengal)

একদা রামকৃষ্ণ মিশনের এক ব্রহ্মচারী (তাঁর নাম ছিল শঙ্কর) বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে স্বামীজির প্রভাব বিষয়ে প্রবীণ বিপ্লবীদের কিছু স্মৃতিকথা সংগ্রহ করেছিলেন। সেই স্মৃতি সংগ্রহে বাঘাযতীনের আর এক বিশিষ্ট সহকর্মী নলিনীকান্ত কর খুব পরিষ্কার ভাবেই বাঘাযতীনের সঙ্গে নিবেদিতার রাজনৈতিক সংযোগের কথা বলেছিলেন এবং ওড়িশার বাণপুরে ১৯০৮ সালে বিপ্লবীদল সংগঠিত করবার কাজে নিবেদিতাকে রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। গণেন্দ্রনাথ ছিলেন নিবেদিতার দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। ব্যক্তিগত স্তরে তিনি মা সারদামণির অন্যতম সেবক ছিলেন। শ্রীশ্রী মায়ের বহু আলোকচিত্র পরবর্তী জীবনে এই ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের ব্যবস্থাপনাতে তোলা হয়েছিল। নিবেদিতার বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে লিজের রেঁম-র সেতুবন্ধনের কাজ এই ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ নানা স্বকল্পিত অভিযোগ এনে এই গণেন্দ্রনাথকে মিশন থেকে বিতাড়িত করেন।

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

অন্নপূর্ণা হিমঘর (প্রা.) লি.

দীঘা, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 27

With best compliments of

Jawaharlal Nehru Computer Literacy Drive™

AN ISO:2015 CERTIFIED ORGANIZATION
Registered under NCT Delhi, Govt. of India

Right Choice for Bright Future

Bhedia (Chowrasta), Station Road, Aushgram, Purba Bardhaman-713126
Mob. 9800945470, 9153816785, E-mail : israil.sk2010@gmail.com, Website : www.JNCLD.in

Sl. No. 26

With best compliments of

MAA ANNAPURNA SHEET GRAH

Vill. Singerkone, Purba Bardhaman, PIN : 715122

Sl. No. 42

এক সাহিত্যিক এবং এক যোদ্ধা

রঙ্গনকান্তি জানা

ক্রিস্টোফার কডওয়েল মাত্র ২৯ বছর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুবরণ করেন স্পেনের গৃহযুদ্ধে। তাঁর আসল নাম ছিল ক্রিস্টোফার সেন্ট জন স্প্রিগ। লন্ডনের এক মধ্যবিত্ত শহরতলিতে কম জেসিকা কডওয়েল-এর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন তিনি। জন্ম ১৯০৭ সালের ২০ অক্টোবর। মা জেসিকা ছিলেন একজন প্রখ্যাত চিত্রকর। বাবা উইলিয়াম স্টানহোল স্প্রিগ ছিলেন একজন পেশাদার সাংবাদিক। ক্রিস্টোফার-রা তিন ভাইবোন। পড়াশোনা লন্ডনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সাসেক্স ও ইলিং-এর স্কুলে। তবে আর্থিক অনটনে তা বেশিদূর এগোতে পারেনি। কডওয়েল-এর জীবনে তাঁর মায়ের শিল্পপ্রবণতা বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। পাশাপাশি বাবার অনুপ্রেরণায় লাভ করেন সাংবাদিক হিসেবে লেখালেখির তালিম, বিচিত্র বিষয়ে নিবন্ধ রচনার ক্ষমতা।

আর্থিক অনটনে পড়াশোনা বন্ধ হবার পর বাবা যে পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন—'ইয়র্কশায়ার অবজারভার', সেখানে শিক্ষানবিশ সাংবাদিক হিসেবে যোগ দিলেন। যুদ্ধে মৃত্যুবরণের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর রচনা সংগ্রহের বিপুল ভাণ্ডার সম্পর্কে জানতে পারা যায়। সব রচনাই জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি, তাঁর রচনাসমূহ এইরকম—

স্প্রিগ নামাঙ্কিত বই—

Crime in Kensington (London 1933), *Fatality in Fleet Street* (London 1933), *The Perfect Alibi* (London 1934), *Great Flights* (London 1935), *The Six Queer Things* (London 1937)

কডওয়েল নামাঙ্কিত বই—

This My Hand (London 1936), *Illusion and Reality: A Study of the Sources of Poetry* (London 1937), *Studies in a Dying Culture: Introduced by J Stratchey* (London 1938), *The Crisis in Physics*, ed. and introduced by H. Levy (London 1939), *Poems*, edited by P. Beard (London 1939), *Further Studies in a Dying Culture*, edited with a preface by E. Rickword (London 1949), *The Concept of Freedom: Selection of Essays from Studies and Further, Studies and Five Chapters of the Crisis in Physics* (London 1965), *Romance and Realism*, edited and introduction by S. Hynes (USA 1970), *Studies and Further Studies in a Dying Culture* (USA 1971), *Collected Poems 1924-36*, edited and introduced by A. Young (Manchester 1986), *Scenes and Actions: Unpublished manuscripts*, edited and introduced by D. Margolies and J Dupare (London 1986)

অপ্রকাশিত রচনা—

Illusions and Reality (First typescript version with author's manuscript revisions), *Romance and Realism* (Typescript version with authors manuscript insertions), *Autograph Manuscript Notebook, Correspondence between C.St. John Sprigg and Paul and Belley Beard (1930-36), Correspondence to Brother Theo (1935-36), Communalism and Religion.*

এছাড়া আরও কিছু পাণ্ডুলিপির হদিশ পাওয়া গিয়েছে—

The Wisdom of Gautama, Heaviside, The Rock, The Way the Wind Blows, The Island, Verse and Mathematics, Heredity and Development.

একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, নাট্যকার, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক, কডওয়েল-এর লেখকজীবনের প্রথম পর্বে রাজনৈতিক মতাদর্শগত কোনো ছাপ দেখতে পাওয়া যায় না।

১৯৩৪ সাল থেকে কডওয়েল লেখালেখির পাশাপাশি লন্ডনের গ্রন্থাগারগুলোতে গভীর অধ্যয়নে নিমগ্ন হন। নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর অধ্যয়ন ওই বছরের শেষ দিকে একটা বিশেষ রূপ নিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। কডওয়েল মার্কসবাদের তত্ত্বে আকৃষ্ট হন। সোভিয়েত রাশিয়াতে যাবার জন্য তিনি রুশ ভাষা শিখতে শুরু করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর রাশিয়া যাওয়া হয়ে ওঠেনি। স্পেনের গৃহযুদ্ধে তিনি জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩৫-এর শেষের দিকে কডওয়েল কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এই সময়টি তাঁর জীবনের ব্যস্ততম অধ্যায়—রুশ কমরেডদের ইংরেজ মজদুরদের সম্পর্কে চিঠি লিখে জানাচ্ছেন। কমিউনিস্ট পার্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করছেন। কডওয়েল মার্কসবাদ ও সাহিত্য বিষয়ে পাঠ ও প্রবন্ধ রচনায়

মনোনিবেশ করছেন। একাধারে লেখা, পড়াশোনা ও ভালোলাগা তত্ত্বের আলোচনায় অংশগ্রহণ তাঁর উপলব্ধির জগৎকে সমৃদ্ধ করতে থাকে। ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে জেনারেল ফ্রোঙ্কো স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। কডওয়েল পপুলার ফ্রন্ট ও যুদ্ধ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ব্রিটিশ বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৩৬ সালের শেষদিক থেকে ব্রিটেন থেকে ভলান্টিয়ার বাহিনী স্পেনের উদ্দেশ্যে রওনা হতে শুরু করে। পপুলার ফ্রন্টের পক্ষ অবলম্বন করে চুয়ান্নটি দেশের প্রায় চল্লিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক যুদ্ধ করতে এসেছিল। স্পাকলাতওয়ালা ব্যাটেলিয়ান-এ ছিলেন কডওয়েল। ছিলেন আরও একজন বিখ্যাত মানুষ র‍্যালফ্ ফক্স। যুদ্ধে যাবার আগে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন—পার্টির কাজ, 'Illusion and Reality'-র পাণ্ডুলিপি প্রকাশক ম্যাকমিলানের হাতে তুলে দেবার আগে সংশোধন করে, পাণ্ডুলিপিকে প্রকাশযোগ্য করে তোলা। এছাড়াও আরও কয়েকটি বই। স্পেনে তিনি মেসিনগান ইনস্ট্রাকটারের দায়িত্ব পান। ব্যাটেলিয়ানের দেওয়াল পত্রিকার দায়িত্বে ছিলেন কডওয়েল। ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবকরা যুদ্ধে অংশ নেয় এবং ব্রিটিশ ব্যাটেলিয়নের বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করে। যতটুকু জানা যায়, মাদ্রিদ শহরের বাইরে সান মার্টিন রোডে মোরটা নামে একটি জায়গায় কডওয়েলের মৃত্যু হয় ওই দিনই বিকেলবেলায়। র‍্যালফ ফক্স স্পেনে নিহত হবার পরপরই 'Left Review' পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে প্রয়াণলেখ প্রকাশিত হয়। কডওয়েল সম্পর্কে 'Left Review'-তে লেখা হয় তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে। এটা সম্ভবত তাঁর 'Illusion and Reality' প্রকাশিত হবার পর। 'Left Review'-তে ১৯৩৭ সালের মে মাসের সংখ্যায় লেখা হয়—''র‍্যালফ ফক্সের মতো তিনিও বাস্তব ও বৌদ্ধিক কাজের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, তাঁর শেষ রচনায় ('Illusion and Reality') তিনি সৃজনশীল সাহিত্যের মার্কসীয় বিশ্লেষণ করেছেন।'' 'Left Review'-এর জুলাই সংখ্যায় (১৯৩৭) Douglas Garman-লিখিত কডওয়েলের শেষ বইটির সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'Testament of a Revolutionary' শিরোনামে।

কডওয়েল খুব অল্প বয়স থেকে কবিতা লিখেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্কুলের বন্ধু পল বেয়ার্ড পাণ্ডুলিপি থেকে কবিতাগুলি সংগ্রহ করে ছাপতে দেন। বইটি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সংগ্রহটিতে—'একটি এপিটাফ' ছাড়া ছিল, The Hair, Hymn to Philosophy, Tierra Del Fuego, Was it?, Donne's Reverie, The Sones of Ruskin, Classic Encounter, The Progress of Poetry, Essay on Free Will, The Coal, Twenty Sonnets of Wm Smith, The Art of Dying, On a Public School Anthology, On a Dead Cat, In the Aegean, Epigram on Dryden। এছাড়া ছিল Orestes নামে একটি কাব্যনাটক। কডওয়েল যে-সময় কাব্যরচনায় মগ্ন সেই সময় ইংরেজি কবিতায় বিশেষভাবে রাজত্ব করছেন টি. এস এলিঅট, অডেন, স্পেন্ডার, ডি. লুইয়িথ। কডওয়েল কবিতা রচনা করেছিলেন ঠিকই তবে কাব্যশৈলীর মানোন্নয়নে তাঁর অভিনিবেশের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। আসলে মনে হয় নানা রকম কাজে ব্যস্ত জীবন কডওয়েলের কাব্যিক মানোন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কডওয়েলের কথাসাহিত্যে গল্পে-উপন্যাসের মধ্যে কয়েকটি সাহিত্য আলোচনায় জায়গা করে নেয়। একমাত্র মননশীল উপন্যাস 'This My Hand', ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের মূল চরিত্র একটি হিংসাশ্রয়ী মানুষ। খুন করা তার স্বভাব। খুন করা হত সেই সব মেয়েদের, যারা মানসিকতার তাগিদে লোকটির কাছাকাছি এসে পড়ত। মনস্তত্ত্ব নিয়ে পাঠগ্রহণ করা কডওয়েল সেই আখ্যান রচনায় খুব যত্নশীল ছিলেন বলে মনে হয় না। 'থ্রিলার' ও মনস্তত্ত্ব চর্চা দুয়ের মধ্যে অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। এই উপন্যাসে কডওয়েলের কোনো দিক্‌দর্শিতা নেই, আবার নেই কোনো অর্থবহ উত্তরণের পথ। কোনো পাঠকের পক্ষে এই আখ্যানে কোনটা সহানুভূতিযোগ্য বা নিন্দাযোগ্য তা খুঁজে বার করা দুষ্কর কাজ। এই আখ্যানে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংশ্লেষের প্রয়াস খুবই দুর্বলভাবে চিত্রিত। এছাড়াও কডওয়েল অনেকগুলি গল্প, উপন্যাস রচনা করেন, তবে সেগুলিতে সমকালীন সামাজিক সংবেদনশীলতার অভাব বাস্তবিক ভাবে নজরে আসে। যদিও কডওয়েলের সাহিত্যচর্চা নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য আলোচনা দৃষ্টিগোচর হয় না।

গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে শিল্পসাহিত্যের ব্যাখ্যামূলক রচনা 'Illusion and Reality'। কডওয়েলের এই রচনাটি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। বইটির বিষয়বস্তুর অনুসন্ধানে দেখা যায়—তাঁর জীবনী বিষয়ক নোট ও ভূমিকা বাদে বারোটি অধ্যায় এবং গ্রন্থপঞ্জি ও ইনডেক্স। বারোটি বিষয় যথাক্রমে—The Birth of Poetry; The Death of Mythology; The Development of Modern Poetry; English Poets : (i) Primitive Accumulation, (ii) The Industrial Revolution, (iii) Decline of Capitalism; The Characteristics of Poetry; The World and I; The Psyche and Phantasy; Poetry's Dream Work; The Organisation of the Arts; The Future of Poetry। উপরোক্ত বিষয়গুলির শিরোনাম থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না বইটি কবিতা ও তার উৎসকে প্রতিপাদ্য করে রচনা করা। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এই বই-এর মূল ভিত্তি। যেখানে যান্ত্রিক বস্তুবাদ নয়, ভাববাদ নয়, মার্কস-কথিত বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্ক, তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ, শ্রেণিসচেতনতা, সমাজের অবশিষ্ট অচেতন অংশের সঙ্গে বিচ্ছেদ, বাস্তব জীবন, বাস্তব জীবনযাত্রার তত্ত্ব—এই সবের নিরিখে শিল্প ও কবিতার বিচারই মূল প্রতিপাদ্য। বারোটি পরিচ্ছেদের—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়তে আছে কাব্যের জন্ম, পুরাণের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আধুনিক কাব্যের উদ্ভব বিষয়ে আলোচনা, সমাজ ও মানুষে বাস্তব পারস্পরিক সম্পর্কের বিশদ বিশ্লেষণ। এছাড়া আলোচিত হয়েছে কবি মানসের সঙ্গে অলীক কল্পনাজগতের সম্পর্ক, স্বপ্নের সঙ্গে কাব্যের সাদৃশ্য ও দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে কাব্যের ভবিষ্যৎ।

তরুণ এই কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক এবং সর্বোপরি এক কমিউনিস্ট যোদ্ধা ক্রিস্টোফার কডওয়েল (১৯০৭-১৯৩৭) তাঁর অগ্রগতিময় চিন্তাপথে তাঁর সৃষ্টিতে দেখিয়ে দিয়েছেন সচেতনতা ও সংশয়হীনতা।

তথ্যসূত্র

১. Christopher Caudwell, *Illusion and Reality: A Study of the Sources of Poetry*, New Delhi, 1956
২. Robert Sullivan, *Christopher Caudwell*, London, 1987
৩. যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, *কডওয়েল ও মার্কসবাদ*, 'নতুন সাহিত্য' দ্বিতীয় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, কলকাতা
৪. বিনয় ঘোষ, *নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা*, ১৯৮১, কলকাতা
৫. সুজিত ঘোষ, 'কডওয়েল বিতর্ক', *জলার্ক*, মাঘ ১৩৯৫-আষাঢ় ১৩৯৬, কলকাতা
৬. রবিন পাল, *ইলিউশন অ্যান্ড রিয়ালিটি, ক্রিস্টোফার কডওয়েল : চর্চা ও পাঠ*, ২০১২

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও খ্রিস্টান মিশনারি সম্প্রদায়

সর্বজিৎ যশ

রাজা রামমোহন রায়ের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি এমন একটি ধর্মীয় উপাসনারীতি চালু করার চেষ্টা করেন যাতে যে-কোনো ধর্মের লোক যোগ দিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতার, উদার, চিন্তাশীল সংস্কার প্রবর্তন করতে প্রয়াসী কতিপয় ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন। এর দ্বারা তিনি কোনো স্বতন্ত্র ধর্ম স্থাপন করেননি। তিনি ভারতীয় রীতিতে নিরাকার উপাসনা ব্যবস্থায় উদ্যোগী হন। এই সভায় বেদান্ত ধর্মের বিচার ও ব্যাখ্যা হতো। আত্মীয় সভার মাধ্যমে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট তিনি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে নিরাকার উপাসনারীতি প্রচারের জন্য একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানটির নাম দেন 'ব্রাহ্ম সমাজ'।[১] সমাজ অর্থে এখানে একটি গোষ্ঠীকে বোঝায়, কোনো ধর্মকে বোঝায় না। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে রচিত ব্রাহ্ম সমাজের 'ট্রাস্ট ডিড' অনুসারে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল দুটি—প্রথমত, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের জন্য ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়ত, লোকহিত। কেনেথ জোনস্-এর মতে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনকে acculturative movement (অপর সভ্যতা থেকে প্রথাদি গ্রহণের ধারা) বলা চলে। কেনেথ জোনস্ মনে করেন যে এই আন্দোলনের ফলে সৃষ্টি হয় এক নতুন হিন্দুবাদের এবং এটি সেই সমস্ত শিক্ষিত এলিটদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করেছিল, যাঁরা দেশীয় হিন্দু এবং অনুপ্রবিষ্ট পশ্চিমি সভ্যতার টানাপোড়েনে পড়েছিলেন।[২]

রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজকে প্রকৃত ধর্মীয় সমাজে পরিণত করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে এটিকে নতুন ধর্মে রূপান্তরিত করেন। তাই তাঁর নাম দিলেন 'ব্রাহ্মধর্ম'। শুধু তাই নয়, এই নতুন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের একটি বিধিও তিনি রচনা করেন। সেই বিধি অনুসারে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর তাঁর কুড়িজন বন্ধু, আত্মীয় সহ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এর পূর্বে তিনি ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করেন। এই সভার প্রধান কাজ ছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করা এবং প্রাচীন উপনিষদের শিক্ষা প্রসারে সচেষ্ট হওয়া। অত্যন্ত দ্রুত তত্ত্ববোধিনী সভার বিকাশ ঘটতে থাকে। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে সভার সদস্যসংখ্যা ১০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০-র অধিক হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম থেকেই তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এবং অচিরেই

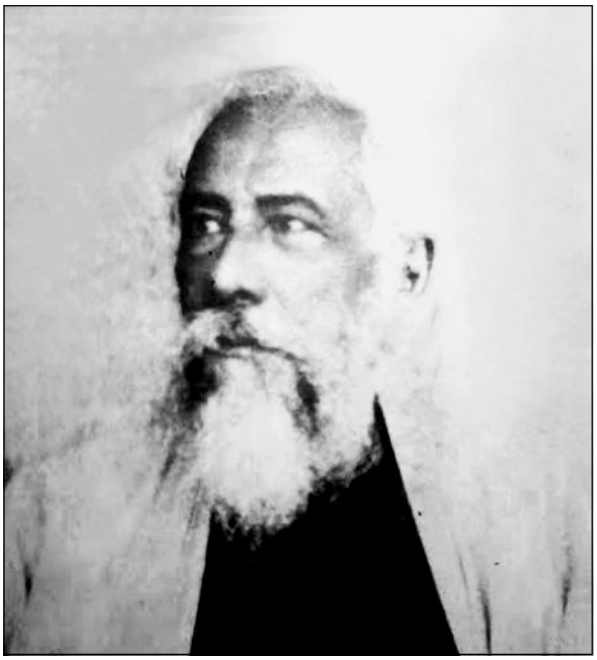

দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রচার-সংঘে পরিণত হয়। যোগেশচন্দ্র বাগল 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এবং 'সমকালীন বাংলার প্রগতি'কে সমার্থক হিসেবে বর্ণনা করেন।[৩]

ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে দেবেন্দ্রনাথ যে কেবলমাত্র রামমোহনের ধর্মীয় মিশনকেই অব্যাহত রেখেছিলেন তাই নয়, তার সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মবিরোধী অতি উগ্র যাবতীয় প্রবণতার এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিরোধী প্রচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচারের, বিজ্ঞান শিক্ষার, ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা এবং অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিল। পত্রিকায় বাংলার বৃহত্তর গ্রামীণ জীবনের নানাবিধ সমস্যা এবং দরিদ্র রায়তের ওপর অভিজাত ভূস্বামীর নির্যাতনের দিকটি বিশেষভাবে তুলে ধরা হতো। শুধু তাই নয়, অভ্যন্তরীণ শিল্পবাণিজ্যের বিকাশ এবং সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপরেও এই পত্রিকায় গুরুত্ব দান করা হতো।

উল্লেখযোগ্য যে এতদিন পর্যন্ত ব্রাহ্ম আন্দোলন মূলত কলকাতা মহানগরীতেই আবদ্ধ ছিল, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দৌলতে অচিরেই তা কলকাতার সীমা অতিক্রম করে বেশ কিছু শহর-নগরে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুত দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্ম আন্দোলনের যে দ্রুত প্রসার ঘটেছিল, তা ইতিপূর্বে ঘটেনি।[৪]

দেবেন্দ্রনাথ সর্বদা এদেশে খ্রিস্টান নিশনারিদের খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিরোধিতা করে গেছেন। ১৭৮১ শকাব্দে খ্রিস্টানগণ মেদিনীপুরে খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু করেন, সে বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে পত্রে লেখেন—''খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকেরা এতদিন পরে মেদিনীপুর আক্রমণ করিয়াছে, ভালই হইয়াছে। ঘর্ষণ দ্বারা সত্য জ্যোতিই বিকীর্ণ হইবে! খ্রীস্টান ধর্ম যদিও ধনবলে ও রাজবলে ও বিদ্যাবলে অধুনা বলবান, তথাপি ব্রাহ্ম ধর্মের সত্য বলে তাহারা সকলই পরাজিত হইবেক।''[৫]

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব মুহূর্তে এরূপে সমকালীন বাংলায় দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ব্রাহ্ম আন্দোলনের ছত্রছায়ায় যে নব্যদর্শন লক্ষ করা যাচ্ছিল তাকে অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু 'বৌদ্ধিক বিদ্রোহ' বলে বর্ণনা করেন।[৬] এই বৌদ্ধিক বিদ্রোহেরই এক উল্লেখযোগ্য দিক ছিল নতুনতর প্রজন্মের কিছু ব্রাহ্ম-সদস্যদের মধ্যে বৌদ্ধিক অভ্রান্ততার প্রতি ধ্বংসমূলক মনোভাবের প্রকাশ। এই নব্যপ্রজন্মের ব্রাহ্মদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল এই আন্দোলনকে একটি বুদ্ধিদীপ্ত রূপ দেওয়া। তাঁর সংস্কারের বাসনা আরো খ্যাতিলাভ করল যখন দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু-পুত্র কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করলেন। তিনি ইতিমধ্যেই সমাজে একজন আন্দোলনকারী নেতা হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর চারপাশে আরও কতকগুলি প্রাণবন্ত যুবককে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন, যাঁরা পরবর্তী সমাজসংস্কার আন্দোলনে এক একটি দিকচিহ্নের সৃষ্টি করেছিলেন। এঁরা হলেন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন বসু, ঢাকার দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বরিশালের দুর্গামোহন দাস এবং ২৪ পরগনার শিবনাথ শাস্ত্রী। এই যুবসম্প্রদায় শীঘ্রই কেশবচন্দ্রের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাঁর কঠোর সমালোচনা করতে শুরু করলেন।[৭]

রামমোহনের পরবর্তী যুগে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক যুক্তিবাদী ডিরোজিও (১৮০৯-৩৯)-র অনুবর্তী 'ইয়ং বেঙ্গল' দল জাতিভেদ ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতেন। এঁদের প্রভাবে পড়ে কোনো কোনো ব্রাহ্মণ সন্তান সে যুগে উপবীত ত্যাগ করেন। হিন্দু কলেজের 'প্রগতিশীল' ছাত্রদের অনেকের মধ্যেই ১৬/১৭ বছর বয়সে সুরাপান ও গোমাংস ভক্ষণে বিশেষ আসক্তি দেখা গিয়েছিল। এঁদের মধ্যে যাঁরা ব্রাহ্মণ বংশের ছিলেন, তাঁরা সান্ধ্যাহ্নিক পরিত্যাগ করতে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' পুস্তকে (১৯০৩) লিখেছেন, ''তাহাদিগকে (অর্থাৎ, এই ছাত্রদের) বলপূর্বক ঠাকুর ঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধা-আহ্নিকের পরিবর্তে হোমারের 'ইলিয়াড' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত। কেহ কেহ রাজপথে যাইবার সময় মুণ্ডিত-মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই 'আমরা গোরু খাই গো' বলিয়া চিৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিত।'' ডিরোজিও-র এক শিষ্য রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রকাশ্য আদালতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তামা-তুলসী-গঙ্গাজল স্পর্শ করে সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হন, কারণ গঙ্গাজলের পবিত্রতায় তিনি বিশ্বাস করতেন না।[৮]

হিন্দু কলেজের ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ডিরোজিওর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন, তিনি হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হবার পর তিনি হিন্দু-বিরোধী হয়ে ওঠেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে খুবই অপছন্দ করতেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচন্দ্-এর জন্মদিনের ভোজসভায় অতিথি হিসেবে এসে কৃষ্ণমোহনকে মদ্যপ অবস্থায় দেখে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে পত্রে লেখেন— ''খ্রিস্টান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রাত্রির সভাতে আসিয়া টেবিল আহারে বসিয়া গেলেন এবং মদ্যপান করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। আমাকে তিনি অনুরোধ করিলেন রাজার অদ্য জন্মোৎসব, আপনি কিছু আমার সহিত মধুপান করুন, আমি তাহাতে অস্বীকার হইলাম। পরে কহিলেন সামপেন পান করুন, আমি কহিলাম, না। পরে তিনি নিরস্ত হইলেন। ভদ্রসাহেব ও বিবিদিগের সভার মধ্যে এবং রাজা ও আমাদিগের সাক্ষাতে স্বয়ং ধর্মযাজক হইয়া যে প্রকার মদোন্মত স্বরে আলাপ আরম্ভ করিলেন তাহাতে সকলেই ত্যক্ত হইয়া উঠিল। আহারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় বাদ্য হইতেছিল, বাদ্যকে ঢাকিয়া মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণ বন্দ্যোর স্বর সকলের কর্ণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং তাঁহার কটু শ্লেষ ও অশুভ ভাব উদগীরিত হইয়া মুহুর্মুহু তাহার নিকটবর্তীদিগকে বিষ জ্বালার জ্বালান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ বন্দ্যোর এ প্রকার স্বভাব আমি কখন মনে করি নাই। ক্রাইস্টের উপদেশ, ক্রাইস্টের দৃষ্টান্ত তাহার যে কিছুমাত্র মনোগত হইয়াছে এমন কখনই বোধ হয় না। হা ঈশ্বর!''[৯]

ইয়ং বেঙ্গল বাংলাদেশে যে নতুন সমাজমুখী ও মানবমুখী চিন্তার আলো জ্বালিয়েছিল সেই আলোকে ঊনবিংশ শতকের ত্রিশের দশকেই কয়েকটি প্রদীপের শিখা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মধ্য দিয়ে। নব্যচিন্তার মূল ভিত্তি ক্রমে প্রসারিত হচ্ছিল এবং তার তারুণ্যের অসংযত উদ্দামতাও ক্রমে শান্ত ও সংযত হয়ে আসছিল। তিরিশের শেষ দিক থেকে এই দুটি বিদ্বৎসভা নব্যচিন্তার এই রূপান্তরের প্রধান সহায় হয়। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম ও কর্মের যোগসাধনে আরও অনেকটা এগিয়ে যায়।[১০] 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সাথে সাথে দেবেন্দ্রনাথ মিশনারি শিক্ষা থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' নামে একটি ধর্মীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে বাহ্ম আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট করা। এই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। এই সভার আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার একটি উপায় হল এই পাঠশালা, দ্বিতীয় উপায় হল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩)। এই পত্রিকার প্রকাশকালে সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। কিন্তু 'সভায়' ও 'পত্রিকার' পেপার-কমিটিতে অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিল। ব্রাহ্মধর্মের মূল নীতি ও স্বরূপ নির্ণয় থেকে পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধের নির্বাচন পর্যন্ত সব ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। মতামতের দিক থেকে অক্ষয়কুমারের প্রধান সমর্থক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সভ্য ছিলেন। পরে সম্পাদকও হন। উভয়ের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তত্ত্ববোধিনীর যুগের শিক্ষিত বাঙালির মনন প্রসারিত হতে থাকে।[১১]

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের কলম ধরতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর একটি পত্রে এর উল্লেখও দেখা যায়। ১৭৭৩ শক-এর ২৫ আষাঢ় রাজনারায়ণ বসুকে পত্রে দেবেন্দ্রনাথ লেখেন, ''শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দত্ত খ্রিস্টিয়ান ধর্মের বিপক্ষ হইয়া যে যে লিখিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তাহা লেখা তাঁহার সমাপ্তি হইয়াছে, তোমাকে তিনি তাহা দেখিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিবেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রবাবুর স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে তিনি

আপনার পিতার সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে লক্ষ টাকার ক্ষত লিখিয়া লইয়াছেন এবং কলিকাতার অন্যস্থানে বাসা করিয়া আছেন, এমন পাগল আর ভূ-ভারতে নাই। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার মনকে সম্যক্ অধিকার করিয়াছে। বোধ হয় খ্রিস্টিয়ান বা হইতেও পারে, কিন্তু তাহার এখন কিছুই নিশ্চয় নাই। যাহার কিছু ধর্মবৃত্তি আছে, সে কি কখন জ্ঞানেদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে। যে পিতা চিরকাল তাহাকে পোষণ করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে এ প্রকার আন্তরিক যাতনা দিবার অপেক্ষা আর অধিক পাপ কি আছে?"[১২]

উল্লেখ্য, জ্ঞানেন্দ্রবাবু হলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটা 'ঠাকুর শাখার' প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। তাঁর স্ত্রী বালাসুন্দরী অন্তঃপুরের শিক্ষায় নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হয়ে ওঠেন। তাঁর অকালমৃত্যু হয়। সেই সময় (১৮৫১ খ্রি.) তাঁর পিতার সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে আলাদা বাসা করে থাকতেন। এরপর তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলমনিকে বিবাহ করেন। তারপর থেকে বিলেতেই থাকতেন এবং সেখানে থাকতেই ব্যারিস্টারি পাশ করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি হিন্দু আইন পড়াতেন। খ্রিস্টান হবার পর প্রসন্নকুমার ঠাকুর রাগে-দুঃখে পুত্রকে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে ভাইপো যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দিয়ে যান।

ব্রাহ্মধর্ম ছিল বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের আনুষ্ঠানিক দীক্ষা প্রবর্তন করলেও বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করতেন। বেদের অভ্রান্ততা নিয়ে পাদ্রিদের বাদানুবাদ চলতে থাকে। শুধু তাই নয়, এই নিয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গেও দেবেন্দ্রনাথের দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। ব্রাহ্মধর্মের এই ঐতিহাসিক রূপান্তরে অক্ষয়কুমার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে এই বিষয়ে লেখেন—"ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মে অগ্রে বেদান্ত ধর্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানত, তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।... তিনি সহজে স্বীয় অবলম্বিত কোনো মত বা কার্যপ্রণালী পরিবর্তন করিতেন না। সুতরাং তাঁহাকে বেদান্ত ধর্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয়বাবুকে বহু প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্তবাদ পরিত্যাগ করিলেন।"[১৩]

খ্রিস্টান পাদ্রিদের সঙ্গে আদর্শ-সংঘাতে দেবেন্দ্রনাথ ধর্মহীন শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধেও খুব চিন্তিত হন। এগারো বছরের বালিকাবধূ সহ উমেশচন্দ্র সরকারকে যখন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়, তখন দেবেন্দ্রনাথ খুবই উত্তেজিত হয়ে লেখেন, "অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত খৃস্টান করিতে লাগিল। তবে রোস, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনই অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল।"[১৪] এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর দেবেন্দ্রনাথ প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা কলকাতার সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে হিন্দু সন্তানদের যাতে আর পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে না পাঠানো হয়, তার অনুরোধ করেন। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ধর্মসভা ও ব্রাহ্মসভা একত্রিত হন। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে একটি সভায় স্থির হয় 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়, "সেই অবধি খৃস্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারীদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"[১৫]

ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন একটি খ্রিস্টান-বিরোধী আন্দোলনে পরিগণিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই খ্রিস্টান মিশনারিরা এদেশে ধর্মান্তরিতকরণের কাজে নেমে পড়েন। হিন্দুধর্মের মধ্যে জাতপাতের সমস্যা ও গ্রামের দরিদ্র লোকদের অর্থনৈতিক দৈন্যের সুযোগ নিয়ে তাঁরা ধর্মান্তরিত করতেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও এটি ব্যাপক আকার ধারণ করে। বাঙালি হিন্দু বর্ষিষ্ণু পরিবারের সন্তানরাও এর শিকার হন। এর প্রমাণ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি সম্ভ্রান্তবংশের উচ্চশিক্ষিত যুবকরা। জোর করে ধর্মান্তরিত করার নজিরও শহরের বুকে অজস্র ছিল। আলেকজান্ডার ডাফ্-এর মতো মিশনারি ও শিক্ষাব্রতীরা বিনা বাধায় এর সুযোগ নিয়েছেন। বাংলার পল্লীগ্রামে এই মিশনারিরা বিনাবাধায় ধর্মান্তরিত করেছেন। এই সম্পর্কেই উদ্বিগ্ন দেবেন্দ্রনাথ বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বেচারাম চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন—"অবোধ গ্রাম্য লোককে এইক্ষণে খ্রীষ্টানেরা মোহজালে আচ্ছন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তুমি একাকী বেহালাতে থাকিয়া আর্তনাদ করিতেছ, তথাকার ভদ্রলোকেরা ভারি বিপদের প্রতি কিছুমাত্র শঙ্কিত নহেন। তাঁহাদের যত ভয় হিতৈষী ব্রহ্মদল হইতে, কি আশ্চর্য! হরিসভা সম্পাদক কি করিতেছেন? তিনি কি খ্রীষ্টানদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য কোনই চেষ্টা করিতেছেন না? তাঁহাকে ত জাগ্রত করিয়া দেওয়া উচিত। ভদ্র পরিবারের মধ্যে খ্রীষ্টান দিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া, আপনার শিরে আপনি খড়্গাঘাত করার সমান। তুমি সেসব ভদ্র পরিবারের কর্ত্তাদিগকে এ বিষয়ে চেতন করিয়া দিতে পারিলে অনেক মঙ্গল হয়। তুমি ত তবু বেহালাতে বসিয়া খ্রীষ্টানদিগের আক্রমণের প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু আর আর পল্লীগ্রামের দশা কি হইতেছে। সেখানে খ্রীষ্টানদিগের প্রতিকূলে একটি শব্দমাত্রও বোধ হয় বিনির্গত হয় না। সংবাদ পাইলাম যে, রাজপুরেও খ্রীষ্টানেরা পরিবেশ করিয়াছে। এইক্ষণে খ্রীষ্টানেরা নগরের প্রতি নিরাশ হইয়া পল্লীগ্রামের অবোধ ব্যক্তিদিগের ধর্মপথে কন্টক দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঈশ্বর কখনও অসত্যের জয়বিধান করিবেন না, এই আশার উপর নির্ভর করিয়া সাধ্যমত যত্ন কর, অবশ্যই তুমি কৃতার্থ হইবে।"[১৬]

অনেক ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ মিশনারিদের কর্মকাণ্ডকে নিয়ে কৌতুক করেছেন। যেমন তিনি এক পত্রে লেখেন—"ভবানীপুর লন্ডন মিশনারি সংক্রান্ত খ্রীষ্টানদিগের কীর্ত্তন শুনিয়া অতীব কৌতুকাবিষ্ট হইলাম।"[১৭]

দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী মৃত পিতা দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করতে রাজি না হওয়ায় ব্রাহ্ম সমাজের ভিতরে ও বাইরে কিছু নতুন সংকটের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। নিজের আত্মিক ও বৌদ্ধিক উন্নতির উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ অতঃপর বারানসীতে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং সেখানে বিস্তৃত পঠন-পাঠনের ফলে তিনি নিজেই 'বেদের অভ্রান্তবাদ' সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। এ পর্যায়ে নবীনতর ব্রাহ্মরা ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধানতম স্তম্ভ বৈদিক অসুস্থতার দর্শন বর্জন করার জন্য দেবেন্দ্রনাথকে চাপ দিতে শুরু করেন। কিন্তু তখনও দেবেন্দ্রনাথ মানসিক অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন, রামমোহন প্রবর্তিত পুরাতন শাস্ত্রীয় ভিত্তি থেকে ব্রাহ্ম আন্দোলনকে সরিয়ে নিয়ে আসতে তাঁর মন সায় দিচ্ছিল না। এ পরিস্থিতিতে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ থেকে একেশ্বরবাদ সংক্রান্ত কিছু অংশ উদ্ধার করে নিয়ে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামক দুই খণ্ডে লিখিত একটি গ্রন্থে সেগুলিকে সংকলিত করেন।[১৮] তাছাড়া ব্রাহ্মদের আধ্যাত্মিক পথ দেখানোর জন্য তিনি

'ব্রাহ্মধর্ম বীজ' নামেও একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করার ফলে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন ক্রমশ চরম রূপ ধারণ করতে শুরু করে এবং হিন্দুধর্মের সঙ্গে ক্রমশ এক ব্যবধান রচিত হয়। বহুবিবাহ, কুলীন প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় এবং বিধবাবিবাহ ও নারীমুক্তিতে উৎসাহ দেওয়া হয়।[১৯]

দেবেন্দ্রনাথ খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। স্কটিশ মিশনারি ড. আলেকজান্ডার ডাফ 'India and Indian Mission' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি, বিশেষত বেদান্তের বিরুদ্ধে কটূ ভাষায় সমালোচনা করেন। ভারত থেকে হিন্দুধর্মকে সম্পূর্ণ বিদায় করে তার জায়গায় খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠা করাই ডাফ্ মিশনারিদের প্রধান উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে মিশনারিদের অনুসৃত পথে হিন্দুধর্মকে এদেশ থেকে বিদায় করা যাবে না। তাছাড়া এ কাজ করতে হলে হিন্দুধর্মের নিচের তলা থেকে কাজ আরম্ভ করলে চলবে না। হিন্দুধর্মের উপরের স্তরে যেসব উন্নত ও উচ্চবর্ণের লোকেরা বাস করে তাদের থেকে শুরু করতে হবে। ডাফ্-এর মতে, যদি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই নিম্নশ্রেণির লোকেরা দলে দলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবে। ড. ডাফ্-এর সমালোচনার উচিত জবাব দিতে দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ত্ববোধিনী সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাঁর আক্রমণের বিরুদ্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় চারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলিকে সংকলিত করে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে তত্ত্ববোধিনী সভা 'Vaidantic Doctrines Vindicated' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে মিশনারিদের কুৎসার জবাব দেয়। অনেকের মতে দেবেন্দ্রনাথই এই পুস্তিকা রচনা করেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ডাফ্-কে পরাজয় স্বীকার করতে হয় এবং তিনি ভারত ছেড়ে চলে যান।[২০]

শিশু ও বালকদের জোর করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার বিরুদ্ধেও দেবেন্দ্রনাথ রুখে দাঁড়ান। খ্রিস্টধর্মের প্রভাব থেকে তাদের সরিয়ে নেবার জন্য কলকাতায় 'Hindu Charitable Institution' নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ও খোলা হয়। পানিহাটি, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি মফঃস্বল অঞ্চলেও এই ধরনের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এইসব প্রচেষ্টার ফলে খ্রিস্টান মিশনারিরা যথেষ্ট দমে যায়। কিন্তু হিন্দুরা ক্রমশ কেন খ্রিস্টধর্মের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল তা নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ভাবনাচিন্তা করেছিলেন এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় এর কারণ বিশ্লেষণ করে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। হিন্দুধর্মের কুপ্রথাগুলি দূর করার জন্যও আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে 'সমাজোন্নতি বিধায়নী সুহৃৎ সমিতি' স্থাপিত হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা রোধ, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি নিয়ে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ও কিশোরীচাঁদ মিত্র ছিলেন এর যুগ্ম সম্পাদক। দেবেন্দ্রনাথ অবশ্য সমাজ সংস্কারের কাজে ধীরে চল নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি চাননি হিন্দুদের সঙ্গে সরাসরি কোনো সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে। এই বিষয়ে কেশবচন্দ্র সেন ও পরবর্তীকালের অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ছিল।[২১]

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে মস্তিষ্কের মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তাতে অবশ্য তরুণ ব্রাহ্ম-সদস্যদের যুক্তিবাদী আন্দোলনের বেগ স্তিমিত হল না। তারা সামাজিক আন্দোলনের পক্ষে বক্তব্য প্রকাশ করে চললেন। অবশ্য এ আন্দোলন কখনও বিরাট আকারে আত্মপ্রকাশ করেনি। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ মনান্তর এবং পারিবারিক অশান্তির ফলে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে হিমালয় পর্বতে আত্মিক সাধনার মাধ্যমে শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। সেখানে তিনি ইউরোপীয় দর্শন, হিন্দু শাস্ত্র এবং পার্শি কবি হাফিজের কবিতা পাঠ করে শান্তি লাভের চেষ্টা করেন। দেবেন্দ্রনাথের হিমালয় অবস্থানকালে তাঁর বন্ধুপুত্র কেশবচন্দ্র সেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। বিখ্যাত রামকমল সেনের পৌত্র কেশবচন্দ্র সেন এক বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করায় ব্রাহ্ম আন্দোলন এক নতুন মোড় নেয়। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে হিমালয় থেকে ফিরে দেবেন্দ্রনাথ তরুণ কেশবচন্দ্রের সহায়তায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পুনরায় প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চারিত করেন। কেশবচন্দ্র তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতায় সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে ব্রাহ্ম আন্দোলনকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এক সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত করেন।[২২]

কিন্তু ১৮৬০-এর দশকের সূচনায় কেশবচন্দ্রের ও দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে গৃহানুষ্ঠান সংক্রান্ত একাধিক ধর্মীয় রীতিনীতিকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরেই মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়।[২৩] এই পরিস্থিতিতে কেশবচন্দ্র সেন সমাজের পরিচালনায় কিছু সংস্কার আনতে চেয়ে দেবেন্দ্রনাথকে যে পত্র লেখেন তা দেবেন্দ্রনাথ না-মঞ্জুর করেন। বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারিদের সংস্পর্শে এসে কেশবচন্দ্রের যথেষ্ট খ্রিস্টভক্তি জন্মেছিল। তিনি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে 'Jesus Christ, Europe and Asia' এই বিষয়ের ওপর একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি যিশুখ্রিস্টকে অবতার হিসেবে উপস্থাপিত করেন। অনেকের এই ধারণাও হয়েছিল যে তিনি হয়তো খ্রিস্টান হয়ে যাবেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম হলেও বিভিন্ন ধর্মের আচার-আচরণের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল। অবতারত্বের প্রতিও তাঁর মোহ ছিল। মিশনারিদের, প্রধানত রেভারেন্ড সি.এইচ. ডালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে কেশবচন্দ্রের মধ্যে সুপ্ত খ্রিস্টপ্রীতি বর্ধিত হয়। এরপরে তিনি বিভিন্ন বক্তৃতায় খ্রিস্টের মহত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন। দেবেন্দ্রনাথ বিষয়টি ভালো চোখে দেখেননি। দেবেন্দ্রনাথকে বিষয়টি পত্র মারফৎ জানান জনৈক সত্যেন্দ্রবাবু। পত্রে সত্যেন্দ্রবাবু লেখেন—''কেশববাবু সম্প্রতি 'ঈশা কে?' এই বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এ দেশীয় ব্রাহ্ম বয়সি যাহা বলিয়াছেন তাহা মহাশয়ের দর্শনার্থে পাঠাইতেছি। কেশববাবু ব্রাহ্ম হইয়া ঈশার প্রতি যেরূপ অমানুষিক ভক্তি প্রদর্শন করেন, তাহাতে শুদ্ধ যে আমাদের লোকেরা অবাক হয় তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার অনেক পশ্চিমবাসী বন্ধুরাও আশ্চর্য প্রকাশ করিতেছেন। বয়সির উপদেশে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, আর তিনি যেমন তন্নতন্ন করিয়া কেশববাবুর বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অন্ধ চেলাদের মধ্যেও অনেকের চক্ষু ফুটিবে সন্দেহ নাই। বয়সির এই বক্তৃতার উপর মহাশয়ের মত ব্যক্ত করিয়া লিখিলে সন্তুষ্ট হই। আদি সমাজের পক্ষ হইতে বয়সিকে এই বিষয়ে রাজনারায়ণবাবু যদি এক পত্র লিখেন তো ভাল হয়। কেশববাবু ব্রাহ্মধর্মের নামে এইরূপ খৃষ্টপূজা প্রচার করিয়া আপনাকে হাস্যাস্পদই করিয়া তুলিতেছেন, হয় ত খৃষ্টের পদে তিনি নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এইরূপ তাঁহার কোনো অভিসন্ধি থাকিবে।''[২৪] এরপর দেবেন্দ্রনাথ দার্জিলিং থেকে পত্র মারফৎ রাজনারায়ণবাবুকে জানান—''তুমি সভাপতিরূপে আদি সমাজের পক্ষ হইতে বয়সির উপদেশের সহানুভূতি করিয়া যদি এক পত্র তাঁহাকে লেখ, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্মের মান যে রক্ষা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব সত্যেন্দ্রের প্রস্তাব অনুসারে তোমার প্রতি আমার এই অনুরোধ জানিবে।''[২৫]

এই সময়েই কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা আরম্ভ হওয়ার প্রথম দিনে দেবেন্দ্রনাথকে আচার্যের কাজ সম্পন্ন করার আহ্বান জানান। সেই পত্রের জবাবে দেবেন্দ্রনাথ লেখেন—''ব্রাহ্মমন্দিরে শীঘ্র উপাসনা আরম্ভ হইবে এবং সেই উপাসনার প্রথম দিনে আমাকে আচার্যের কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছ। তোমার এই আহ্বানপত্র পাঠ করিবামাত্র আমার মন উৎসাহে দ্রুতগামী হইল—কিন্তু তাহার পরেই একটি সংশয় উপস্থিত হইয়া তাহাকে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ করিল। সে সংশয় এই যে ব্রাহ্ম মন্দিরে প্রিয়তম ব্রহ্মের সহিত খ্রীষ্ট ও চৈতন্য প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর ভ্রান্ত অবতারদিগেরও আরাধনা হইতে পারে। এই সংশয়ের প্রবল হেতু মুঙ্গেরের ব্রাহ্মসমাজের খ্রীষ্টের উপাসনা। ইহাতে আমার মন আরো ব্যাকুল হইয়াছে যে এমন অব্রাহ্মিক ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সর্বপ্রযত্নে অনুমোদন ও পোষণ করিতেছেন। এ অবস্থাতে তোমার নিকটে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি কৃপা করিয়া আমাকে এই সংশয় হইতে উত্তীর্ণ কর।''[২৬] কেশবচন্দ্র মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে খ্রিস্ট উপাসনা করেছিলেন, সেই কথা উল্লেখ করে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে উপরোক্ত পত্র লেখেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র তা অস্বীকার করেন। তখন দেবেন্দ্রনাথ তার প্রমাণ সহ পুনরায় পত্রে তাঁকে লেখেন—''যদিও তুমি নিজে সকল প্রকার পৌত্তলিকতার বিরোধী তথাপি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা খ্রীষ্ট অবতারের উপাসনা ব্রাহ্মদিগের বিধেয় বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ইহাতে আমি নতভাবে তোমাকে এই পরামর্শ দিতেছি যে, এই অশেষ গোলযোগের মধ্যে তুমি কেবল তোমার বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করিবে না, কেবল অপৌত্তলিক ভাবে পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না। কিন্তু এই গুরতর সংকল্প স্থিরীকৃত করিবার নিমিত্তে একটি ট্রষ্টডীড রেজেস্টারী করিয়া দিবে। সেই ট্রষ্টডীডে সকল প্রকার অবতারের নামে স্তুতি বন্দনা গাথা প্রার্থনা প্রভৃতির উল্লেখ নিষিদ্ধ থাকিবে। তাহা হইলে আমি নিঃসংশয় হই আর আমার কোন ভাবনা থাকে না এবং তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করি। তোমাদের সদ্ভাবের জয় হউক।''[২৭] কেশবের 'মহামানব' সংক্রান্ত বক্তৃতা দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবের দূরত্বকে আরও বৃদ্ধি করে। এখানে উল্লেখ্য, কেশবচন্দ্র তাঁর নববিধানের প্রতীকে (১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ) 'ক্রুশ'কে একটি প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন।[২৮] ফলে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে নবীনতর ব্রাহ্মরা দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং নতুন সমাজ স্থাপন করেন, যা 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়। অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়। এই ভাঙন অবশ্য ব্রাহ্ম আন্দোলনকে দুর্বল করতে পারেনি। রাজনারায়ণ বসু, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গেই ছিলে, তাঁরা অ-পৌত্তলিক এবং একেশ্বরবাদী হলেও হিন্দু-ঘেঁষা ছিলেন। অবশ্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কাজকর্ম যতটা ব্যাপকতা লাভ করেছিল, আদি ব্রাহ্ম সমাজ তা করতে পারেনি। অবশেষে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়।[২৯]

রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম আন্দোলনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, দেবেন্দ্রনাথ তা যোগ্যতার সঙ্গে পূরণ করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবে রাধাকান্ত দেবের মতো রক্ষণশীল হিন্দুরাও যেমন তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ইয়ং বেঙ্গলের মতো চরম আদর্শে বিশ্বাসী যুব সম্প্রদায়ও তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তবে খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ ডিরোজিওপন্থীরা সমর্থন করতে পারেননি। একদিকে রামমোহন ও অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্বের মাঝে দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকা অনেকটা ম্লান বলে মনে হলেও, ঊনবিংশ শতকের ইতিহাসে তাঁর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।[৩০]

তথ্যসূত্র

১. Subhendu Kumar Sarkar, *Rise and Fulfillment of Brahmo Samaj: A Sociological Study*, Lipika, 2002, pp. 34-35
২. Keneth W. Jones, *Socio Religious Reform Movement in British India*, Bombay, p. 3
৩. Sekhar Bahdyopadhyay, *From Plassey to Partition: A History of Modern India*, Orient Longman, 2004, pp. 187-89
৪. Pronob Roy, 'Brahmoism: The Modern Concept of Human Religion', *Bodhi*, Tapabrata Brahmachari (ed.), Brahmo Conference, 2005, pp. 17-18
৫. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী (স.), *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী*, অলকানন্দা পাবলিশার্স, ২০১৪, পৃ. ৫৬
৬. Nemai Sadhan Bose, *Indian Awakening and Bengal*, Firma KLM, 1976, pp. 107-13
৭. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, 'ব্রাহ্ম আন্দোলন ও উনিশ শতকের বাঙালি জীবন', স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (স.) *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, ২০০৩, পৃ. ১৩১
৮. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, *জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ*, কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮১, পৃ. ৫৫-৫৬
৯. *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
১০. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১
১১. তদেব, পৃ. ১৩১-৩২
১২. *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫
১৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ*, নিউ এজ, ১৯৫৫, পৃ. ২০০
১৪. *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, ১৭৬৭ শক, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা
১৫. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, অলকানন্দা পাবলিশার্স, ২০১২, পৃ. ৬৫
১৬. *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
১৭. তদেব, পৃ. ১১০
১৮. Sekhar Bandyopadhyay, *ibid*, pp. 190-91
১৯. সমরকুমার ল্লিক, *আধুনিক ভারতের দেড়শো বছর*, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ. ৪২৪
২০. তদেব, পৃ. ৪২৪-২৫
২১. তদেব, পৃ. ৪২৫
২২. কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, *আধুনিক ভারত*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯২, পৃ. ১৭০
২৩. Subhendu Kumar Sarkar, *ibid*, pp. 31-43
২৪. *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
২৫. তদেব, পৃ. ৮৪
২৬. তদেব, পৃ. ১২৪
২৭. তদেব, পৃ. ১২৬
২৮. সুরঞ্জন মিদ্দে, *বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য*, রূপসী বাংলা, ২০১২, পৃ. XV
২৯. এ.আর দেশাই, *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৬, পৃ. ২৩০-৩১
৩০. সমরকুমার মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কালেশ্বর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

কালেশ্বর, কুচুট, বর্ধমান

আমাদের ব্যবসা : **কেসিসি ঋণ দান, ১৮টি সাবমার্সিবলের মাধ্যমে কৃষকের জমিতে সেচ প্রদান, কম খরচে ট্রাকটরের মাধ্যমে চাষ, কাঁসা-পিতন বন্ধকী, সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ বিক্রয়**

ব্যাঙ্কিং : **সেভিংস, রেকারিং, টিডি ও কেভিপি, এনএসসি কাগজ রেখে ঋণদান**

Sl. No. 13

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শ্রীপল্লী নার্শারি

প্রোঃ পরেশ মিত্র

সকল প্রকার ফুল, ফল ও বৃক্ষজাতীয় চারা পাওয়া যায়।
বিঃদ্রঃ এখানে বাগান তৈরির যাবতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়।

সগড়াই বাজার, পূর্ব বর্ধমান, ফোন : ৯৭৩৫৮৩৩৭৬৮, ৮১৪৫৪৩৩৯৮৮

Sl. No. 11

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

এ.এম.সি. এমপ্লয়িজ কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রেজি. নং : ১৮১ তাং : ১১-০৮-১৯৮৮

বার্নপুর, পশ্চিম বর্ধমান

Sl. No. 12

অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়ায় দেশ ও সমাজ

বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস

বাংলার সব ছড়াকে মূলত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এক ধরনের ছড়া হল ছেলেভুলানো ছড়া বা ঘুম-পাড়ানো ছড়া। এই ধরনের ছড়ায় থাকে অজস্র উদ্ভট ভাবনার গজদন্তমিনার, বিশুদ্ধ কল্পনার ও স্বপ্নের সাতরঙা রামধনু। অন্য বিপরীত ধারার ছড়ার রাজ্যে থাকে দেশ, সমাজ ও বিশ্বের নানা সমস্যার শিল্পিত প্রতিফলন। থাকে অন্যায়, অবিচার, অসাম্য, দ্বিচারিতা, শোষণ, ভণ্ডামি, দারিদ্র ও বহুবিধ যন্ত্রণার বিস্তার। সেই ধারার ছড়ায় ঝলসে ওঠে ছড়াকারের ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, উপহাস, কটাক্ষ। দেখা যাক ছড়ার অপরূপ রূপকার অন্নদাশঙ্করের বড়দের জন্য লেখা ছড়ায় দেশ, কাল, সমাজ, বিশ্ব কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বর্তমানে অনেক রেখে-ঢেকে, কায়দাকানুন করে পণ নেওয়া হয় বিয়ের সময়। সেই কথাটা অন্নদাশঙ্কর চমৎকারভাবে লিখেছেন তাঁর পণ ছড়াতে। কটা লাইন পড়া যাক—

তোমরা সবে শুধাও তবে—
আমিই বা কোন কার্তিক
প্রশ্ন শুনে কোথায় যাব
বদ্ধ দেখি চারদিক।
মানতে হল দরকারটা
উভয়ত আর্থিক
স্বর্ণের নাম সুন্দরী, আর
মাইনের নাম কার্তিক।

অন্নদাশঙ্করের মতে দেশের চরম সর্বনাশ এনেছে তিনটি অভিশাপ। তা তিনি অতি সংক্ষিপ্তভাবে, সাবলীল ও নাটকীয় কায়দায় তুলে ধরলেন 'তিন সেন' ছড়ায়। কয়েকটা লাইন দেখা যাক—

দেশের দফা করলো রফা
এ তিন সেন
পার্টিসেন আর
ইনফ্লেসেন আর কোরাপসেন।

একটা সময়ে খুব বেশি করে বলা হত সব অনিষ্টের মূলে হল কমিউনিস্ট। এই ঐতিহাসিক অপপ্রচারটিকে কত সার্থকভাবে, ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে ছড়াকার তুলে ধরেছেন। গিন্নী বলেন ছড়ায়—

যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি
সকলের মূলে কমিউনিষ্টি
মুর্শিদাবাদে হয় না বৃষ্টি
গোড়ায় কে তার? কমিউনিষ্টি।
পাবনায় ভেসে গিয়েছে সৃষ্টি?
তলে তলে কেটা? কমিউনিষ্টি।

একটা সময়ে কিছু বিভ্রান্ত, হুজুগে তরুণরা মূর্তি ভাঙার খেলায় দিনরাত মত্ত হয়েছিল। এই সস্তায় বাজিমাত করার প্রবণতাকে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর ছড়াতে—

নাথুরাম তো হানল দেহ
হানবে এরা মূর্ত্তি

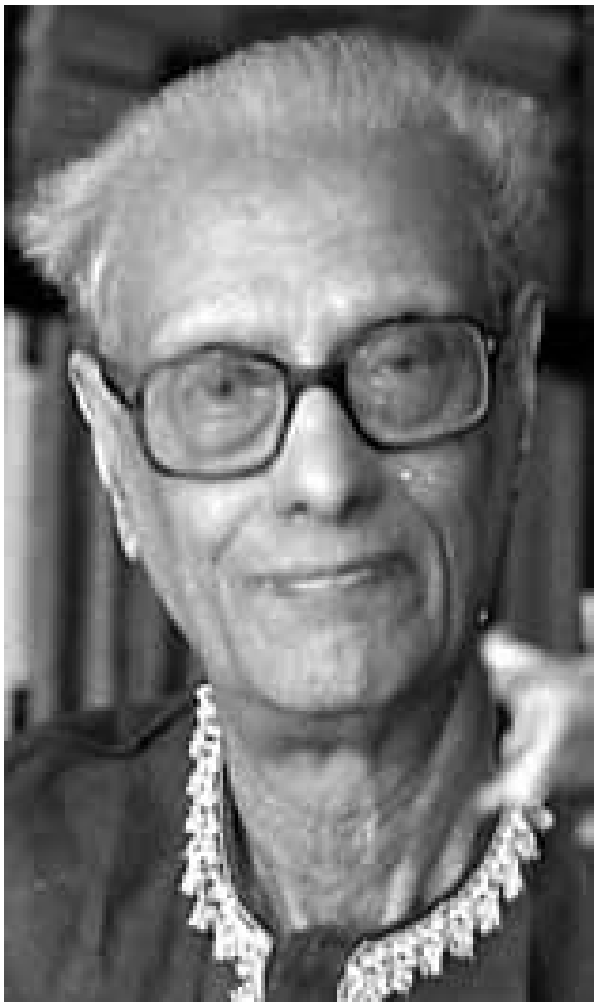

দেশের মুখে কালি মেখে
ধন্য এদের ফূর্তি।

হিংসার রাজনীতিতে, দলের কোন্দলে, নোংরা ব্যক্তিস্বার্থের চরম হানাহানিতে মেতে উঠেছিল কিছু মানুষ, এখনো মেতে উঠছে। এই ঘৃণ্য, অমানবিক চিত্রটি ছড়াকারের 'নব পদাবলী' ছড়াতে বাণীরূপ লাভ করেছে। চারটে লাইনে চোখ বুলানো যাক—

মারতে মারতে মরতে মরতে
থাকবে না কেউ বর্তে,
মর্ত্যের লোক স্বর্গ পেলেই
স্বর্গ নামবে মর্ত্যে।

এটা নির্মম সত্য যে আমাদের দেশে জনপ্রতিনিধি বেচাকেনা হয়। অনেক দলই কমবেশি এই কেনাবেচায় থাকে। এই প্রবণতা এখনো বর্তমান। এই নীতিহীন প্রবণতাকে ছড়াকার চমৎকারভাবে ব্যঙ্গ করেছেন 'মৎস্যরঙা' ছড়াতে। কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো গেল না।

সকলপক্ষী মৎস্যভক্ষী
মৎস্যরঙ্গা কলঙ্কিনী
আস্তলেকে দুষবেন কে?
সবাই করেন বিকিকিনি।

খেলার মাঠে চরম উত্তেজনাময় ম্যাচে কিছু অতি হুজুগে, অন্ধ ফ্যানরা মারপিট বাঁধান, শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা। কত মানুষ হতাহত হন। এমন এক হৃদয়-বিদারক ছবি ছড়াকার তুলে ধরেছেন—'খেলার মাঠ না কারবালা' ছড়াতে। ছটা লাইন দেখা যাক।

কাণ্ড দেখে দর্শকেরা
হাঁকে 'পালা, পালা,
ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি—
মারডালা, মারডালা
খেলার মাঠ না মরণফাঁদ
বাংলার কারবালা।

গাছ কেটে, পুকুর ভরাট করে, পার্ক বন্ধ করে মানুষ কীভাবে দূষণের অভিশাপকে ডেকে আনছে, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছে, সেই রূঢ় সত্য ছড়াকার উচ্চারণ করেছেন তাঁর 'তরুহীন মরু' ছড়াতে। দেখা যাক কটা লাইন—

নির্মল বাতাস ছিল
কোথায় গেল সে বা
বৃক্ষ বিনা দূষণ রোধ
করতে পারে কে বা
পার্কগুলো নিলাম করে
পুকুর করে ভরাট
আমরা দিয়ে যাচ্ছি ভায়া
শ্বাসকষ্টের বরাত।

গণেশমূর্তি দুধ পান করছেন এমন অবৈজ্ঞানিক তথ্য ও দৃশ্য মিডিয়ায় ফলাও করে দেখানো হয়েছিল। খবরের কাগজে, হাটে বাজারে তখন সবার মুখে-মুখে গণেশ ঠাকুরের দুধপানের খবর। এই ঘটনাকে চার লাইনে ছড়াকার মজাদার ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন 'অবাক দুধপান' ছড়াতে।

খবরটা শুনে আমি মুগ্ধ
গণেশজী খেয়েছেন দুগ্ধ
বিমোহিত হব শুনি যদি
ইঁদুরজী খেয়েছেন দধি।

অনেক উচ্চপদাধিকারী প্রশাসক ও ভিআইপি-রা বাইরে উচ্চ আদর্শের ঝলমলে নামাবলি গায়ে দেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা দুর্নীতি ও অসৎপথের কারবারি। ছড়াকার তাঁদের বিদ্রুপ করতে ছাড়েননি 'বাইরে ও ভিতরে' ছড়ায়। ছটা লাইনে চোখ রাখা যাক—

বাইরে ধলা টুপি
ভেতরে কালা রূপী
রাম রাম হরে হরে
বাইরে ভি,আই,পি
ভেতরে খোলা ছিপি
রাম রাম হরে হরে।

পরিশেষে একটি ছড়ার কথা উল্লেখ না করলে নিবন্ধটি অবশ্যই অসম্পূর্ণ থাকবে—সে ছড়াটি 'খুকু ও খোকা'। এই ছড়াটি এখনো জনপ্রিয়তার তুঙ্গে এবং এপার বাংলা ও ওপার বাংলার জনগণমন বিজয়ী হিসেবে প্রশ্নাতীত মর্যাদা ও সমীহের দাবিদার। এই ছড়াটি দেশভাগের যন্ত্রণাকে এত সাবলীল ও দক্ষভাবে তুলে ধরে যে তা পাঠ করলেই সব সংবেদনশীল অন্তরের অন্তঃস্থল দারুণভাবে যন্ত্রণাদগ্ধ হয়—

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো
তার বেলা?

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

সুশান্তকুমার রায়

খানা জংশন, গলসি, পূর্ববর্ধমান

Sl. No. 135

শিশির : দ্য ল্যস্ট অফ্ রোমানস্

দেবেশ ঠাকুর

শ্রীরঙ্গম। প্রথম দৃশ্য। মুখের মেক্ আপ তুলতে তুলতে শিশির ভাদুড়ী অসেন। প্রফুল্ল নাটকের শেষ সংলাপ 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' শোনা যাবে। সেই সঙ্গে বেহালায় বেদনাবিধুর প্রেক্ষাসঙ্গীত।

শিশির ।। কে দেখা করতে এসেছে, পুতুল? (উইংস-এর দিকে তাকিয়ে) অ, তুমি? ওখানেই বসো। কী যেন নাম বললো—অ্যাঁ, সৌমিত্র—তুমি পুতুলের ছেলের বন্ধু? পুতুল যেন অন্য একটা নাম বলেছিল—হাঁ পলু। চেয়ার টেনে অত ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে আসার দরকার নেই। ওখানেই বসো। তা কলেজে ফিফথ্ ইয়ারে পড়ো। বাংলার মাস্টারি করলেই তো পারতে। আবার থেটার কেন! আমাকে দেখো। শিশির ভাদুড়ী—এম.এ. ইংরাজি। কলেজের মাস্টার ছিলাম। হয়েছি থেটারওয়ালা। তোমাদের প্রিয় অহীন্দ্র চৌধুরীকে দেখো। ম্যাট্রিক ফেল। ছিলো থিয়েটারওয়ালা। এখন মাস্টার। তা পলুবাবু, কথার টান শুনে তো মনে হচ্ছে, কলকাত্তাই নয়। বাড়ি কোথায়? কৃষ্ণনগর? চেহারাটি তো ঘুর্ণির কারিগরের গড়া। আমার বোনের বিয়ে হয়েছে ওখানে। তুমি কাদের বাড়ি—এ্যাঁ! বলো কী হে! সে তো বিপ্লবীদের বাড়ি! একেবারে যতীন মুখুজ্জে—যাক, তোমার অভিলাষ পুরণ করতে পারলাম না, পলুবাবু। শিশির ভাদুড়ীর অদ্য নাট্যজীবনের শেষ রজনী। আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে শ্রীরঙ্গম থেকে বের করে দিয়েছে। এই দেখো কোর্টের পেয়াদা বেলিফি। আমি যত তাড়াতাড়ি এই থিয়েটারের সাজানো বাগান থেকে বেরিয়ে যাবো, ওদের ততই মঙ্গল। বিসর্জনের পর চারিদিকে যেমন রাংতা ছড়ানো থাকে—ওই যে আমাদের নকল সিংহাসন, টিনের তলোয়ার, নকল জরির রাজবেশ। (*একটি পোষাক তুলে*) এইটা পরে আমি আলমগীর সাজতাম। তখন এ পোষাক চিৎপুরের হাজু খলিফার হাত থেকে চলে যেত দিল্লির চাঁদনি চকে। নকল জরি স্পটলাইটের আলোয় মোগল তক্ত্-এ-তাউসের রোশনাই ঢেলে দিত। পলুবাবু, এই আলো বড় মায়াবি। মুখে আলো পড়লে আমার আমি হারিয়ে যাবো। অন্তরের আমির সঙ্গে বাইরের আমির লুকোচুরি খেলা চলবে। কানামাছি খেলা। —ওদিকে কী দেখছো? সবাই কাঁদছে। থেটারের এই মায়ালোক ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। এই যে তারাকুমার, ওই যে শেফালিকা—সব কাঁদছে। দুঃখ ভুলতে মদ খেয়েছে, ওই যে, জাগুলের জমিদারবাড়ির রাজপুত্র ছবি বিশ্বাস। আমি কিন্তু কাঁদছি না। আমি এখন শ্মশানভৈরব। নিজ হাতে চন্দনের চিতায় আগুন দিয়েছি। শ্রীরঙ্গম পুড়ে যাবে। নেমে আসবে গাঢ় অন্ধকার। কেউ এসে বলবে না, লেট দেয়ার বি লাইট অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট।

রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে গেল
যবে দীপশিখা
রিক্ত হল সভাতল, আঁধারের
মসী অবলেপে
স্বপ্নচ্ছবি মুছে যাওয়া সুষুপ্তির
মতো শান্ত হলো
চিত্ত মোর নিঃশব্দের তর্জনী সংকেতে।

ওই দেখো, প্রেক্ষাঘরের আলোগুলো একটার পর একটা নিবিয়ে দিচ্ছে। শিশির ভাদুড়ীর স্বর্গ হতে বিদায়। প্যারাডাইস লস্ট। ওই পাশে—ওই যে অন্ধকার গলির দিকে—ইনফার্নো :

'There is hell, there is darkness,
There is the sulphurous pit—
Burning, scalding, stench, consumption,
Fie fie fie! Pah, pah! Give me an ounce of
Civet, good apothecary, to sweeten my
imagination.'

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। কিং লিয়ার।

স্কটিশ চার্চ কলেজে ইংরিজি নাটক করতাম। সেক্সপিয়ারের ক্লাসিকস্। যাত্রাওয়ালা আর কবিগানের আখড়া থেকে উঠে আসিনি হে। সিজারে ব্রুটাস করেছি। মার্চেন্ট অব ভেনিসে অ্যান্টোনিও করেছি। হ্যামলেটে ক্লডিয়াস করেছি। অভিনয় আর নাটক শেখাতেন প্রফেসর ম্যাকলিন, ডেভিস্ ও ডগলাস। দ্য গ্রেট মন্মথনাথ বসুর কাছে নাটক শিখেছি। (*দূরে তাকিয়ে*) এ্যয় শালা, তরবারিটা অমন অশ্রদ্ধা করে ছুঁড়ে ফেলছো কেন! ওটা তোর বাপের খেলনা নয়। এই সেদিন তখৎ-এ-তাউস-এ জাহাঙ্গীর শা-র হাতে ওই তরবারি যেদিন ঘুরতো—মঞ্চ এক ছায়ালোক, এক মায়ালোক। ডালহৌসি পাড়ার যে কেরানি হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, বড়ো সাহেবের গুঁতো খায়, মাথা নিচু করে অপমান সইতে সইতে কুঁজো হয়ে যায়, মঞ্চে যখন এই তরবারিরূপী পরশপাথর স্পর্শ করে তখন সে মনে মনে চ্যালেঞ্জ করে ওই বড়ো সাহেবকে। ছায়াযুদ্ধে নামে উপরওয়ালার সঙ্গে। নব্বই শতাংশ ছা-পোষা বাঙালি মধ্যবিত্ত মনে প্রাণে নিমচাঁদ দত্ত। কলেজে পড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক বড়লোকের মোসাহেবি করে। এই যন্ত্রণা এই বেদনা তুমি বুঝবে না। বুঝতে গেলে বঙ্কিমের মুচিরাম গুড় পোড়ো। বঙ্কিম প্রথম গ্র্যাজুয়েট। সাহেবদের থেকে বিদ্যেবুদ্ধি কিছুমাত্র কম ছিল না। কিন্তু সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মুচিরাম মূর্খ—সেও ডেপুটি। মেমসাহেবের চেয়ারের জল মুছতো রুমাল দিয়ে। মেমসাহেবের চরণবন্দনা না করে জল খেতো না। সে

আসল কেতাবটি পড়েছিল যাতে বিদ্যেও হয় সুন্দরও হয়। বঙ্কিমের বুকের পাটা থাকলেও ডেপুটিত্ব ছাড়তে পারেন নি। বাঙালি চাকরি বড়ো মায়া। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম.এ.। স্কটিশ চার্চের অধ্যাপকের পদ ছেড়েছিলেন 'আলমগীর' লিখবেন বলে। আমি শিশির ভাদুড়ী এম.এ. আলমগীর করব বলে অধ্যাপকের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। স্টেজ থেকে রেকর্ড কোম্পানি সবাই ওই এম.এ. ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছে। আমি কিন্তু এম.এ. বেচে খাই না।

(*পোঁটলা খুলতে খুলতে*) এই সব পোঁটলা-পুঁটলি আপাতবর্জনীয়। তেমন দামী কিছু নয়। এত সব জিনিস নিয়ে কোথায় যাবো। (*একটি চাদর বের করে*) হা—হা রে সময়! সময় এক নির্মম কালপুরুষ—সব কেড়ে নেয়। এই চাদর গায়ে জড়িয়ে কত রাত চাণক্য করেছি জানো! আর আজ এই বিবর্ণ চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—(*চাদর জড়িয়ে*) 'ওঃ কি অধঃপতন! একেবারে পর্বতের শিখর হতে গভীর গহ্বরে। আজ ব্রাহ্মণ তাই মুষিকের মতো গৃহের এক অন্ধকার গর্ত থেকে অন্য গর্তে সেঁধোবার জন্য মাথা নিচু করে চলেছে; অন্যের পরিত্যক্ত চারিটি তন্ডুলকণা খুঁটে বেড়াচ্ছে। লজ্জাও নাই! একদিন যার তিনগাছি সূতা দেখে দেবরাজ ঐরাবত থেকে নেমে আসতেন, একদিন যার পদঘাত চিহ্ন স্বয়ং নারায়ণ সগর্বে বক্ষে ধারণ করতেন—আজ সে উপবীতসার ব্রাহ্মণ মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত। ওঃ কী অধঃপতন—কী বলছ পলুবাবু, সুযোগ পেলে 'চন্দ্রগুপ্ত' করবো? সোজা চোখের দিকে তাকাও, মেরুদণ্ড সোজা করো। চন্দ্রগুপ্ত করবো! আবার ফিরে আসছে সেই বিশ্বাস। আবার চোখের সামনে আলোর বর্শাশানিত রেখা—তুমি চন্দ্রগুপ্ত আমি চাণক্য প্রভা মুরা—আমি নাট্য নির্দেশনার কালে ডাইরেক্টর থেকে ডিক্টেটার হয়ে যাই, জানো? জানো। তুমি সহ্য করতে পারবে? পারবে?

হ্যাঁ তুমি পার্ব্বে। তোমার মুখ, তোমার দৃষ্টি, তোমার ভঙ্গিমা সমস্বরে বলছে যে, তুমি পার্ব্বে। হাঁ, আমি তোমায় দীক্ষা দেব। তোমায় মগধের সিংহাসনে বসাবো। তোমায় ভারতের অধীশ্বর কর্ব্ব। তবে ইন্ধন প্রস্তুত করো চন্দ্রগুপ্ত! আমি তাকে ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত কর্ব্ব!'

তুমি আমার পুত্রবৎ। তবু তোমাকে বলতে আমার কুণ্ঠা নেই—যদিচ আমি সামান্য পান করেছি, তবে তোমাকে নেশার ঘোরে কথা বলছি সে তুমি মনে করো না। ওই যে ছবিকে দেখছো, দূরে ঘুর ঘুর করছে। পান করে আমার সামনে এসে দাঁড়ানোর সাহস নেই। কী বলছ? মদ খাওয়ার জন্য শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটার উঠে গেল। একটা মানুষ কত টাকার মদ খেতে পারে জীবনে? পঞ্চাশ হাজার? সত্তর হাজার? আশি হাজার? আমি কত রোজগার করেছি জীবনে জানো! ভাবতেও পারবে না। আমি পেশাদার থিয়েটার করেছি। কিন্তু পাটোয়ারি বুদ্ধি আমার নেই। বেনে হয়ে উঠতে পারি নি। চোখের সামনে চুরি দেখেছি, কিছু বলতে পারি নি। গভীর গভীরতর অন্যায় দেখেও নীরব থেকেছি। ওই যে মঞ্চ—প্রসেনিয়ম, এর প্রতিটি ইঞ্চি আমি চিনি। মঞ্চের বাইরের পৃথিবীকে হয়ত তেমন চিনতে পারিনি। পারলেই বা কী করতাম। অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়েছি। সংসারের সব দায়-দায়িত্ব—এতগুলো মানুষ পরিবারে, সব আমাকে দেখতে হয়েছে। ওরা ভেবেছে আমি মানি প্ল্যান্ট। টাকার গাছ। তাই ওরা অবলীলাক্রমে পরজীবী মানিপ্ল্যান্ট হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে। পলুবাবু, জীবনে একটাই দুঃখ রয়ে গেল, যা করতে চেয়েছিলাম, করতে পারলাম না। যা হতে চেয়েছিলাম, হতে পারলাম না। তাই আমাকে বোধহয় এখন থেকে ভাড়াটে কেষ্ট হয়ে থাকতে হবে। ওই দেখো, ধীরে ধীরে সব প্রদীপ নিভে যাচ্ছে। 'out out brief candle, life is but a walking shadow...'

আলো যত নিভে আসছে কেমন একটা ভয় আমাকে তাড়া করে আসছে—কী রকম একটা পাগলের মতো লাগছে। কে যেন গলা টিপে ধরছে—আঃ আঃ—সত্যই তো আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি। না না না—আমি পাগল হব না। ঈশ্বর, এই শীর্ণ দুর্বল জরাজীর্ণ নেহাৎই সাহাজানকে দেখ ঈশ্বর। তোমার দয়া হচ্ছে না? ধ্যুস, দয়া করুণা এসব শব্দ আমার অসহ্য লাগে। দয়া করে আমাকে হাত ধরে কেউ নিয়ে যাবে—ভাবতেও পারি না। আমি যোগেশ নই—চাণক্য। সাম্রাজ্য গড়ি, সাম্রাজ্য ভাঙি।

ভয় আমি পাইনা সৌমিত্র। ভালো চাকরি ছেড়ে লখীন্দরের ভেলা নিয়ে গাঙুরের জলে ভাসিয়েছি। ঘাটে ঘাটে বিপদ। তবু ভয় আমি পাইনি। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াচ্ছি। স্ত্রী আত্মহত্যা করলেন। ছাত্রদের সামনে অকপট বলেছি সেই নির্মম সত্য। রঘুবীর দেখে কাগজওলা লিখলে, শিশির ভাদুড়ী সুর দিয়ে অভিনয় করে। যোড়শীতে জীবানন্দ যখন অলকার সঙ্গে কথা বলছে—রুক্ষ, বাস্তব, সত্য আর গভীর প্রেম। দর্শক পিঠ চাপড়ে দিলে। ম্যাডানের কর্ণওয়ালিস বেঙ্গলি থিয়েটার। জানতাম রুস্তমজী ব্যবসা করতে নেমেছে। চাল, ডাল, লোহার বদলে শিল্প বেচবে। ঝাঁপিয়ে পড়লাম নির্ভয়ে। আজও মনে আছে ১০ ডিসেম্বর, ১৯২১—নাটক আলমগীর। নাটকে সিন আছে ৩২ টা। আলমগীরের এ্যাপিয়ারেন্স মাত্র আটবার। এই আটবারের জন্যে দর্শকের লাইন মাইল ছাড়িয়ে যেত। ভয় পেলে পারতাম না, হে। লোকে তখন তুলনা করত, কে বড়ো? গিরিশ না শিশির? নিলাম চ্যালেঞ্জ—বিচার করবে দর্শক-ভগবান। ম্যাডান তখন 'অপরাধী কে' নামিয়েছে। কী বিজ্ঞাপন! আলোর চটক! আমাদের চটক! আমাদের দল ভাঙাচ্ছে, তখনই স্টার ভাড়া নিয়ে টিকিট বিক্রি করে চ্যালেঞ্জ নিলাম, ৩৮ বছর আগের পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস নামালাম। নিজের নাটকে গিরিশ করতেন কীচক, ভীম করতেন অমৃতলাল মিত্তির, বিনোদিনী করতেন দ্রৌপদী। আমি করলাম ভীম। আয় শালা, কে তুলনা করবি কর। জেনে রেখো এটাই বাংলার প্রথম production। দুঃখের বিষয় জানো? আমার পোস্টা-র নাম রুস্তমজী। আর গিরিশের পোস্টা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। এই রকম একটা মানুষের ছোঁয়া পেলে—হা—

চরম পাপ একবার করেছিলাম। ইংল্যান্ডের যুবরাজ, ভারতের ভাবী সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড এলেন। তাঁর অনারে আলমগীর করতে হবে। রাজার সামনে নাচতে হবে। চৌরঙ্গি পাড়া আলোকোজ্জ্বল। তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে। চৌরঙ্গির সাহেবপাড়া ছাড়া সারা কলকাতা নিষ্প্রদীপ। মনে হয়েছিল এ পাপ—এক রৌরবে টগবগ করে দগ্ধ হচ্ছি। চার বছর পর পাপ স্খালন করলাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সম্মানে তাঁর সামনে সীতা করলাম।

(*বিপরীত দিকে তাকিয়ে*) কী হল, কানু, কিছু বলবে? হ্যাঁ, ওই সব রাংতা-জরি নিয়ে আর কী হবে। ফেলেই দাও। ওকে চেন, পলুবাবু? ওর নাম কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। আলমগীরে বিক্রম শোলঙ্কি করতে এসেছিল। 'যোগাযোগ' নাটকে নবীনের অভিনয় দেখে তোমাদের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন, (দীর্ঘশ্বাস) থাকতে পারল না। সিনেমা করতে চলে গেল। ৩২ বার শট দিয়ে বলে 'হ্যাঁ' বা 'না'। তবে মানিকবাবুর ছবিতে হরিহর ভালো করেছে। থিয়েটার আর সিনেমা! থিয়েটারে ভক্ত ভগবানকে আর ভগবান ভক্তকে ছুঁতে পারে। ডাইরেক্ট কমিউনিকেশন। আর সিনেমা—পাঁচ-ছটা ছবি তো করলাম। কোন ফিলিংস্ পাই না। 'চন্দ্রগুপ্ত' করবে তো বলছো সৌমিত্তির, সিনেমায় মোহ নেই তো! ভেবেচিন্তে দেখো। মঞ্চমায়া না পর্দা-মায়া! আমাকে তাতিয়ে ঝটকে যাবে না তো?

ভয় আমি এক বারই পেয়েছিলাম। কী রকম রাহুগ্রস্ত আশঙ্কা। ওই একদিন—এক বোতল উড়িয়ে দিয়েও ঘুমোতে পারিনি। সালটা ১৯৪৪। শ্রীরঙ্গমে মাইকেল করছি। পিল পিল করে দর্শক আসছে, অমিত্রাক্ষর শুনতে। তবু দর্শকের মধ্যে কোথায় যেন একটা আশা নিরাশার দোলাচল। আমি দর্শকের চোখের দিকে তাকালে সব বুঝতে পারি। আমার থিয়েটারে শম্ভু মিত্তির আর বিজন ভট্টাচার্যের দলবল নবান্ন করলে। কোথায় আমার রাজকীয় ক্ল্যাসিকস্ আর কোথায় চট টাঙানো ভিকিরির গল্প, মন্বন্তরের গল্প, কম্যুদের কাহিনি। তোমাকে চুপি চুপি বলছি, অসাধারণ নাটক। প্রতিটি সেন্টিমিটার মাপা। কী নিখুঁত—আর সংলাপ। ওরাই ঠিক বলছে। আমি সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনা করছি। ওরা খিদের ভূগোল আঁকছে। আমি আর ওদের শ্যো করতে দিই নি। মনে হয়েছিল, আমাকে, শিশির ভাদুড়ীকে, the last of the Romans-কে, কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করতে পারে, তা হল এরা। সেই প্রথম মনে হল, আমি একা নারায়ণ হতে পারি, ওরা নারায়ণী সেনা। ঝড়ের মতো আছড়ে পড়েছে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে। নীলদর্পণের পর উত্তাল ঝড়।

আকাশে কি মেঘ করেছে, সৌমিত্র? জানুয়ারি মাসের শীত। তবু কী রকম গুমোট দেখছো, আমি কি একা হয়ে যাচ্ছি। একা! কাল থেকে আমার একাকীত্বের অহল্যা প্রতীক্ষা। ভাই হৃষিকেশের বরানগরের বাড়িতে ঠাঁই পেয়েছি। (*সাজাহানের পোষাক তুলে, গায়ে দিয়ে*) বরানগরের দুর্গে নিরবচ্ছিন্ন একাকীত্ব—দূরে তাজমহল—না 'শ্রীরঙ্গম'—ভুল বললাম; রাসবিহারী কিনেই নাম বদলে দিয়েছে 'বিশ্বরূপা'।

'ইচ্ছা করছে... এই রাত্রির ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখানে দিয়ে একবার ছুটে বেরোই। আর এই সাদা চুল ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছে করছে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই। ইচ্ছা করছে যে এখানে থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে বার করে তা ঈশ্বরকে দেখাই! ওই আবার গর্জন। মেঘ। বারবার কি নিষ্ফল গর্জন কচ্ছি? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খানখান করে দিতে পারো? অন্ধকার? কি অন্ধকার হয়েছো! তোমার পিছনে ওই সূর্য, নক্ষত্রগুলিকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেলতে পারো?' (*বসে পড়েন*) সব আলো নিভিয়ে দাও।

'Put out the light, and then put out the light.

If I quench thee, thou flaming, I can again try the former light restore, should minister I repent me, but once put out thy light.' বরানগরে এসো। চন্দ্রগুপ্ত শুরু করব নতুন করে। তুমি চন্দ্রগুপ্ত, আমি চাণক্য। Till then, put out the light.

(*অন্ধকার। আলো আসে। বরানগর*)

শিশির : কে! অ, সৌমিত্র। বসো, কী দেখছো? তিন বছরে কতটা জীর্ণ হয়ে গেলাম। বিরল পলিত কেশ—লোল চর্ম, কথায় জড়িমা। এই নাও বই ধরো—প্রথম অঙ্ক, চচুর্থ দৃশ্য—বলো 'গুরুদেব, সেকেন্দার সাহার এই ভবিষ্যৎবাণী যে আমি দিগ্বিজয়ী বীর হব। সেই আশ্বাস বাণী। নিদ্রায় ও জাগরণে আমার কর্ণে এখনও বাজছে'—কী হল, বল। নীরব কেন? কী বলছ? এ্যাঁ—একটু জোরে বল। কানে ইদানিং কম শুনছি।

হ্যাঁ ঠিকই শুনেছি। সত্যজিৎ রায় আমাকে 'মহানগর' ছবিতে অভিনয় করার অনুরোধ করেছিল। আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। কেন! কতবার বলেছি, আই অ্যাম দ্য লাস্ট অফ দ্য রোমানস—আমি ক্যালিগুলা সিজার, নীরো সিজারের উত্তরসুরি। হ্যাঁ, এও সঠিক শুনেছ। রাসবিহারী সরকার আমাকে বিশ্বরূপায় অনুরোধ করেছেন। আমি আর কোথাও বাঁধা থাকবো না। হয়ত ভাড়াটে কেষ্ট হয়ে থাকতে হবে—বিধানবাবু ডেকেছিলেন সঙ্গীত নাটক একাডেমির কর্তৃত্বভার দেওয়ার জন্যে। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম, কোনো আমলা শিল্পকর্মের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না তো? যে আমলা আজ শিক্ষায়, কাল সে দমকলে, আজ যে গাড়িতে, কাল সে আবগারিতে। আজ সেচ-এ, কাল শৌচে। আপনি শুনেছি পথের পাঁচালীকে পাঠিয়েছিলেন পি.ডব্লু.ডি.-তে। আমার মাথার উপর আমলা থাকলে আমি কাজ করব না।

কী বলছ? হ্যাঁ, প্রত্যাখ্যান করেছি। পদ্মভূষণ দিতে চেয়েছে ভারত সরকার। ও নিয়ে আমি কী করব! লিখে দিয়েছি, পুরস্কার খেতাব চাই না। আমাকে সম্মান জানাতে হলে কলকাতায় পাবলিক্ স্টেজ বানিয়ে দাও।

বাদ দাও ওসব কথা। পুরস্কার তিরস্কারে আমি বিচলিত হই না। বলো ডায়ালগ বল—'গুরুদেব—' অত মিউমিউ করছ কেন? তোমার গলা বেশ র‍্যোমান্টিক। উদাত্ত কণ্ঠে বলো—কী! কী বলছ—মানিকবাবুর কাছে সিনেমা করবে বলে নাম লিখিয়েছ? et tu brute! তুমিও—হাঃ হাঃ হাঃ (*কান্নায় গলা ধরে আসে*)—নির্বাসন—চিরনির্বাসন—'একা আমি এই অসীম সৌন্দর্যরাজ্য থেকে নির্বাসিত। বিশ্বে অমৃতের সমুদ্রের ঢেউ বহে যাচ্ছে—আর পঙ্গু আমি তাপিত তৃষিত হৃদয়ে তীরে ছটফট্ করছি—তপোবনের প্রান্তে শুকরের মতো পল্বলপঙ্কে পড়ে আছি—' on lente' lente qurite noctis equi—(গান : '*ওরে আয় ছুটে আয় ছুটে আয় রে ত্বরা*'...)

এই নাটকের প্রায় সব কথা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-এর মুখ থেকে শোনা। কিছু তথ্য স্বতন্ত্র। এক সঙ্গে দূর দূরান্তরে অনুষ্ঠানের সুবাদে প্রবাদপ্রতিম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রাণ খুলে গল্প করতে করতে যেতেন। উঠে আসত রত্নখচিত এক একটি ইতিহাস। নাটকটি লিখেছি সৌমিত্রদার জন্য।

With best compliments of

GANGULY & COMPANY

Civil Contractor, Drilling and Pipeline Job

Vill. & P.O. : Tapsi, Dist. Paschim Bardhaman
M : 9333343951, E-mail : aganguly72@rediffmail.com

Sl. No. 64

মিশন নির্মল বাংলা

পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ
জেলা জল ও স্বাস্থ্যবিধান সেল

সার্বিক নির্মলতার জন্য প্রচারাভিযান

শৌচাগার নির্মাণ করলেই হবে না পরিবারের সকলে মিলে শৌচাগার ব্যবহার করতে হবে

জল খেয়ে গ্লাস সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে নিতে হবে

বাড়িতে খাবার জল রাখতে হবে পরিষ্কার মুখ ঢাকা পাত্রে

১. স্বাস্থ্যবিধানের সম্বন্ধে নিরন্তর প্রচার, বিভিন্ন স্তর থেকে মনিটরিং ও পর্যালোচনা করা।

২. ছাত্রছাত্রী ও ছোটোছোটো ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুস্বাস্থ্যের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং তাদের মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতন করা।

৩. এলাকার সমস্ত স্কুল, কলেজ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৌচাগার না থাকলে অবিলম্বে শৌচাগার তৈরি করে ফেলা এবং বিধিসম্মতভাবে এই শৌচাগার ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা।

৪. খোলা জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা এবং নির্মল পরিবেশ গড়ে তোলা ও বজায় রাখা।

৫. শিশুদের মল অবশ্যই শৌচাগারে ফেলার অভ্যাস গড়ে তোলা।

৬. হাট বাজার ও অন্যান্য জনবহুল স্থানে সাধারণের ব্যবহার্য জায়গায় শৌচাগার নির্মাণ করা এবং তা ব্যবহার করার সচেতনতা গড়ে তোলা।

৭. নিরাপদ উৎস যেমন নলকূপ বা ট্যাপের জল থেকে পানীয় জল এনে তা ঢেকে রাখা এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তা ব্যবহার করা।

৮. বাড়িতে একটি শোষক গর্ত তৈরি করে সেখানে বাড়ির বর্জ্য জল ফেলা।

৯. বাড়ির আবর্জনা ফেলার জন্য বাড়িতে একটি স্বাস্থ্যসম্মত সারগাদা তৈরি করা।

১০. রান্না করা খাবার-দাবার ঢেকে রাখার এবং বাসি খাবার না খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

বাচ্চার পায়খানা পরিষ্কার করার পর সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে

প্রতিবার মলত্যাগ করার পর সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে

খাওয়া, রান্না পরিবেশন এবং বাচ্চাকে খাওয়ানোর আগে প্রতিবার সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে

অনুরাগ শ্রীবাস্তব
জেলাশাসক, পূর্ব বর্ধমান ও
নির্বাহী আধিকারিক
পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

দেবু টুডু
সভাধিপতি
পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

শতবর্ষে নভেম্বর বিপ্লব ও লেনিনের জীবনীনাট্য

সব্যসাচী বাগ

১৯১৭ সালের নভেম্বরে রাশিয়াতে ঘটলো বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, যার নেতৃত্ব দিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪)। তাই সারা পৃথিবীর শোষিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও মুক্তিকামী মানুষের কাছে নভেম্বর বিপ্লবের কাহিনি ও মহান লেনিনের জীবনকাহিনি অনুধাবন ও উপলব্ধি করা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। যখন নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ আজও নিরক্ষর, তখন সেই সমস্ত অশিক্ষিত মানুষের মনে বিপ্লবের কাহিনি বা লেনিনের কর্মকাণ্ডকে গেঁথে দেবার কাজটি আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে লেনিনের জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে অনায়াসে করতে পেরেছিলেন যাত্রাপালাকার শম্ভু বাগ, যখন যাত্রা দেখতে আসা জনৈক কৃষকের কথা ছিল—'হ্যাঁরে প্যালা, লেনিন ব্যাটাছেল, না মেয়েছেলে?'

বিশিষ্ট প্রবন্ধকার শ্রদ্ধেয় অশোক দাশ 'নন্দন' পত্রিকার ৪ ডিসেম্বর, ২০১৬ সংখ্যায় 'যাত্রাপালায় লেনিন' শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন, যেখানে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে যাত্রার তৎকালীন প্রেক্ষাপট, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, লেনিন পালায় শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিকতা, প্রায় প্রতিটি দৃশ্য ধরে ধরে নাটকের কাঠামো বিশ্লেষণ, দর্শকবৃন্দের উন্মাদনার কথা, এমনকি নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষে 'লেনিন' পালার পুনরভিনয়ের দাবির কথাও। তাঁর প্রবন্ধে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ফাঁকফোঁকরও তিনি হতে দেননি। স্বভাবতই এ রচনায় তার পুনরাবৃত্তি ঘটাই স্বাভাবিক। তবু চেষ্টা থাকবে একটু অন্যভাবে উপস্থাপনার।

নট-নাট্যকার-নির্দেশক শম্ভু বাগের (১৯৩৬-২০০২) বাবা ছিলেন সূর্যনারায়ণ, মা মায়ারানি। তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিল চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে দামোদর পার করে এলেন বর্ধমানে কলেজের পড়াশোনার জন্য। মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে কোনো বস্তির চালাঘর, কখনো কারোর নির্মীয়মান বাড়িতে জানালা-দরজায় খড়ের ঝাঁপ বন্ধ করে। রোজগার বলতে দু-চারটে ট্যুইসনি। পড়াশোনার পাশাপাশি চলত কাব্যচর্চা ও অভিনয়চর্চা। 'মায়াসূর্য' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছিলেন বন্ধুবান্ধবদের আর্থিক সহায়তায়। 'একাঙ্কি' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিল 'বাগেশ্রী' ছদ্মনামে। তারপর যাত্রা, নাটক, বিষয়ে বাংলার প্রথম পত্রিকা 'যাত্রাজগৎ' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন বর্ধমান থেকে। তারই মধ্যে গ্রন্থপাঠ ও নাট্যরচনা। কোনো রাজনৈতিক দলের তকমা না এঁটেও তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত কমিউনিস্ট। বর্ধমানে বিভিন্ন অ্যামেচার গোষ্ঠীর সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার দে, নন্দগোপাল রায়চৌধুরী, সৌরীন্দ্রমোহন প্রমুখ

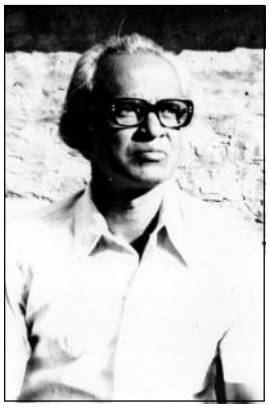

প্রতিষ্ঠিত পালাকারদের পালায় অভিনয় করছিলেন। কিন্তু কোথাও যেন একটা অতৃপ্তি থেকে যাচ্ছিল। ষাটের দশকের গোড়ায় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, 'বর্ধমান নবনাট্য আন্দোলন গ্রুপ'। নামকরণের মধ্যেই এর উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। নাটক ও যাত্রা দুই-ই অভিনীত হয়েছে এই নাট্যদলের উদ্যোগে। শম্ভু বাগের প্রথম রচনা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল মানুষদের জীবন নিয়ে 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দুর্ভিক্ষ ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস নিয়ে 'পৃথিবী তোমায় সেলাম' অভিনীত হচ্ছিল সগৌরবে বর্ধমানের এখানে ওখানে। ইতিমধ্যে ১৯৬৫-তে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় সাংসারিক দায়িত্ব বাড়লেও রোজগার বাড়েনি এতটুকু। বর্ধমানের অদূরে খানা জংশনের পার্শ্ববর্তী গ্রাম সাটীনন্দীতে একটা স্কুল খোলার তোড়জোড় চলছিল। সেখানে যোগ দিলেও দু-চার মাস পরপর সামান্য কিছু জোটে। ইচ্ছে ছিল কোলকাতার দলে নাম লেখানো। কিন্তু পিছুটান ছিল ইস্কুলটার। তাই সব দিক বজায় রাখতে যোগ দিলেন বোলপুরের শক্তিপদ সাহার শ্রীদুর্গা অপেরায়; নাট্যকার, অভিনেতা ও পরে পরিচালক হিসেবে রয়ে গেলেন ১৯৬৫ সাল থেকে। স্কুলের ছুটির পর ট্রেন-বাস ধরে পৌঁছে যেতেন আসরে। আবার ভোরবেলায় একইভাবে সরাসরি স্কুলের পথে রওনা। গ্রামের কোনো বন্ধুর বাড়িতে দুপুরের খাওয়া সারতে হতো। এইভাবে কখনো টানা তিনচারদিন বাড়ি, সংসার কিংবা ঘুমের সঙ্গে সংযোগ থাকতো না। এই দলে বেশিরভাগ সময় 'সোনাই দীঘি, 'সতীর ঘাট', 'মার্ডার', 'মীরার বঁধুয়া', 'দেবী সুলতানা', 'কোহিনুর', 'নাচমহল' প্রভৃতি পালার অভিনয় হতো। শম্ভু বাগ সেখানে বৃত্রাসুরের কাহিনি অবলম্বনে 'মেঘমুক্তি' (পরে 'স্বর্গের সিংহাসন'), আলাউদ্দীন খিলজির উত্থান নিয়ে লেখা 'দ্বিতীয় সেকেন্দার' এবং ধনতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব শেষে সমাজতন্ত্রের জয় সম্বলিত কাল্পনিক পালা 'কাঞ্চী-কাবেরী' রচনা-পরিচালনা ও অভিনয় করেন।

দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করা শম্ভুর মাথায় তখন কিলবিল করছে। বিপ্লব আর সাম্যবাদের পোকা। তাই যাত্রাজগতে তখনো যখন পৌরাণিক পালার রমরমা, কান পতলে শোনা যায় ঐতিহাসিক

পালার তরবারির ঝনঝনানি—তখন শম্ভুর কলমে উঠে এলো বৈপ্লবিক কাহিনি 'বৈতালিক' (পরে 'ঘুম ভাঙার গান')। বর্ধমানের প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, মৃত্যুঞ্জয় দাঁ, কৃষ্ণকুমার মণ্ডল, কালীপদ চৌধুরী, নারায়ণ রায়, স্বদেশ রায়, রাখাল সিংহ, গৌরী দাস (পরে রাখাল সিংহরে ঘরণী), প্রভাতকুমার প্রমুখ সহযোগীদের নিয়ে 'বর্ধমান নবনাট্য আন্দোলন গ্রুপ' গড়ে গলসীর পুরোনো সিনো হলে 'বৈতালিক' পালার অভিনয় করলেন শম্ভু বাগ। চারদিকে প্রশংসার বন্যা বয়ে গেল। ইত্যবসরে বর্ধমানে অভিনয় করতে এলেন শান্তিগোপাল। মূলত তাঁর বন্ধু ও গাইড কৌতুক অভিনেতা শিব ভট্টাচার্যের আগ্রহেই তাঁরা তরুণ নাট্যকারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে 'বৈতালিক' ও 'দ্বিতীয় সেকেন্দার' পালা-দুটি নিয়ে গেলেন পরের বছর অভিনয়ের জন্য। ১৯৬৭ সালে 'বৈতালিক' পালা, 'ঘুম ভাঙার গান' নামে, প্রথমে শিব ভট্টাচার্যের উদ্যোগে 'যাত্রা শিল্পী সংঘ'-এ এক রাত্রি অভিনয়ের পর তরুণ অপেরায় অভিনীত হয়। যাত্রার যাত্রাপথ বদলের সেই শুরু। পরের বছর ১৯৬৮-তে কলেজজীবনে নাট্য কাঠামোর বদলের প্রচেষ্টায় মক্‌শো করা 'হিটলার' পালাটি পুনর্লিখন করে পেশ করলেন।

'হিটলার' পালার উপস্থাপনার সঙ্গেসঙ্গেই যাত্রার নতুন ইতিহাস তৈরি হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি নায়কের বীভৎস রূপ সম্বলিত বিশ্ব ইতিহাসের পাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া একটা অধ্যায় যেমন কাহিনির দিক থেকে একেবারে নতুন, তেমনি উপক্রমণিকা, প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব, উপসংহার—এই চারটি পর্বে বিন্যস্ত পালাটি নাট্য কাঠামোর দিক থেকেও নতুন। আবার উপস্থাপনায় টেপ রেকর্ডারে কামান, বোমা, গুলি ও প্লেনের শব্দ প্রক্ষেপও নতুন। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে শান্তিগোপালের পৈতৃক বাড়ি বন্ধক দিয়ে পালার জন্য পোশাক, সরঞ্জাম কিনতে হয়েছিল। বীরভূমের কোনো আসরে ডবল-শো দিয়ে এর উদ্বোধন হয়। প্রথম শো-তে হতাশাজনক পরিস্থিতি তৈরি হলেও দ্বিতীয় শো-তে দর্শক ভেঙে পড়ে।

পাঠক মার্জনা করবেন। ভাববেন না, ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি। কারণ বাংলার লোকনাট্য যাত্রার মঞ্চে রাশিয়ার বিপ্লবী নায়ক 'লেনিন'-এর প্রবেশ বিশেষ সুগম ছিল না। 'ঘুম ভাঙার গান'-এর মতো বৈপ্লবিক পালা এবং 'হিটলার' প্রযোজনার মাধ্যমেই দর্শকমনে 'লেনিন'-এর বিশ্বযোগ্যতা তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিও খুব একটা সুবিধের ছিল না। ১৯৬৭-র যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন এবং ভেঙে যাওয়া, পুনরায় ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন, আবার তা ভেঙে যাওয়া, শাসকদলের মস্তান বাহিনীর যথেচ্ছ নিপীড়ন, জরুরি অবস্থা—ইত্যাদি সব মিলিয়ে এক টালমাটাল সময়ে আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে লেনিনের জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে প্রযোজিত হয় 'লেনিন'। হ্যাঁ, কলকাতার প্রগতিশীল থিয়েটার-দলগুলিকেও পিছনে ফেলে সামনের সারিতে চলে আসে বাংলার লোকনাট্য যাত্রা। যাত্রার মঞ্চে অভিনেতারা লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে শ্লোগান দিয়েছে—'দুনিয়ার মজদুর এক হও' কিংবা 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্'। যাত্রার বিবেকের গানকে সরিয়ে রেখে সম্মিলিত কণ্ঠে গেয়েছে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত—'জাগো জাগো সর্বহারা'। বলশোভিকদের জয়ে উদ্বেলিত দর্শকদের করতালিতে মুখর হয়ে উঠেছে আসরের পর আসর। লেনিনের দেখানো পথকে মনে মনে গ্রহণ করে স্বপ্ন দেখেছে বাংলার শ্রমিক যুবক-মেহনতি জনতা, লেনিনের আদর্শকে গ্রহণ করে ভরিয়ে তুলেছে বামপন্থী জনসভার ময়দান।

১৮৭০ সালের ১০ এপ্রিল থেকে ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত লেনিনের জীবন থেকে খুব সামান্য অংশই 'লেনিন' পালায় ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯১৭-র অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্বেই নাট্যকাহিনির শুরু। নাট্যকাহিনির শেষ হয় বিপ্লবের পরপরই রাষ্ট্র পরিচালনার কমিসার কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নানাজনের নাম ঘোষণার মধ্যে এবং সেখানেই ঘোষিত হয় যে প্রায় ৪০ কোটি একর কৃষিজমি শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হবে। শুধু তাই নয়, কৃষকদের খাজনা সম্পূর্ণ মুকুব করা হবে। খনিজ সম্পদ, অরণ্য, জলাশয় প্রভৃতি জনগণের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে। শুধু শীতপ্রাসাদ নয়, সমগ্র রাশিয়া আজ মেহনতি মানুষের সম্পত্তি। রাগের বশে বোকার মতো কিছু ভেঙে ফেলা যেন না হয় রাষ্ট্র গঠনের পরবর্তী অধ্যায় নাটকে নেই, নেই কৈশোর ও যৌবনের কাহিনি। শুধু তারই মধ্যে শোনা যায় ভলোদয়া থেকে লেনিন হয়ে ওঠার কাহিনি। লেনিন পালার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃশ্য—যেখানে লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে এসে নগিনের মা ভেরা আবিষ্কার করেন তাঁর ছেলেবলার সাথী ভলোদয়াকে। লেনিন জানতে চান ভল্গা নদীতে এখনো ঝাঁকে ঝাঁকে নৌকো ভাসে কি না, সিমবির্স্কের ঘোলা জলাটায় বকগুলো বসে কি না? ভেরা জানতে চায়—আজও কি লেনিনের মধ্য সিবির্স্কের ভলোদয়া বেঁচে আছে?

> লেনিন ।। আমি তো লেনিন হতে চাইনি ভেরা, আমি তোমাদের মাঝে ভলোদয়া হয়েই বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যেদিন দেখলাম জমিদারের পাইক এসে তোমার মামাকে খাজনার দায়ে বেগার খাটিয়ে প্রহারে প্রহারে আধমরা করে তুললো, যেদিন শুনলাম ঐ জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েই আমার প্রাণের সসাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়েছে, সেদিন থেকেই কে যেন আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিল আবাল্যের সবুজ স্বপ্ন, মুখের হাসি কেড়ে নিয়ে, আনন্দের পশরা উলটিয়ে, প্রেমের মিনার চূর্ণবিচূর্ণ করে আমাকে গড়ে তুললো কঠোর কর্কশ এক তর্কবাগীশ করে।
>
> ভেরা ।। ভলোদয়া!
>
> লেনিন ।। যখনই ইচ্ছে হয় সিমবির্স্কের সেই উইলো বনে ছুটে বেড়াই, যখনই ইচ্ছে হয় ভলগার ঢেউয়ের ঝুঁটি জাপটে ধরে সাঁতার কাটি, যখনই ইচ্ছে হয় শুম্ নদীর জমাট বাঁধা বরফের বুকে দল বেঁধে স্কেটিং-এ যাই, তখনই মনে ব্যথার সমুদ্র তোলপাড় করে জেগে ওঠে দারিদ্র্যের বিশালবাহু অক্টোপাস, ওটা যেন তার সবকটা পা দিয়ে আমার টুঁটি চেপে ধরে আমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে তোলে।
>
> ভেরা ।। ভলোদয়া!
>
> লেনিন ।। তখনই দেখতে পাই—একটি ভেরা যেন সহস্র ভেরা হয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদছে, তখনই দেখতে পাই একটি ইভান যেন লক্ষ ইভান হয়ে বুর্জোয়াদের বিশাল প্রাসাদের দিকে বুভুক্ষু নয়নে তাকিয়ে আছে, তখনই দেখতে পাই একটি ভলোদয়া কোটি কোটি লেনিন হয়ে ওই রক্তমুখী অক্টোপাসের বাহুচ্ছেদনে তুলে ধরছে কোটে কোটি কাস্তে আর হাতুড়ি।

নাট্যকার নাটকে তিনটি অঙ্ক দেখিয়েছেন। প্রথম অঙ্কের দৃশ্যগুলিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঠাঁই পেয়েছে : লেনিন বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ইশ্‌তেহার বিলির দায়িত্ব বন্টন করেছেন। ইশতেহার সঙ্গে রাখার অপরাধে ধৃত জিরিয়ানভকে জুঙ্কার বাহিনীর নেতা স্তেপানের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন ছদ্মবেশী লেনিন। ওবেশ্বেয়ে দেলো পত্রিকার সম্পাদক বুর্ৎসেভের মাধ্যমে বুজোয়া সংবাদপত্রের ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন, বুঝিয়েছেন কারো জয় পরাজয় তাদের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হলো মুনাফা।

বুর্ৎসেভ ।। ... হাজার হাজার ছবি তোলা আছে। নারীর ওপর অত্যাচার, শিশুহত্যা, লুটপাট,...
কেরনেস্কি ।। এ সবই কি বলশেভিকরা করেছে?
বুর্ৎসেভ ।। কে করেছে তাতে কী যায় আসে? সবকটাকেই বলশেভিক বলে চালিয়ে দেব।

বলশেভিকদের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের সময় আন্তনিও-র গুলিতে স্তেপান আহত হয়, কিন্তু লেডি শক্ ব্যাটেলিয়ানের পরিচালিকা মিস্ শাশার গুলিতে আন্তনিও-র রিভলভার পড়ে যায়। শাশা তার হাতে হাতকড়ি পরালেও অন্যমনস্কতার সুযোগে হাতকড়ার অপর প্রান্ত শাশার হাতে পরিয়ে লক করে দেয়। এখন দুজনেই পরস্পরকে বন্দি বলে দাবি করে। হাতকড়ার ওপর কোট চাপিয়ে লেনিনের সঙ্গে দেখা করার সময় শাশা নিজেকে কেরনস্কি সরকারের লোক বলে পরিচয় দিয়ে গোপন কথা বলতে নিষেধ করে। মানবচরিত্র অধ্যয়নে দক্ষ লেনিন বলেন, শত্রুপক্ষের লোক হলে একথা সে বলতো না, বরং শোনাতেই আগ্রহ বেশি থাকত। সে এখন বলশেভিকদের ক্ষতি চায় না বলেই গোপন কথা শুনতে চায় না, যদি সরকারের লোক সেকথা আদায় করে নেয়। শাশা লেনিনকে গুলি করার হুমকি দেয়। লেনিন বলেন—'একটা বুলেট খরচ করে একটা বিরাট গণঅভ্যুত্থানকে দমন করা যায় না মিস শাশা বরং সে অভ্যুত্থানের আগুনে ইন্ধন জোগানো হয়।" লেনিন আন্তনিওকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন, আশ্বাস দেন বিপ্লবীরা তাকে ছাড়িয়ে আনবে। কারণ সাধারণ কামারশালে হাতকড়া ভাঙা গেলেও শাশার প্রাণসংশয় হতে পারে।

প্রথম অঙ্কে আরো দেখানো হয়েছে যে 'রাবোচিপুট' পত্রিকা সরকার ও তার সহযোগী কোটিপতিদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে-কোনো মূল্যে লেনিনকে গ্রেপ্তার করতে তৎপর সরকার। সরকারি তৎপরতায় বেশ কজন ছদ্মবেশী লেনিনকে লেনিন সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। ছদ্মবেশী লেনিনদের ওপর অত্যাচার নেমে আসে। ক্ষুব্ধ কেরনেস্কি 'রাবোচিপুট' পত্রিকার দপ্তর কামান দেগে উড়িয়ে দেবার নির্দেশ দেন।

নাটক প্রবেশ করে দ্বিতীয় অংকে। স্কুলের ছাত্রছাত্রী মিখাইল ও লেনা বাদামের ঠোঙা ছাড়িয়ে ইশতেহার পড়তে আগ্রহী। ঝাড়ুদারের ছদ্মবেশী নাগিনের গলায় ওরা ঝাড়ুর ডান্ডা চেপে ধরে। আন্তনিও ওকে বাঁচায়। 'রাবোচিপুট' পত্রিকার দপ্তর উড়িয়ে দিতে এক মিনিট সময় দেওয়া হয়। কয়েক সেকেন্ড আগে চকিতে হ্যান্ড গ্রেনেডে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় মিখাইল। সাঁজোয়াটি ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে মিখাইল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মনে পড়ে যায় অগ্নিযুগের কিশোর বিপ্লবীদের কথা। এদিকে ছদ্মবেশী লেনিনদের কোর্টমার্শাল করার সময় শ্বেতরক্ষীবাহিনী গুলি চালাতে অস্বীকার করে। শাশাও ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছে বলশেভিকদের সঙ্গে। লেনিনের বক্তৃতায় জানা যায় কেন্দ্রীয় ডাকঘর, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সরকারি দপ্তরগুলি বলশেভিকরা দখল করেছে। বাকি শুধু শীতপ্রাসাদ। সামরিক সদর দপ্তর অচিরেই হাতে এসে যাবে। এই অংশে স্বল্প পরিসরে লেনিন-ট্রটস্কি দ্বন্দ্বকে সহজভাবে উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকার। লেনিন বলেন, ''দেখুন, বিপ্লব আপনিও চেয়েছিলেন, আমিও চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি হতে চেয়েছিলেন রোম্যান্টিক কল্পনাপ্রবণ বিপ্লবী—আর আমি হতে চেয়েছি বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী। নির্বাসনে থাকার সময় আপনি যখন প্রবাসী বিপ্লবীদের নিয়ে দল গড়তে ব্যস্ত, আমি সেই অবস্থায় ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের বীজমন্ত্র সংগ্রহ করেছি। আপনার জ্বালাময়ী ভাষায় আপনি যখন উত্তেজিত জনতার হাতে রিভলবার তুলে দিচ্ছেন, আমি তখন সর্বহারা জনতার হাতে তুলে দিচ্ছি তাদের আত্মপরিচয়ের হিসাব, রিভলবারের বদলে ডাস্ ক্যাপিটালের এক একখানা পাতা। কারণ আমি বুঝেছিলাম, যেদিন তারা নিজেদের চিনতে পারবে, সেদিন তারা নিজেরাই অস্ত্র সংগ্রহ করে নেবে।"

অবস্থা বেগতিক দেখে রকফেলার বুশিনস্কি পালিয়ে বাঁচে। বিপ্লবীদের হাতে ধরা পড়ে বুর্ৎসেভ্। ওরা ক্যামেরার ফিল্ম খুলে বার করে নেয়। বিপ্লবীদের নির্যাতনে জেরবার বুর্ৎসেভ অবশেষে অন্তর্বাস পরে পালাতে বাধ্য হয়।

উন্মাদিনীর বেশে শাশা এবং নানের ছদ্মবেশে ভেরা শীতপ্রাসাদে ঢুকে পড়ে। কেরনেস্কি ও তেরশ্চেঙ্কো ও স্তেপান রক্ষীদেরকে এদের ওপর নজর রাখতে বলে চলে যায়। কিন্তু বাইবেলের অন্তরালে থাকা ইশতেহার রক্ষীদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে ওদের বোকা বানিয়ে ভেরা ও শাশা পালিয়ে যায়। শ্বেতরক্ষীদের উদ্দেশ্যে লেখা ইশ্‌তেহার দেখে ওরা লুকিয়ে ফেলে। এদিকে শীত প্রাসাদের দিকে বিপ্লবীদের কামান গর্জে উঠলেও প্রাসাদরক্ষীদের কামান থেকে তার উত্তর না যাওয়ায় দিশাহারা হয়ে পড়েন কেরনেস্কি ও মার্শাল তেরেশ্চেঙ্কো।

নাটক প্রবেশ করে শেষ অংকে। গোপন ঘাঁটিতে মিটিং করছেন লেনিন, স্তালিন এবং ট্রটস্কি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তেরেশ্চেঙ্কো শ্বেতরক্ষী বাহিনী নিয়ে প্রতি বাড়িতে চিরুনিতল্লাশি চালান। আন্তনিও, লেনিন, স্তালিন ও ট্রটস্কির পিঠে লঙ-কোট চাপা দিয়ে বসার জায়গা বানিয়ে মদের আসর জমায় জিরিয়ানভ, নসিন ও পাভেলকে নিয়ে। নাচগানে যোগ দেয় আশা ও লেনা। সন্দিগ্ধ তেরেশ্চঙ্কো দুজন রক্ষীকে প্রহরায় রেখে ওদের স্ফূর্তি করতে বলে বেরিয়ে যান। রক্ষীরা মদ খেয়ে বন্দুক রেখে ওদের নাচগানে যোগ দেয়। গানের শেষে রক্ষীরা বন্দি হয় বিপ্লবীদের হাতে।

পরবর্তী দৃশ্যে লালফৌজ ক্যাশেলের বন্দিদের মুক্ত করে হাতকাটা স্তেপানকে পেত্রোগ্রাদের রাজপথে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঠেলতে টেলতে নিয়ে চলে। ওদের বন্দুকের ঘোড়া টিপে স্তেপান আত্মহত্যা করে। এদিকে বুর্ৎসেভ ও বুশিনস্কি পালানোর চেষ্টা করে। মাইকে ঘোষণা শোনা যায় শীতপ্রাসাদ দখলের ও সরকারের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার খবরের। ছদ্মবেশে কেরনেস্কি ও তেশ্চেঙ্কো পালানোর সময় তেরেশ্চেঙ্কো নগিন, আন্তনিওদের মাঝে ঘেরাও হয়ে পড়ে। তেরেশ্চেঙ্কোর ছোঁড়া গুলিতে নাগিন প্রাণ হারায়। এই বিয়োগব্যথার মধ্যেই বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটে। শেষ দৃশ্যে স্মোল্‌নি ইনস্টিটিউটের জনসভায় আন্তনিওর হাতুড়ি আর শাশার কাস্তে মিশে গিয়ে বিপ্লবের প্রতীক তৈরি করে। লেনিনের উপস্থিতিতে বিভিন্ন দপ্তর বন্টনের মধ্যে নাটক শেষ হয়।

লেনিন পালা একই সঙ্গে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, চাকুরে, ব্যবসাদার থেকে শুরু করে শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের জনসমর্থন আদায় করেছিল। এমন ভাগ্য কম লোকেরই হয়। বাস, ট্রাক, ট্রাক্টরে চড়ে দূর দূরান্ত থেকে দল বেঁধে মানুষরা আসতেন 'লেনিন' দেখতে। আশির দশকের মাঝামাঝি তৃতীয় বারের জন্য যখন তরুণ অপেরা দ্বিতীয় প্রযোজনা হিসেবে 'লেনিন' করছিল, তখনও স্বাস্থ্যমেলার উদ্যোগে বর্ধমানে দর্শকদের উন্মাদনার কোনো ঘাটতি ছিল না। লেনিন পালার গ্রামোফোন রেকর্ডের কভারে

কৃষকনেতা হরেকৃষ্ণ কোঙারের স্বীকারোক্তি যথার্থ ছিল যে, ''হাজার রাজনৈতিক বক্তৃতার মাধ্যমে আমরা দেশের সাধারণ মানুষকে যতটা সচেতন করেছি, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি করছে এই যাত্রাপালা।''

সহস্রাধিক রজনী অতিক্রান্ত 'লেনিন' পালা লক্ষ লক্ষ মানুষের মন ছুঁয়ে দোলা দিল সোভিয়েত রাশিয়ার মনেও। সেভিয়েত দেশের পক্ষ থেকে 'লেনিন' ছিনিয়ে আনলো আন্তর্জাতিক সম্মান। লেনিন জন্মশতবর্ষে সোভিয়েত রাশিয়ায় নেহরু পুরস্কার লাভ করে 'লেনিন' পালা। বাংলা, অসমীয়া প্রভৃতি সবকটি ভাষায় সোভিয়েত দেশ পত্রিকায় নাট্যকারের ছবিসহ সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। শান্তিগোপাল পেলেন আমন্ত্রণমূলক সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের সুযোগ। এর আগে ১৯৬৯ সালেই সঙ্গীত নাটকের 'দিশারী' পুরস্কার পেয়েছেন পালাকার শম্ভু বাগ। তবে এ জয় শুধু শম্ভু বাগের নয়, এ জয় পরিচালক অমর ঘোষের, সুরকার হেমাঙ্গ বিশ্বাসের, লেনিনের চরিত্রে শান্তিগোপালের এবং সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। দলগত অভিনয়ে সবাই সেরা হলেও মনে রাখার মতো অভিনয় করেছিলেন কেরনেস্কি চরিত্রে অমর ভট্টাচার্য, বুর্ৎসেভ চরিত্রে অজিত দত্ত ও পরে শিব ভট্টাচার্য, আন্তনিও চরিত্রে সুদেশকুমার, স্তেপান চরিত্রে গুণসিন্ধু মণ্ডল ও পরে বর্ধমানের মহিম পাল, নগিন চরিত্রে বর্ধমানের বাবলু চৌধুরী, শাশা চরিত্রে বর্ণালী ব্যানার্জী, নাদেজদা চরিত্রে বর্ধমানের পুতুল দত্ত (পরে চৌধুরী)। প্রথম অভিনয় হয়েছিল ২৩ আশ্বিন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে কলকাতার মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে।

প্রগতিশীল পালাকার হিসেবে মূলত দু-জনের নাম উঠে আসে। একজন শম্ভু বাগ, অন্যজন উৎপল দত্ত। উৎপল দত্ত চলচ্চিত্র ও থিয়েটারের অবিসংবাদী ব্যক্তিত্ব। তাই বোধহয় শহর কলকাতার বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কাছে উৎপলই হয়ে ওঠেন প্রগতিশীল যাত্রার জনক। বস্তুতপক্ষে উৎপলের আগে এসে শম্ভু বৈপ্লবিক পালা 'ঘুম ভাঙার গান' ও সমকালে 'হিটলার' পালার মধ্য দিয়ে বিশ্বইতিহাসকে সামনে এনে বিষয়বস্তু, রচনার আঙ্গিক এবং উপস্থাপনার বদল ঘটিয়ে যাত্রায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর একে একে কার্ল মার্কস, ক্রীতদাস (স্পার্টাকাস), রক্তাক্ত আফ্রিকা, বিপন্ন বসুধা, কারাগার জাগছে (ম্যান্ডেলা), আগুন জ্বেলে দিল, শত্রু-রক্ত-যুদ্ধ (ড. নর্ম্যান বেথুন) প্রভৃতি পালার মধ্য দিয়ে বিশ্বের জনজাগরণের ইতিহাসকে সামনে এনে বাংলার বামপন্থী মানসিকতাকে উজ্জীবিত করেছেন। তাই মাঝে কখনো 'কালপুরুষ' (বীরসা মুণ্ডা) কিংবা 'রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা' বা 'জ্বালা'-র মধ্য দিয়ে জাতীয় স্তরের গণআন্দোলনের ছবি এঁকেছেন। অন্যদিকে, ১৯৬৮-তে 'রাইফেল' পালার মাধ্যমে যাত্রাজগতে অভিষেক ঘটেছিল উৎপলের। মাত্র বছর কুড়ি আগে প্রাপ্ত স্বাধীনতার পরবর্তীতে বাঙালির ব্রিটিশ-বিরোধী আবেগ তখনও টাটকা। পরবর্তীকালে 'জালিওয়ানাবাগ', 'বৈশাখী মেঘ', 'ফেরারী ফৌজ', 'দিল্লি চলো' প্রভৃতি পালার মধ্য দিয়ে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের সেই ব্রিটিশবিরোধী আবেগকেই উস্কে দিয়েছেন উৎপল। পরে অবশ্য 'মাও জে দং' কিংবা প্যারি কমিউনের পতন অবলম্বনে 'মুক্তিদীক্ষা' (১৯৭৮) জাতীয় পালা রচনা করেন। উৎপল এবং শম্ভুর মধ্যে শম্ভুই অবশ্য বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্বসূরি ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র প্রশংসা কুড়িয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, 'লেনিন' পালার দর্শিত পথে পরবর্তীতে রমেন লাহিড়ী ('রাহুমুক্ত রাশিয়া' ১৯৭১) ও কানাইলাল নাথ (অজেয় ভিয়েতনাম-১৯৭০)-এর মতো পালাকাররা বিশ্ববিপ্লবের নায়কদের যাত্রামঞ্চে উপস্থিত করেন।

লেনিন পালার মূল্যায়ন তো হলো, এবার একটু পালাকারের মূল্যায়নে চোখ রাখা যাক্। যিনি অন্যান্য অনেক পালাকারদের মতো ব্যবসায়িক পালা রচনা করে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হতে পারতেন, তিনি দু-এক বছর অন্তর শান্তিগোপালের মর্জিমাফিক পাওয়া যৎসামান্য টাকা আর আজীবন শিক্ষকতার বেতনের ওপর নির্ভর করে অসচ্ছলভাবে জীবন কাটিয়ে গেছেন। তবু তারই মধ্যে তিনি যাত্রাকে বুর্জোয়া মালিকদের কবলমুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। (তারই পথনির্দেশ রেখেছেন 'সূর্য ওঠার আগে' একাঙ্কতে)। স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন একটি স্বাধীন যাত্রামঞ্চের যা হবে সারা বর্ধমান তথা বাংলার সমস্ত অপেশাদার যাত্রাসংস্থাগুলোর প্রগতিশীল যাত্রা প্রদর্শনীর একমাত্র নিজস্ব মঞ্চ। কয়েকটা বছর রাতের পর রাত জেগে তাঁর নাট্যদলের ছেলেদের নিয়ে সারা বাংলা চষে বেড়িয়েছেন। যাত্রার উপার্জিত অর্থে এবং ব্যক্তিগত বিশাল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে বর্ধমান স্টেশনের কাছেই বিঘে খানেক একটা জলাভূমি কিনে ফেললেন। এর জন্য অবশ্য দু-চারটে যাত্রা ও সিনেমার চ্যারিটি শো করতে হয়েছিল এবং আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের কাছে কমবেশি হাত পাততেও হয়েছিল। এ সবই তিনি করেছেন সত্তরের দশকে, যখন তিনি খ্যাতির শিখরে। যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে অজস্র খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের কেউ তাঁদের চেনাছকের বাইরে এমনতরভাবে অগ্রসর হয়েছেন বলে অন্তত আমার জানা নেই। যাই হোক, এখানেই দম শেষ। ধার দেনা শোধ করতেই যার দিন যায়, মঞ্চ গড়ার সামর্থ্য কোথায় তার? অচিরেই তাই সরকারি সাহায্যের প্রত্যাশায় একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে জমি হস্তান্তর (১৯৮৩) করলেন ওঁরা। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে দিয়ে শিলান্যাসও (১৯৮৭) করা হল। শিলান্যাসের শ্বেতফলকটি বুকে করে ওঁরা কাটালেন ১৩-১৪ বছর। তারপর কাগজওয়ালাদের বিস্তর লেখালেখির চাপে ২০০০ সালের পরবর্তীতে জলাভূমি ভরিয়ে ঘেরা দিয়ে একটা ধাঁচা গোছের কিছু হলো। সেটা করতে গিয়ে মঞ্চকে প্রায় সিকিভাগ জমি, রাস্তা ও ড্রেনের জন্য ছেড়ে দিতে হয়। এ-যেন ঢাকের দায়ে মনসাই বিক্রি হওয়ার মতো অবস্থা। তবু সবটুকু কাজ হওয়ার আগেই শম্ভু বাগ জীবনের শেষ দৃশ্যে অভিনয় করতে নামলেন।

তবে কি তিনি কিছুই পেলেন না? হ্যাঁ, পেয়েছেন বৈকি! পেয়েছেন অবজ্ঞা, অপমান, লাঞ্ছনা। মাত্র একবার তাঁকে রাজ্য সরকার পুরস্কৃত করে (১৯৮৮)। অথচ সে পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠানে তাঁকে আহ্বান করা হয় না। খবরের কাগজ পড়ে জানতে হয় সে খবর। তাকে কয়েক মাস বাদে মার্চের শেষ সপ্তাহে পুরস্কারের অর্থমূল্যটুকু ভিক্ষা করে আনতে হয় মৌলালীর তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর থেকে।

তারই মধ্যে সান্ত্বনা এই যে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে স্থানীয় বিধায়ক এবং মন্ত্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের উদোগে শম্ভু বাগের স্বপ্নের মঞ্চটি 'শম্ভু বাগ মুক্তমঞ্চ' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষে ফিরে দেখা মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব

রমজান আলি

বিপ্লবের ইতিহাসে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকা কম ছিল না। ইতিবাচক দিক থেকে এঁরা মানুষের অধিসত্তায় আগুন লাগিয়ে সমাজ পরিবর্তনের কারিগর হয়ে ওঠেন, আর নেতিবাচক দিক থেকে এঁরা শাসক সম্প্রদায়কে নানাভাবে অস্থির করে তোলেন। ভবিষ্যৎ ভাবনায় প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে তাঁদেরকে বিতাড়িত করার কথা বলেছিলেন। কারণ তাঁরাই তো হেগেল-কথিত পরিবর্তনশীল মনকে চিন্তায় ফেলেন, বিপরীতের সমন্বয় ও দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেন। তাছাড়া এঁরা করেনটা কী? প্লেটো সাহিত্যকে অনুকরণ বলতে গিয়ে অনুকরণের সংকীর্ণ 'অবিকল প্রতিরূপ'-এর কথাই ভেবেছিলেন। তাঁর মতে জগৎ হল অতীন্দ্রিয় কিছু ভাব বা আইডিয়ার সমাহার। এই আইডিয়াগুলি চরম ও নিখুঁত সত্য। বিশ্বের যাবতীয় বস্তু সেই আইডিয়াগুলির অসম্পূর্ণ অনুকরণ। আবার মানব-বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর অনুকরণ হয় শিল্পে। তা আরও অসম্পূর্ণ। তাই শিল্প অনুকরণের অনুকরণ; এবং সত্য থেকে দুই বা তিন ধাপ দূরে অবস্থিত। তা হলে এর প্রয়োজনটা কোথায়?

মার্কসবাদী সাহিত্য

মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব অন্যান্য সাহিত্যতত্ত্ব থেকে ব্যতিক্রম। কারণ অন্যান্য সমস্ত সাহিত্যতত্ত্ব কম বেশি সাহিত্যের জন্যই রচিত হয়, মার্কসবাদী সাহিত্য একান্তভাবেই সমাজমুখী সৃজনশীল চেতনা থেকে উদ্ভূত। এই নীতির অধীনে সাহিত্য বিচার করেছেন কার্ল মার্কস এবং তাঁর সহযোগী এঙ্গেলস।

> জীবন ধারার ছাপ চেতনাকে করে
> চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়। (সমর সেন : ক্রান্তি)

অর্থাৎ চেতনার ছাপ জীবনধারায় নয়, কিন্তু জীবনের ছাপ চেতনায় রয়েছে। জীবন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা জ্ঞান-চেতনাকে তৈরি করে। অর্থাৎ চেতনা জীবনধারা-সম্ভূত বা জীবনধারা-জাত। ব্যক্তিগত জীবন সুন্দর হলে জীবন-চেতনাও সুন্দর হয়। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টি তৈরি করে জীবনদর্শন। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক আবহাওয়ার প্রভাব দৈনন্দিন জীবনে পড়ে—সেটা পরোক্ষও হতে পারে। সেই জীবনদর্শন তৈরি করে জীবন-চেতনা।

সাহিত্য সম্পর্কেও এঙ্গেলস বললেন, তাঁরাও মানছেন শিল্প-সাহিত্য স্রষ্টার সৃজনশীল চেতনা থেকে উদ্ভূত। কিন্তু এই সৃজনশীল চেতনা কোনো আমূল বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, এরও একটা শিকড় আছে। মাটির অভ্যন্তরে শুনতে পায় অতল জলের আহ্বান, আকাশের দিকে প্রসারিত করে দেয় তার প্রত্যঙ্গ, বাতাসের দোলে দোলায়িত হয় তার স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ। শেক্সপিয়ার, গ্যেটে, স্কট, বালজাক—এঁরা ছিলেন তাঁদের মনঃপুত সাহিত্যিক। কারণ সাহিত্য-শিল্পের একটা সার্বভৌম অর্থ আছে—যার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত সমাজ।

মার্কস-এঙ্গেলস বললেন—সৃজনশীল চেতনা ব্যাখ্যা করা যায় না, এমন নয়। এই কারণেই শিল্প-সাহিত্যকে বুঝকে হবে শিল্প-সাহিত্যের নিজত্বে নিহিত বিকাশ পদ্ধতি থেকে। এই নিজত্বে নিহিত শিল্প-সাহিত্যের বিকাশপদ্ধতির অস্তিত্ব কিন্তু এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে। এইখানেই মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মৌলিকতা। মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব শিল্প-সাহিত্যের যে একটা সামাজিক স্বরূপ বা প্রকৃতি আছে তা প্রথম উল্লেখ করলেন। অর্থাৎ এতকাল শিল্প-সাহিত্যের বিচার হয়েছে সমাজ ব্যতিরেকে। কিন্তু সেটা ভুল। কারণ শিল্প-সাহিত্য সমাজ থেকে উদ্ভূত। সমাজ আসলে শ্রেণিবিভক্ত, সেখানে শিল্প-সাহিত্যও শ্রেণি-বিরোধিতার দ্বারা প্রভাবিত। শিল্প-সাহিত্য সেইজন্য নিরপেক্ষ হতে পারে না। সমস্ত সামাজিক কাঠামোর মূলে আছে আর্থিক ভিত্তি, এই আর্থিক ভিত্তি অসমবন্টিত হলে উপরিতলও দুর্বল হবে। এক্ষেত্রে শিল্প-সাহিত্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তারা শোষক শ্রেণির ভিত নড়িয়ে দিতে পারে।

মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের সাহিত্যতত্ত্বে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উল্লেখ করেছেন। সমস্ত সময়ে সমাজে মানুষের জীবনে একটা দ্বন্দ্ব বা দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি আছে (এই দ্বন্দ্বের কথা ভাববাদীরা অন্যভাবে বলেছেন)। এই দ্বন্দ্ব আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির সঙ্গে আর্থিকভাবে সবল শ্রেণির দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্ব কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও পরোক্ষ। সৃজনশীল শিল্পকে এইজন্যই বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ বাস্তবকে দেখার জন্যই তো শিল্পকর্ম। অবাস্তব, অলৌকিক জগৎ শিল্পকর্ম নয়। বাস্তবজীবনের প্রতিফলন বা মানব জীবনের ঘটনার অনুকরণই শিল্প-সাহিত্য। তাকে অবশ্যই সাহিত্যের শর্ত মেনে চলতে হবে।

মানবিকতার আত্মিক বিকাশকে প্রভাবিত করার সব চাইতে অমোঘ চালিকা শক্তি শিল্প-সাহিত্য। তার নিজস্ব একটা শর্ত আছে। সেই শর্তের সাপেক্ষে তার যে সামাজিক গুরুত্ব সেটা দেখাই তো বাঞ্ছনীয়।

লেনিনের কালে পার্টি-সাহিত্য

তুলনামূলকভাবে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন তাঁর পূর্বসূরি মার্কস ও এঙ্গেলসের মতো ব্যাপকভাবে শিল্পসাহিত্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করার এতোটা সময় হয়তো পান নি। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে লেনিনের

নেতৃত্বে রুশবিপ্লব সফল হলেও প্রথমদিকে অন্তর্ঘাত এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরোধিতা তাকে সামলাতে হয়েছিল।

তার অনেক আগে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লেনিন 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' সম্পর্কিত মতামত প্রকাশ করেন। একটি বিতর্কিত বিষয়। লেনিন তাঁর এই প্রবন্ধে শিল্পসংস্কৃতির চালিকাশক্তির ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন। উক্ত প্রবন্ধটি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর 'Novaya Zhizn' (নোভায়া ঝিন্) পত্রিকার ১২ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটিতে লেনিন কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে—

১. নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় লেখক কিংবা যে-সব লেখক নিজেদেরকে অতিমানব মনে করেন তারা নিপাত যাক। সর্বহারা শ্রেণির পক্ষে থেকেই শিল্পসাহিত্য রচনা করতে হবে।

২. তিনি সাহিত্যকে একটি চাকার দাঁতের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। যা আসলে একটি যন্ত্র। পার্টির কাজকর্মের সঙ্গে শিল্পসাহিত্যের সরাসরি যোগ থাকবে।

৩. সংবাদপত্রগুলি হবে পার্টিসংগঠনের মুখপত্র। পাশাপাশি বই ছাপানোর কেন্দ্র, বইয়ের দোকান, রিডিং রুম, লাইব্রেরি এমনকি লেখক পর্যন্ত পার্টির নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

৪. পার্টির নিয়ন্ত্রণে পার্টির একটি প্রকাশন সংস্থা থাকবে যা পুলিশ শাসনমুক্ত, ধনী শাসনমুক্ত এবং ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে।

৫. বিষয়টি পাঠকের কাছে অপমানজনক মনে হলেও তা চিন্তাদর্শগতভাবে গ্রাহ্য।

৬. সমস্ত প্রকার সামাজিক গণতান্ত্রিক সাহিত্যকে পার্টিসাহিত্য হতে হবে।

৭. শিল্পীর চূড়ান্ত স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। বৃহত্তর শ্রমজীবী মানুষের পক্ষ নিয়েই তাকে কাজ করতে হবে।

প্রবন্ধটিতে শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে লেনিনের এই নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে পার্টি-নিয়ন্ত্রিত। যেখানে লেখকের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। স্বাভাবিকভাবেই শিল্পী-সাহিত্যিকেরা তাদের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে বলেই মনে করেন। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন যে, লেনিন আসলে তাঁদেরকে (শিল্পী ও সাহিত্যিকদের) পার্টি ও রাষ্ট্রের সমালোচনায় না থেকে সৃষ্টির কাজে মন দিতে বলেছেন। কিন্তু অধিসত্তা থেমে থাকে না। শেষ পর্যন্ত রাশিয়ায় যা ঘটেছিল তাতে করে লেনিনের সময়কাল থেকেই ধীরে ধীরে একটা বিরোধী পক্ষের সূত্রপাত ঘটে।

ট্রটস্কির ভাবনা

প্রথমে বিরোধী পরে লেনিনের সহযোগী ট্রটস্কি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রের প্রয়োজন আছে কিনা, কিংবা রাষ্ট্র তার কার্যকলাপে সমালোচিত হবে কিনা—এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। মতাদর্শগত সংগ্রাম তখনও কার্যকর ছিল। ১৯২০ সালে অভ্যুত্থানের কালে সদ্য জন্ম নেওয়া সোভিয়েতকে রক্ষা করার জন্য তিনি সেনানায়ক হিসাবে সাঁজোয়া ট্রেনে চড়ে দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ছুটেছিলেন। ব্যস্ততার মধ্যেও লিখেছিলেন Literature and Revolution. নামের গ্রন্থ। ১৯৩০-পরবর্তী স্তালিনের শাসনকালে ট্রটস্কিকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'সংবর্ত' কবিতায় লিখেছেন—

> উপশয়ী সংবর্তের আড়ালে অশনি
> লেলিহান করবালে ধার দিতে শুরু করেছিলো।
> প্রবাদের ধুয়ো ধরেছিলো
> তৎপূর্বে অন্তত
> মুসোলিনী যুদ্ধগামী বর্বরের মতো;
> এবং উদ্বাস্তু ট্রট্স্কি ইতিমধ্যে দেশে-দেশান্তরে
> ঘুরে মরেছিলো...

ট্রটস্কির বিরোধিতা কেন তা জানতে অনেকের ইচ্ছা করে। সেক্ষেত্রে তাঁর ভাবনাটাকে একটু জানতেই হয়। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল—

১. শিল্পের বিধান নিয়েই শিল্প বাঁচবে। পার্টির নির্দেশের প্রয়োজন নেই।

২. বিপ্লব হলো শ্রেণিহীন সমাজের দূত। শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতির পুনর্নির্মাণ হবে। তবে তার আগে একনায়কত্বের অবসান ঘটা দরকার।

৩. প্রলেতারীয় শিকড়কে অস্বীকার করা চলবে না।

৪. সামাজিক শিকড়কে অস্বীকার করা চলবে না।

১৯৯৭ সাল থেকে যুদ্ধ করে আসা নায়ক, জেলখাটা নায়ক একদিন 'সাম্রাজ্যবাদী অনুচর দালাল' বলে অভিহিত হলেন স্তালিনের রাজত্বকালে।

স্তালিনের শিল্প-সাহিত্য ভাবনা

ছাত্রজীবন থেকেই শেক্সপীয়ার, তলস্তয়, গোগল, চেকভ, ভিক্টর হুগো, থাকারে প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। বৈপ্লবিক আন্দোলনে শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকাকে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু প্রশাসনের চেয়ারে বসে তিনি জাতীয় সংস্কৃতি বা সংস্কৃতির বুর্জোয়া উপাদানের বিরুদ্ধে পূর্বসূরি লেনিনকে সমর্থন করেছিলেন। ইলিয়া এরেনবুর্গের 'প্যারীর পতন' উপন্যাস পড়ে তিনি লেখককে ফোনে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

লেনিনের দেহ দেখার লাইনে দাঁড়িয়ে আমাদের গাইড নাদিয়ার সঙ্গে নানা আলোচনা হয়। স্তালিন সম্পর্কে একটা বিষয়ে নাদিয়া উচ্ছসিত যে স্তালিন মস্কোতে প্রথম নাগরিকদের কথা ভেবে প্রচুর আবাসন বানিয়েছিলেন। যেগুলি এখন স্তালিন আবাসন নামে পরিচিত। তবে ক্রেমলিনের বইমেলার প্রসঙ্গ ধরে যখন তাঁর শিল্প-সাহিত্য নীতি নিয়ে কথা হচ্ছিল তখন নাদিয়া কেমন যেন একটা উদাস স্বরে কথা বলছিল। স্তালিনের শাসনকালে তাঁকে বেশ কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, যা গণতন্ত্রকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। 'পার্টি-বিরোধী' কাজে শাস্তি ও নিষিদ্ধকরণের অনেক নিদর্শন তাঁর সময়কালে আছে। যেখানে সাহিত্যিকরাও ছাড় পায় নি। তিনি বরিস পাস্তেরনাকের 'ডক্টর জিভাগো' উপন্যাস নিষিদ্ধ করেছিলেন। চলচ্চিত্রস্রষ্টা সের্গেই আইজেনস্টাইনের আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে তৈরি 'আইডল দ্য টেরিবল'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ-এর প্রদর্শন নিষিদ্ধ হয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, নাকি মানুষের কাছ থেকে সরে যাওয়ার একটা আশঙ্কা থেকে তিনি এতটা কঠোর হয়েছিলেন।

মাও জে দং-এর শিল্প-সাহিত্য ভাবনা

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লব সারা পৃথিবীর শোষিত মানুষকে শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দর্শনে চিনের সামাজিক পটভূমি, রাশিয়ার তুলনায় কিছুটা আলাদা। মাও জে দং-এর নেতৃত্বে 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' ঘটে। ১৯১৯ সালের ৪ মে প্যারিসে প্রথম মহাযুদ্ধের শান্তি সম্মেলনের প্রতিবাদে চিনে প্রতিবাদী আন্দোলন সংঘটিত হয়। এই আন্দোলনের পর থেকেই চিনে শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে মাও জে দং কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—

১. চিনে কমিউনিস্ট পার্টি যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বহন করবে, শিল্পী-সাহিত্যিকদের সেই একই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিপূরক হিসাবে শিল্পসাহিত্য রচনা করতে হবে।

২. রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটলে তার সঙ্গে তাল রেখেই শিল্পী-সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে।

৩. শিল্প-সাহিত্যের লক্ষ্য হবে প্রাচীন ইতিহাস ঘেঁটে দেখানো যে তারা কতখানি সর্বহারা মানুষের পক্ষে ছিল।

৪. শিল্পসাহিত্য যতই উৎকৃষ্ট মানের হোক না কেন তা যদি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে হয় তা হলে সেই শিল্পসাহিত্য 'জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর' বস্তু বলে বর্জন করতে হবে।

৫. আবার সর্বহারা শ্রেণিকে নিয়ে লেখা হলেও তার মধ্যে শিল্পগুণ না থাকলে তাকে বর্জন করতে হবে।

কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী মাও জে দং মনে করতেন শিল্প-সাহিত্যের অন্যতম কাজ হল শোষিত মানুষের পক্ষ নিয়ে শোষণমুক্তির কাজ করা। এক্ষেত্রে যাঁরা বুদ্ধিজীবী তাঁদের চিন্তা ও মনোভাবে আমূল পরিবর্তন দরকার। আর কোনো শিল্পী বা সাহিত্যিকের মূল্যায়নের মানদণ্ড হবে যে তিনি তাঁর শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে শোষিত মানুষের পক্ষে কতটা কাজ করেছিলেন বা সেই শিল্পকর্ম সাম্যবাদের প্রচারে কতটা কাজ করেছিল। সেক্ষেত্রে দেখতে হবে পার্টির সদস্য না হয়েও তিনি সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে কতটা কষ্ট সহ্য করেছিলেন বা কতটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। চীনের বিখ্যাত লেখক লু-সুন-এর মৃত্যুর পর পার্টির পক্ষে তাঁর বিবিধ গুণাবলী লক্ষ করে মাও জে দং তাঁকে 'আধুনিক চীনের প্রজ্ঞাবান পুরুষ' বলে অভিহিত করেছেন।

মাও জে দং-এর শিল্প-সাহিত্য ভাবনা শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্বাধীন ইচ্ছার অবদমন মনে করে ১৯৬৬ সালে চিনে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' শুরু হয়। তাদের প্রতিবাদ থামানোর জন্য তাদেরকে জোর করে গ্রামে পাঠানো হতো। আজও পর্যন্ত চিনে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার শিল্পী-সাহিত্যিকদের নেই। আধুনিক চিনে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক মো ইয়ানকে জেলখানায় পচে মরতে হলো পার্টির স্বার্থে। আশির দশকের শেষে চিনে তাঁর উপন্যাস নিষিদ্ধ হয়। পার্টি প্রশ্নের মুখে পড়লেই বলে দশের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে।

পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদীদের শিল্প-সাহিত্য ভাবনা

অনেক সাধারণ মানুষ বাসে-ট্রেনে বলে থাকেন যে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তার শাসনের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলে মনে করতো। একথা আংশিক সত্য হলেও ধরে নেওয়া যায় যে তার কারণ ছিল রাশিয়ার কঠোর নীতির প্রভাব। লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন দেখা দিতেই পারে যে শিকড়কে আমরা কতটা অস্বীকার করতে পারি? মনে হয় পারি না। তাই রবীন্দ্রনাথ আবার ফিরে এলেন। শুরু হলো রবীন্দ্র-সাহিত্যে শোষণের বাণী খোঁজার আর এক প্রচেষ্টা। পার্টি-সাহিত্য হিসাবে যাতে গুরুত্ব পায়, সেই লক্ষ্যে আরোপিত করার অপচেষ্টা। আমরা দেশীয় ঐতিহ্যকে সামনে রেখে কোনো নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না। তাই কোথায় যেন একটা ফাঁকি থেকে গেল। Art for arts sake অর্থাৎ সাহিত্যের জন্য সাহিত্য-এ ফিরে যাওয়ার অন্তঃ প্রচেষ্টা ফল্গুস্রোতের মতো কাজ করেছিল।

অতি সাধারণ মানুষের অন্তঃসত্তা সর্বদা হেগেল কথিত পরিবর্তনের পক্ষে বলেই হয়তো ভাববাদকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বৃহত্তর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করলেই বোধ হয় সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম ঘিরে শিল্পী-সাহিত্যিকদের অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটলো কিনা তার পর্যালোচনা অবান্তর নয়।

উৎপল দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মহাশ্বেতা দেবীর অবস্থানগত পরিবর্তন সত্যিই কি মানবমুক্তির পথ থেকে সরে আসা? এ বিতর্ক চলতেই থাকে।

তথ্যসূত্র

১. টেরি ঈগলটন (ভাষান্তর নিরঞ্জন গোস্বামী), *মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা*, দীপায়ন, কলকাতা
২. জ্যোতি ভট্টাচার্য, *নন্দন-তত্ত্ব ও মার্কসবাদ*, অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা
৩. অশোক চট্টোপাধ্যায়, *মার্কসীয় চিরায়ত ভাবনা / শিল্পসাহিত্য প্রসঙ্গে* : তৃতীয় দুনিয়ার সাহিত্য, কলকাতা
৪. জি.বি. প্লেখ্যনভ, *শিল্প ও সমাজজীবন*, মনীষা
৫. বদরুদ্দীন উমর, *মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, চিরায়ত প্রকাশন
৬. প্রদ্যোৎ গুহ, *মার্কসীয় সাহিত্য-সমালোচনার সমস্যা*, চলতি দুনিয়া প্রকাশনী, কলকাতা

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

রাধাকৃষ্ণ অ্যাগ্রো প্রডাক্টস

(রাইস মিল)

গ্রাম ও পোঃ বেলারি, বড় চৌমাথা (এন.এইচ-২বি), পূর্ব বর্ধমান

যোগাযোগ : ৭৭৯৭২৭৮৬৭১, ৭২, ৭৩

Sl. No. 23

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

আমাদের লক্ষ্য—নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত

বাড়িতে একটি শৌচাগার বানান

পরিবারের সম্ভ্রম রক্ষা করুন

এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর

খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ সিদুলি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান

এই বিভাজন : কষ্ট নীরবতা

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

জনপদে ছড়িয়েছ তুমি অনাবাসী বীজ—
কান পেতে শুনি শুধু মাটির নিবিড় সংলাপ,
দণ্ডকারণ্য থেকে দিগলিপুর
মরিচঝাঁপি থেকে মায়াবন্দর
আমি এখন ছোটো ছোটো খণ্ডিত দ্বীপ।

আমার ভেতরে আজ রক্তাক্ত হৃদয়ের গান,
শুধু তুমি নেই বলে
অভ্যস্ত জীবনের মায়া
প্রতিদিন অভিমানে খুলে দেয় সদর দরজা,
হলুদ আলোয় কেঁপে ওঠে সহস্র জাগরণ।

কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক গলে
একদিন ফিরে যায় রূপকথার নির্জন চড়ুই—
ঠোঁটে তার তীব্র গুঞ্জরণ,
ভূগোলের আজন্ম ক্রোধ উদ্বাস্তু ডানায়।

আমার নিজস্ব আকাশে, আমি জানি
শেষ রাতের ম্লান চাঁদ লুঠ হয়ে গেছে গবে!

নতুন দিনের ঠিকানা

পরেশনাথ কর্মকার

চারিদিকে দমবন্ধ পরিবেশ
চলছে কণ্ঠরোধের পালা।
আর কতদিন কথা বন্ধ করে
থাকবে বন্ধু? আর—
কীভাবেই বা চলবে পথ!
যেদিকে যাবে সেদিকেই তো
পথ বন্ধ।
তবে কি এভাবেই কাটবে জীবন?
দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে
কোন দিকে পিছোবে আর?
তার চেয়ে চল না—
সামনেই এগিয়ে যাই
সব বাধা দূর করে
লড়াইয়ের ময়দানে,
কারণ—
লাড়াইয়ে লুকিয়ে থাকে
নতুন দিনের ঠিকানা...।।

একটি মানুষ

প্রকাশ দাস

আকাশ ঢেকে আছে কালো মেঘে,
তার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবি
আকাশের সমস্ত নক্ষত্রগুলি
অন্ধকার সাঁতরে পার হয়ে
সম্মুখে এসে
একদিন জিজ্ঞাসা করবে
কেমন আছেন আপনি?

এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি নদীটির মোহনার বাঁকে।
নদী পারাপার করে—
অনেক অন্ধকার সাঁতরে
একটি মানুষ হেঁটে যাচ্ছে আলপথ ধরে।
অল্প হাওয়ায়
এদিক-ওদিক উড়ছে দুলছে তার এলোমেলো চুল।
নক্ষত্রখচিত আলোকবর্তিকার মতো
মনে হল তাকে।

কবিতা পড়া প্রথম বন্ধু

পরেশ কর্মকার

তুমি নন্দন কবি, ইচ্ছেমতো কাঙালি হও
হঠাৎ করে খুঁজতে বসা হৃদয় সবুজ মাঠ পেরিয়ে
অন্ধকার হয়। অন্ধকারে মিশে জন্মান্তরবাদী হতে
বুক চিরে এক চিলতে ফসল ভরা মাঠ, নদী, গ্রাম ছোঁয়া বহুদিন
বাকি থাকা উৎসব হয়ে উঠে, এমনকি বসন্ত উৎসব পর্যন্ত।
তুমি বুঝি বুঝেছো অন্ধকারে বয়ে যাওয়া নদীর শব্দগুলো
সেই আলাপীভাষা টুপটুপ করে ঝরে পড়ে ক্লান্ত ঘরের মাঝে
টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকো আর একটা পাতা উল্টাবে বলে
কবিতা পড়া প্রথম বন্ধুটি ভুবনডাঙার কথা বলো, শুনি।

হাপর

নরেশ মণ্ডল

বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে কখনও কি মনে হয়
জলে নামি, তারপর নদী, সমুদ্র
পথ চলতে চলতে কখনও ইচ্ছে হয়
দাঁড়িয়ে পড়ি প্রতিবাদে পথ অবরোধে
অচল হয়ে যাক সব, গাল পাড়ুক যারা আটকেছে
অন্তত মুখোমুখি হওয়া যাক
উনুনে আঁচ দিতে দিতে মনে হয় না
যাই এবার আবর্জনাগুলো পুড়িয়ে আসি আগে
না হলে নিরাপদ হবে না ঘর গৃহস্থালী।

এইখানে, এই...

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

রক্ষাকর্তা কে!
তাকে ডাক। ডেকে নিয়ে আয়
এইখানে, এই
বিচারসভায়।

এই দিনে এই রুক্ষ দুপুরবেলায়
কেন এত রোদ, এত খরা!

ধরাকে যে সরা
দেখে, তাকে মানবে না কেউ।
মানবে না পুরবাসীগণ,
মানবে না প্রজাবৃন্দ। তুলবে না ধ্বজা
তার গান গেয়ে।

অন্ধকারে গুপ্তসিঁড়ি বেয়ে
যে উঠেছে আমাদের মাথার ওপরে
তাকে ঘরে-ঘরে
কুঁজো হয়ে আর
পুজো করব না।

সমুদ্র শুকিয়ে যায়। পঙ্গপাল নামে
মধ্যযামে ফসলের খেতে। যেতে-যেতে
পায়ে-পায়ে হোঁচট। গায়ে-গায়ে
চাবুকের দাগ। যে নিদাঘ
ঝরে পড়ে অঝোর কান্নায়—
আজ নিরালায় তাকে খুঁজি।

মানুষ কাঁদছে। তার পঞ্জিকা-ঠিকুজি
কিংবা প্রাণপুঁজি
সমস্ত বাতাসে উড়ে যায়।
ডাক তাকে। ডেকে নিয়ে আয়
জনতার বিচারশালায়।

এও বাঁচা

মুরারী মণ্ডল

সবার যা হবার
আমারও তাই হবে
এর বইতো নয়।
এতদিনে বুঝে গেছি এটা
তাই উৎকণ্ঠা উদ্বেগ শ্লেষ
ক্ষোভ প্রতিবাদ সবকে দিচ্ছি বিদায়।

অর্থাৎ একা নই আর
আমি পাঁকের মধ্যে পাঁক
আগাছার খেতে আরও এক আগাছা।
আমাকে আর আলাদা করে চেনে না কেউ
এদের সাথে দিব্যি কেমন অসুস্থ হয়ে বাঁচা

আয়ুরেখা

গণেশ ভট্টাচার্য

এবং সময়
কাজটি সেরেছে বেশ সুচারু ভঙ্গিমায়
কোথাও দেয়নি কোনও ফাঁকি
কোথাও রাখেনি কোনও ফাঁক...

কখন বয়স এসে গুটিগুটি
সমস্ত শরীরে তাঁর বেঁধেছে দীর্ঘ এক বাসা
যেমন পাখিরা বোনে গাছের পাতায়, ডালে ডালে;
কখনও শরীর ছেড়ে চলে গেছে যৌবনের গান
যৌনতার খিদে, এমনকি নারীর আশ্চর্য রূপ
তাঁকে আর উত্তেজিত করে না একটুও...
সে যেন পাথর এক
কঠিন প্রশ্নপত্র জীবনের।

তবু সে বাঁচতে চায় আরও
তবু সে দেখতে চায়
নদীটি কেমনভাবে হেঁটে যায়
সমুদ্রের দিকে।

অপদেবতার ডাক

সৈয়দ কওসর জামাল

এখানে গড়েছ বধ্যভূমি
উল্টিয়ে রেখেছ সূর্যের মুখ
লক্ষ করছে হাওয়া, সাদা মেঘ
হননেচ্ছা তোমার অসুখ।

কাহিনির যত নিষ্ঠুরতা
লিখে রাখি রাত্রির অক্ষরে
তোমার ধ্বংসের প্ররোচনা
প্রতিহত ভাষার ভিতরে।

তীরবিদ্ধ করেছ শরীর
আসলে ঘাতক অহর্নিশ
ঈর্ষা ভেবে আমি উদাসীন
জিভে তুলি এই সর্পবিষ।

তুমি অপদেবতার ডাক
ঘন ছায়া তুমি পিশাচের
বেঁধেছ দুহাত, মুখঢাকা
ইতিহাস দেখেছে তা ঢের।

মৃত্যুর উপত্যকায় দেখি
হলকর্ষ জ্যোতিচিহ্নময়,
শ্রাবণ অক্ষরলিপি, কৃষি
তৃষ্ণারেখা প্রাণের সঞ্চয়।

এইরকম কোনো এক স্তূপের উপরেই

মাধুরী অধিকারী

আজকের মজলিসি বিকেলে
পুরোনো বছরগুলো ফিরে দেখার নেশা
প্রথাগত এই নেশার আকরে
শূন্য চোখের ভর্ৎসনা
মানুষ নয়, মানুষের অবয়ব।
যার সাথে নিত্য চলাফেরা
নিত্য নতুন ঝগড়া
ঝগড়া শেষে পূর্ণ প্রসাধন।

সেই যেন কবে কথা বললেই
কবিতার রস
প্রতি পদক্ষেপে শরীর দোলে নানা আঙ্গিকে
আর হাসলে যেন সত সুরের ঝঙ্কার।
সেই যেন কবে
প্রথম পুরুষ দর্শন
প্রথম নিবেদন
প্রথম কবিতা নিয়ে বাঁচা
যা কিনা আজও হয়নি।

আজও শুধু দ্বিধা আর দ্বন্দ্বে জর্জরিত
মেঘমুক্ত আকাশ দেখতে ভুলে গেছি কবেই
আকাশে মেঘের আধিক্যে ভয়
মেঘমল্লার আর বাজে না
তাই বুঝি এত জল এত ঝড়
রবি ঠাকুর আর কণ্ঠে বসেন না
তাল লয় ছন্দ ধুয়ে মুছে হাহাকার।
উঁইপোকায় কেটে দিল লেখার খাতা
আলকাতরায় কেরোসিন মিশিয়ে
দিতে গিয়ে আঁতকে উঠি
অসংখ্য মানুষ ঝলসে গেল
আমারই হাতে।

যত দাঙ্গা যত যুদ্ধ
সব কিছু আমার জন্য
পৃথিবীর যতগুলো সংসার
সব আমিই ভেঙেছি
যত যত মৃতের ফসিল
সব আমি।
আমারই স্তূপের উপর
রচিত মিনার
ধ্বংসস্তূপ থেকে অনুদ্ধার আমি
সব সব রিপুর আধার এই আমি।

একবারও মনে পড়ে না
এই রকম কোনো এক স্তূপের উপরেই
রত্নাকর বাল্মীকি হয়েছিলেন।

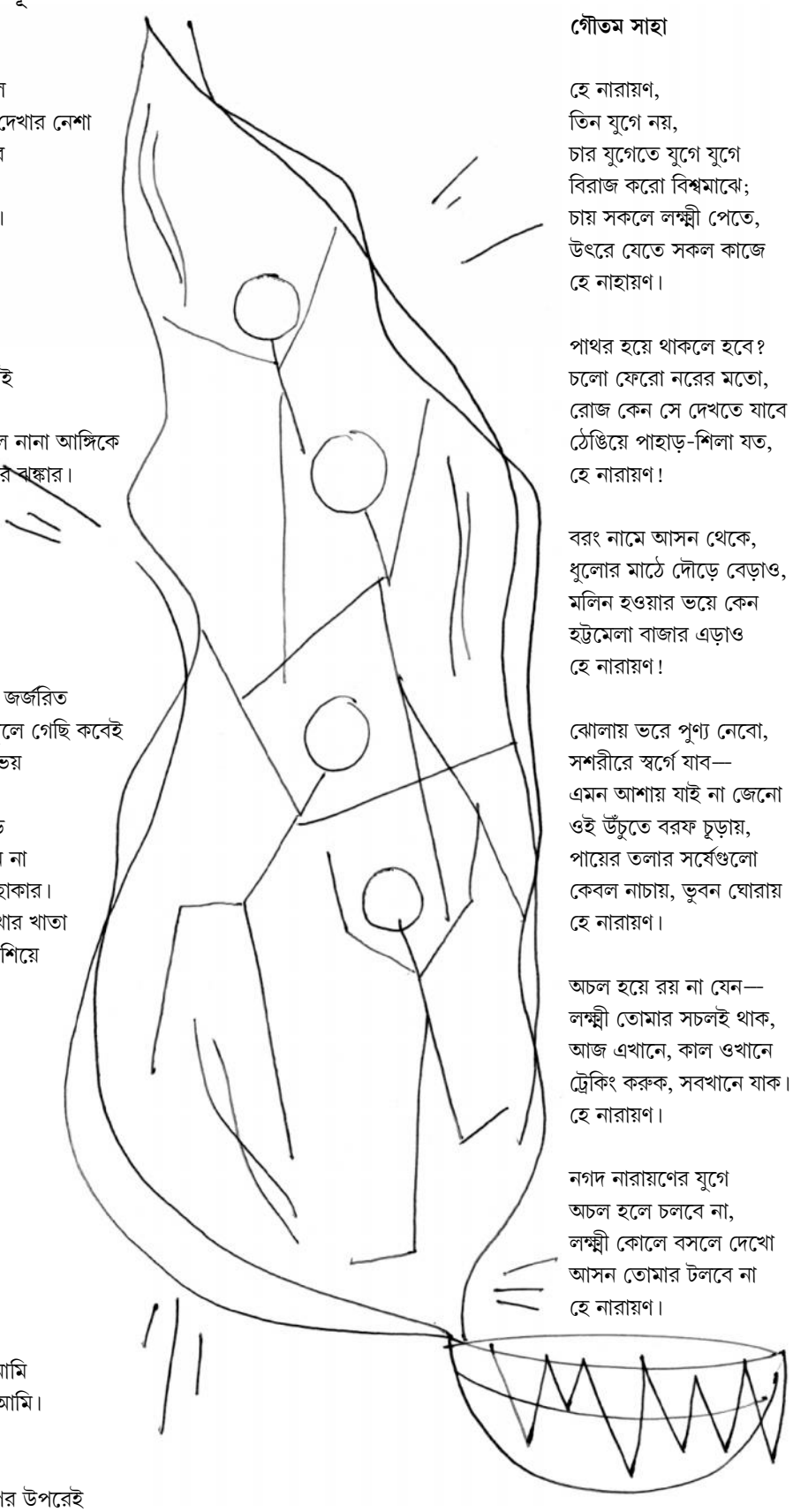

অচল হলে চলবে না

গৌতম সাহা

হে নারায়ণ,
তিন যুগে নয়,
চার যুগেতে যুগে যুগে
বিরাজ করো বিশ্বমাঝে;
চায় সকলে লক্ষ্মী পেতে,
উৎরে যেতে সকল কাজে
হে নাহায়ণ।

পাথর হয়ে থাকলে হবে?
চলো ফেরো নরের মতো,
রোজ কেন সে দেখতে যাবে
ঠেঙিয়ে পাহাড়-শিলা যত,
হে নারায়ণ!

বরং নামে আসন থেকে,
ধুলোর মাঠে দৌড়ে বেড়াও,
মলিন হওয়ার ভয়ে কেন
হট্টমেলা বাজার এড়াও
হে নারায়ণ!

ঝোলায় ভরে পুণ্য নেবো,
সশরীরে স্বর্গে যাব—
এমন আশায় যাই না জেনো
ওই উঁচুতে বরফ চূড়ায়,
পায়ের তলার সর্ষেগুলো
কেবল নাচায়, ভুবন ঘোরায়
হে নারায়ণ।

অচল হয়ে রয় না যেন—
লক্ষ্মী তোমার সচলই থাক,
আজ এখানে, কাল ওখানে
ট্রেকিং করুক, সবখানে যাক।
হে নারায়ণ।

নগদ নারায়ণের যুগে
অচল হলে চলবে না,
লক্ষ্মী কোলে বসলে দেখো
আসন তোমার টলবে না
হে নারায়ণ।

হাওয়া

সুশীল নাগ

আজ হাওয়া কিছু এলোমেলো
জানালা খুলতেই বৃষ্টির ছাঁট, রোদ
লুকিয়ে রয়েছে মেঘের আড়ালে, সর্বত্র
কানাঘুষো ফিস্‌ফাস্‌!

অন্যায়ের উদ্ধত চেহারা—উল্টো পথে
ঘুরছে চাকা, তবুও প্রগতি?
সংজ্ঞা পাল্টে জল হল আগুন, আগুন হল
জল, জোয়ারের নাম ভাঁটা—ভাঁটাকেই
বলছি জোয়ার; ঊর্ধ্ব সেভাবেই অধঃ।

যাপন বৃত্তে এখন সর্বত্রই উলট পুরাণ
যাপন তামাশা—যাপন বিস্ময়!
প্রতিটি হারের ভেতর দুর্দান্ত জয়!!

অতামসিক

অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়

অরণ্যের অন্ধকারে দুই হাতে চোখ দুটি ঢেকে
জীবনের দিনগুলি মিশ্রণের মাঝে এনে রাখি
তামাটে রঙেন মন অবিরত রাখি অনিমিখে
মুক্ত করে দিই শূন্যে না দেখার কল্পনার আঁখি।

হলুদ রঙের বনে পাখিরা যে নিত্য দেয় ডাক
জোনাকিরা ভিড় করে আধো আলো আঁধারের মাঝে
মন্দিরে পূজার কালে নিত্য যবে বেজে ওঠে শাঁখ
স্তব্ধতার বদ্ধ মনে চঞ্চলতা ভিড় করে সাজে।

নিশীথে নির্জনে কাল-শ্মশানের ভয়াল রাত্রিতে
রুদ্র এসে হানা দেয় মনহীন প্রাণের অন্দরে
অন্ধকার করে ঘন দীপশিখা দূরের যাত্রাতে
উজ্জ্বল তমসাদিগ্ধ নির্জনতা বুকের ভিতরে।

শরতের স্বচ্ছ নীল আকাশের উদাসী প্রাঙ্গণে
পূষাদীপ্ত শাদ্বলের মধুরতা আনে যে স্পন্দন
নির্জনে হারানো মন অবিমিশ্র রক্ত আলিম্পনে
মর্মরের ধ্বনি তার খুলে দেয় সুরের বন্ধন।

আলো জ্বেলে বাতায়নে দুটি চোখে চেয়ে চেয়ে দেখি
কোলাহল ঘেরা এই পৃথিবীর বিরাট সৃষ্টিকে
উৎসবের রাত্রি করে গোষ্ঠীহীন আমারে একাকী
মেনে নিতে মনে হয় জীবনের মহান রিষ্টিকে।

আলো আর অন্ধকারে জীবনের সেই সম্পূর্ণতা
আশাহীন করে যেন এই মনে করেছে গৈরিক
শাশ্বত সীমার মাঝে নিরন্তর এনেছে ব্যর্থতা
স্বপ্নময় বেড়াজালে ঘিরে তাই মন চতুর্দিক।

মেম্ফিসের চাঁদ

রমেশ পুরকায়স্থ

[কায়রোর প্যাপিরাস মিউজিয়ামে সংরক্ষিত চার থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে লেখা এক কৃষক রমণীর প্রেমপত্র দেখে]

আজ রাতে বসন্তের চাঁদ যখন আইসিসের মন্দিরচূড়ায়
ছড়াবে তার সোনালী যাদু
নীলনদের নির্জন বাঁকে খুঁজে নিয়ো তোমার মরুযুবতীকে
খেজুরবীথির নিচে সোনালী বালির চড়া যেখানে একা-একা
স্বপ্নের মাথায় ভেজা রাত জাগে নীল সাহারায়;
দুরন্ত বন্যার মতো আমাকে গ্রাস কোরো, প্রিয়
অনেক দূরের দেশে ভাসিয়ে নিয়ে যেও আমাকে
সোনালী গমের শীষ
ভেড়ার মাংস
উটের দুধ
আর মিষ্টি খেজুরের স্বাদে হেসে উঠবে নতুন সকাল
প্যাপিরাসের পুষ্পসার মোহিনী ওড়না ওড়াবে
আমাদের মিলিত রাত্রির গায়ে।

মেম্ফিসের গলি থেকে গ্রীক রোম পারসিক সাম্রাজ্যের
ব্যস্ত দিনলিপি কতবার ছুঁয়ে গেছে প্লাবনের তীব্র জলোচ্ছ্বাস
কত শত-সহস্র বছর
হলুদ স্মৃতির মতো লেগে আছে কীটদষ্ট মৃত ইতিহাসে;
প্যাপিরাসের পাতায় আজও অক্ষত সে চিঠি
যুদ্ধ নয়, হত্যা নয়, প্রতিহিংসা নয়
হৃদয়ের যাদুস্পর্শে
একটি পুরুষ আর প্রিয় রমণীর দৈনন্দিন যাপনের
তুচ্ছ গল্পগুলি
কম্‌ওম্বো কার্নাকের বিশাল স্তম্ভের মতো
সম্ভ্রান্ত দাঁড়িয়ে আছে—মহীকাল চালচিত্রে মূক;
পিরামিড সাক্ষী শুধু মুগ্ধ মরুযুবতীর চোখে
কোন্‌ আলো জ্বেলেছিল সে প্রাচীন মেম্ফিসের চাঁদ।

মেম্ফিস : প্রাচীন মিশরের রাজধানী, যেখানে প্রাচীনতম পিরামিডটি অবস্থিত

দুর্ভাগ্য যখন আসে

অনন্ত দাশ

দুর্ভাগ্য যখন আসে কেউ তাকে থামাতে পারে না
তার চতুর্দিকে অস্থিরতা টলোমলো নৌকার মতন
ধ্বংসের ভিতরে ধ্বংস ব্যর্থতা ও হতাশা পাশাপাশি থাকে
পতনের মুখোমুখি কেউ তাই দাঁড়াতে চায় না।

আয়নায় নিজেকে দেখি আর ভাবি
কোথা গেল সেইসব দিনের উজ্জ্বল আভাস
স্পর্ধিত যৌবন আর বিপ্লব প্রত্যাশা
নদী পাড়ে ছুটে যাওয়া
সাইকেলে সুদীর্ঘ ভ্রমণ
সন্ধ্যাবধি খোলা মাঠে ছুটোছুটি
খড়ের পালায় লুকোচুরি
খুব দ্রুত হারালো কৈশোর

জীবন বিচিত্রগামী
উপস্থাপনার একটাই পথ
বিপরীত দিক থেকে হাওয়া এসে
কেড়ে নেয় সব
মনে হয় আর ফিরে পাবে না সময়
যা পেয়েছ কোঁচা ভরে তুলে নাও
আর রেখে দাও
অন্ধকার কুলুঙ্গিতে
আর মাঝে মাঝে
তাকে দেখ নিভৃত খাঁচায়

বৃষ্টি বুঝেছে

অচিন মিত্র

বৃষ্টি বুঝেছে দুঃখী হৃদয়ের ভাষা

নিরুপায় অশ্রুর রেখা মুছে দিতে
মেঘের প্রাকার ভেঙে ক্ষতবিক্ষত
ফুলের রেণুর মতো গন্ধের শুশ্রূষা
ভেজা করতল
জ্বরের আগুনে যেন তপ্ত কপালে

রাত্রির আলো নিভে গেলে
দিনের তমসা গাঢ়তর
বনস্থলীর শেষে জনপদ
একলা একাকী যেন দূরে দূরে দ্বীপগুলি
করুণার মতো বৃষ্টির ধারা
ঘুমের বার্তা লেখে জলের হরফে

হৃদয়ের কথা বুঝে দুঃখী মানুষের
বৃষ্টি রেখেছে দ্বার অবারিত
শরণাগতের চলা ভিতরে অবাধ

দিয়ে দাও

আবদুস শুকুর খান

যে যা চাইছে, তাকে তা দিয়ে দাও।
কার্পণ্য করো না, তোমার উদ্বৃত্তটুকুই তো দেবে
দিয়ে দাও সরল হৃদয়ে, পূর্ণতার সঙ্গে দিয়ে দাও
'কী হবে? কী পাবে?'—প্রশ্ন কোরো না, উলটে নিজেকে
প্রশ্ন করো—তোমার শূন্যতায় কী হবে সম্পদের
কী হবে আভিজাত্য, অহংবোধ, ও অহংকারের!
বরং পৃথিবীর কাছে এমন কিছু রেখে যাও
সম্ভব হলে—একটি বীজ পুঁতে যাও পথের ধারে
যে বীজ বৃক্ষের জন্ম দেবে, ছায়া দেবে; সুশীতল ছায়া
দেবে প্রাণবায়ু, বেঁচে থাকার ব্যঞ্জনা—মনে রেখো
তোমার পবিত্র হাতের স্পর্শে এই পৃথিবীতে একদিন
অমৃত ধারায় জোছনার প্লাবন আসবে নেমে—তুমিও
শাশ্বতের মুখে পরম পুরুষ হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে
মুছে গেলে পার্থিব দেহ, মানবের হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে যাবে।

দাও যে যা চাইছে তাকে তা নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে দাও
সম্ভব হলে—মাটিতে একটি বীজ পুঁতে যাও।

গ্রামরচনা

প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

গেরস্থ ঘরের সনাতনী ভেঙে
পুঁইমাচার ছায়া ছিনিয়ে
ঢুকে পড়ছে ভুবন-লিপি

জলপিপির পিপাসার যুগে
ভাসছে প্লাস্টিক পাউচ—

গত বছর গান শুনিয়ে গেছে
অতসী বোষ্টুমী—
এ বছর উঠোনে বাজছে স্প্যানিশ।
ফাটা-জিন্‌সের যুবক এসেছে
রক শোনাবে বলে—

কবে শেষবার বেজেছিল সিরাজদৌল্লা
পাড়ার মাইকে—
এবছর শব্দ-তাড়নায় বয়স্করা
যায়নি ঘাটে।
গ্রাম্য হাওয়ার সোঁদালি গন্ধ
কবেই উধাও
এখন হাওয়ায় ভাসে শুধু
কঠিন-চোয়াল শ্বাস!

বাঁশঝাড়ে ডাকে না তক্ষক—
জলার ধারে উঁকি দেয় না কাশ।

উত্তরসত্য পর্ব

কঙ্কন সরকার

দিন তো গেল আঁধার হল
ঘনিয়ে এল মেঘ
মেঘের ঘনঘটা দেখে গভীর উদ্বেগ!

কোথায় কাজ? কোথায় মানুষ?
সমস্ত বরবাদ
আমরা এখন ভাঙন শিরে, নিচে গভীর খাদ!

হায়রে পতন, হায় রে পবন
আগুনে পোড়ে হাত
কী চেয়ে আজ কী পেয়েছি, গুরুতর সংঘাত!

কীসের খেলা, কীসের লীলা?
কোথায় মুক্ত অঙ্গন?
কলকাতা হবে লন্ডন তাই কর্মে সংকোচন!

কর্মে মুক্তি, ক্ষুধাভুক্তি
চিন্তা নিদারুণ
ভাবে ঐক্য, ভাবে মুক্তি, বামপন্থা ছাড়ুন!

সদ্য কেবল চাঁদের বাজার
ভয়ার্ত সবদিক
এখন সবই ঐতিহাসিক, সবই অলৌকিক!

বেঠিক? বলে কে রে ছোড়া
নিশ্চয়ই সিপিএম?
চুপ করে থাক! আমারই হাতে পুলিশ প্রশাসন 'গেম'!

অব্যয়কথা

স্বপন পাঁজা

একটা স্বাধীন 'এবং'-কে দুটো ঈগল
দু-দিকে ঠোঁটে ধরে হাইজ্যাক করছে,
একটা ভীরু 'অথচ'-কে গুটিকয় কাঁকড়া
গর্তে ঢোকাতে কামড়া-কামড়ি করছে,
একটা নাবালক 'কিন্তু'-কে লোফালুফি করতে
কয়েকটা শুয়োর কচুবনে ঘোঁতঘোঁত করছে,
আর একটা নিশ্চিন্ত 'তাহলে'-কে কব্জা করতে
শকুনেরা নজরে রাখছে বানভাসি গরুটাকে!

আপনার ফটোক্রোম চশমা এইসব গ্রামীণ অব্যয়ে
আক্রান্ত-অপমানিত হলে বরং দেখুন—

দামি টুথপেস্টে এবার শরৎ কেমন হাসছে!

লাশবাজেট

কণিষ্ক আচার্য

ধপাধপ লাশ পড়ছে, লাশ!
গোনাগুন্তি শেষ হয়ে যায় নি এখনো
জানিনা লাগবে কত দিন।
পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা শান্তিপ্রহরী—
বিষ্ট চিত্তে—হাতের তালুতে—
খৈনি দলে—দিদির পুলিশ।
ধারাপাত খালি হয়ে যাচ্ছে কিনা?
গুনতির সংখ্যা তবে শেষ হবে কবে?
বাহবা! বাহবা বেশ! তাহলে কি ধরা হবে
বড় সুখে, বড় শান্তিময়—এ রাজ্যের—
নিরীহ নাগরিক?
ঘুচে যায় যাক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ভাতা
অগণিত নারী আজ অধোমুখী—
নারী হওয়ার অপরাধে অবাধে চলছে লুট
মানব ফসল।
অভাবের ফাঁদে পড়ে কাঁদছে দেখ অহরহ
দরিদ্র কৃষক! শেষমেশ আত্মহননের পথ
শ্রেয় করে ধরিত্রীকে ছেড়ে যায়—ক্ষিতির সন্তান
সারস্বত সাধনার পবিত্র কমল বনে—
দেবীর বরপুত্র দুষ্টদানবের নিষ্ঠুর দলনে—
তছনছ হয়ে যায়—শিক্ষার অঙ্গন
মানুষ গড়ার যাঁরা কারিগর—
যাঁরা এই পোড়া দেশে এখনো নীতি নিয়ে বাঁচতে চান
নিপীড়নে-নির্যাতনে তাদের আয়ু শেষ?
ধপাধপ লাশ পড়ছে—লাশ।
পিশাচেরা চায় দুর্জনেরা বেঁচেবর্তে থাক—
সুজনের অবশ্য বিনাশ!

জীবন ফোটা ফুল

অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

ভালোবেসে মরণ হলে সেও অনেক সুখ
সুখ নদীতে ভাসিয়ে দেব আমার উদাস বুক
শিশির কেন ঝরে আজো ধরণীরই কোলে
ধরণীও ডাকে তাকে ভালোবাসার দোলে
দুখ পাখিকে বলে দিও ঘুষ দেব বেশি
ভালোবেসে মরব তবু থাকবো পাশাপাশি
পাহাড়ি ফুল আনব তুলে মেঘ দেব সরিয়ে
তোকে আরো বাসবো ভালো সমাজ দিক তাড়িয়ে
দুঃখ আমি চাইছি নিজে তোকে সাজাবো বলে
ভালোবেসে বাঁচবো না হয় যাবই অনলে
তোর গন্ধে পেয়েছি আমার জীবন ফোটা ফুল
ভুল করেছি বললে সবাই করবো আরও ভুল।

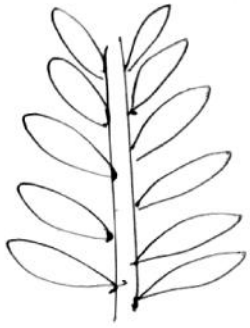

হাতছানি

সোমনাথ বেনিয়া

ওরকম হাতছানিতে ডেকো না
আমার ক্রোমোজোম কেঁপে ওঠে
চারিদিকে বাতাস ভীষণ ভারি
গন্ধে বুঁদ হয়ে টলোমলো
দর কষাকষিতে দরজা খুলে যায়
অথচ একটি দখিনের জানালা চেয়েছিল
তোমার হোঁচট খাওয়া অভিলাষ—

এই নাগরিক অভ্যাসে আটকে গেছে
আমার যাবতীয় আয়োজন
ইচ্ছাহীন হওয়ায় শক্তি যোগায় না—
স্নায়বিক পঙক্তিমালা
কোনো ভগ্নাংশ নেই!

তবুও দিশেহারা আমার ব্যাকরণবিচ্যুতি—
হারতে হারতে হরের ঘরে প্রণীত হতে চায়
যখন তুমি লব হয়ে কিছুটা শীর্ষ ধারণ করে
একটি অন্য রকম একা হয়ে গেছো!

দুগ্‌গা মা

অনিল মাইতি

পোড়া ঘরটার দিকে
হাঁ করে চেয়েছিল মা,
দুগ্‌গা মা।
একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস
বেরিয়ে এলো তার
পাঁজড় ভেদ করে।
দাওয়ায় তখনো
চাপ চাপ রক্ত
শুকিয়ে গিয়ে
কালচে হয়ে গেছে।
আধপোড়া বাঁশগুলো
বিদ্রুপ করছিল তখনও।

কদিন আগে
গণতন্ত্রের পূজারীরা
খুন করেছে তার
মহাদেব স্বামীকে।
লুট করেছে ঘরের সবকিছু।
বাঁচেনি তার সম্ভ্রমও।
একমাত্র ছেলে আসতে পারেনি
বাবাকে শেষবারের মতো দেখতে,
সেও আজ ঘরছাড়া তিনমাস।

ঘাতকের প্রতি সীমাহীন ঘৃণায়
দুগ্‌গা মা-র বুকে
আগ্নেয়গিরিরি গলিত লাভা
উদ্‌গিরণের অপেক্ষায়
গুনছে প্রহর।
চঞ্চল ধমনীতে উঠেছে
বৈশাখী ঝড়।
অসুরদলনী চিন্ময়ী দুর্গার
ত্রিশূল আজ
মৃন্ময়ী দুগ্‌গার হাতে।
পাশে তার অজস্র দুগ্‌গা মা
এক, দুই, তিন
অযুত, নিযুত, লক্ষ...

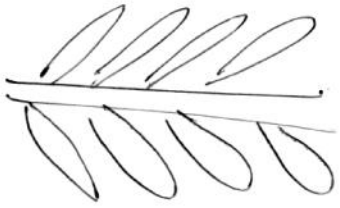

কমরেড সঞ্জয় প্রসাদ স্মরণে

মলয়কান্তি মণ্ডল

কীভাবে হাঁটবো আমরা এই অবেলায়
শব্দহীন শোকমিছিল,
কীভাবে গাইবো গান? মেলাবো সুর...
ক্লান্ত ছিলে না তুমি, তবু দেহ
মাদুরে শুয়েছে অনন্ত শয্যায়।

ভেসে আসে স্মৃতিকথা, পরিতাপ-শোক
আকাশে এখনো জেগে দীপ্ত সূর্যালোক।
অসময়ে অস্ত গেছ তবু তো হারাওনি দিক
বুকে থাকো জেগে চেতনার অশরীরী সৈনিক।

নট ইন মাই নেম

সূর্য মণ্ডল

আমি জানি
তোমাদের তালিকায়—আমার নাম নেই
তোমরা যখন ব্যস্ত ছিলে তালিকা তৈরির কাজে
তখন আমার আলি আকবরের রাত
তখন আমার গালিবের শায়েরি
তখন আমার চারপাশে কোজাগরি পূর্ণমার চাঁদ—
ফিরোজ়া বেগম।
শাহেনশা আকবর জ়াকির হোসেনের মেহফিল ছেড়ে
রবিশঙ্করের সাথে গেলেন মীরা বাঈ-এর ভজনে

আমি জানি
আমি নিশ্চিত জানি
তোমাদের তালিতায় আমার নাম নেই বলে
অস্ত্রে শান দিচ্ছে মৃত্যুদেবতা

দিচ্ছে দিক। কার কাছে নোয়াব মাথা?
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
ফেলে রেখে কবেই পায়ে তীর খেয়ে ফিরে গেছে শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর
চৌরাশিয়ার হাতে বাঁশি আর
মন্দির-মসজিদ-গির্জার দেবাসন থেকে ছিটকে পড়ছে
পতঙ্গ মানুষের হাড়।

আমি জানি
আমি নিশ্চিত জানি
এই শহরে কাল
তোমাদের তালিকার থেকে বেশি
টিকিট বিক্রি হবে
রবিশঙ্কর আর জাকির হোসেনের
লাইভ কনসার্টে।

খেলাঘর

উজ্জ্বলকুমার ঘোষ

অজানা অচেনা সময়ের ঠিকানা
কবে যে কী হবে কারুর তো নাই জানা
হাসি আর খুশি যে হৃদয়ের সান্ত্বনা
শুকনো বাগান গেয়ে ওঠে গান।

আঁধারের কালো যাক ভেসে যাক
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেম চিরকাল থাক
ভরে যাক দিকবিদিক রঙিন এই আলোতে
মুছে যাক মানুষের যন্ত্রণা।

স্বপ্নের খেলাঘর যাক ভেসে যাক
বাস্তব কিছুটা মিলেমিশে থাক
জীবনটা মানুষের নয় বসে থাকা
অধিকার পেতে চাওয়া সংগ্রাম।

সূঁচ

মিনতি গোস্বামী

দেশ রাষ্ট্র সরকার নেই
সূঁচের ব্যথায় শরীর নীল
জন্মভূমির আকাশে ওড়ে
লোভী শকুন আর নধর চিল।

এখানে কবিরা শ্রাবণ লেখে
সময়ে সাজে রাজনীতির কলমচি
সূঁচের ব্যথায় শব নীল হলে
কখনো মোমবাতি কখনো ধুনুচি।

দ্রুপদ পিতা যে দেশে কন্যাকে
দিয়েছে হাজার লাঞ্ছনার অভিশাপ
সে দেশে কন্যা জন্ম নিলে
বইতে তো হবে হাজার পাপ।

সত্য সেলুকাস, ধর্ষক হিরো
বুদ্ধিজীবীরা বানায় সিনেমা
শ্রাবণের বিশুদ্ধ কবিতায়
কাঁহাতক আর নারীর তর্জমা।

শব্দ

রীণা কুণ্ডু

দূরে ঢাক বাজছে দুর্গা যাচ্ছে প্যান্ডেলে
ঢাকের শব্দ শুনলে তোমায় মনে পড়ে
ছবি ভেসে আসে স্ক্রিনে
খিড়কি বন্ধ করতে করতে দেখি
তুমি জড়িয়ে নিয়েছ বুকে
টুপ-টাপ করে পড়ছে শিউলি
আমাদের শরীরে তারারা দিচ্ছে আলো
শিশির ভিজিয়েছে ঠোঁট
জোয়ারের জলে ভেসে যায় সাঁকো
তুমি ডুবেছ মোহনায়
হৃদয় ঘামছে ধরে নিগড়াই
নিঃশব্দে হজম করি মন্থনের সব বিষ
কারণ তুমি এক মুহূর্ত হলেও
ভালোবেসেছিলে।

ও যে মানে না মানা

নমিতা রাউত

সীমান্তে কাঁটাতার—
ঊর্ধ্বে দপ্তরবিহীন মহাকাশ
বসন্ত বাতাসে খুশির কম্পন নীলাকাশে
অজানা আমন্ত্রণে এপার ওপারের আকাশ
এক হয়ে যায়
কাঁটাতারের ছুঁচলো ধারালো মুখে
প্রতিহত হয় না একমুঠো সজীব বাতাস
মনে হয় পৃথিবীর এই কোণে
প্রকৃতির অপার করুণা।
ইছামতীর জলস্রোতে শারদীয়া ভাসান নৌকা
চলে এপারের ওপারের
অদৃশ্য কোনো টানে যেন
এক হয়ে যায় বিসর্জনের বাজনা।
মাটি ভাগ হয় কাঁটাতারে
নদীস্রোত ভাগ হবে কেমন করে?
নদীর দুই পাড় মুখোমুখি
মাঝখানে প্রবহমান স্রোতধারার দুস্তর ব্যবধান
অতলে অতলে স্রোত কথা বলে
কিনা কে জানে
হয়তো বা বলে।
চরাচরের আলোয় প্রদীপ জ্বেলে
দুহাতে ভাসিয়ে দিই ইছামতীর জলে
ভাগ হয়ে যাওয়ার বেদনাকে
বন্ধক রাখতে ইচ্ছে করে মহাশূন্যে
এবার ওপারের মাটির গন্ধ
যূথবদ্ধ হয় শব্দহীন বাক্যালাপে।

কবির বীক্ষণে নতুন শব্দ

নির্মল নিয়োগী

শব্দকে ছিনিয়ে আনো পৃথ্বীরাজের মতো,
ঘোড়ার পিঠে সংযুক্তা
হাতের চাবুক ঝলসে উঠুক।
অভিধানে সাজানো বাগান
কে বলেছে নিমিত্ত নয়—
অনেক নতুন শব্দ মানতে পারি না
মাছের ওপর শাকের বৈধব্য
আঁশটে গন্ধ কবিতার অক্সিজেন-এ
খামতি রেখে যায়।—যেখানে
অপরকে বোঝানোর নতুন অশ্লীলতা।

শব্দকে গর্ভযন্ত্রণায় স্থান দাও
অপেক্ষা কর নতুন কান্নার
—সত্যের মুখোমুখি হোক ধ্রুবতারা;
সৃষ্টি খেয়ালে হয় না
অনিবার্য মেনে চলে
জ্ঞান তাকে মর্যাদা দেয়।

কবির বীক্ষণে নতুন শব্দ
বাজার দখলের দর্শন নয়...
মানুষের প্রয়োজন
তোমার সৃষ্টি
তোমার আয়োজন
তোমারই প্রাণবায়ু।

শুদ্ধ আকাশখানা

ঝর্না মুখোপাধ্যায়

অসহায় ছেঁড়া বেলা
গভীরে বাঁধানো, চোখ ভরা জল
দরজায় কে যেন এসেছে!

সারা রাত সঙ্গীহীন
আদর, রাপকথা শিশিরে গড়ায়
ক্ষত নিয়ে কটা পাখি গাছবাসা ছেড়ে
ইলেকট্রিকের তারে।

জমানো আঁধার থেকে শব্দের মোচড় টান!
পাশ ফেরে কবিতারা
অবহেলা প্রতিরোধে—
লাঙল হাতুড়ি হাতে
বেলচা কাঁধে হাঁটে...
শুদ্ধ আকাশখানা তার সাথে সাথে...

যদি রৌদ্র দিতে

সত্যনারায়ণ মাজিলা

একটু রোদ দিলে মা কেমন হতো—
স্নানবেলার দৌড়ে যাওয়া
তোমার কোলের আস্বাদে মা মুক্ত হাওয়া
মিষ্টি হাসির বিরক্তিবোধ ইচ্ছে মতো
বেহিসেবি ফেলিয়ে যেতাম যতই খোঁজ
উষ্ণতা কী অশান্ত তা তুমিই বোঝ।

একটু রোদ দিলে মা কেমন হতো
সে তো তোমার ইচ্ছেতে নয়, তাও জানি
সকাল থেকে দুপুর বেলা
তখনও ভাই করছে খেলা
দু-পায়ে তার দড়ির বাঁধন
বোনটি আমার বড্ড ভালোবাসা
অবাধ সে কোন্ স্রোতস্বিনী মায়ের ভাষা।

একটু রোদ দিলে মা কেমন হতো
ছিন্ন হৃদয় ভিন্ন প্রকৃতি
ঠিক যেন সব তোমার মতো
শীতের কাঁথায় নকশা স্মৃতি
আজও আঁকে অদৃশ্য দুই হাত
যদি বাড়িয়ে দিতে একমুঠো উত্তাপ।

ঘাসের ডকে শিশির-স্নেহ
পৌষ সকালের এই তো খেলা
কান পেতে রই আসছে কেহ...
রৌদ্র আসে রৌদ্র যায়—
সূর্য তখন অস্তবেলার মালা।

একটু রোদ দিও মা ডাকছে তোমার খোকা
তবুও তুমি দাও না সাড়া, বাড়াও না হাত
রৌদ্র আসে টপকে পাঁচিল, উঁচু বাড়ির ছাদ
তুলসিতলায় আলপনা দেয় ঘোমটা পরা বউ
সেখানেতে রৌদ্র পড়ে—
কুড়িয়ে বেড়ায় তোমার মতো কেউ।

মাঝি বউ

রসুল করিম

মাঝি ও তার নৌকোখানি জলরঙে
এঁকে চলে প্রেম
নদীচরে শুয়ে থাকা রোদ চোখ ঝলসায়
তাবৎ কংকাল জড়ো করে
দুখ তাড়ানোর গান গেয়ে যায় মাঝি।

তালপাতায় ছাওয়া পাখির কোটরে
মাঝিবউ ঘর মোছে
আঁচলে বাঁধে বুকের মানিক
হা-পিত্যেশে জ্বলে সাঁঝবাতি আলো।

গতকাল বৃষ্টি নামার কথা ছিল
নামেনি
শুধু মেঘে মেঘে ছয়লাপ চারিদিক

শেষরাতে আকাশ গর্জালে
মাঝিবউ উনুনে জল রাঁধে।

স্বপ্নভঙ্গের ক্ষোভ

অমল কর

দিঘল স্বপ্ন নিয়ে জীবন খুঁজতে
উন্নিসা ভল্ল-গাঁথা আকাশে
কাপালিক প্রহরেও প্রত্যহ স্কুলে যায়
শ্বপদসংকুল পথ-পেরোনোর অনিশ্চয়তায়
যেন এক শঙ্কিত-কম্পিত বনহরিণী...

পথের মোড়ে গজালি-মারা লাফাঙ্গা হেঁচকি-বোম্বারা
রাজার একান্ত 'অনুপ্রেরণায়'
রগরগে খিস্তি ওড়ায় উন্নিসার পথচলায়
বিকলাঙ্গ সময়ে ধ্বংসের দেশে ঘোড়াও অট্টহাসে
সাতঘোড়ার দাপাদাপি তখন উন্নিসার কলিজায়

বিভীষিকাময় অন্ধকারের অলজ্জ তাণ্ডব-হুল্লোড়ে
উন্নিসার মর্মবিদারী রক্তপাতে আর
বিলাপী অশ্রুর প্রবাহে দেশ ভাসে
স্বপ্নভঙ্গের একরাষ্ট্র ক্ষোভে আর গলিত লাভায়
উন্নিসার নগ্ন শব বিষণ্ণ হাসে ভেড়ির মাচায়।

খালিপায়ে পথে একটু হেঁটে বেড়ান

কালিদাস ভদ্র

খালি পায়ে পথে একটু হেঁটে বেড়ান

ফুটপাথে থাকা মেয়ে-বউদের
প্লাসটিক টাঙানো ঘরের পাশে খানিক বসুন।
কিছুক্ষণের জন্যে আপনার কবিতার খাতা
ইটের আঁখার তাপে সেঁকে নিন
কাঁধের ব্যাগ পেতে দিন আসনের মতো।

হাড়জিরজিরে আবার পোয়াতি বউটার
শুকনো কিসমিস স্তনে
দুধ না পাওয়া কোলের বাচ্চাটার কান্না
মনোযোগ দিয়ে আজ শুনুন।
খেতাব পাওয়ার জন্যে হাওয়াই চটির ধুলো
কবিতার শরীরে আর ছড়াবেন না
আপনার বুকের ডানদিকটায় দেখুন
কেমন ময়লা জমে দাগ পড়েছে

অন্যের বুকের ময়লা দাগ নিয়ে
আপনাকে ভাবতে হবে না আর
আপনার বুকের ময়লা দাগ নিয়ে ভাবুন,
সাথে নিজের ছেলের বুকে
যাতে সংক্রমণ না হয় লক্ষ্য রাখুন...

হুকুমের হুঁশ

অনাথ মুখোপাধ্যায়

তারামণ্ডলের চাঁদোয়ার নিচে
মুক্তকেশী অন্ধকার।
কোথায় লুকোবে মুখ, চেনা মুখ ঠেকেনা অচেনা
খাঁজকাটা সে মুখের বাহার
প্রশ্রয়ের প্রার্থনায় অসুখের সুখ
বলে ফেলে দলায় দুর্মুখ।

কিছুই ভুলি না, তাই ফিরে আসি বারংবার
তোমাতেই মিলি আর বিলি কাটি চুলে
ভালোবাসা, ভালো লাগার কোনো ব্যাখ্যা
তিথি নক্ষত্র দেখে সময় অপব্যয়

দিনগুলো পায়রার সুখ ও অসুখ
ঘরের কার্নিসে
ফাঁকফোঁকরে বকবকম রকমসকম,
যে যেমন পারে হাত করে অধর্মের ব্রতকথা
ভদ্রতার দয়ানিধি
অশান্ত মরশুমের মাশরুম,
যা বলেন তাই পাওয়া জো হুকুম বরদার!
হৃদয়ের অগোচরে অনুভব উথলায়
অথচ অক্ষরে হয়ে যায় তামাদি।

মায়া-মমতায় মজে মজা তাই
কালোর ভিতরে কাঁপে থরথর
ধিকিধিকি জ্বলে, পোড়ে তুঁষ
জনতার বুকে বাজে দুন্দুভি—
নয় যে বেহুঁশ।

মধ্যবিত্ত

প্রভাত ঘোষ

যেই না আমি হাত বাড়িয়ে
তোমার হাত ছুঁতে গেছি
অমনি দেয়াল
আড়াল করে তোমায়, আমায়।

তোমরা যখন ডাকলে আমায়
ওপারেতে যাবে বলে
যেই না পথে পা রেখেছি
অমনি দেয়াল
মাথা তোলে, পথ আটকায়।

যেই না তোমায় ছুঁতে গেছি
যেই না কোথাও যেতে গেছি
যেই না কথা বলতে গেছি
অমনি দেয়াল রুখে দাঁড়ায়।

আমায় তবু যেতেই হবে
কথা কিছু কইতে হবে
হাত তোমাদের ছুঁতেই হবে
আমারই দায়।

এবার তবে লাগুক দোলা
ভাঙুক প্রাচীর ঝোড়ো হাওয়া।

মিথ্যে তোমার লেখা

রঞ্জন দত্ত

শুনছো কবি, তোমায় বলছি, তোমায়,
লেখায় তো দিতে চাও জীবনের স্বাদ!
খবর রাখনি, সেই জীবনকে কোমায়
পাঠাতে চাইছে—উগ্র-মৌলবাদ?

হয়তো জেনেছো, তবু আছো নিশ্চুপ,
কারণ, এসবে নেই যে কাব্যগুণ!
বরাদ্দ আছে—মোমবাতি আর ধূপ
প্রতিবাদ করে কেউ হয়ে গেলে খুন।

প্রেমের লেখায় হাতটি তোমার পাকা,
বাজারে রয়েছে বেশ কয়েকটি বই,
বিক্রিও হয়, উসুল ছাপার টাকা,
কিন্তু, সত্যি-প্রেমিক হয়েছ কই?

ভক্তের সাজে ভণ্ডামিটাই বেশি,
অজুহাতে তাই দায়িত্ব হয় সারা!
শয়তানগুলো দেখিয়েছে যেই পেশি
ভয়েতে তোমার হারিয়েছে শিরদাঁড়া।

মিথ্যুক তুমি, মিথ্যে তোমার লেখা,
মিথ্যে তোমার এই কাব্যিক চাল!
অনেক জেনেও, হয়নি তোমার শেখা
কলম কখন হয়ে ওঠে তরোয়াল।।

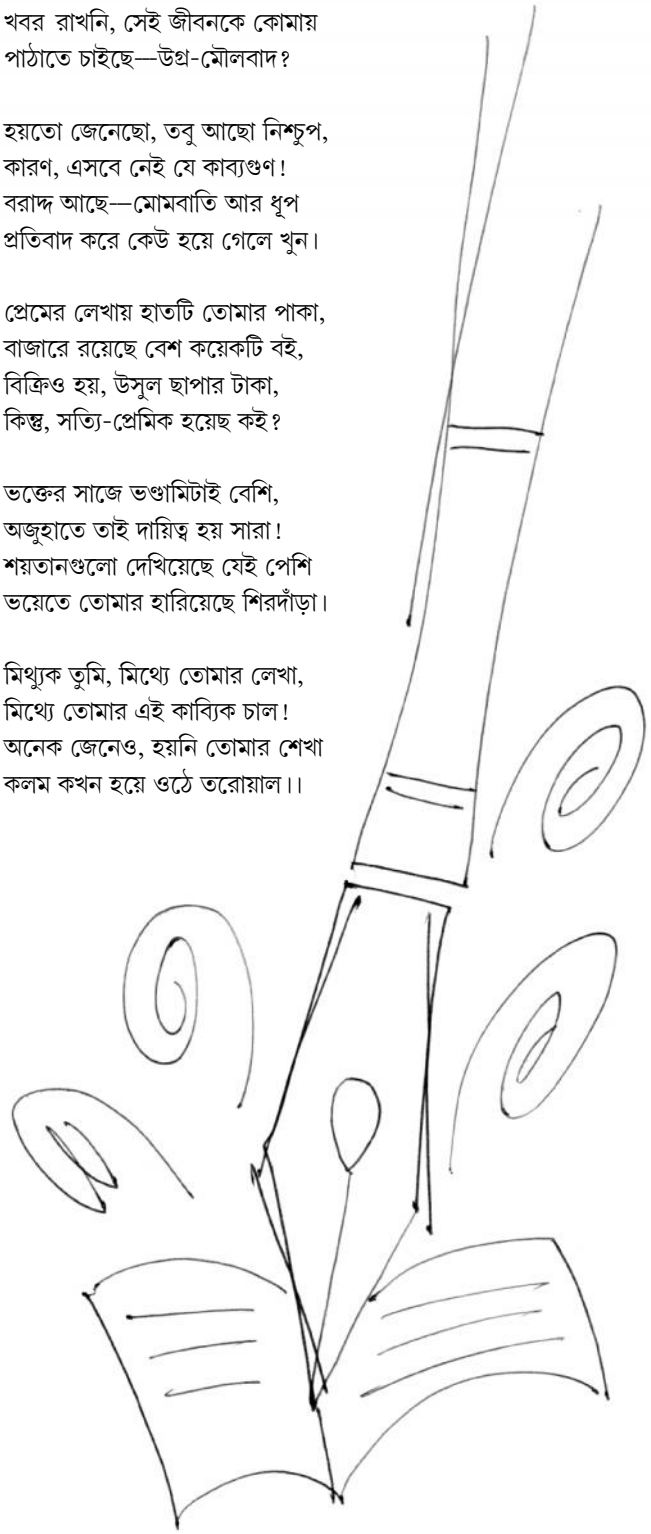

সহোদর

সুকান্ত দে

ত্রিশূল থেকে তরোয়াল থেকে কামান থেকে
লোহা এনে দাও
এদেশের অধিকাংশ মায়ের রক্তে
লোহার ঘাটতি আছে।

মধ্যবিত্ত অভিমন্যুর গল্প জানে,

মধ্যবিত্ত চক্রব্যূহের কথা আলোচনা করে,

মধ্যবিত্ত চা পান করে,

মধ্যবিত্ত কবিতা লেখে..

কবিতার প্রাচুর্যের কথা মাথায় রেখেই বলি
পশুটার কথা সেই সর্বাগ্রে বলেছিল,

যোগীর জন্ম অনেক পরে

পশুটা চেহারা বদলে ফেলে অনায়াসে।

দুঃশাসনের রক্ত থেকে লুফিয়ে ঢুকেছিল
ভীমের শরীরে,
মৃতের রক্তপান করেও
সে ধর্মের সহোদর।

বেবকুফ

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

ষড়ভুজ প্রেম
তার খ্যাপাটে ছেলেপিলেরা ছোটোরাস্তায় ভিক্ষে করে
আনুগত্য ও অবহেলা
দিনগুলো লালচে, স্যাটার্ন ডুবিয়ে চলে নৌকো
টগবগ ফুটে ওঠে ভেষজ প্রশান্তি

বিগত মুগ্ধতা রাত্রির কথা বলে
আমরা দালানের গায়ে আঁকিবুঁকি কেটে
হাসতে হাসতে ঢলে পড়ি একে অপরের গায়ে

ভেতর উপচে গোপন হাসি
নম্র মৃতরা তাদের ধরে রাখে সবুজ পরির মতো
কোনো ভাবনাই নতুন নয়, প্রেম ঈশ্বরকে লুফে নিয়ে
গোল হয়ে বসে যায় গাছের তলায়—প্রতিটি জীব
নারায়ণ ধরে রাখে

ভোর প্রসব করে সূর্য মিশে যায় উঠোনে
ভবঘুরে বিদেশি পাপীরা কনুন ভেঙে টুকে নেয় অনবদ্য ভুবন

অভাব শুধু একটিমাত্র পবিত্র ঘৃণার